জগদীশ গুপ্তের উপন্যাস : স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে
পিএইচ. ডি. উপাধির জন্য উপস্থাপিত
গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক
রঞ্জন রায়

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ড. নিখিল চন্দ্র রায়
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
নভেম্বর, ২০১৭

<u>ঘোষণা</u>

আমি **জগদীশ গুপ্তের উপন্যাস : স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান** শিরোনামে একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করেছি। এটি অধ্যাপক নিখিল চন্দ্র রায়ের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এই গবেষণাপত্রের কোন অংশই অন্য কোনো উপাধির জন্য দাখিল করা হয়নি। এটি আমার স্বরচিত এবং মৌলিক রচনা।

(রঞ্জন রায়)
গবেষক
বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং
সূচক - ৭৩৪০১৩

ড. নিখিল চন্দ্র রায়
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

ডাকঘর : নর্থ বেঙ্গল ইউনিভারসিটি
রাজা রামমোহনপুর, জেলা : দার্জিলিং
সূচক - ৭৩৪০১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

স্মারক নং : ....   তারিখ : ....

শংসাপত্র

রঞ্জন রায় আমার তত্ত্বাবধানে **জগদীশ গুপ্তের উপন্যাস : স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান** শিরোনামে একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করেছেন। যতদূর জানি এই অভিসন্দর্ভ তাঁর মৌলিক রচনা।

এটিকে আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. (বাংলা) পরীক্ষার জন্য দাখিল করার উপযুক্ত বিবেচনা করি। আমি রঞ্জন রায়ের সাফল্য কামনা করি।

ড. নিখিল চন্দ্র রায়
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং,
সূচক- ৭৩৪০১৩

Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

অধ্যাপক (ড.) নিখিল চন্দ্র রায়
অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

ডাকঘর : নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি
রাজা রামমোহনপুর, জেলা : দার্জিলিং
সূচক - ৭৩৪০১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

স্মারক নং : ....   তারিখ : ....

কুম্ভিলকবৃত্তি প্রতিরোধী শংসাপত্র

রঞ্জন রায়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে **জগদীশ গুপ্তের উপন্যাস : স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান** শিরোনামে আমার তত্ত্বাবধানে পিএইচ.ডি. গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছেন। আমার সর্বোত্তম জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী জ্ঞাপন করছি যে, গবেষক এই গবেষণাকর্মে কোনোরূপ কুম্ভিলকবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করেননি।

(অধ্যাপক (ড.) নিখিল চন্দ্র রায়)
অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং,
ডাকসূচক সংখ্যা- ৭৩৪০১৩

Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

সারসংক্ষেপ (Abstract)

বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রীয় রুচি, রূপ, রীতি ও বিশ্বাসকে অগ্রাহ্য ও বিচূর্ণ ক'রে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে যে পালাবদল শুরু হয়েছিল জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) ছিলেন তার প্রধান ঋত্বিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়কালে মানুষের জীবনে অনিবার্যভাবেই টিঁকে থাকার জন্য এসেছিল প্রবল গতির তাড়না। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালের ফসল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ আত্মস্বার্থ সর্বস্বতা, শ্রেষ্ঠত্ব লাভের ইঁদুর দৌড় প্রসূত পারস্পরিক সন্দেহ-হিংসা বিদ্বেষ-শোষণ-বঞ্চনা-প্রতারণার বিষবাষ্প ছেয়ে ফেলেছিল পৃথিবীর স্বচ্ছ-নির্মল-মুক্ত আকাশকে। জীবনের প্রতি পলে পলে প্রত্যাশার আলোক রশ্মি ম্লান থেকে ম্লানতর হয়েছে। এই অন্ধকার সময়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ব্যক্তি সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে নেমে এসেছে এক 'অদ্ভুত আঁধার'। সেই আঁধারে নিমজ্জমান মানুষের অন্তরের গহন লোকে প্রবেশ করে তাদের জীবনধারাকে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় সংবেদনশীল স্রষ্টারা লিপিবদ্ধ করে চলেছেন। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে সেই লিপিবদ্ধকরণের কাজটি উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শুরু হলেও সেই অর্থে জীবন সমস্যার অতলে পৌঁছতে পারেননি সেই সময়ের অন্যতম স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি মূলতঃ ইতিহাস ও ইতিহাসাশ্রিত রোমান্সধর্মী উপন্যাস, তত্ত্বকথা নির্ভর উপন্যাস আর অনেকটাই নীতিকথার রং চড়িয়ে তাঁর সামাজিক উপন্যাসগুলি লিখেছিলেন। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথই প্রথম মানব জীবন সমস্যার গভীরে ডুব দিয়ে তুলে এনেছেন চরিত্রদের 'আঁতের কথা'কে। কিন্তু ঔপনিষদিক ভাবনায় আলোকিত রবীন্দ্রনাথ মানব মনের অন্ধকার দিকটিতে সেভাবে আলোকপাত করেননি। রবীন্দ্রনাথের পরে শরৎচন্দ্র মাটি ঘেঁষা জীবনের কাছাকাছি মানুষের কথা তুলে এনেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে; কিন্তু সেখানেও ছিল ভাবাবেগের আতিশয্য। সেদিক থেকে শরৎচন্দ্রের 'মানসপুত্র' জগদীশ গুপ্তই প্রথম মানবজীবনের সেই অন্ধকার রাজ্যে নিয়ত বিচরণ করে তুলে এনেছেন আচরণের আড়ালের মানব চরিত্রকে।

১৮৮৬ সালের জুন মাসে তৎকালীন নদীয়া জেলার মহকুমা কুষ্ঠিয়া শহরের গড়াই নদীর তীরবর্তী আমলাপাড়ায় এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য পরিবারে লেখকের জন্ম। তারপর বিচিত্র

জীবন অভিজ্ঞতা লাভ। ব্যবসা থেকে শুরু করে আদালতে টাইপিস্টের চাকরী সূত্রে স্বচক্ষে দেখা গ্রাম থেকে শুরু করে শহরতলীর জীবনধারাকে তিনি অংকন করতে গিয়ে মানুষগুলির দারিদ্র, হতাশা, গ্লানির পাশাপাশি তাদের জৈবিক সম্পর্ক হিংসা-বিদ্বেষসহ জীবনের যাবতীয় ক্লেদ পঙ্কিলতাকে তুলির টানে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর উপন্যাসগুলিতে। মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'কলঙ্কিত তীর্থ' (১৯৬০) -কে তার শেষ উপন্যাস ধরলে তিন দশকেরও বেশী সময়ে তিনি মাত্র ১৭টি উপন্যাস লিখেছিলেন। কালানুক্রমের নিরীখে তাঁর উপন্যাসগুলি হল—

'অসাধু সিদ্ধার্থ' (১৯২৯)
'মহিষী' (১৯২৯)
'লঘুগুরু' (১৯৩১)
'রোমন্থন' (১৯৩১)
'দুলালের দোলা' (১৯৩১)
'যথাক্রমে' (১৯৩৩)
'তাতল সৈকতে' (১৯৩৩)
'সুতিনী' (১৯৩৩)
'রতি ও বিরতি' (১৯৩৪)
'গতিহারা জাহ্নবী' (১৯৩৫)
'দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা' (১৯৩৯)
'নন্দ আর কৃষ্ণা' (১৯৪৭)
'চৌধুরাণী' (১৯৪৭)
'আলুনী আলু' (১৯৫০)
'নিষেধের পটভূমিকায়' (১৯৫২)
'নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ' (প্রকাশকাল জানা যায়নি)
'কলঙ্কিত তীর্থ' (১৯৬০)

একদিকে রবীন্দ্রনাথ অন্যদিকে, কল্লোলীয়রা —এই বিপরীত পরিমণ্ডল নিয়ে যত গবেষণা

হয়েছে, সেই তুলনায় জগদীশ গুপ্তকে নিয়ে তেমনভাবে গবেষণার কাজ হয়নি। তাঁর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে আলোচিত এখনো পর্যন্ত তিন-চারটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ পাওয়া যায়। এইসব আলোচনা গ্রন্থ পাঠ করার পরেও মনে হয়েছে জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে, বিশেষ করে তাঁর উপন্যাসগুলির বিষয়গত স্বাতন্ত্র্য ও আঙ্গিকের অভিনবত্ব নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হওয়া দরকার—যাতে সমকালে প্রায় অবহেলিত লেখককে বর্তমানের নগদমূল্য দেওয়া যায়। সেজন্যই আমার গবেষণাকর্মের অবতারণা।

'জগদীশ গুপ্তের উপন্যাস : স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান' এই শিরোনামে আমার আলোচনাকে আটটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি। বিষয় ও আঙ্গিকের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করে ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন করার প্রয়াস করেছি। পর্যায়ক্রমে বিষয়গুলি হল—

প্রথম অধ্যায়	:	বাংলা উপন্যাসের সূচনা পর্ব : জগদীশ গুপ্তের পূর্বসূরীদের উপন্যাসের জগৎ।
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	জগদীশ গুপ্তের জীবন অভিজ্ঞতা : তাঁর উপন্যাসের ভিত্তি ভূমি।
তৃতীয় অধ্যায়	:	উপন্যাসে বর্ণিত সমাজ ধারায় প্রতিকূল স্রোত।
চতুর্থ অধ্যায়	:	সামাজিক নারী-পুরুষের সম্পর্ক : নতুন দিকের সন্ধান।
পঞ্চম অধ্যায়	:	অন্ধকার গলিপথের মানুষ : নিয়তির হাতের পুতুল।
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	চরিত্রদের মনোজগতের কুটিল বিসপিল গতি।
সপ্তম অধ্যায়	:	উপন্যাসের আঙ্গিক ও ভাষা : একটি স্বতন্ত্র নিরীক্ষা।
অষ্টম অধ্যায়	:	ঔপন্যাসিক হিসেবে মূল্যায়ন।

প্রথম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ হয়ে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের যে ধারা তাতে মানব জীবনের অন্ধকার গলিপথের যে নগ্ন বাস্তব দিক তা সচরাচর ধরা পড়েনি। সেই অনালোকিত জীবন ধারায় জগদীশ গুপ্ত কীভাবে আলো নিক্ষেপ করেছেন তাঁর উপন্যাসে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে লেখকের ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতা। জন্মেছিলেন গ্রামীণ

পরিবেশে। জীবন পথ মসৃণ না হওয়ায় অল্পকালের মধ্যেই কর্ম জগতে প্রবেশ করেন। বিভিন্ন স্থানের আদালতে টাইপিস্টের চাকরীসূত্রে বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন। সেই সঙ্গে বিভিন্ন ব্যবসার ব্যর্থ চেষ্টা আর চরম দারিদ্র্য সঙ্গী করে বেঁচে থাকা এবং তারই ফসল তাঁর রচনাগুলি।

তৃতীয় অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে প্রচলিত সমাজ ভাবনার কথা কেমন করে স্বীকৃতি পায়নি বরং পল্লী সমাজের কুৎসিত দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে উপন্যাসে বর্ণিত কাহিনীতে।

চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে নারী-পুরুষের সম্পর্কের মেরুকরণ। 'নারীকে আপন ভাগ্য জয়' কিংবা 'নারীর মূল্য'কে নস্যাৎ করে নিতান্ত জৈবিক তাড়নায় নারী-পুরুষের জীবন কীভাবে অসুস্থ চেতনাকেই লালন করেছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে ঈশ্বরের প্রতি জিজ্ঞাসু, সত্য-শিব ও সুন্দরের প্রতি অবিশ্বাসী মানুষগুলি কেমন করে ক্রমশ জীবনের রাজপথ ছেড়ে অন্ধকার গতিপথ অতিক্রম করেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে চরিত্রের 'আঁতের কথা'। মনোজগতের কুটিল বিসর্পিল গতি কীভাবে চরিত্রদের নিয়ে গেছে এক রহস্যময় জগতে সেকথা রয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে, জগদীশবাবুই প্রথম কীভাবে উপন্যাসের প্রচলিত ছক ভেঙ্গেছেন। তিনি প্লটকে গুরুত্ব দেননি, তাঁর বক্তব্যকে নিজের মতো করে সাজিয়ে দিয়েছেন। সেইসঙ্গে ভাষার ক্ষেত্রেও এনেছেন অনেক অভিনবত্ব।

অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে 'অনুপস্থিত লেখক' জগদীশবাবুকে তাঁর কালের নিরীখে তুলনামূলক বিচার ক'রে তাঁর সৃষ্টি ধারার স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধান। সমকালে তিনি স্বীকৃতি পাননি, কিন্তু ভবিষ্যতের সচেতন পাঠক-গবেষকের দৃষ্টিতে তাঁর মৌলিকতা চিহ্নিত হয়েছে।

প্রাক্‌কথন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতাটির সঙ্গে ছেলেবেলাতেই পরিচয় হয়েছিল। সেই ভৃত্য ছিল প্রভু-অন্ত প্রাণ। কিন্তু নয়ের দশকের সূচনায় কলেজে পড়তে এসে পরিচয় হয় এমন পুরাতন ভৃত্যের সঙ্গে যে প্রকাশ্য রাস্তায় ছুরি দেখিয়ে অনায়াসেই মণিবের টাকার ব্যাগ নিয়ে চম্পট দিয়েছে। কিংবা শুধুমাত্র পণের টাকার লোভে নিজের পুত্রবধূদের এক এক করে ওষুধ দেওয়ার নাম করে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে কবিরাজ কৃষ্ণকান্ত সেন শর্মা।

এমন উল্টো করে মানুষকে দেখেছিলেন যিনি তিনি আর কেউ নন, রবীন্দ্র-শরৎ পরবর্তী কথাকার জগদীশ গুপ্ত। অনার্সে তাঁর গল্পগুলি পাঠ্য থাকার সুবাদেই তাঁর লেখার প্রতি প্রথম আকর্ষণ জন্মেছিল। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়তে এসে পড়ে ফেলি 'লঘুগুরু' 'অসাধু সিদ্ধার্থ', 'নিষেধের পটভূমিকা'য় কিংবা 'কলঙ্কিত তীর্থে'র মতো ব্যতিক্রমী ধারার উপন্যাস। একটা অন্যরকম ভালো লাগা তৈরী হয়ে জগদীশ গুপ্তের প্রতি। ব্যক্তিগত জীবনে কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে বিচিত্ররকম মানুষ দেখার অভিজ্ঞতা লেখকের মতো তাঁর এই পাঠককেও অনেকটাই সমমেরুতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। স্বভাবতই শিক্ষান্তে জীবন জীবিকার তাগিদে নেমে পড়ায় দীর্ঘকাল বুকের মধ্যে স্বপ্নটা কেবল লালন-পালন করেছি জগদীশ গুপ্তকে নিয়ে গবেষণা করতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের নীতিবাগিশতা, রবীন্দ্রনাথের আনন্দবাদী ভাবনা, শরৎচন্দ্রীয় ভাবাবেগ কিংবা কল্লোলীয়দের যৌনতা নির্ভর নগ্ন বাস্তবতা থেকে একেবারে দূরত্বে অবস্থানকারী, আত্মপ্রচার বিমুখ এই লেখকের প্রতি নির্মল ভালোবাসাই আমাকে প্রনোদিত করেছে। আমার অগ্রজপ্রতিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নিখিলচন্দ্র রায়, আমাদের প্রিয় নিখিলেশ দা'র হাত ধরে আমার সেই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হতে দীর্ঘকাল সময় লেগে গেল। তবুও তো শেষ রক্ষা হলো। আমার গবেষণার অভিসন্দর্ভ তৈরী করতে পেরেছি জগদীশ গুপ্তের ঔপন্যাসিক প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য সন্ধান বিষয়ে।

জীবনকে একেবারে স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা একজন প্রায় অনালোচিত স্রষ্টার উপন্যাসগুলির মধ্যদিয়ে তাঁর প্রতিভার বিচার-বিশ্লেষণ করার আন্তরিক চেষ্টা করেছি। আমার

আলোচনার ক্ষেত্রটিকে আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। অধ্যায়গুলি হল—

প্রথম অধ্যায়	:	বাংলা উপন্যাসের সূচনা পর্ব : জগদীশ গুপ্তের পূর্বসূরীদের উপন্যাসের জগৎ।
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	জগদীশ গুপ্তের জীবন অভিজ্ঞতা : তাঁর উপন্যাসের ভিত্তি ভূমি।
তৃতীয় অধ্যায়	:	উপন্যাসে বর্ণিত সমাজ ধারায় প্রতিকূল স্রোত।
চতুর্থ অধ্যায়	:	সামাজিক নারী-পুরুষের সম্পর্ক : নতুন দিকের সন্ধান।
পঞ্চম অধ্যায়	:	অন্ধকার গলিপথের মানুষ : নিয়তির হাতের পুতুল।
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	চরিত্রদের মনোজগতের কুটিল বিসর্পিল গতি।
সপ্তম অধ্যায়	:	উপন্যাসের আঙ্গিক ও ভাষা : একটি স্বতন্ত্র নিরীক্ষা।
অষ্টম অধ্যায়	:	ঔপন্যাসিক হিসেবে মূল্যায়ন।

আমার এই গবেষণাকর্ম সম্পাদনের জন্য যিনি আমার তত্ত্বাবধায়ক ড. নিখিলচন্দ্র রায়, তিনি দীর্ঘকাল ধরে আমার সঙ্গে নানাভাবে বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা শুধু করেননি আমাকে বারবার তাগাদা দিয়েছেন কাজটি নিষ্পন্ন করার জন্য। কিন্তু কর্মব্যস্ততা আর পারিবারিক দায়বদ্ধতা বারবার আমাকে পিছিয়ে দিয়েছে। আজ বিশেষ করে মনে পড়ছে আমার মা-বাবার কথা। এই গবেষণার কাজ চলাকালীন যাঁদের আমি হারিয়েছি। প্রায় গুছিয়ে ওঠা পড়াশুনা আমার লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। সেই দিনগুলোর কথা মনে করে দু'চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। মা-বাবা আমার এই কাজ দেখে যেতে পারলেন না। এই শোকের কোনো সান্ত্বনা নেই। আমাকে নিরন্তর উৎসাহ জুগিয়েছে আমার স্ত্রী সীমা, পুত্র সোহম আর শাশুড়িমা, শ্যালক ও শ্যালকের স্ত্রী। ওরা আমার প্রতিদিনের কাজের প্রেরণা।

গবেষণার সূত্রেই যাঁদের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয় তাঁরা হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. অঙ্কুশ ভট্ট, ড. সুবোধকুমার যশ, ড. মঞ্জুলা বেরা, ড. উৎপল মণ্ডল, ড. দীপককুমার রায়, দর্শন বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. রঘুনাথ ঘোষ প্রমুখ। এঁরা নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন, তাগাদা দিয়েছেন আমাকে। নানা পরামর্শ পেয়েছি এঁদের কাছে।

আমার কলেজের সহকর্মী ড. মৃণালকান্তি সিন্‌হা, ড. আবু সিদ্দিক, ড. আজিজ আহমেদ, ড. সুব্রত দেবনাথ; আমার বিভাগীয় সহকর্মী আশীষ, অলোক, সনাতন, প্রিয়াংকা এরা সকলেই আমার কাজে নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। অধ্যক্ষ ড. হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য খোঁজখবর নিয়েছেন আমার কাজের অগ্রগতির। অসংখ্য গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রী আমার প্রেরণা। তারা চেয়েছে আমি কাজটি যেন শেষ করি। সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার তত্ত্বাবধায়কের সহধর্মিণী শ্রীমতী তন্দ্রা বর্মণ, অগ্রজপ্রতিম মালদা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক আবদুল সালাম সমু, আমার ছাত্র জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ রায়, অগ্রজপ্রতিম মেখলিগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক ভগীরথ দাস; কোচবিহার বি.টি. এণ্ড ইভিনিং কলেজের অধ্যাপক ড. উত্তম দত্ত, ড. জয়দীপ সরকার; কোচবিহার ঠাকুর পঞ্চানন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. উপেন্দ্রনাথ বর্মণ, অধ্যাপক বিভূতিভূষণ বিশ্বাস; মাথাভাঙ্গা কলেজের অধ্যাপক অনুজপ্রতিম শেখর সরকার—এমন অনেক গুণমুগ্ধ মানুষ আমার কাজের প্রেরণা যুগিয়েছে। সকলের প্রতি রইল আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের কাছ থেকেও সহযোগিতা পেয়েছি। বই সংগ্রহে সাহায্য করেছে গৌরীপুর আসাম, প্রমথেশ বড়ুয়া কলেজের অধ্যাপিকা শিল্পী রায়, কলকাতা ‘সোপান’ পাবলিশার্স -এর জয়জিৎ মুখার্জি, যিনি ‘লঘুগুরু’ বিষয়ক আমার আলোচনা গ্রন্থটির (জগদীশ গুপ্তের লঘুগুরু : স্বতন্ত্র নির্মাণ) প্রকাশক; সেইসাথে উল্লেখ করতে হয় সম্পূর্ণ অভিসন্দর্ভটির মুদ্রক প্রিয় বুবুন কুমার বর্মণ এবং প্রুফ সংশোধনে সাহায্য করেছে আমার ছাত্র তুফান রায়। এরা আমার আপনজন। এদের মিলিত প্রচেষ্টার ফসল এই অভিসন্দর্ভ।

রঞ্জন রায়

তাং : ০৯/১১/১৭ (রঞ্জন রায়)

সূচিপত্র

ভূমিকা			১-২
প্রথম অধ্যায়	:	বাংলা উপন্যাসের সূচনা পর্ব : জগদীশ গুপ্তের পূর্বসূরীদের উপন্যাসের জগৎ।	৩-৫০
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	জগদীশ গুপ্তের জীবন অভিজ্ঞতা : তাঁর উপন্যাসের ভিত্তি ভূমি।	৫১-৮৮
তৃতীয় অধ্যায়	:	উপন্যাসে বর্ণিত সমাজ ধারায় প্রতিকূল স্রোত	৮৯-১২২
চতুর্থ অধ্যায়	:	সামাজিক নারী-পুরুষের সম্পর্ক : নতুন দিকের সন্ধান	১২৩-১৫৬
পঞ্চম অধ্যায়	:	অন্ধকার গলিপথের মানুষ : নিয়তির হাতের পুতুল	১৫৭-১৮১
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	চরিত্রদের মনোজগতের কুটিল বিসর্পিল গতি	১৮২-২১৯
সপ্তম অধ্যায়	:	উপন্যাসের আঙ্গিক ও ভাষা : একটি স্বতন্ত্র নিরীক্ষা	২২০-২৬৪
অষ্টম অধ্যায়	:	ঔপন্যাসিক হিসেবে মূল্যায়ন	২৬৫-২৯৫
গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography) :			২৯৬-৩১১
আকরগ্রন্থ	:		
সহায়কগ্রন্থ	:		
নির্ঘণ্ট	:		৩১২-৩২৬

ভূমিকা

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রথমবর্ষে সেমিনার পেপার তৈরী করেছিলাম জগদীশগুপ্তের ছোটগল্প বিষয়ে। ‘জীবনের অন্ধকার দিক : গল্পকার জগদীশ গুপ্ত’। আমার সেই প্রবন্ধের ভূয়শী প্রশংসা করেছিলেন তৎকালীন বিভাগের প্রিয় অধ্যাপক তথা বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা সমালোচক ড. অশ্রুকুমার সিকদার। সেই থেকে আমার চেতনার ভূমিতে বীজ বপণ। তারপর যথারীতি দ্বিতীয় বর্ষে স্পেশাল পেপার হিসেবে ‘উপন্যাস ও ছোটগল্প’ নির্বাচন করি। জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে নিরন্তর অনুসন্ধান চলতে থাকে। তবে প্রায় অনালোচিত অনুপস্থিত লেখকের বইপত্র পাওয়া যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ছিল। দীর্ঘ সময় কেটেছে বইপত্র সংগ্রহ করতে। শেষ বইটা সংগ্রহ করেছি বাংলাদেশের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে আমার এক পরম আত্মীয়ের মাধ্যমে। ‘জগদীশ গুপ্ত’; আবুল আহসান চৌধুরী রচিত ছোট আকারের বইটি জগদীশ গুপ্ত বিষয়ে একটি মহামূল্যবান গ্রন্থ। অনিয়মিতভাবে জগদীশ গুপ্ত নিয়ে ভাবনা ধারা বইতে থাকে। যত পড়ছি, তত অবাক হচ্ছি। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ, কিংবা শরৎচন্দ্র থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদের কারও সঙ্গেই মেলে না। এক অদ্ভুত জীবন শিল্পী! উপন্যাসগুলো পড়ার পর থমকে যেতে হয় মানুষের অন্তর্গত স্বরূপ প্রত্যক্ষ ক’রে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অশ্রুবাবু তাঁর ‘আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস’ গ্রন্থে জগদীশ গুপ্তকে নিয়ে যে প্রবন্ধ লিখেছেন তাতে তিনি লেখকের রচনাকে বলেছেন ‘মনুষ্যধর্মের স্তবে নিরুত্তর’। সত্যিই কি তাই! বারবার নিজের কাছেই প্রশ্ন করেছি।

বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতা, সে অসফল ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে দেশের নানাস্থানের আদালতের টাইপিস্ট হিসেবে কত রকমের মানুষ যে লেখকের চোখে পড়েছিল। সেই মানুষদের আচরণের আড়ালে যে মানুষ বাস করে তাদেরই তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর ‘অসাধু সিদ্ধার্থ’ (১৯২৯) থেকে ‘কলঙ্কিত তীর্থ’ (১৯৬০) উপন্যাসে। শুধু বিষয়গত স্বাতন্ত্র্যে নয়, আঙ্গিকগত দিক থেকে পূর্বসূরীদের সঙ্গে কোনরকম মিল নেই। এমনকী তাঁর ‘লঘুগুরু’ উপন্যাসটির সমালোচনা নিয়েও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে প্রতি-উত্তরে অকপটে জানিয়ে দিয়েছিলেন সমালোচক আসামীকে

ছেড়ে আসামীর পিতাকে আক্রমণ করেছেন। এমন দৃঢ়চেতা, এমন অনমনীয় একজন জীবন শিল্পী।

ঘরেতে অন্নাভাব। প্রকাশককে লেখা দিয়ে অর্থ অগ্রিম নিয়েছেন। তারপর প্রকাশক প্রস্তাব পাঠাচ্ছেন গল্পটা একটু যদি 'রসঘন' করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে সেই লেখা ফেরৎ চেয়ে পাঠিয়েছেন। অন্যত্র ধার ক'রে সেই অগ্রিম টাকা মিটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তবু কাহিনীকে রদবদল করতে চান নি। তাঁর কোনো রচনারই প্রায় পুনরায় সংস্করণের কোনো তথ্য নেই। এমন আত্মপ্রচার বিমুখ মানুষ চিরটাকাল অন্তরালেই থেকে গেছেন। জন কোলাহলের মাঝে এসে 'সাফল্যের সার্টিফিকেট' প্রত্যাশা করেননি।

গবেষক হিসেবে আমার অনুসন্ধানী দৃষ্টি এমন স্রষ্টাকেই নির্বাচন করেছে। এবং বিষয় ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে কোথায় কোথায় তিনি তাঁর কালকে অতিক্রম করে আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক সেই প্রায় অনালোচিত অধ্যায় আমার আলোচনার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত তিনি বোধহয় আর মনুষ্যধর্মের স্তবে নিরুত্তর বা পলায়নবাদী থাকেননি। আজকের যন্ত্রণা জটিল সময়ে তাঁর সৃষ্টিগুলির প্রাসঙ্গিকতা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানেই তাঁর স্বতন্ত্রতা।

প্রথম অধ্যায়
বাংলা উপন্যাসের সূচনা পর্ব : জগদীশ গুপ্তের পূর্বসূরীদের উপন্যাসের জগৎ

"কোনো বস্তুরই ইতিবৃত্ত লিখতে গেলে বস্তুটি কি সে বিষয়ে একটা স্পষ্ট ধারণা নিয়ে আরম্ভ করতে হয়। উপন্যাস কি বস্তু তা নিয়ে বহু বছর ধরে পণ্ডিতদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক আছে। তাত্ত্বিকেরা যে ধারণা তৈরী করে তুলছেন, নতুন ঔপন্যাসিকেরা তা ভেঙে ফেলছেন। নতুন বোধ গড়ে উঠছে, তাও আবার পরিত্যক্ত হচ্ছে। অদলবদল এখনও চলছে, কারণ উপন্যাস সাহিত্যাঙ্গ হিসেবে সবচেয়ে তরুণ, গতিশীল, আগ্রাসী এবং জনপ্রিয়।"[১]
—ড. ক্ষেত্র গুপ্তের এই অভিমতের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকলে সাহিত্য শাখার রূপ হিসেবে উপন্যাস যে ক্রম পরিবর্তমান তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আসলে নিয়ত বদলে যাওয়া জীবনের নানা অভিঘাতই সাহিত্যে বর্ণিত হয় দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে স্ব স্ব ভাবে। সাধারণতঃ সবদেশের মত বাংলাদেশেও উপন্যাস লেখা হয়েছে গদ্যাকারে; অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। উপন্যাস যখন পুরনো খাত ছেড়ে নতুন নতুন খাতে বইতে বইতে আধুনিক কালের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে তখন বিশেষ লেখকের উপন্যাসের সৃষ্টির অভিনবত্ব, স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদির মূল্যায়ন করতে গেলে প্রথমেই তাঁর পূর্বসূরীদের রচনার দিকে অভিনিবেশ করতে হয়। আর তারও আগে বোধহয় সেই রূপটির উৎসস্থলেও কিছুটা আলোকপাত করা জরুরী হয়ে পড়ে। ভাষা ও সমাজ সংস্কৃতিগত বিভিন্নতা থাকলেও জীবনের নানা দিকের প্রতিফলন ঘটে থাকে সব দেশের সব ভাষার সাহিত্যে—সেই হিসেবে উপন্যাসেও। সেই অর্থে সার্থক বাংলা উপন্যাসের পূর্বসূরী ইংরেজী উপন্যাসের ক্ষেত্রভূমির স্বরূপও উন্মোচিত হয়ে যাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন পণ্ডিতবর্গের দ্বারা নির্ণীত উপন্যাসের সংজ্ঞা ও স্বরূপের বর্ণনার মধ্যে।

ক. "The actual term 'novel' has had a variety of meanings and implications at different stages. ... it is a form of story or prose narrative containing characters, action and incident, and perhaps, a plot."[২]

খ. "The term 'novel' is now applied to a great variety of writings that have in common only the attribute of being extended works of

fiction written in prose."[৩]

গ. "গল্প বলিবার ও শুনিবার প্রবৃত্তি মানুষের একটি স্বাভাবিক ধর্ম; এবং এই সর্বদেশ সাধারণ গল্পের মধ্যেই উপন্যাসের মৌলিক বীজ নিহিত ছিল। এই গল্প বলিবার বিশেষ একটি ভঙ্গীকে—গল্পের মধ্য দিয়া মানুষের প্রকৃত জীবনের ছবি আঁকিবার চেষ্টা, ঘটনা সংঘাতে তাহার চরিত্র স্ফুরনের উদ্‌যোগ, সামাজিক মানুষের মধ্যে যে অহরহঃ একটা আকর্ষন-বিকষণের দ্বন্দ্ব চলিতেছে তাহারই সূক্ষ্ম আলোচনা, ও এই দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যদিয়ে মনুষ্য জীবন সম্বন্ধে একটা বৃহত্তর, ব্যাপকতর সত্যকে ফুটাইয়া তোলা-—ইহাকেই উপন্যাস বলা যাইতে পারে।"[৪]

ঘ. "... শ্রেষ্ঠ উপন্যাস আখ্যানভাগ, চরিত্র চিত্র, পরিবেশ কল্পনা ও বাণীভঙ্গি মিলিয়া সুসম্বদ্ধ একটি শিল্পরূপ মাত্র। ইহার শ্রেষ্ঠত্ব লেখকের জীবন-দর্শনের উপর নির্ভর করে। যুগে যুগে উপন্যাসের বহির্গতরূপ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, যুগ-মানব পিপাসা বিভিন্ন রসসৃষ্টির দাবীও করিতে পারে, নব নব জিজ্ঞাসায় ঔপন্যাসিক জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিতে পারেন। কিন্তু দেখিতে হইবে, তাঁহার জীবন জিজ্ঞাসা (criticism of life) কতখানি গভীর করিয়া, বিস্তৃত করিয়া, সত্য করিয়া জীবন যুদ্ধে অবতীর্ণ নরনারীর ভাগ্যকে পরিস্ফুট করিয়াছে, তাঁহাদের ক্ষণ-প্রাণ জীবনকে চিরন্তণের মহিমা দান করিয়াছে।"[৫]

—এইভাবে প্রাচ্য বা পাশচাত্য যে কোন স্তরের পণ্ডিতদেরই অভিমত হোক না কেন, উপন্যাসে যে একটি কথা বা গল্প-মুখ্যতা থাকে, তা সকলেই স্বীকার করেছেন। বাংলা উপন্যাসের প্রথম যথার্থ স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রও উপন্যাস অর্থে 'রচা কথা' (দেবী চৌধুরাণী) বুঝেছিলেন। তবে জীবন যেহেতু নদীর মতই নানা খাতে পরিবর্তিত হয়, উপন্যাসও তেমনি নানা দিক পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে ক্রমশই বদলে গেছে। সেখানে কথার বিষয়টি বাহ্যরূপ পরিত্যাগ করে অন্তর্মুখী হয়ে উঠেছে। আবার উপন্যাসে চরিত্র ও ঘটনাবলীর চাইতে লেখকের জীবন প্রতীতিই মুখ্য হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস লিখতে গিয়ে লেখকের জীবন সম্পর্কিত ভাবনার কথাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এই বাহ্যরূপের পরিবর্তন ঘটে গেছে রবীন্দ্রনাথের হাতে যখন আমরা আধুনিক ভাবধারার ফসল হিসেবে উপন্যাসকে পেয়েছি। তিনি আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাস সম্পর্কে স্পষ্টতই লিখেছেন— "এবারকার গল্প বানাতে হবে এ যুগের কারখানা ঘরে। শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনো হত এখনো হয়, তবে কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা, অন্তত গল্পের এলাকার মধ্যে। এখানকার ছবি খুব স্পষ্ট, সাজ সজ্জায় অলংকারে তাকে

আচ্ছন্ন করলে তাকে ঝাপসা ক'রে দেওয়া হয়, তার আধুনিক স্বভাব হয় নষ্ট ।.... সাহিত্যের নব পর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাঁদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।"[৬]

আধুনিক কালের উপন্যাস 'ঘটনা পরম্পরার' পরিবর্তে চরিত্রদের অন্তর্গত বাস্তবতাকে প্রাধান্য দিয়েছে। বিশেষত্বগত এই বিবর্তনের পাশাপাশি বাংলা উপন্যাসের উৎস বীজ সন্ধান করতে গিয়ে বলা হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র মূলতঃ পাশ্চাত্যের উপন্যাস সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই বাংলা উপন্যাস লিখেছিলেন। অথচ বঙ্কিম যদি পাশ্চাত্য আদর্শকে অনুসরণ না করতেন, তাহলেও এদেশের যে নিজস্ব গল্প রচনার ধারা সমান্তরাল ভাবে বইছিল, সেই পথেই বাংলায় উপন্যাস লেখা হত। আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিগত সেই ধারার মূলান্বেষণ করা হয়েছে মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে, বিশেষ করে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে। এই কাব্যধারার বিশিষ্ট কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যে আধুনিক উপন্যাসের বিশেষত্বগুলি খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর নানা চড়াই-উৎরাই পূর্ণ জীবনপথ তাঁকে এই বৈশিষ্ট্যগুলি সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল। এবিষয়ে সমালোচক ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছেন—''মুকুন্দরামের 'কবিকঙ্কণচণ্ডী'তে স্ফুটোজ্জ্বল বাস্তবচিত্রে, দক্ষ চরিত্রাঙ্কণে, কুশল ঘটনা সন্নিবেশে ও সর্বোপরি আখ্যায়িকা ও চরিত্রের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ও জীবন্ত সম্বন্ধ স্থাপনে, আমরা ভবিষ্যৎ কালের উপন্যাসের বেশ সুস্পষ্ট পূর্বাভাস পাইয়া থাকি।... দক্ষ ঔপন্যাসিকের অধিকাংশ গুণই তাঁহার মধ্যে বর্তমান ছিল। এযুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই।"[৭]

—আসলে মুকুন্দ চক্রবর্তী কেবল সময়ের প্রভাব অতিক্রম করতে, অতীত প্রথার সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করতে কিংবা অতিলৌকিকতার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারেননি বলেই তিনি 'খাঁটি ঔপন্যাসিক' হতে পারেননি। কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাব যে, মুকুন্দের অনেক আগেই আদি-মধ্য যুগের প্রথম কাহিনী কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র রচয়িতার মধ্যেই এইসব গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক এই কাহিনীতে কবি বড়ু চণ্ডীদাস দক্ষ ঔপন্যাসিকের অনেক গণ্ডীই অতিক্রম করেছেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চোখের বালি'র সূচনায় যে 'আঁতের কথা' বের ক'রে দেখানোর দাবী করেছেন তারও পূর্বাভাস এই কাহিনী কাব্যটিতে পাওয়া যায়। পরকীয়া রাধার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কের যে

কৌণিকতা তাতে কৃষ্ণ চরিত্রের পাশাপাশি রাধারও বিবর্তন এবং এমনকী বড়াই চরিত্রটিরও অনেকটাই পরিবর্তিত রূপ লক্ষ্য করি। রাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে প্রেম তা মূলত দেহজ বাসনা প্রভূত হলেও শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের তিনটি বিবর্তিত রূপ দেখি। দানখণ্ডে সে 'কৃষ্ণ সতৃষ্ণঃ', নৌকাখণ্ডে 'কামি কৃষ্ণঃ' থেকে 'রাধাবিরহ' অংশে কবি তাঁকে বলেছেন 'গততৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ'। বড়াইকেও কবি একটি 'কুট্টিনী চরিত্র' রূপে শুরু করেছিলেন। কিন্তু স্নেহপ্রীতি মমতায় পরিপূর্ণ একটি মানবিক চরিত্ররূপে সম্পূর্ণ করেছেন। তবে সবচেয়ে মনস্তত্ত্বসম্মত ভাবে অঙ্কিত চরিত্র রাধা। আইহন পত্নী রাধার বয়ক্রমের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবি তাঁর মানসিক বিকাশটিকেও পূর্ণতা দিয়েছেন। 'তাম্বুল খণ্ডে' যে রাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমকে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তিনিই আবার ধীরে ধীরে কৃষ্ণের সঙ্গে দৈহিক মিলনে লিপ্ত হওয়া থেকে 'বংশী খণ্ডে' গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শুনে প্রেমে আকুল হয়ে উঠেছেন। কবি লিখেছেন—

''কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকূলে।।
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শব্দদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন।।''[৮]

এরপর রাধাবিরহ অংশে শ্রীকৃষ্ণ কংস বধের জন্য মথুরায় চলে গেলে রাধার যে বেদনার সুর তা ব্যক্তিগত গণ্ডীকে ভেঙ্গে সবদেশের সবকালের বিরহ বেদনার ধারার সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এইভাবে সমকালের বাস্তব জীবন, চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন আর কাহিনীর নিটোল বয়নে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস-ই ঔপন্যাসিকের মর্যাদা পেতে পারতেন। নিছক অলৌকিকত্ব আর কালগত-ভাষাগত সীমাবদ্ধতার জন্যই তা হয়ে ওঠেনি। তাঁকে ঔপন্যাসিক মর্যাদা দিতে গিয়ে ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা তাই লিখেছেন—

''ঔপন্যাসিকের দক্ষতায় আমরা কবিকঙ্কণ মুকুন্দকে সর্বদা অভিনন্দন জানাই। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের চরিত্র সৃষ্টির কথা তখন ভাবি না। ভাবলে দেখবো দোষে গুণে, ভালোয়-মন্দেয়, সার্থকতায়-ব্যর্থতায় রাধাকৃষ্ণের মতোই বড়ায়ি চরিত্র চিত্রণেও কবি আধুনিক ঔপন্যাসিকের পূর্বসূরীত্ব দাবী করতে সক্ষম।''[৯]

১৮০০ খ্রীঃ ৪ঠা মে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলা গদ্যের বিকাশ শুরু হয়। সেইসময় থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বকাল পর্যন্ত বাংলায় নকশা জাতীয় বচনা

যেমন রচিত হয়েছে তেমনি উপন্যাসোপম একাধিক রচনার সন্ধান আমরা পাই। এই ধারার প্রথম বিশিষ্ট রচনা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাবু উপাখ্যান’। ১৮২১ খ্রীঃ ২৪ শে ফেব্রুয়ারী এটি ‘সমাচার দর্পণ’ পত্রিকায় বেরিয়েছিল। এই লেখকেরই ‘নববাবু বিলাস’, ‘নববিবি বিলাস’ কিংবা ‘কলিকাতা কমলালয়’ —এগুলি সবই উনিশ শতকের সূচনালগ্নের কলকাতার বাবু শ্রেণীর জীবনের বিক্ষিপ্ত চিত্রণ। ১৮৫২ খ্রীঃ প্রকাশিত হয় হ্যানা ক্যাথারিণ ম্যুলেন্সের ‘ফুলমণি ও করুণার বিবরণ’। মূলতঃ খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও এখানে ফুলমণি আর করুণার জীবনের যে ছবি লেখিকা ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে রচনাটি হয়ে উঠেছে প্রাক্-বঙ্কিম পর্বের অন্যতম রচনা। চরিত্রসৃষ্টি, পরিবেশ বর্ণনা আর ভাষার সাবলীল প্রয়োগে এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হয়ে উঠতে পারতো। কিন্তু ঘটনা ও চরিত্রের নানা অসংগতির কারণে তা হয়ে ওঠেনি। এই পর্বের অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ (১৮৫৭) -এর অন্তর্গত দুটি গল্প ‘সফল স্বপ্ন’ ও ‘অঙ্গুরীয় বিনিময়’; লাল বিহারী দে’র ‘চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান’ (১৮৫৯); কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের ‘দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ’ (১৮৫৮); আর ‘বিচিত্র বীর্য’ (১৮৬২); মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের ‘সুশীলার উপাখ্যান’ (১৮৫৯-৬০); কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘হুতোম প্যাঁচার নক্শা।’ (১৮৬১-৬২); গোপীমোহন ঘোষের ‘বিজয় বল্লভ’ (১৮৬৩) ইত্যাদি। তবে এই সময়ের সবচেয়ে উপন্যাসের কাছাকাছি রচনা হিসেবে যেটি গ্রহণযোগ্য হবার দাবী রাখে তা হল প্যারীচাঁদ মিত্রের ‘আলালের ঘরের দুলাল’ (১৮৫৮)। এতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকের কলকাতার ও শহরতলীর জীবন চিত্র বর্ণিত হয়েছে। কুশিক্ষা ও সৎসঙ্গের অভাবে মানুষের অধঃপতন এবং যথোচিত শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের ফলে সেই অধঃপতন থেকে মুক্তি—মতিলাল চরিত্রটির বিবর্তনের মধ্যদিয়ে লেখক এটাই তুলে ধরেছেন। রচনাটিকে উপন্যাসের মর্যাদা দিতে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন— “উপন্যাসের আদি সূচনা ‘করুণা ও ফুলমণি’তে হইলেও উহার সার্থক পরিণতি সম্ভাবনাময় আরম্ভ ‘আলাল’-এ। এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে আলালের ঘরের দুলাল’ই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সমধিক উপন্যাসের লক্ষণ বিশিষ্ট। এই শ্রেষ্ঠত্ব বাস্তব বর্ণনা চরিত্র চিত্রণ ও মনন শীলতা সমস্ত দিকেই পরিস্ফুট। ‘... আলালের ঘরের দুলাল’ই বোধহয় বঙ্গভাষায় প্রথম সম্পূর্ণবয়ব ও সর্বাঙ্গ সুন্দর উপন্যাস।”[১০] অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই দাবীর সঙ্গে অনেক সমালোচকই সহমত হতে পারেননি। কেননা পূর্ণাঙ্গ

উপন্যাস হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে রচনাটির কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল—

- এর প্লট বা আখ্যানভাগ খাপছাড়া রকমের।
- মূল কাহিনী প্রায়ই অবান্তর ঘটনায় আচ্ছন্ন হয়ে তার গতিকে শ্লথ করে দিয়েছে।
- অধিকাংশ চরিত্রের ভূমিকাই অপরিণত, অস্ফুট অথবা ক্ষণদৃশ্য। ব্যতিক্রম ঠকচাকা চরিত্রটি।
- নারী চরিত্রগুলি ভূমিকার একেবারেই অবহেলিত হয়ে পড়েছে।
- উপন্যাসে আকাঙ্ক্ষিত প্রণয় রসের স্পর্শমাত্র নেই।
- ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়া চরিত্রের পরিবর্তনে সহায়তা করে না।

এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতির উপস্থিতি লক্ষ্য করে সমালোচক ড. সুকুমার সেন মূল্যায়ন করে বলেছেন— ‘‘আলালের ঘরের দুলাল প্যারীচাঁদের সর্বাপেক্ষা সার্থক রচনা। বইটির নামেই উদ্দেশ্যমূলকতা ধরা পড়িয়াছে। যদিও কাহিনীর ধারাবাহিকতা উপন্যাসের মতোই তবুও কয়েকটি কারণে বইটিকে রীতিমত উপন্যাস বলা চলে না।’’[১১] এইভাবে রচনাটির উপন্যাস কৌলিণ্য খর্ব হলেও এর বাস্তবধর্মী কাহিনী, সরস কৌতুকরস, বাক্‌রীতির চপলতা টাইপ চরিত্র চিত্রণের নিরীখে এটিকে বাংলা উপন্যাসের পূর্বাভাস রূপে গ্রহণ করা যায়।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘ ছয় দশকেরও বেশী সময় অতিক্রান্ত হলে বাংলা উপন্যাস ভ্রূণ অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছিল তার স্বভূমির মৃত্তিকায়। সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্র হঠাৎই বাংলা উপন্যাসকে ভিন্নমুখী করে তোলেন। মূলতঃ পাশ্চাত্য রীতির প্রভাবে তিনি বাংলা উপন্যাসের নিজস্ব স্থায়ী পথনির্মাণ করে দিলেন। সেই পরমক্ষণটি ১৮৬৫ খ্রীঃ। তাঁর আগের বছর আত্মপ্রকাশ করেছে 'Indian field' পত্রিকায় লেখকের 'Rajmohan's wife' (1864)। তবে ‘দুর্গেশনন্দিনী’ (১৮৬৫) থেকেই বঙ্কিমের নিজের তথা বাংলা উপন্যাসের নিজস্ব পথ পরিক্রমা সূচিত হয়েছে। ১৮৬৫-১৮৮৭ দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশী সময় ধরে বঙ্কিমের ছোট বড় মিলিয়ে উপন্যাসের সংখ্যা চোদ্দটি। উনিশ শতকের নবজাগরণ প্রসূত বাংলাদেশের সমাজ জীবনের অন্যতম প্রাণপুরুষ হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র যখন এইসব উপন্যাসগুলি লেখেন—তারমধ্যে লেখকের অন্তর্গত সত্তার এক প্রবল দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয় অনিবার্যভাবে। এই দ্বন্দ্বের মূলকথা হল নবজাগরণের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে প্রগতিশীলতার পথে এগিয়ে যাওয়া — নাকি রক্ষণশীল ভাবনার গণ্ডীতেই আবদ্ধ থাকা। বঙ্কিমের মধ্যে এই

দুইয়ের সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। তিনি তাঁর উপন্যাসগুলিতে সেই দ্বন্দ্বকেই বড় ক'রে তুলেছেন। সেইসঙ্গে তাঁর উপন্যাসে বাস্তবতানুগতির দিকটি বড় হয়ে ওঠেনি কখনোই। 'রাজসিংহ' (১৮৮২) উপন্যাসটিকে বাদ দিলে তাঁর বাকী উপন্যাসগুলি বাংলাদেশের পরিচিত পরিমণ্ডলের জীবন নিয়েই রচিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলিতেও বাস্তবতার দিকটি বড় হয়ে ওঠেনি। এর পেছনে কারণ খুঁজতে গেলে প্রথমেই দেখা যাবে শিল্পীর নিরপেক্ষতার পরিবর্তে তাঁর নীতিবাগীশ মনোভাব। প্রসঙ্গত তিনি সাহিত্য সৃষ্টির পেছনে দুটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যের কথা বলেছিলেন তাঁর উত্তরসূরীদের উদ্দেশ্যে লক্ষ্য করে—

■ "যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে না। লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে।"[১২]

■ "টাকার জন্য লিখিবেন না। ইউরোপে এখন অনেক লোক টাকার জন্যই লেখে এবং টাকাও পায়; লেখাও ভাল হয়। কিন্তু আমাদের এখনও সে দিন হয় নাই। অর্থের উদ্দেশ্যে লিখিতে গেলে, লোকরঞ্জন প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া পড়ে।"[১৩]

■ "যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। ... সত্য ও ধর্ম্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ মহাপাপ।"[১৪]

নতুনদের প্রতি লেখকের এই নিবেদন থেকেই পরিস্কার যে, তিনি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই সাহিত্য সৃষ্টির কথা ভাবতেন। নিছক অর্থ-যশ প্রাপ্তি তাঁর লক্ষ্য ছিল না। তিনি মূলতঃ দুটি লক্ষ্য মাত্রা রেখেই সাহিত্য চর্চা করেছেন—

■ সৌন্দর্য সৃষ্টি এবং সমাজের মঙ্গল সাধন। এর অন্যথা হলেই তা পাপে জর্জরিত হবে। ফলে লেখকের যাবতীয় সৃষ্টির বিশেষভাবে উপন্যাস সাহিত্যে এই উদ্দেশ্যমূলকতা পরিলক্ষিত হয়। তাঁর উপন্যাসগুলির গভীরে অবগাহণ করলে দেখা যাবে তিনি এর অন্যথা হতে দেননি। সমাজবাস্তবতা, নরনারীর সম্পর্কের টানাপোড়েন ইত্যাদি একেবারেই গৌণ ব্যাপার ছিল। যতটুকু ছিল তা তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই। এই ভাবনার সমর্থন পাই ড. সুকুমার সেনের বক্তব্যেও— "বঙ্কিমের উপন্যাসে বাস্তব-অনুগতির স্থান কখনোই প্রধান নয়। তাঁহার অঙ্কিত মেয়ে-পুরুষ নিজেদের প্রণয় স্বপ্নে সমাহিত, হৃদয়ারণ্যে তাহাদের বাস, প্রতিদিনকার ঘরকন্নার কাজে তাহাদের দেখা যায় না। তাই হৃদয় দ্বন্দ্বের ও প্রণয় ব্যাকুলতার

বাহিরে যে বৃহৎ কর্ম ও ভাব জীবন পড়িয়া রহিয়াছে সেখানে তাহাদের দেখা নাই। মাঝে মাঝে যেটুকু গৃহস্থালির বর্ণনা পাই সেটুকু রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপটের মতো অচল ছবি নায়ক-নায়িকার জীবন সংযোগ সেগুলিতে নাই।"[১৫]

—স্বভাবতই বঙ্কিমী ভাবনার এই দিকটির প্রতি লক্ষ্য রেখেই তাঁর উপন্যাসগুলির উপর আলোকপাত করা যেতে পারে। সমালোচক অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমের উপন্যাসগুলিকে বিষয়ের নিরীখে মূলতঃ বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছিলেন—

■ উপন্যাস ও রোমান্স : উপন্যাসে novel এবং romance বলে যে দুটি প্রধান ভাগ আছে, বঙ্কিমের উপন্যাসেও সেই দুটি ভাগ রয়েছে। প্রসঙ্গত অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় novel এবং romance এর তুলনা টেনে বলেছেন— "Novel অবিমিশ্রভাবেই বাস্তব, ইহার মধ্যে কল্পনার ইন্দ্র-ধনুরাগ সমাবেশের অবসর অত্যন্ত অল্প। ইহার প্রধান কাজ সমসাময়িক সমাজ ও পারিবারিক জীবন চিত্রণ।..। Romance -এর বাস্তবতা অপেক্ষাকৃত মিশ্র ধরণের; ইহা জীবনের সহজ প্রবাহ অপেক্ষা তাহার অসাধারণ উচ্ছ্বাস বা গৌরবময় মুহূর্তগুলির উপরেই অধিক নির্ভর করে।"[১৬]

—এই পার্থক্য যাই থাক না কেন, অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমের যেসব উপন্যাসকে রোমান্সের অন্তর্ভুক্ত করেছেন সেগুলি হল—

'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫)
'কপাল কুণ্ডলা' (১৮৬৬)
'মৃণালিনী' (১৮৬৯)
'যুগলাঙ্গরীয়' (১৮৭৪)
'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫)
'রাজসিংহ' (১৮৮১)
'আনন্দমঠ' (১৮৮৪)
'দেবীচৌধুরাণী' (১৮৮৪)
'সীতারাম' (১৮৮৭)

অবশ্য এই সমস্ত উপন্যাসে রোমান্সের উপাদান সমানভাবে ছিল না। অন্ততঃ 'চন্দ্রেশেখর', 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'— এই চারটি উপন্যাসে আবার রোমান্সের আতিশয্য

লক্ষ্য করেছিলেন অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেছেন 'রাজসিংহ'কে। আর 'ইন্দিরা' (১৮৭৩), 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭২), 'রজনী' (১৮৭৭) এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) -কে বলেছেন 'সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস। বাস্তবিক এই ধরণের মেরুকরণ যথার্থ নয়। কেননা বঙ্কিমের কোন উপন্যাসকে সম্পূর্ণ বাস্তব বা সম্পূর্ণ কল্পনাত্মক বলা সম্ভব নয়। কল্পনা ও বাস্তবের মেলবন্ধন ঘটে গেছে বলে রোমান্স রচনাগুলিতে নভেলের বৈশিষ্ট্য এবং বিপরীতটাও পরিলক্ষিত হয়। 'কপালকুণ্ডলা' একমাত্র রোমান্স আর 'রাজসিংহ' একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস।

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেণীকরণকে না মেনে উত্তরকালে কোন কোন সমালোচক বঙ্কিমের উপন্যাসগুলিকে মূলতঃ চারটি ভাগে ভাগ করেছেন।

সামাজিক ও সাংসারিক উপন্যাস : বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, রজনী এবং কৃষ্ণকান্তের উইল।

ঐতিহাসিক উপন্যাস : রাজসিংহ।

ধর্মাত্মক উপন্যাস : আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী এবং সীতারাম।

জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেমের উপন্যাস : এই শ্রেণীতে আবার আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী এবং সীতারাম -এর উল্লেখ করা হয়েছে। এই মেরুকরণ থেকেও বোঝা যায় যে এটিও যথাথথ নয়। কেননা এক্ষেত্রে দুর্গেশনন্দিনী, যুগলাঙ্গরীয়, চন্দ্রশেখর আর রাধারাণীকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আবার অন্যভাবে দেখলে বলা যায় 'রাজসিংহ' ঐতিহাসিক উপন্যাস কিন্তু 'দুর্গেশনন্দিনী', 'চন্দ্রশেখর' আর 'সীতারাম' উপন্যাসেও তো ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু 'আনন্দমঠ'-এ ইতিহাস নেই, এমনটা বলা যাবে না। 'মৃণালিণীতে বাংলাদেশের সাতশ' বছরের সামাজিক ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে। এরকম বিষয়গত শ্রেণীবিন্যাস যাই করা হোক না কেন—তা পুরোপুরি পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে না কখনোই। একমাত্র 'রাজসিংহ' উপন্যাসটি যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস। লেখক নিজেই এবিষয়ে স্পষ্ট করে লিখেছেন— "... আমি পূর্ব্বে কখনো ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।"[১৭]

বিষয় ভাবনার ভিত্তিতে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির শ্রেণীকরণ যাই হোক না কেন এবং সেটা নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত সমালোচক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ক'রে যেসব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, তার নিরীখে বলা যায় উপন্যাসগুলি মূলত ইতিহাসাশ্রিত, ঐতিহাসিক, রোমান্সধর্মী, তত্ত্বমূলক

এবং সামাজিক পারিবারিক দলিল। তবে সে দলিল কতটা বাস্তব জীবন ঘেঁষা আর কতটা আদর্শায়িত তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। পাশাপাশি বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যভাবে উল্লেখ করতে হয় আঙ্গিকগত দিকটির কথাও। এই আঙ্গিক বা গাঠনিক দিকটি নিয়ে পর্যালোচনা করে সমালোচক ড. সুকুমার সেন আবার পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন—

ক. ‘‘বিবাহের পূর্বে প্রণয় সঞ্চার বা পূর্বরাগ। রূপকথা ছাড়া বঙ্কিম-পূর্ব আখ্যায়িকায় পূর্বরাগ অভাবিত ছিল। ... দুর্গেশনন্দিনীতে পূর্বরাগ আদ্যন্ত জুড়িয়া আছে।... রজনী অন্ধ বালিকা, সুতরাং তাহার পূর্বরাগে দোষ নাই। কপালকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখর, ইন্দিরা, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম —এগুলিতে পূর্বরাগ (একতরফা ও দোতরফা) চলিয়াছে বিবাহের পরে।’’[১৮]

খ. চন্দ্রশেখর আর রজনী উপন্যাসের নায়িকাদের বাদ দিলে অন্য উপন্যাসগুলিতে নায়িকা চরিত্রের কোনো দ্বন্দ্ব নেই বললেই চলে। এগুলিতে দ্বন্দ্ব মূলতঃ নায়কের। আবার কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, ইন্দিরা, রাজসিংহ উপন্যাসে নায়কেরা দ্বন্দ্ব শূন্য প্রায় ব্যক্তিত্ব মাত্র।

গ. সাধু-সন্ন্যাসীসহ অলৌকিক ঘটনা ইত্যাদির প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব দুর্বলতা বরাবরই ছিল। তিনি নিজে বিশ্বাসও করতেন এসব। ফলে তাঁর অনেক উপন্যাসেই (কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, রজনী ইত্যাদি) এইসব মানুষ ও ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এই অলৌকিকত্ব বিষয়ে বঙ্কিমের একটি সুস্পষ্ট অভিমত ছিল। তিনি জানিয়েছেন— ‘‘কাব্যে অতিপ্রকৃতের সংস্থানের উদ্দেশ্য এবং উপকার এই এবং তাহার নিয়ম এই যে, যাহা প্রকৃত তাহা যেসকল নিয়মের অধীন, কবির সৃষ্ট অতিপ্রকৃতও সেই সকল নিয়মের অধীন হওয়া উচিত।’’[১৯]

ঘ. অধিকাংশ উপন্যাসে দুটি ক’রে সমান্তরাল প্রেম কাহিনী একটি মুখ্য, অপরটি গৌণ। অবশ্য মৃণালিনী ও চন্দ্রশেখরে কাহিনী দুটিতে সমান্তরাল সামঞ্জস্য নেই। আবার কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকাণ্ডের উইল এবং দেবী চৌধুরাণীতে দুটি প্রণয় কাহিনীর পরিবর্তে নায়কের একাধিক পত্নী ও প্রেমাস্পদ আছে।

ঙ. সংসারের সঙ্গে নায়িকাদের যোগ খুবই ক্ষীণ, তাদের অবস্থান মূলতঃ হৃদয় রাজ্যে। আর নায়কেরা ততটাই অবাস্তব নয়। কিন্তু নারী চরিত্রের তুলনায় পুরুষ চরিত্র এতটা অপরিণত যে সেগুলিও ঐতিহাসিক বাস্তবতার বাইরে।

বাংলা উপন্যাসের প্রথম নির্মাতা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মনন, কল্পনা, সমাজচেতনা আর সাংবাদিকের সমন্বয় ধর্ম নিয়ে উপন্যাসের যুগোপযোগী মূর্তিটি গড়েছিলেন। উত্তরসূরীর সৃষ্টির ক্ষেত্র কতটা বিস্তার লাভ কিংবা ভিন্নপথগামী হয়েছে, তার যথার্থ মূল্যায়ণ সম্ভব হবে বঙ্কিমের গড়া প্রতিমার স্বরূপ নির্ণয়ের পথ ধরেই। বিষয়গত বৈচিত্র্যের নিরীখে বঙ্কিমের উপন্যাসগুলো মূলতঃ তিন শ্রেণীর— ■ ইতিহাসাশ্রিত ও ঐতিহাসিক, ■ পরিবার ও সমাজ ধর্মকেন্দ্রিক এবং ■ তত্ত্বমূলক উপন্যাস।

মধ্যবর্তী ধারাটিকে বেষ্টন ক'রে আছে প্রান্তের ধারা দুটি। উনিশ শতকীয় রেনেসাঁর আলোয় আলোক প্রাপ্ত বঙ্কিম মূলতঃ স্ববিরোধিতার দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। এর পেছনে ছিল সমকালের শিক্ষিত বাঙালীর চিত্তের দোলাচলবৃত্তি। সমালোচক ড. জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এই দিকটির প্রতি আলোকপাত করে লিখেছেন— ''উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির চিত্ত কোনো অবস্থাতেই পুরানো অভ্যাস থেকে উন্মুলিত হয়ে পূর্ণ প্রগতিবাদে স্নান করে ওঠেনি। পুরানো শিক্ষা সংস্কারে দৃঢ় প্রোথিত সাবেকি মন নূতন যুগের বাণীকে সীমাবদ্ধভাবে ঠিক যতটা বহন করে চলতে পারে, বঙ্কিমী সাহিত্যে তারই একটা গড়পড়তা হিসাব পাওয়া যাবে।''[২০]

মানব সভ্যতার ক্রম বিবর্তনের ধারাবাহিক বিবরণই হল ইতিহাস। গাছ যত দীর্ঘতর হয় তার শিকড়ও তত গভীরে প্রবেশ করে, তাহলেই সেই গাছ শত বিপর্যয়েও দাঁড়িয়ে থাকে মাথা উঁচু করে। একইভাবে একটি জাতির শিকড় হল তার ইতিহাস। বাঙালী জাতির দুর্বলতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বঙ্কিম বুঝেছিলেন বাঙালীর ইতিহাস নেই, তার উজ্জীবনের জন্য দরকার ইতিহাস। সতেরজন অশ্বারোহী নিয়ে বখতিয়ার খলজির বাংলাদেশ দখলের আজগুবি গল্পকে আমাদের ইতিহাস বলে মান্যতা দিতে হয়েছে। এই ইতিহাসের রচয়িতা বাঙালী নয় বলেই এরূপ বিভ্রান্তি। এরকম একটা জাতির জীবনকে পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। তাঁর কমলাকান্ত চক্রবর্তী আফিম খেয়ে জাতির দৈন্যদশা প্রত্যক্ষ করে আক্ষেপ করেছিল। এরকম ইতিহাসাকাঙ্ক্ষী বঙ্কিম স্বভাবতই ইতিহাসের আশ্রয়েই তাঁর প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) লিখলেন। ষোড়শ শতকের শেষভাগে উড়িষ্যার অধিকার নিয়ে মোগল পাঠানের যে যুদ্ধ তারই পটভূমিকায় এই উপন্যাসটি রচিত। এই যুদ্ধের পরিণাম বিচিত্র করতে গিয়ে জগৎ সিংহ তিলোত্তমা-আয়েষা এবং ওসমার-খাঁর প্রেম, পাশাপাশি বিমলা ও বীরেন্দ্র সিংহের অস্ফুট সম্পর্ককে লেখক নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন।

‘কপালকুণ্ডলা’ (১৮৬৬) উপন্যাসে রোমান্স রসের প্রাধান্য থাকলেও এর পটভূমিও মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলের শেষাংশ। মোগল হারেমের মতিবিবি এবং কপালকুণ্ডলার দ্বন্দ্ব আর নবকুমারের নিষ্ক্রিয় পৌরুষকে কেন্দ্র করে এর রোমান্স রস ঘনীভূত হয়েছে। তুর্কী বিজয়ের গল্পকে নিয়ে লেখা ‘মৃণালিনী’ (১৮৬৯)। এয়োদশ শতকের প্রারম্ভেই বাংলায় যে তুর্কী আক্রমণ হয়েছিল তারই পটভূমিকায় উপন্যাসটি রচিত। সতেরজন অশ্বারোহী নিয়ে বঙ্গ বিজয়ের এই গালগল্পের পাশাপাশি মৃণালিনী ও হেমচন্দ্রের জীবন জটিলতা আর মনোরমা-পশুপতির রহস্যময় দ্বান্দ্বিকতাকে লেখক চিত্রিত করেছেন। ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘যুগলাঙ্গরীয়’ (১৮৭৪) উপন্যাসটির ঐতিহাসিক পটভূমি তাম্রলিপ্ত। এটিকে অনেকে ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স বলেছেন। ইতিহাস এখানে ঘটনা বস্তুতে নিয়ন্ত্রণ করেনি; সামান্য স্পষ্ট করেছে মাত্র। এরপর পলাশী যুদ্ধের অবসানে মীরকাশিম ও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় ‘চন্দ্রশেখর’ (১৮৭৫) উপন্যাসটি লিখেছিলেন বঙ্কিম। এখানে যদিও চন্দ্রশেখর শৈবলিনী-প্রতাপ কেন্দ্রিক মূল কাহিনীটি কাল্পনিক। সেইসঙ্গে মীর কাশিম দলনী বেগম গুরগনআমিয়েটের গল্পও ছদ্ম ঐতিহাসিক। এইসব ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসে লেখক অতীত জীবনের গুপ্ত রহস্য সন্ধান করতে গিয়ে ইতিহাসের সত্যের পাশাপাশি কল্পনাকেও প্রাধান্য দিয়েছেন। এগুলি যে পুরোপুরি ইতিহাস ভিত্তিক উপন্যাস নয়, কিংবা তিনি ইতিহাসের মূল সত্য উদ্‌ঘাটন করতেও নামেন নি—সেকথা আমরা বুঝতে পারি যখন তাঁর ‘রাজসিংহ’ (১৮৮২) উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল। দিল্লীর সম্রাট ঔরঙ্গজেব ও পার্বত্য রাজা রাজসিংহের চঞ্চলকুমারীকে কেন্দ্র করে বিরোধ ঔরঙ্গজেবের পরাজয় এবং রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীর পরিণয়—এই ঐতিহাসিক সত্য কাহিনীকেই উপন্যাসে মূখ্য বিষয় করেছেন। অবশ্য এতেও দুটি ইতিহাসাশ্রিত উপকাহিনী ছিল—ঔরঙ্গজেব-মানিকলাল-নির্মলকুমারী আর জেবউন্নিসা মবারক দরিয়ার গল্প। যুগের আবহকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলে লেখক বাংলায় প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাসের সূচনা করলেন এখানে। তবে এই জাতীয় উপন্যাসে ইতিহাস ও কল্পনা কোন্‌টা কতটা থাকবে তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে দিলেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসকে উপন্যাস এবং ইতিহাস—এই দুই অংশে ভাগ করে তিনি ‘রাজসিংহ’ শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করেছিলেন। আর ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ নামক আলোচনার একজায়গায় তিনি লিখলেন— “ইতিহাসের সংস্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ

রস সুঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রস টুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোনো খাতির নাই। কেহ যদি উপন্যাসে কেবল ইতিহাসের সেই বিশেষ গন্ধটুকু এবং স্বাদটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা হইতে অখণ্ড ইতিহাস উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আস্ত জিরে-ধনে-হলুদ-সর্ষে সন্ধান করেন। মসলা আস্ত রাখিয়া যিনি ব্যঞ্জনে স্বাদ দিতে পারেন, তিনি দিন, যিনি বাঁটিয়া ঘাঁটিয়া একাকার করিয়া থাকেন তাঁহার সঙ্গেও আমার কোনো বিবাদ নাই; কারণ, স্বাদই এ স্থলে লক্ষ্য, মসলা উপলক্ষ মাত্র।"[২১]

সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাসে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ মানসিকতার দ্বন্দ্ব ও পরিণতি যেমন থাকে, তেমনি সমকালীন জীবনেরও প্রতিফলন পাঠক প্রত্যাশা করে। এই সমাজ তরঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্রের চেতনায় কতটা আলোড়ন তুলেছিল তার সুস্পষ্ট পরিমাপ পাওয়া না গেলেও তিনি যে উনিশ শতকের সেই নবজাগরণের কালে প্রগতিশীলতার মানদণ্ডে তাঁর সাবেকী ব্যবস্থার মর্মমূলে আঘাত হানার পক্ষপাতী ছিলেন না, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বরং তিনি পুরনো ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলা যায়। নবীনদের তিনি স্পষ্টতই বলেও ছিলেন সমাজের মঙ্গল সাধনের জন্যই লিখতে হবে, অন্য কারণে নয়। মঙ্গল বলতে তিনি বুঝেছিলেন সমাজকল্যাণ। আসলে ব্যক্তি এবং পারিবারিক জীবনকে সুচিন্তিত নীতির ভিত্তিতে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই একদিন সমাজ সৃষ্টি হয়েছিল। সমাজ বিধিকে স্বীকার করেই সভ্যতার অগ্রগতি—এই বিশ্বাস বঙ্কিমের ছিল। সেজন্য তিনি 'ধর্মতত্ত্ব' (অনুশীলন) গ্রন্থের এক জায়গায় গুরুর জবানীতে লিখেছেন— "সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, মনুষ্যের যত গুণ আছে, সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা দণ্ড প্রণেতা ভরণপোষণ এবং রক্ষাকর্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক। ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যত্নবান হইবে। এই তত্ত্বের সম্প্রসারণ করিয়া ও গুস্ত কোমৎ 'মানবদেবী'র পূজার বিধান করিয়াছেন। সুতরাং এবিষয়ে আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই।"[২২] আসলে বঙ্কিম মূলত মানুষের হৃদয় রহস্য সন্ধানী কল্পনাপ্রবণ সৌন্দর্য স্রষ্টা হলেও সমাজ সম্পর্কে তাঁর শিল্পী সত্তা অনেকটাই পিছনে পড়ে গিয়েছিল নীতিবাগীশ সত্তার কাছে। তাইতো তিনি বিধবার অন্য পুরুষের প্রতি প্রেম, কিংবা বিবাহিত পুরুষের অন্য বিধবা নারীর আসক্তিকে ভালো চোখে দেখেননি কখনোই। এর প্রমাণ লেখকের 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭২) এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) উপন্যাস দুটি। এখানে তিনি শুধু বিধবার প্রেমকে স্বীকৃতি দেননি তাই নয়, সেই বিধবাদের পৃথিবী থেকে

সরিয়ে দিয়েছেন সমাজের মঙ্গলার্থে। তিনি মনে করতেন বিধবার প্রেম কিংবা বিবাহিত পুরুষের অন্য নারীতে আসক্তি সমাজের মাটিতে বিষবৃক্ষের বীজ বপণ করে। এবিষয়ে তিনি তাঁর 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের উনত্রিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদ — 'বিষবৃক্ষ কী' -এর এক জায়গায় স্পষ্টই লিখেছেন— "যে বিষবৃক্ষের বীজ বপণ হইতে ফলোৎপত্তি এবং ফলভোগ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যানে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা সকলেরই গৃহ প্রাঙ্গণে রোপিত আছে। বিপুর প্রাবল্য ইহার বীজ। ... চিত্ত সংযমের অভাবই ইহার অঙ্কুর, তাহাতেই এ বৃক্ষের বৃদ্ধি। এই বৃক্ষ মহাতেজস্বী; একবার ইহার পুষ্টি হইলে আর নাশ নাই। এবং ইহার শোভা অতিশয় নয়ন প্রীতিকর; দূর হইতে ইহার বিবিধ বর্ণ পল্লব ও সমুৎফুল্ল মুকুলদাম দেখিতে অতি রমণীয়। কিন্তু ইহার ফল বিষময়; যে খায় সেই মরে।"[২৩]

এই ফল খেয়েই বিধবা কুন্দনন্দিনীকে বিষপানে মরতে হয়েছে। কিংবা বিধবা নারী হীরাদাসী দেবেন্দ্রতে প্রলুব্ধ হয়ে উন্মাদিনীতে পরিণত হয়েছে। আর কৃষ্ণকান্তের উইলে বিধবা রোহিনীকে গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছে। শুধু তাই নয় সেসময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে বাংলাদেশে বিধবা বিবাহ আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং দীর্ঘ লড়াই শেষে ১৮৫৬ খ্রীঃ বিধবাবিবাহ আইন সম্মত হয়। বিদ্যাসাগরের এই প্রচেষ্টাকে বঙ্কিম ভালো চোখে দেখেননি। বরং তিনি অত্যন্ত কৌশলে তার 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের চরিত্র সূর্যমুখীকে দিয়ে বিদ্যাসাগরকে মুর্খ বলিয়েছেন। সূর্যমুখী একটি চিঠিতে কমলমণিকে লিখেছিল— "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবা বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?"[২৪]

—এইভাবে কখনো নায়িকাদের সমাজ থেকে চিরতরে সরিয়ে কিংবা বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের উপসংহারে স্পষ্টতঃই পাঠক বর্গকে উপদেশের ভঙ্গিতে লিখেছেন— "আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।"[২৫] এ প্রসঙ্গে লেখকের 'সাম্য' গ্রন্থে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যায়। বঙ্কিম এখানে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা যেমন বলেছেন তেমনি বিধবার বিবাহ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী বলেছেন— "...বিধবা বিবাহ ভাল কি মন্দ, এটি স্বতন্ত্র কথা। তাহার বিবেচনার স্থল এ নহে। তবে ইহা বলিতে পারি

যে, কেহ যদি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, স্ত্রী শিক্ষা ভাল কি মন্দ? সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিত হওয়া উচিত কিনা, আমরা তখনই উত্তর দিব, স্ত্রীশিক্ষা অতিশয় মঙ্গলকর, সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হওয়া উচিত; কিন্তু বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আমাদিগকে কেহ সেরূপ প্রশ্ন করিলে আমরা সেরূপ উত্তর দিব না। আমরা বলিব বিধবাবিবাহ হওয়া কদাচ ভালো নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামিত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল।"[২৬] —এই অভিমতের মধ্যে যতটা নারী পুরুষে সমানাধিকারের কথা আছে তার চেয়ে স্ববিরোধী ভাবনাই ব্যক্ত হয়েছে। উপরন্তু তিনি এও বলেছেন 'যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্ব্বপতিকে আন্তরিক ভালোবাসিয়াছিল, সে কখনই পুনর্ব্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না।"[২৭] এর মধ্যেও একটা নীতিবোধের সেন্টিমেন্টকে ব্যবহার করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এরই বিষময় পরিণতি আমরা দেখি লেখকের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) উপন্যাসে। সেখানে বিধবা রোহিণীকে গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলিতে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। এখানে আমরা দেখি বিধবা রোহিণীর দেহজ কামনা গোবিন্দলাল ভ্রমরের দাম্পত্য জীবনকে বিনষ্ট করেছে। নগেন্দ্রনাথের মত গোবিন্দলাল রোহিণীকে বিয়ে করেনি, তাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে এবং রিপুর তাড়নায় গোবিন্দলাল দাম্পত্য ধর্মের শুচিতাকে গলাটিপে হত্যা করেছে। অল্পকালের মধ্যেই রোহিণী সম্পর্কে তার মোহ দূর হয়ে গেছে। রোহিণীকে নিষ্ঠুর মৃত্যু দিলেও গোবিন্দলাল তার স্ত্রী ভ্রমরকে আর ফিরে পায়নি। ভ্রমরের হৃদয় যন্ত্রণার অবসান হল মৃত্যুর মধ্যদিয়ে। আর গোবিন্দলাল সন্ন্যাস জীবনের মধ্যে 'ভ্রমরাধিক' শান্তি পেতে গিয়ে আত্ম-প্রতারণা করল। রোহিণী এই মৃত্যু নিয়ে উত্তরকালে শরৎচন্দ্র প্রশ্ন তুলে দিলেন সমাজ নীতিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে রোহিণীর মৃত্যুর জন্য কায় দায় ছিল?[২৮]

"রোহিণীর চরিত্র আমাকে অত্যন্ত ধাক্কা দিয়েছিল। মৃত্যুর জন্য আক্ষেপ করিনে, কিন্তু করি তার অকারণ অহেতুক জবরদস্তির অপমৃত্যুতে। অভাগিনীর অস্বাভাবিক মরণে পাঠক-পাঠিকার সুশিক্ষা থেকে আরম্ভ করে সমাজের বিধি ও নীতির convention বেঁচে গেল, সন্দেহ নেই। কি ম'ল, সে আর তার সঙ্গে সত্য সুন্দর আর্ট।... উপন্যাসের চরিত্র শুধু উপন্যাসের আইনেই মরতে পারে, নীতির চোখ রাঙাণিতে তার মরা চলে না।" —যদিও মোহিতলাল মজুমদার শরৎচন্দ্রের বক্তব্যের বিরোধিতা করে বঙ্কিমচন্দ্রের সপক্ষেই সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে রোহিণী চরিত্রটি বিশ্লেষণ করে ছিলেন। আবার অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও রোহিণীর পরিণতির ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছিলেন— "যাহারা রোহিণীর অপঘাত মৃত্যু ঘটাইবার জন্য বঙ্কিমকে হৃদয় হীনতার

জন্য অপরাধী করিয়াছেন তাঁহারা রোহিণী সমস্যার কোনো উৎকৃষ্টতার সমাধান নির্দেশ করিতে পারেন নাই। রোহিনী বাঁচিয়া থাকিলে হীরাদাসীর পর্যায়ে নামিয়া যাইত। তাঁহার মৃত্যু অন্তঃত তাহাকে এই অবনতি হইতে রক্ষা করিয়াছে। রোহিণীর অপমৃত্যু তাহার কলঙ্কিত ভোগসর্বস্ব প্রেমের স্বাভাবিক ও অপরিহার্য মৃত্যু হইাতে নীতির কোনো অনুচিত প্রভাব নাই আছে সূক্ষ্মতর বিশ্ববিধানের সহিত সহজ সঙ্গতি।"[২৯] এইভাবে বিতর্ক যাই থাক না কেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্র যতটা রক্ষণশীল ও নীতিবাগিশ ছিলেন ততখানি শিল্পীর নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেননি।

বঙ্কিমের তত্ত্বমূলক উপন্যাস 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪) এবং 'সীতারাম' (১৮৮৭)—এই তিনটিকে একত্রে 'ত্রয়ী উপন্যাস' (Trilogy) বলা হয়েছে। এই ত্রয়ী উপন্যাসের মূল বক্তব্য হল গীতার অনুশীলন তত্ত্ব ও স্বদেশ ভাবনা। এই তত্ত্ব ভাবনা প্রসঙ্গে ড. অরবিন্দ পোদ্দার লিখেছেন— "... চোখের দৃষ্টিকে খর্ব করার ফলেই পরিণামে তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) স্বদেশ ধর্মের বিমূর্ত তত্ত্বে উপস্থিত হন। তত্ত্ব যখন শুধুমাত্রই তত্ত্ব, তখন তাহার মূল্য নিতান্তই কম। কিন্তু তত্ত্ব যখন ব্যবহারিক সত্যের মর্যাদা লইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই তাহার পূর্ণ সার্থকতা, তাহার যথার্থ উপযোগিতা।'[৩০]
—বঙ্কিমচন্দ্রের এই স্বদেশ প্রীতির পরিচয় আমরা পাই 'ধর্মতত্ত্ব -এর চতুর্বিংশ অধ্যায়ে। এখানে তিনি তাঁর ভাবনাকে ব্যক্ত করে জানিয়েছেন—

সমাজের বাহিরে মনুষ্যের কেবল পশুজীবন আছে মাত্র, সমাজের ভিতরে ভিন্ন মনুষ্যের ধর্ম্মজীবন নাই। ... সমাজ ধ্বংসে সমস্ত মনুষ্যের ধর্ম্ম ধ্বংস। এবং সমস্ত মনুষ্যের সকল প্রকার মঙ্গল ধ্বংস।'[৩১] স্বভাবতই তিনি অনুশীলন আর স্বদেশ প্রীতির পথে জাতির মুক্তি অণ্বেষণ করেছেন, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে লেখা 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে, 'মৃণালিনী'র স্বদেশপ্রীতির উচ্ছ্বাস এতে কাব্যরসসিক্ত সংহতি লাভ করেছে। দেশের প্রতি অপার অগাধ ভালোবাসা জনিত ভাবাবেশে তিনি স্বদেশ মাতৃকাকে কালিকা মূর্তির সঙ্গে উপমিত করেছেন। মা যা ছিলেন, মা যা হয়েছেন এবং মা যা হবেন। এই অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যৎ তিনটি কালের নিরীখে তিনি 'বন্দে মাতরম' উচ্চারণ করেছিলেন। এতে বর্ণিত সমস্ত ঘটনা সমস্ত চরিত্রকে এক সমুন্নত ভাব কল্পনার সুসংগতির ঐক্যসূত্রে গেঁথেছে, বাস্তব ও কল্পিত আদর্শের মধ্যে সমস্ত বিরোধ মুছে গেছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ—ইতিহাসের এই

বাতাবরণের মধ্যে উপস্থাপিত উপন্যাসের কাহিনীটি লেখকের ভাবনা প্রসূত। এককথায় এতে লেখক জগজ্জননীর যে বন্দনা করেছেন তা ভারতীয় শাস্ত্রের মূলমন্ত্র 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' -এরই অনুসারী। ফলে এই উপন্যাস মন্বন্তরের দলিল যতটা তার চেয়ে বেশী লেখকের জীবন দর্শনের বাণী প্রচারের এক অভিনব প্রয়াস।

'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪) উপন্যাসটিও সেদিক থেকে 'আনন্দমঠ' -এর পরিশিষ্টের মত। বাংলাদেশে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন কালের এক বিশেষ সময়ের ফসল এই দুটি উপন্যাস। ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজত্বের প্রথমদিকের ঘটনা রূপ পেয়েছে 'আনন্দমঠ' -এ আর শেষের দিকে ঘটনা রয়েছে 'দেবী চৌধুরাণী'তে। দুটিরই পটভূমিতে আমরা পাই উত্তরবঙ্গকে। দেশে তখন চরম অরাজকতা চলছে। সেই মাৎস্যন্যায় কালে দাঁড়িয়ে গীতার নিষ্কাম তত্ত্ব ও কল্যাণময়ী পরিবারনিষ্ঠ জীবনাদর্শ গ্রহণ করে বাংলাদেশের সাধারণ গৃহবধূ প্রফুল্ল দেবী চৌধুরাণীতে পরিণত হয়েছিল। স্বামী ব্রজেশ্বরের নীরব উপস্থিতি আর শ্বশুর বাড়ীর লোকজনদের ক্রূর ভূমিকায় প্রফুল্লকে অপমানিত ও বিতাড়িত হয়ে বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহে উত্তরবঙ্গের তখনকার রবীন হুড ভবানী পাঠকের সান্নিধ্যে দুর্ধর্ষ নারী ডাকাত দেবী চৌধুরাণী করেছে। বিভিন্ন অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেবী রাণীর সংগ্রাম শেষে এক আদর্শ গৃহী নারী হিসেবে শ্বশুর গৃহে পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটেছে। মাঝে প্রফুল্ল যোগ সাধনা করেছে—জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগ—এগুলি তাকে যথার্থ মহীয়সী নারীতে রূপান্তরিত করেছে। এইভাবে পর্বতের মুষিক প্রসবের মত প্রফুল্লর কাহিনীতে কিছু কিছু অসংগতি সহজেই চোখে পড়ে। প্রফুল্ল জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির শিক্ষা নিয়ে আদর্শ নারীতে পরিণত হল — তা পরিণামে কেবল গৃহ জীবনেই পূর্ণতা পেল—একজন আদর্শ গৃহিণী হওয়ার জন্য এত কাল এত রকম সাধনার প্রয়োজন ছিল না। সেইসঙ্গে অতিরিক্ত ঘটনার ঘনঘটায় এটি সাধারণ রোমাঞ্চ রচনায় পর্যবসিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও অবশ্য এখানে লেখকের শিল্প দক্ষতার বেশ পরিচয় রয়েছে। এবিষয়ে ড. সুকুমার সেন লিখেছেন— ''কাহিনীর পরিকল্পনায় ও বিন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প দক্ষতা বেশ পরিস্ফুট আছে 'দেবী চৌধুরাণী'তে আরম্ভ অত্যন্ত অভিনব। পাত্রপাত্রীর কোনরূপ পরিচয় না দিয়া, স্থানকালের কিছুমাত্র উদ্দেশ না দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পাঠককে সদরে না বসাইয়া একেবারে অন্তরে প্রবেশ করাইয়াছেন। ... ঘর সংসারের চিত্র যেটুকু আছে তাহা যথা সম্ভব বাস্তব ও মনোহর।''[৩২]

বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের প্রকৃত স্বরূপ সন্ধানে আজীবন ব্যাপৃত ছিলেন। এই জীবন নিয়ে কী করব, কী করতে হয়—এরই উত্তর সন্ধানে তিনি জীবনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছেন। এহেন শিল্পীর শেষ উপন্যাস 'সীতারাম' এ এসে আমরা দেখতে পাই তিনি যেন ধর্মতত্ত্ব প্রচারের পথ পরিত্যাগ করে কিছুটা জীবন শিল্পীর প্রমাণ রাখলেন। সামন্ত রাজ্যের অধিপতি সীতারাম কেমন করে আদর্শচ্যুত হয়ে পতনের দিকে ধাবিত হলেন সেটাই লেখক এখানে তুলে ধরেছেন। আসলে গীতার তত্ত্বের বাঁধ দিয়ে মানুষের কল্লোলিত প্রকৃতিকে রোধ করা যায় না। কেননা মানব জীবন নিয়ে নিয়তির খেলা যেমন রহস্যময় তেমনি নিষ্ঠুর। মানুষের ভাগ্য চিরকাল পুঞ্জীভূত অন্ধকারের প্রস্তর কঠিন প্রাকারে প্রতিহত হয়েছে। তার সামনে কোনো আলো নেই, আশা নেই, আশ্বাস নেই। এখানেও তাই দেখা যায় নারী-পুরুষের দ্বন্দ্ব, সীতারাম ও শ্রী'র পারস্পরিক আকর্ষণ বিকর্ষণের চিত্র, সংসার এবং সন্ন্যাসের সংঘাত। স্বামীর অমঙ্গল আশংকায় সহধর্মিণী স্বামীকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেলেন। পরমবাঞ্ছিতা নারীকে হারিয়ে সীতারাম অতৃপ্ত পিপাসা সঞ্জাত উন্মত্ত আচরণ করে নিজের বিনষ্টি আর রাজ্যের অধঃপতন ঘটালেন। ছদ্ম ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এই কাহিনীটি উপস্থাপিত করে লেখক 'ত্রয়ী উপন্যাসের বৃত্তটিকে সম্পূর্ণ করেছেন। এই ত্রয়ীর মূল্যায়ণ করে ড. ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন—''...বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের শিল্পরূপ কিছু নতুন চেষ্টা সত্ত্বেও আনন্দমঠে এবং সম্পূর্ণত দেবী চৌধুরাণীতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। সীতারাম তাকে ভেদ করে সবেগে এবং পূর্ণ দীপ্তিতে মুক্তি লাভ করেছে।''[৩৩]

বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাংলা উপন্যাসের গতিধারা যখন প্রায় রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল সেই সময় রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস সাহিত্যে নতুন করে গতিসঞ্চার করে তাকে নতুন পথে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। আসলে তাঁর অনন্য সাধারণ প্রতিভার স্পর্শে পাষাণী অহল্যার মত বাংলা উপন্যাসের দীর্ঘ ঘুমের অবসান ঘটে যায়। বাংলা উপন্যাস নব কলেবরে প্রবাহিত হতে শুরু করে। এবিষয়ে সমালোচক অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন— ''বঙ্কিমচন্দ্রের পরে উপন্যাসে যে গভীরতর বাস্তবতা পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহার প্রথম সূচনা রবীন্দ্রনাথেই পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথই প্রতিভার পূর্বজ্ঞান বলে বঙ্কিম প্রবর্তিত উপন্যাসের ধ্বংসোন্মুখতা উপলব্ধি করিয়া উপন্যাসের ভিত্তিকে রোমান্স ও ইতিহাসের চোরাবালি হইতে সরাইয়া বাস্তব জীবনের দৃঢ় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ও তাহাকে অসাধারণত্বের অনুসন্ধান হইতে

ফিরাইয়া আনিয়া প্রাত্যহিক জীবনের সূক্ষ্ম ও রসপূর্ণ বিশ্লেষণের কাজে লাগাইয়াছেন।”[৩৪] —এই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূলতঃ কবি। তাঁর কিশোর কবি মনকে প্রথম যিনি প্রভাবিত করেছিলেন তিনি বিহারীলাল চক্রবর্তী—বাংলা কবিতার ‘ভোরের পাখি’—তাঁকে রবীন্দ্রনাথ গুরুপদে বরণ করেছিলেন সেই কিশোর বয়সে। কেননা বিহারীলালের কাব্যের গভীর আবেগ, তীব্র রোমান্স আর সুদূর সঞ্চরণের অভিলাষ রবীন্দ্রনাথকে নাড়া দিয়েছিল। এরপর মধুসূদন দত্তের ক্লাসিক কাব্যের গভীরে ডুব দিয়ে তিনি আরও বেশী রসাস্বাদন করেছেন এবং আপন সৃষ্টি ধারায় তা ছড়িয়ে দিয়েছেন। এরই পাশাপাশি তরুণ কবিকে উপন্যাস রচনায় বিশেষ প্রেরণা দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা রশ্মি। রবীন্দ্রনাথ যখন বিহারীলাল-মধুসূদনে মাতোয়ারা, সেইসময় আবেগপ্রবণ কিশোরটির হাতে এসেছিল ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকা। ১৮৭২ খ্রীঃ থেকে প্রকাশিত বঙ্কিমের ‘বঙ্গদর্শন’ বাংলাদেশের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র হৃদয়ও লুঠ করে নিল। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন— “এমন সময়ে বঙ্গদর্শন মাসিকপত্র দেখা দিল। তখন থেকে বাঙালির চিত্তে নব্য বাংলার সাহিত্যের অধিকার দেখতে দেখতে অবারিত হল সর্বত্র। ইংরাজি ভাষায় যাঁরা প্রবীণ তাঁরাও একে সবিস্ময়ে স্বীকার করে নিলেন।”[৩৫] এই ভাবে রবীন্দ্রনাথের শৈশবেই বঙ্কিম উপন্যাসের জগতে প্রবেশ নিশ্চিত হয়েছিল। তাঁর চেতনার পরিস্ফুরণের সাথে সাথে তিনি দেখেছেন অন্তঃপুরে বটতলার ফাঁকে ফাঁকে দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী ইত্যাদি স্বর্ণ সম্পদ। তবে এইসব সম্পদ ঘেঁটে রবীন্দ্রনাথ খুব বেশীকাল আবদ্ধ থাকলেন না। অচিরেই তিনি হয়ে উঠলেন পরবর্তী বাংলা কথাশিল্পের দিক নির্দেশক। বাস্তবিক উপন্যাসের একদিকে যেমন থাকে জীবনের জটিলতা, অন্যদিকে তেমনি আত্মপ্রকাশ করে সচেতন মন। জীবন সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের সামগ্রিকতাবোধ নির্ভর করে তাঁর জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে ধ্যান ও ধারণার উপর। এই জীবন আবার নিয়ত রূপান্তর প্রবণ। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক ও বিরোধও পরিবর্তনশীল। তাই প্রতিমুহূর্তের পরিবর্তনশীল সমাজ সভ্যতার বৃহৎদায় ব্যক্তি কেমন করে বহন করছে তার রূপায়ণও ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব। ব্যক্তি মানুষ সমাজ পরিবেশের আঘাতে যে যন্ত্রণা অনুভব করছে, যে যন্ত্রণা তার অস্তিত্বের যন্ত্রণা — তা নিঃসন্দেহে উপন্যাসের বিষয়। বিষয়বস্তু সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের বোধ, চেতনার বিস্তার এবং গভীরতা উপন্যাসের প্রতিটি অংশেই অভিব্যক্তি লাভ করে। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে সঞ্চার করেছেন এক নতুন আত্মবিশ্বাস এক নতুন শিল্প চেতনা যার ফলে ‘রিয়ালিটি’ সম্পর্কে

আমাদের ধারণা বদলে যায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ জীবন ধারায় (১৮৬১-১৯৪১) প্রায় অর্ধ-শতাব্দী কালের ব্যবধানে ছোট-বড় মিলিয়ে মোট ১৩টি উপন্যাস লিখেছেন। আর 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' কে ধরলে সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়ায় ১৪টি। এগুলির মধ্যে কিশোর বয়সে লেখা 'করুণা'কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই পরে উপন্যাসের তালিকাভুক্ত করতে সংকোচ বোধ করেছেন। ১৮৭৭-৭৮ খ্রীঃ 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত এই উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে আলাদা করে বের হয়নি। এর কারণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'জীবন স্মৃতি'র পাতায় জানিয়েছেন— ''যে বয়সে ভারতীতে লিখিতে শুরু করিয়াছিলাম সে বয়সের লেখা প্রকাশযোগ্য হইতেই পারে না।''[৩৬] এই উপন্যাসে করুণা নাম্মী একটি কিশোরীর জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে। রোমান্টিক গীতি কবিতার ভাবাবেগে কবির হৃদয় তখন পরিপূর্ণ ছিল। অন্তরের আবেগ-অনুভূতিকে কবি বাস্তবের শক্ত মাটির উপর দাঁড় করাতে পারেননি। জীবন এখানে আকস্মিকতার সূত্রে গ্রথিত। করুণার পিতার আশ্রিত দরিদ্র নরেন্দ্র ঘটনাস্রোতে করুণার স্বামী। ভোগপরায়ণ স্বার্থান্ধ দুষ্ক্রিয়াসক্ত নরেন্দ্রর আচার-আচরণের প্রতিবাদ করতে পারেনি করুণা। আত্মরক্ষায় অসমর্থ করুণাকে শেষে মর্ম-যন্ত্রণায় মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। তবে এতে রয়েছে করুণা ছাড়াও আরও দুটি নারী চরিত্র-মোহিনী ও রজনী। মোহিণীর বৈধব্য জীবনের যে সংকট উপন্যাসে তুলে ধরেছেন লেখক তাতে তাঁর চরিত্র সৃষ্টির সামর্থ্যের প্রথম আভাস আমরা পাই। সেইসঙ্গে এখানে তিনি রজনী - মহেন্দ্র- মোহিনীর ত্রিকোণ প্রেমের বৃত্ত অংকনের চেষ্টা করেছেন। ফলে কাঁচা হাতের এই লেখার ভেতরেই পরবর্তীকালে লেখা 'চোখের বালি'র পূর্বাভাস পাওয়া যায়। ড. সুকুমার সেন প্রসঙ্গত লিখেছেন— ''...করুণা অপরিণত রচনা হইলেও ঐতিহাসিক মূল্য বর্জিত নয়। মোহিনী-মহেন্দ্রর অপ্রধান কাহিনীর মধ্যে কৃষ্ণকান্তের উইলের ছায়া এবং চোখের বালির পূর্বাভাস আছে। করুণার মহেন্দ্র ও রজনী পরে চোখের বালির মহেন্দ্র আশাতে পরিণত।''[৩৭]

নিতান্ত কিশোর বয়সের অপরিণত প্রয়াস আর পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্রের ছায়ারেখা অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিকে বিষয় ভাবনার নিরীখে বিভাজন ক'রে সেগুলির ওপর আলোকপাত করা যায়।

ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস : 'বৌঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩), 'রাজর্ষি' (১৮৮৭)।

জীবন সমস্যা মূলক উপন্যাস : 'চোখের বালি' (১৯০৩), 'নৌকাডুবি' (১৯০৬), 'যোগাযোগ' (১৯২৯)।

বৃহত্তর রাজনৈতিক ভাবনার ফসল : 'গোরা' (১৯১০), 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬), 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪)।

রোমান্টিক ও তত্ত্বমূলক উপন্যাস : 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬), 'শেষের কবিতা' (১৯২৯), 'দুই বোন' (১৯৩৩), 'মালঞ্চ' (১৯৩৪)।

বঙ্কিমচন্দ্রের নির্মিত পথ ধরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ২২ বছর বয়সে লিখলেন ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট'। করুণাকে বাদ দিলে এটি তাঁর প্রথম যথার্থ উপন্যাস। এতে বাংলাদেশের বারো ভুঁইঞার অন্যতম প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। ইতোপূর্বে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' (১৭৫২) কাব্যের 'মানসিংহ' অংশে কিংবা ফোট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক তথা কেরী সাহেবের মুন্সী রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। সাইত্রিশটি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ এই উপন্যাসের মূল কাহিনী ইতিহাস থেকে নেওয়া। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটির 'সূচনা' অংশে লিখেছেন— ''স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময়ে বাংলাদেশের আদর্শ বীরচরিত্ররূপে খাড়া করবার চেষ্টা চলেছিল। এখনো তার নিবৃত্তি হয়নি। আমি সে সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তার ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না।''[৩৮]

—স্বভাবতই এই উপন্যাসে প্রতাপাদিত্যকে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী আদর্শ পরায়ণ নায়করূপে চিত্রিত না করে এক উদ্ধত অবিনয়ী কুটিল রাজনীতিজ্ঞ চরিত্র হিসেবে অংকন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রতাপের কুটিল রাজনীতির বিরুদ্ধে ঔপন্যাসিক সহজ মানবধর্মকে দাঁড় করিয়েছেন। রাজনীতির চক্রব্যূহে পড়ে মানসিক প্রেমের ব্যর্থতা বিভা-উদয়াদিত্যের কাহিনীর মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে। বসন্ত রায় প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত্, এখানে আদর্শবাদের প্রতীক বিবিধ মানবিক গুণে তাঁর চরিত্র ঋদ্ধ। প্রতাপাদিত্যকে মহৎ চরিত্র হিসেবে অংকন না করে রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক সত্যকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরন করেছেন। এবিষয়ে ওই সূচনাতেই তিনি আরও লিখেছেন— ''অন্তর্বিষয়ী ভাবের কবিত্ব থেকে বহির্বিষয়ী কল্পনালোকে এক সময়ে মন যে প্রবেশ করলে

ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগল, এ বোধ হয় কৌতূহল থেকে।"[৩৯]
—এইভাবে ইতিহাসের কংকালকে সামনে রেখে রবীন্দ্রনাথ তাতে সঞ্চার করেছেন যথার্থ মানবধর্মকে। যেকারণে প্রতাপাদিত্যের পরিবর্তে বসন্ত রায় আমাদের অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট ভাবনা ও জীবনাদর্শের প্রতিরূপ। সমালোচক ড. ক্ষেত্র গুপ্ত চরিত্রটি সম্পর্কে তাই যথার্থই লিখেছেন—"বসন্ত রায়ের চলা পৃথিবীর মাটি থেকে কিছু উপরে, স্নেহের ভাবালু উচ্ছ্বাসে সংসারের সঙ্গে তার বন্ধন। মাটির পৃথিবীতে দুর্লভ হলেও আলো সুর দিয়ে গড়া, ধুলো দিয়ে নয়, এমন মানুষ বসন্ত রায়। তাকে অলীক বলে অস্বীকার করতে ইচ্ছা হয় না।"[৪০]

ত্রিপুরার রাজবংশের কাহিনী অবলম্বনে লেখা 'রাজর্ষি' উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন লব্ধ উপন্যাস'। এর ভিত্তিমূলে ছিল দুটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ—জন স্টুয়ার্টের 'বাংলার ইতিহাস' এবং কৈলাসচন্দ্র সিংহের 'রাজমালা'। সেই সঙ্গে দেওঘর থেকে রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে দেখা করে ট্রেনে ফেরার সময় লেখক ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সেই সময় স্বপ্নে যা দেখেছিলেন সে বিষয়ে উপন্যাসটির 'সূচনা'য় লিখেছেন—"স্বপ্নে দেখলুম একটা পাথরের মন্দির। ছোটো মেয়েকে নিয়ে বাপ এসেছেন পুজো দিতে। সাদা পাথরের সিঁড়ির উপর দিয়ে বলির রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। দেখে মেয়েটির মুখে কী ভয়! কী বেদনা! বাপকে সে বারবার করুণ স্বরে বলতে লাগল, বাবা, এত রক্ত কেন? বাপ কোনোমতে মেয়ের মুখ চাপা দিতে চায়, মেয়ে তখন নিজের আঁচল দিয়ে রক্ত মুছতে লাগল। জেগে উঠেই বললুম, গল্প পাওয়া গেল।"[৪১]
রাজা গোবিন্দ মানিক্য ও নক্ষত্র রায়ের ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব মন্দিরে বলিদানকে কেন্দ্র করে। এবং এই দ্বন্দ্বে রাজপুরোহিত রঘুপতির দম্ভ ও আচার নিষ্ঠা উপন্যাসে জটিলতা ও গতি সঞ্চার করেছে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কার কিংবা রাজ্য লোভের চেয়ে প্রাণের সহজ প্রীতি ও ভ্রাতৃপ্রেম যে অনেক মহার্ঘ তা উপন্যাসে দেখানো হয়েছে। অবশ্য মূল দ্বন্দ্ব প্রেম ও প্রতাপের। গোবিন্দ মানিক্য প্রেম এবং রঘুপতি প্রতাপের প্রতিভূ হিসেবে উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছেন। শেষপর্যন্ত পালিত পুত্র জয়সিংহের অকল প্রয়াণে প্রেমের কাছে প্রতাপের পরাভব ঘটেছে—রঘুপতি সংস্কার মুক্ত হয়ে প্রেমে উত্তীর্ণ হয়েছেন। পরবর্তী কালে এই কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'বিসর্জন' (১৮৯০) নাটকটি। উপন্যাসটির মূল্যায়ন করে সমালোচক অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"...রাজর্ষিতেও ইতিহাস তাহার সমস্ত বাহ্য বৈচিত্র্য ও কোলাহল

লইয়া বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে; ইতিহাসের রঙ্গভূমি যেন দুইটি আত্মার দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্যই পরিস্কৃত করা হইয়াছে। মোগল সৈন্যের আক্রমণ, শাহসুজার রাজধানী—এ সমস্তই যেন কবির আধ্যাত্মিক ধ্যান-নিরত চক্ষুর সম্মুখ দিয়া অস্পষ্ট, ছায়াময় ভোজবাজির মত চলিয়া গিয়াছে।"[৪২]

—এই পর্যন্ত উপন্যাস রচনা ধারায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ঔপন্যাসিক প্রতিভার আলো খুব বেশী প্রকট ছিল না। তবে তিনি যে ঔপন্যাসিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছেন পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে—তার একটা পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

উপন্যাসে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তত্ত্বকথার বৃত্ত ভেঙ্গে জীবন সমস্যার গভীরে অবগাহণের জন্য রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল সময় নিয়েছিলেন। রাজর্ষি থেকে 'চোখের বালি' (১৮৮৭-১৯০৩) এই দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে তিনি কোনো উপন্যাস লিখলেন না। এই সময় তিনি নিজের মত করে উপন্যাস লেখার জন্য প্রস্তুতি পর্ব রাখলেন। অন্তর্বর্তীকালীন এই সময়টুকুতে তিনি অসংখ্য ছোটোগল্প লিখেছেন। যেন অনেকটা সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাবার জন্য সলতে পাকানো। মাঝের সময়কালগুলোতে তিনি এই ছোটোগল্প লেখা প্রসঙ্গে 'চোখের বালি' উপন্যাসের 'সূচনা' অংশেই লিখেছেন—"....এর পূর্বে মহাকায় গল্প সৃষ্টিতে হাত দিই নি। ছোটোগল্পের উল্কা বৃষ্টি করেছি। ঠিক করতে হল এবারকার গল্প বানাতে হবে এ যুগের কারখানা ঘরে। শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনো হত, এখনো হয়, তবে কীনা তার ক্ষেত্র আলাদা, অন্ততঃ গল্পের এলাকার মধ্যে।"[৪৩] এই উল্কা বৃষ্টি কালেই ১৯০১ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়েছিল 'নষ্টনীড়' গল্পটি। এটি একটি তরতাজা প্রেমের গল্প। বড়লোকের ছেলে ভূপতি তার তরুণী স্ত্রী চারুলতাকে নিয়ে সুখে-দুঃখে ঘর সংসার করছিল। এইসময় বাড়ীতে আসে ভূপতির পিসতুতো ভাই অমল। চারুর সঙ্গে অমলের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। এর কারণ ছিল ভূপতি যখন তার খবরের কাগজ বের করার কাজে ডুবে ছিল, তখন মাঝখান দিয়ে অনেকটা সময় বয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন—"যে সময়ে স্বামী-স্ত্রী প্রেমোন্মেষের প্রথম অরুণালোকে পরস্পরের কাছে অপরূপ মহিমায় চির নূতন বলিয়া প্রতিভাত হয়, দাম্পত্যের সেই স্বর্ণ প্রভামণ্ডিত প্রত্যুষকাল অচেতন অবস্থায় কখন অতীত হইয়া গেল কেহ জানিতে পারিল না। নূতনত্বের স্বাদ না পাইয়াই উভয়ে উভয়ের কাছে পুরাতন অভ্যস্ত হইয়া গেল।"[৪৪] তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙ্গনের গল্পই হল নষ্টনীড়। শেষ

পর্যন্ত অমল চলে গেলেও চারু ভূপতির নীড় নষ্ট হয়েছে। এই নীড় নষ্টেরই এক ভিন্নতর প্রকাশ লেখকের 'চোখের বালি'তে (১৯০৩) আমরা প্রত্যক্ষ করি। তবে দীর্ঘ ১৬ বছরের ব্যবধান কেন প্রয়োজন ছিল না জানি না। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য উপন্যাসের সূচনায় একটা কৈফিয়ৎ দিয়েছেন নিজের মত করে। তিনি লিখেছেন—"আমার সাহিত্যের পথযাত্রা পূর্বাপর অনুসরণ করে দেখলে ধরা পড়বে যে 'চোখের বালি' উপন্যাসটা আকস্মিক, কেবল আমার মধ্যে নয়, সেদিনকার বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে। বাইরে থেকে কোন্ ইশারা এসেছিল আমার মনে, সে প্রশ্নটা দুরূহ।"[৪৫] রবীন্দ্রনাথের এই কথা থেকে পরিস্কার যে, এখান থেকেই রবীন্দ্র উপন্যাসের শুধু নয়, বাংলা উপন্যাসেরও একটা নতুন পথ পরিক্রমার সূচনা। ইতিপূর্বে বিষয়বস্তু, প্রকাশভঙ্গি ইত্যাদির যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন, এখানে এসে তার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়েছে। এখান থেকেই বাংলা উপন্যাস যাবতীয় প্রতিকূলতা কাটিয়ে আধুনিক হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের এই আধুনিকতার শীর্ষভূমিতে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে যে দিকগুলি গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

■ সমকালীন সমাজ পরিবেশে যে আধুনিকতার ধারাপাত ঘটছে সেই রূপটিকে উপন্যাসের পটভূমিতে গ্রহণ করা।

■ চড়াই-উৎরাই শূন্য নিস্তরঙ্গ দ্বন্দ্ব জটিলতাহীন সহজ সরল চিত্রের পরিবর্তে নানা সমস্যা কন্টকিত জটিল রূপকে উপন্যাসের কাহিনীতে উপস্থাপন।

■ নিছক ঘটনা পরম্পরা নয়, মানব চরিত্রের অন্তর্গত প্রবৃত্তি প্রবণতাগুলিকে যথাযথভাবে তুলে ধরা।

■ আধ্যাত্মিক ভাব কল্পনা ও অলৌকিকতার পরিবর্তে যুক্তিবাদী ভাবনা, সন্দেহবাদ ঈশ্বরে বিশ্বাস না-বিশ্বাসের সনাতন পথ পরিহার করে মানুষকে মানুষের স্বরূপে তুলে ধরা।

■ নরনারীর গতানুগতিক সম্পর্কের কৌণিকতা ভেঙ্গে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলির মূল্যায়ন থাকা দরকার।

■ গতানুগতিক ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের গণ্ডী ভেঙ্গে ব্যক্তি মানুষ নিজেকে তুলে ধরবে—তাতে সমাজ ধর্মের সঙ্গে তার সংঘাত অনিবার্য হবে জেনেও।

■ বিষয়ের পাশাপাশি প্রকাশভঙ্গির ক্ষেত্রেও নতুন দিক বিশেষ করে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিকটিতে প্রাধান্য দিয়ে বিশ্বাসযোগ্যতা স্থাপন। এইসব আধুনিক ভাবনার বৃত্ত

গড়ে রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি'কে বাংলা উপন্যাসের পথে একটা মাইল ফলক করে প্রতিষ্ঠা দিলেন। উপন্যাসটির ওই 'সূচনা' অংশের একেবারে শেষে তিনি নিজেও ঘোষণা করেন—''সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নায়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল 'চোখের বালি'তে।''[৪৬]

নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় উপন্যাসটি 'বিনোদিনী' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথ নামকরণ করেন 'চোখের বালি'। বাল বিধবা বিনোদিনীর চিত্তে পুরুষের প্রতি দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার জাগরণ এবং তার মানসিক পরিবর্তনের টানাপোড়েন উপন্যাসের মূল উপজীব্য। এর কাহিনীতে আশা মহেন্দ্রকে, মহেন্দ্র বিনোদিনীকে, বিনোদিনী বিহারীকে আর বিহারী আশাকে ভালোবাসে। ফলে এক জটিলতাময় চমৎকার প্রণয়বৃত্ত রচিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিনোদিনীর কাশী যাত্রার মধ্যদিয়ে উপন্যাসে বাঞ্ছিত শান্তি ফিরে এসেছে। অবশ্য বিনোদিনীর এই পরিণামকে নিয়ে নানাভাবে সমালোচনার ঝড় বয়ে গেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সমালোচনা করেছিলেন কবি ও সমালোচক বুদ্ধদেব বসু। তিনি দেখিয়েছেন উপন্যাসটির দুটি পরিণতি হতে পারত—মহেন্দ্র ও বিনোদিনীর মিলনে মহেন্দ্রর পারিবারিক বিপর্যয় কিংবা বিহারী-বিনোদিনীর বিবাহ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সাহস করে এগিয়ে গেলেও ভয়ে পিছিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথও এই পরিণতির জন্য নিন্দার দ্বারা প্রায়শ্চিত্তের কথা বলেছেন। আসলে মানুষ রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর পরিণাম নিয়ে মনে মনে অনুতাপ করলেও তিনি শিল্পীর নিরপেক্ষতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। কেউ কেউ আবার বলেছেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যেহেতু বিধবা বিবাহ পছন্দ করতেন না তাই তাঁর জীবিতকালে রবীন্দ্রনাথ বিধবা বিনোদিনীর বিয়ে দেননি। এই ধরণের দুর্বল সমালোচনার জবাবে ড. সুকুমার সেন যথার্থই লিখেছেন—''... পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবেন এই ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ চোখের বালি গল্পের 'স্বাভাবিক' পরিণতি ঘটিতে দেন নাই—এমন কল্পনা যাঁহারা করেন তাঁহারা রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিটিকে মোটেই বুঝিতে পারেন নাই এবং তাঁহার শিল্প অনুধাবণেও তাঁহাদের মনোযোগ নাই।''[৪৭]

উপন্যাস হিসেবে 'নৌকাডুবি' (১৯০৬) তরল রোমান্স আশ্রয়ী। রমেশ নামে এক যুবক নৌকাডুবির পর কোনরকমে রক্ষা পায়। জ্ঞান ফিরে এলে সে দেখে, তার কাছে কমলা নামে এক অপরিচিতা নববধূ যে সদ্য বিবাহিতা এবং বিয়ের রাতে স্বামীকে দেখেনি—সেও

পড়ে আছে। কমলা রমেশকেই স্বামী মনে করে এবং ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করতে চায়। কিন্তু রমেশ জানত কমলা তার স্ত্রী নয় এবং সে হেমনলিনী নামে একটি মেয়েকে ভালোবাসে। কমলার স্বামী হল নলিনাক্ষ। শেষপর্যন্ত নানা ঘটনার টানাপোড়েনের পর কমলা ও নলিনাক্ষের পুনর্মিলন ঘটে আর রমেশ হেমনলিনীর জীবন ট্রাজেডির অন্ধকারেই ডুবে থাকে। এই জাতীয় পরিণতি অত্যন্ত আজগুবি। এই উপন্যাস মহাকবির হাতের দুর্বল সৃষ্টি। ড. ক্ষেত্র গুপ্ত উপন্যাসটি সম্পর্কে বলেছেন—''উঁচু শিল্পকর্ম রূপে এ রচনা গ্রাহ্য হতে পারে না। নায়ক চরিত্রটি বিবর্ণ। যে সমস্যার সামনে সে পড়েছে তাকে নিয়ন্ত্রিত করার বা তার দ্বারা গভীরভাবে আলোড়িত হবার মত ব্যক্তিত্ব রমেশের নয়। .... মাঝে বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের হাতের স্পর্শ অনুভব করা গেলেও উপন্যাস হিসেবে এ গ্রন্থের স্থান খুব উচ্চে নয়।''[৪৮] 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'তিন পুরুষ' নামে যে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল পরে তার নামকরণ করেন 'যোগাযোগ'। সমকালে জলধর সেন 'তিন পুরুষ' নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন আর এটি শেষপর্যন্ত তিনটি প্রজন্মের গল্প নয় বলে এরূপ নাম পরিবর্তন। মধুসূদন ও কুমুদিনীর বিড়ম্বিত দাম্পত্য জীবনের অশান্তি এবং তার পরিণাম এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। হঠাৎ ধনাগমে স্ফীত শিক্ষা সংস্কৃতি বর্জিত মধুসূদন আর মার্জিত আভিজাত্যে বর্ধিত পড়তি ঘরের মেয়ে কুমুদিনী বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হল। কুমুদিনীর দাদা বিপ্রদাসের শিক্ষা-সংস্কৃতি রুচি ও আভিজাত্য বোধ মধুসূদনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে কুমুদিনীকে ভরসা যুগিয়েছে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কুমুদিনী যখন জানতে পারল সে 'মা' হতে চলেছে—তখন আর সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারেনি। এই দাম্পত্য জীবনের দ্বন্দ্ব সংঘাতের মূল্যায়ন করে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—''চরিত্র বিশ্লেষণের দিক দিয়া মধুসূদন কুমুদিনীর চরিত্র বৈপরীত্য ও তাহাদের প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বের বর্ণনা খুব উচ্চাঙ্গের হইয়াছে।... বহির্জগতের মত অন্তর্জগতের সংঘর্ষের যদি কোনো বাহ্য লক্ষণ থাকিত তাহা হইলে মধুসূদন কুমুদিনীর মিলন মুহূর্তে ধূমকেতু পুচ্ছপৃষ্ঠ সৌর জগতের ন্যায় একটা প্রলয়কারী অগ্ন্যুৎপাত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।''[৪৯]

বিংশ শতকের সূচনা লগ্নে আসমুদ্র হিমাচল সারাদেশে যে রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ দেখা যায়, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের যে প্রবল ক্ষোভ ও গণ জাগরণ দেখা দিয়েছিল—সেই উত্তাল সময়ে দাঁড়িয়ে সংবেদনশীল ও সমাজ সচেতন শিল্পী হিসেবে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে তার বাইরে রাখতে পারেন নি। দেশের সেই অগ্নিগর্ভ সময়ে দাঁড়িয়ে তিনি লিখেছেন

‘গোরা’ (১৯১০), ‘ঘরে বাইরে’ (১৯১৬) এবং ‘চার অধ্যায়’ (১৯৩৪) -এর মতো প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস। এই তিনটি উপন্যাসে ধর্মান্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট ভাবনার প্রকাশ পাওয়া যায়।

‘গোরা’ উপন্যাসের মধ্যে সমাকালীন যুগ জীবনের এক দ্বন্দ্বময়তা এবং তা থেকে উত্তরণের এক সামগ্রিক পরিমণ্ডলের দ্যোতনা রয়েছে। আয়তনে ও অন্তরধর্মে এটি মহাকাব্যোচিত উপন্যাস। এর সামাজিক পটভূমিকার দিগ্‌দর্শন হিসেবে ব্রাহ্ম সমাজের উৎপত্তি ও বিবর্তন, সেইসঙ্গে হিন্দু পুনরুত্থানবাদের প্রাদুর্ভাব আর ভিন্নমুখী আন্দোলনের সঙ্গে যুগপৎ জাতীয়তার উন্মেষ ও নানা অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে তাঁর বিকাশের রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছে। দেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়ন, ব্রাহ্মণ্য সংস্কার, হিন্দু পুনরুত্থানবাদ, ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন, ইংরেজ স্তব-স্তুতি ইত্যাদি সমকালীন বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ভাব-তরঙ্গ ‘গোরা’কে মহাকাব্যের বিশালতা দিয়েছে। গোরা ও সুচরিতার প্রেম সম্পর্কটি সমুন্নত মহিমা ও গাম্ভীর্যে দীপ্যমাণ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। বহু ঘটনা, বহুচরিত্র, বহু তর্ক-বিতর্ক উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এসবের মধ্যেও উপন্যাসের ভাবকেন্দ্রটি নিপুণতার সঙ্গে বজায় রাখতে পেরেছেন। গোরা, বিনয়, পরেশবাবু, হারান, সুচরিতা, ললিতা, আনন্দময়ী—প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরেশবাবুর শান্ত প্রসন্নতা, আনন্দময়ীর আদর্শবাদ উপন্যাসটিকে বিশেষ গৌরবের আসন দিয়েছে।

উপন্যাসের নায়ক গোরা সনাতন হিন্দু-ধর্মের আদর্শ রক্ষায় তৎপর এবং ইরেজদের বিরুদ্ধেও সে সংগ্রামে দৃঢ় সংকল্প। তার মধ্যে ভারতীয় জীবনবোধের আদর্শ যখন একেবারে গভীরভাবে প্রোথিত সেই সময় গোরা জানতে পারে, সে আসলে আইরিশ সন্তান। তখন গোরার সব বন্ধন ঘুঁচে যায়—তার আর কোনো জাত থাকে না, সংস্কার থাকে না, সংকীর্ণ ধর্মমত থাকে না—সে হয়ে ওঠে বিশ্বমানবতার প্রতীক। পালনকর্ত্রী আনন্দময়ীর মধ্যে সে দেখতে পায় সত্যিকারের ভারতবর্ষকে—আনন্দময়ী যেন এক জ্যোতির্ময় কল্যাণ প্রতিমা। দেশপ্রেম ও বিশ্বচেতনার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে গোরা হয়ে ওঠে ত্যাগ আর যুগ-যুগান্তরের সাধনার প্রতীক। সমালোচক অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গত লিখেছেন—“গোরার যাত্রা শেষপর্যন্ত ভারতবর্ষের দেবতার সন্ধানে—গোরাকে আমরা ভালবাসি বলে একথা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হই। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এ ব্যাখ্যা দিতেই পারেন যে, সে দেবতা মানুষের মধ্যেই।

কেননা পরেশবাবুর কোনো সমাজে স্থান নেই একথার মানে হচ্ছে, সকল দেবালয়ের দ্বারা যখন বন্ধ, তখন মানুষের মাঝেই তাকে সন্ধান করতে হবে।"[৫০]

১৯০৫ খ্রীঃ লর্ড কার্জন-কৃত বঙ্গভঙ্গের প্রয়াসের বিরুদ্ধে যে স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ বাংলাদেশব্যাপী প্রবাহিত হয়েছিল—সেই পটভূমিকায় ঘর ও বাইরের সম্পর্কের নিরীখে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি লেখা হয়েছে। এখানে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত জীবনে 'স্বদেশী' আদর্শে নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং বঙ্গভঙ্গের চক্রান্তের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করে আন্দোলনে নেমেছিলেন এবং কবিতা, গান রচনা, রাখীবন্ধন উৎসব ইত্যাদির মধ্যদিয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আন্দোলনকারী নেতৃত্বের সংকীর্ণতা, বিদ্বেষ-ভাবনা এবং হিংসার বিরোধিতা করে তিনি আন্দোলন থেকে সরে এসেছিলেন একরকম। এই বর্হিমুখী এবং অন্তর্মুখী সংকট নিয়ে লেখা উপন্যাসটি। এই আন্দোলনের বৃত্ত একদিকে স্বামী নিখিলেশ অন্যদিকে স্বামীর বন্ধু সন্দীপ—এই দুয়ের মধ্যে 'শ্রেয়' ও 'প্রেয়ের' দ্বন্দ্বে বিমলা ক্ষতবিক্ষত হয়েছে এবং শেষপর্যন্ত স্বামীর কাছে সে অশ্রুজলে স্মাত হয়ে ফিরে এসেছে। নিখিলেশ আদর্শবাদী উদার ও নরমপন্থায় আস্থাশীল, অন্যদিকে সন্দীপ চরমপন্থার উগ্র সমর্থক শুধু নয়—মেকী দেশপ্রেমিকের আড়ালে সে হীণমনা, অর্থলোভী এবং বিমলার দেহের প্রতি তার প্রবলতর আকর্ষণ। শেষপর্যন্ত সন্দীপ সম্পর্কে বিমলার মোহভঙ্গ হয়েছে। সন্দীপের বৃত্ত ভেঙ্গে বিমলা স্বামীর কাছে ফিরে এসেছে। কেউ কেউ বলেছেন রবীন্দ্রনাথ নিজে নরমপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন বলে নিখিলেশের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। সে তুলনায় সন্দীপকে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচক ড. অশ্রুকুমার সিকদার লিখেছেন—"সন্দীপের প্রতি রবীন্দ্রনাথ অনুকম্পায়ী নন বরং অনেকটাই বিরূপ। অথচ এই চরিত্রের মুখ দিয়েই রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত আধুনিকতার কয়েকটা কথা উচ্চারণ করিয়েছেন। হয়তো দেখাতে চেয়েছেন উচ্চৈঃস্বরে যা নিজেকে আধুনিক বলে প্রমাণ করতে চায়, তা যদি সত্যের বিরুদ্ধে হয় তাহলে তা যথার্থ আধুনিক হতে পারে না।"[৫১] আসলে প্রবৃত্তিকে লজ্জা করা, সংযমকে বড়ো জানাটা মডার্ণ নয়। এই তথাকথিত আধুনিকতার প্রতিনিধি হিসেবে সন্দীপ চরিত্রকে অংকন করে রবীন্দ্রনাথ সেই আধুনিকতার মিথ্যা আড়ম্বরকে ব্যঙ্গ করে আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন। আর নিছক তত্ত্ব এই উপন্যাসে নিরাশ্রয় নয় তত্ত্ব মানুষের জীবন সমস্যার অংশ বিশেষ। তত্ত্ব আধুনিক

কোনো মানুষের কাছে বহিরঙ্গ খোলস নয়, সে সেই মানুষের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের আবরণে 'ঘর' ও 'বাইরে'র মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে তিনি উপন্যাসটিকে একটা বিশেষ মাত্রা দিয়েছেন।

আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ এবং সন্ত্রাসবাদের কবলে নরনারীর জীবন কীভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যায় তারই মর্মান্তিক কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) উপন্যাসটি। অতীন্দ্র ও এলার ব্যর্থতার কাহিনী নিয়ে মাত্র চারটি অধ্যায়ে উপন্যাসটি রচিত। এই উপন্যাসটির আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক ড. নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন—"স্বভাবের এবং স্ব-ধর্মের প্রতিকূল আচরণের মধ্যে গ্লানি ও দুঃখের বীজ নিহিত থাকে, স্ব-ধর্মের পীড়নে মানুষের গভীরতর চিত্ত পীড়িত হয়, ট্রাজেডি অনিবার্য হইয়া উঠে, এই অর্থেই উপাধ্যায় মহাশয়ের পতন বোধগোচর এবং তাহারই ইঙ্গিত 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে।"[৫২]

অতীন্দ্র ও এলা তথাকথিত দেশসেবার দেউলে নিজেদের মানবধর্ম বিসর্জন দিয়েছিল। এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বড় আঘাত নেমে এল মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের উপর। স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের বিবাদটাই রবীন্দ্রনাথের কাছে অসহনীয় মনে হয়েছে। তবে উপন্যাসটি প্রকাশের পরেই এর সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরী হলে রবীন্দ্রনাথ তার জবাব দিতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদের প্রেক্ষাপটে অতীন্দ্র ও এলার প্রেমের কাহিনী বলেছেন।

রোমান্টিক ভাবনার পাশাপাশি বিশেষ বিশেষ তত্ত্বের নিরীখে মানব জীবনের অতলে প্রবেশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—যার ফসল 'চতুরঙ্গ' (১৯১৫), 'শেষের কবিতা' (১৯২৯), 'দুইবোন' (১৯৩৩) এবং 'মালঞ্চ' (১৯৩৪)। প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকায় প্রথমে চারটি ছোটগল্পের আকারে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটি বেরিয়েছিল। 'জ্যাঠামশাই', 'শচীশ', 'দামিনী' এবং 'শ্রীবিলাস'—এই স্বতন্ত্র গল্প চারটিকে লেখক পরে স্বয়ং-সম্পূর্ণ একটি কাহিনীর আকার দিয়েছেন। নায়ক শচীশের আত্মোপলব্ধির সত্যপথ সাংকেতিকতার মধ্যদিয়ে উপন্যাসে বিধৃত। শচীশ-দামিনীর বিচিত্র মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও সম্পর্কের টানাপোড়েনের আভাস ইঙ্গিত মনোবিজ্ঞানের উর্ধ্বে এক অপরূপ চেতনায় ব্যঞ্জিত হয়েছে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, জযাঠামশাইয়ের শিষ্য নব্য মানবতাবাদী 'পজিটিভিস্ট' শচীশ লীলানন্দ স্বামীর কাছে রসের দীক্ষা নিয়ে রূপ-জগতে অরূপ সাধনায় ব্যাপৃত হল। অন্যদিকে দামিনী রূপ জগতের

অধিবাসিনী, ইন্দ্রিয়ময় জগতের মধ্যে সে শচীশকে কামনা করে। ফলে রূপ ও অরূপ, বস্তু ও রসের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে গেল। শচীশের সেই অরূপ এষণা আশ্চর্য তীক্ষ্ণতা ও ব্যঞ্জনার সাহায্যে চিত্রিত হয়েছে উপন্যাসে। সমালোচক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটি সম্পর্কে লিখেছেন---''চেতন মনের অন্তরালে যে রসধারা বহমান, আমাদের দেশের আউল-বাউল-সহজিয়া সাধকেরা যে রসের রসিক, শচীশের মতো মানবতত্ত্বে বিশ্বাসী আধুনিক যুবকও লীলানন্দ স্বামীর কাছে সেই রসের দীক্ষা নিয়ে রূপ জগৎকে অরূপ জগতের অঙ্গীভুত করে নিল। অপরদিকে দামিনী শচীশকে রূপচেতনা ও পার্থিব সত্তার মধ্যদিয়ে কামনা করে। এই বিচিত্র মনোদ্বন্দ্ব আশ্চর্য তীক্ষ্ণতা ও অপরূপ রহস্যময় ব্যঞ্জনার সাহায্যে বর্ণিত হয়েছে।''[৫৩] —বস্তুত এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়ে দিলেন যুক্তিই শেষ কথা নয়। তাই নায়ক শচীশ, প্রথমে ছিল 'না-ঈশ্বরে' বিশ্বাসী, পরে 'ঈশ্বরে বিশ্বাসী'—কিন্তু কোথাও সে স্থায়ী হতে পারল না। শেষ পর্যন্ত আত্মমুক্তির পথে বেরিয়ে সে বলল 'আমি কবি'। এইভাবে যুক্তি, বাস্তবতা, এসব তথাকথিত পথ বর্জন করে রবীন্দ্রনাথ শচীশকে নিয়ে গেছেন এক ভিন্নতর লোকে।

রোমান্সের রাজহংস রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনে পৌঁছে রোমান্টিকতার কাঞ্চনজঙ্ঘায় উপনীত হয়েছেন 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে। জীবনের উপান্তে দাঁড়িয়ে তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন নতুন রামগিরি, নতুন অলকাপুরীর সৌন্দর্য মাঝে। প্রচুর কাব্যগুণ, কাবিযক সংলাপ, কবিতার আবৃত্তি এবং শেষপর্যন্ত একটি দীর্ঘ কবিতা উপন্যাসটির প্রাণ। শিলং পাহাড়ের মায়াময় পরিবেশে অমিতের লঙ্গে লাবণ্যর দেখা, পরস্পরের অনুরাগী হওয়া, শেষ পর্যন্ত সমুদ্রের জলের লবণাক্ত আস্বাদ ছেড়ে ঘড়ার জলে তৃষ্ণা মেটায় অমিত রায়। বিয়ে করে কেতকী মিত্রকে। আর লাবণ্য শোভনলালকে বিয়ে করে সংসার-জীবন পথ চলতে থাকে। যে অমিত লাবণ্যকে ঘিরে একদিন ডানা মেলে পেয়েছিল ওড়ার আকাশ, আজ ছোট্টবাসা পেয়ে ডানা গুটিয়ে বসেছে। আপাতমস্তক রোমান্টিক এই উপন্যাস পড়ে 'কল্লোল' গোষ্ঠীর তরুণ তুর্কীর দল হতচকিত হয়ে যায় রবীন্দ্রনাথের ভাষা-ভঙ্গিমা ও বাক্‌বৈদগ্ধ্য দেখে। উপন্যাসটির আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—''শেষের কবিতা সমন্বয় সুষমা ও কবিত্ব মণ্ডিত বিশ্লেষণ শক্তির দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী উপন্যাস সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানের দাবি করিতে পারে। বিষয়ের ঐক্য ও আলোচনার সমগ্রতায় অবান্তর বস্তুর প্রায় সম্পূর্ণ বর্জনে ইহা অন্যান্য উপন্যাস অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।''[৫৪]

রবীন্দ্র সৃষ্টি ধারার নারীকে আমরা মূলতঃ দুইরূপে পাই—প্রিয়া এবং জননী। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর 'দুইবোন' উপন্যাসটির শুরুতেই 'শর্মিলা' অংশে জানিয়েছেন—"মেয়েরা দুই জাতের, কোনো কোনো পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি।

একজন জাত প্রধানত মা, আর এক জাত প্রিয়া। ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বর্ষা ঋতু। জলদান করেন, ফল দান করেন, নিবারণ করেন তাপ, ... আর প্রিয়া বসন্ত ঋতু। গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র।"[৫৫] মূলতঃ এই তত্ত্ব 'দুইবোন' এবং 'মালঞ্চ' উপন্যাসের উপজীব্য। 'চতুরঙ্গ'-এর মতই চারটি চরিত্রের বক্তব্য নিয়ে 'দুইবোন'-এর কাহিনী রচিত। এরা হল—শর্মিলা, নীরা, ঊর্মিমালা আর শশাঙ্ক। আপাতদৃষ্টিতে চতুর্ভুজ থাকলেও এই উপন্যাস আসলে ত্রিভূজ প্রেমের, শর্মিলা-ঊর্মিমালা আর শশাঙ্ক কেন্দ্রিক। নিঃসন্তান শর্মিলার সমস্ত চিন্তা ছিল স্বামী শশাঙ্ককে ঘিরে। শশাঙ্ককে সমস্ত আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করার ভার সে নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। পরিচিত কক্ষপথে শর্মিলার অসুস্থতার পথ ধরে সংসারে আসে তার বোন ঊর্মিমালা। পারিবারিক হাস্য-পরিহাস, সম্পর্কের ছদ্মবেশে শশাঙ্ক আর ঊর্মিমালার মধ্যে গড়ে উঠেছে গোপন প্রণয়। প্রথমে কেউ আঁচ না পেলেও পরে শর্মিলা টের পেয়েছে এবং শশাঙ্ক ঊর্মিমালা নিজেরা অবহিত হয়েছে সম্পর্কের পরিণতি সম্পর্কে। অন্যদিকে 'মালঞ্চ' উপন্যাসে নীরজা, সরলা আর আদিত্যের সম্পর্কের মধ্যদিয়ে নারী-পুরুষের টানাপোড়েনকে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই উপন্যাস দুটির আলোচনা প্রসঙ্গে ড. ক্ষেত্র গুপ্ত লিখেছেন—"রবীন্দ্রনাথের কোনো দুটি উপন্যাসে এত মিল নেই। এর সঙ্গে তুলনা চলে বিষবৃক্ষ আর কৃষ্ণকান্তের উইলের। বহিরঙ্গ সাদৃশ্যের আপাতদৃষ্টিতে একই ধরনের অবস্থা ও সমস্যা, কিন্তু মানুষগুলি স্বতন্ত্র হওয়ায় সমস্যার রঙ-রূপ বদলে যায়, লেখকের সেই খোঁজ একই ধরনের দুটি বই লেখার ভিত্তিতে কাজ করে থাকবে।"[৫৬] রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনে যা কিছুই লিখে থাকুন না কেন, তাঁর ভিন্ন পরিচয় খুব বেশী প্রয়োজন পড়ে না—তিনি মূলতঃ কবি, কাব্যিক ভাবরসেই তাঁর আত্মার মুক্তি ঘটেছে। যথার্থ উপন্যাস রচয়িতার যে ধরনের বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করার দিকে প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ সচরাচর সে পথে হাঁটেননি। ফলে তাঁর অনেক উপন্যাসেই বাস্তব চিত্রগুলি কল্পনার রংয়ে রঙীন হয়ে উঠেছিল।

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালের বাংলা উপন্যাসে একটি অনিবার্যভাবে উচ্চারিত নাম

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৮-১৯৩৮)। বাংলাদেশের নগর সংস্কৃতির ব্যক্তিত্ববাদের চরম পরাকাষ্ঠা রবীন্দ্র সাহিত্য। ব্যক্তির সম্মোহনের মাত্রাকে তিনি চরম সীমায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। সেদিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের কথা মনে রেখেও বলা যায়, শরৎচন্দ্রই প্রথম বাঙালী পাঠকের মনের মণিকোঠায় পৌঁছতে পেরেছিলেন। তিনি প্রথম দেখিয়েছেন উপন্যাস শুধু গল্প বলা নয়, তার চেয়ে অনেক কিছু বেশী। উপন্যাস জীবনের কথা বলে, জীবনের নানা টানাপোড়েন জ্বালা-যন্ত্রণার কথা তুলে ধরে। জীবন-যন্ত্রণার অভিঘাতে জর্জরিত মানুষের কাছে উপন্যাস মানে শুধু ড্রয়িংরুমে বসে পড়া কোনো জমজমাট গল্প নয়। অর্থাৎ শরৎচন্দ্র নিছক কলাকৈবল্যবাদী নীতিতে বিশ্বাস করতেন না। তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন সাহিত্যকে যদি সমাজের একেবারে নীচু তলায় পৌঁছে না দেওয়া যায়, তাহলে তা কখনোই সর্বজনীনতা পেতে পারেন না। সারা পৃথিবীতে যখন বিজ্ঞানের হাত ধরে মধ্যযুগীয় সব পুরনো ধ্যান-ধারণা বর্জন করে সার্বিক উন্নয়ণের দিকে এগিয়ে চলেছে তখনো এদেশের বেশীর ভাগ মানুষ নানা জপতপ, মন্ত্রতন্ত্র, পুরাণের নানা অলৌকিক কাহিনী ইত্যাদির উপর নির্ভর করে তাদের জীবনপথ পাড়ি দিচ্ছে। সেই আলো-আঁধারি সময়ে দাঁড়িয়ে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত দরদী মন নিয়ে নির্মম বাস্তব কাহিনী তুলে এনে মানুষের বদ্ধমূল ধারণাকে ভাঙ্গতে সচেষ্ট হয়েছেন। যা কিছু সনাতন, যা কিছু প্রাচীন জীর্ণ—সেইসব কিছুকে ভেঙ্গে তিনি নতুন করে ভারতীয় জীবনধারায় আধুনিকতার মুক্ত বাতাস বইয়ে দিয়েছেন। তাঁর সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি নিজেই স্পষ্ট করে বলেছিলেন—''সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখন হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না, সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই, এদের কাছেও কি ঋণ আমার কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে।''[৫৭] এই বক্তব্যের মধ্যেই সমাজের নীচুতলার মানুষদের জন্য শরৎচন্দ্রের দরদ যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি সমাজ ব্যবস্থার পট পরিবর্তনেরও একটা সুর শোনা যায়। এহেন শিল্পীর উপন্যাসগুলিকে বিষয়ের নিরীখে শ্রেণীকরণ করতে গিয়ে সমালোচকরা বিভিন্ন কৌণিকতার সৃষ্টি করেছেন। 'বড়দিদি' (১৯১৩) থেকে 'নববিধান' (১৯৩৮) তাঁর উপন্যাসগুলিকে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে ছয়টি ভাগে ভাগ করেছেন—

- প্রেম বর্জিত পারিবারিক বিরোধচিত্র।
- সমাজবিধির প্রাধান্য চিহ্নিত দাম্পত্য প্রেম ও বিরোধ কাহিনী।
- সমাজ সমালোচনা মূলক উপন্যাস।
- পুর্বরাগ পুষ্ট মধুরান্তিক প্রেম।
- নিষিদ্ধ সমাজ বিরোধী প্রেম।
- মতবাদ প্রধান ও পূর্বানুবৃত্তিমূলক উপন্যাস।

—অন্যদিকে ড. সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (পঞ্চম খণ্ড)-এ চারটি ভাগে বিন্যস্ত করেছেন—

■ প্রথম পর্যায়ে বঙ্কিম অনুপ্রাণিত উপন্যাস—'পরিণীতা' (১৯১৪), 'বিরাজবৌ' (১৯১৪), 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬), 'চন্দ্রনাথ' (১৯১৬), 'দেবদাস' (১৯১৭), 'দত্তা' (১৯১৮), 'দেনাপাওনা' (১৯২৩), 'পথের দাবী' (১৯২৬)—এগুলিতে বঙ্কিমের উপন্যাসের রস ও কালের অনুরণন শোনা যায়।

■ দ্বিতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্র-প্রভাবিত উপন্যাস—'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'গৃহদাহ' (১৯২০), 'বিপ্রদাস' (১৯৩৫)।

■ তৃতীয় পর্যায়ে আত্মকথাশ্রিত উপন্যাস—'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব ১৯১৭, দ্বিতীয় পর্ব ১৯১৮, তৃতীয় পর্ব ১৯২৭, চতুর্থ পর্ব ১৯৩৩)।

■ চতুর্থ পর্যায়কে ড. সেন নাম দিয়েছেন 'দিক্‌ভ্রান্ত'। এখানে 'শেষপ্রশ্ন' (১৯৩১) উপন্যাসটির কথা বলা যায়।

অধ্যাপক জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎসাহিত্যে ব্যক্তি ও সমাজ' গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে বিষয়-ধর্মের গতি-প্রকৃতি অনুসারে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলি হল—

- পরিবার জীবন
- প্রণয় ধর্ম
- সমাজ প্রেক্ষিত
- সমাজতত্ত্ব।

লেখকের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'শ্রীকান্ত' এবং রাজনৈতিক উপন্যাস 'পথের দাবী'—এই

মেরুকরণের বাইরে থাকে।

সমালোচকদের পৃথক পৃথক দৃষ্টিকোণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে আমরা শরৎ উপন্যাসগুলিকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করতে পারি।

- পারিবারিক ও দাম্পত্য সমস্যামূলক ।
- সমাজ সমালোচনা মূলক।
- রোমান্টিক প্রেমোপাখ্যানমূলক।
- তত্ত্বাশ্রয়ী ও রাজনৈতিক মতবাদমূলক।
- আত্মজীবনীমূলক।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাসেই বাঙালী পরিবারের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, পরিবারের মানুষগুলির নানা দোলাচলবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুত শরৎচন্দ্র ছিলেন বাঙালী পারিবারিক জীবনের রূপকার। বাংলাদশের হতদরিদ্র, নিম্নবিত্ত, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত এবং ধনী মানুযের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেছেন। সেই অভিজ্ঞতাকে তিনি নিপুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন। এই অভিজ্ঞতার ফসল পারিবারিক ও দাম্পত্য সমস্যামূলক উপন্যাসগুলি। প্রসঙ্গত লেখকের মানসিকতার মূল সুরটি ব্যক্ত হয়েছে অধ্যাপক জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনায়। তিনি লিখেছেন—''বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের মতো মননশীল পাঠকের চেয়ে সাধারণ পাঠককুলের কাছে পৌঁছানোই শরৎচন্দ্রের অধিকতর পছন্দ ছিল। কাজেই এই শ্রেণীর পাঠকের মর্মমূলে সহজে আলোড়ন তোলার জন্যই পারিবারিক জীবনের 'ডিটেলে'র উপর তিনি কাজ করতে চেয়েছেন।''[৫৮] লেখক দেখিয়েছেন কেমন করে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে একান্তবর্তী পরিবারগুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে। তাঁর 'নিষ্কৃতি', 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'বৈকুণ্ঠের উইল' 'শুভদা', 'অরক্ষণীয়া' প্রভৃতি গল্প-উপন্যাসে এই ভাঙ্গনের চিত্র আমরা পাই। 'নিষ্কৃতি' উপন্যাসে দেখি, নিজেদের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত দুই আইনজীবী ভাইয়ের সংসারে বৃত্তিহীন খুড়তুতো ভাই রমেশের জায়গা হল না। সেইসঙ্গে পরিবারের মধ্যে বহুমুখী নারীর ভাবনা আর চাওয়া-পাওয়ার টানাপোড়েনকেও তুলে ধরেছেন লেখক নয়নতারা শৈলজার মত নারীর মধ্যদিয়ে। 'বিন্দুর ছেলে'তে আবার অর্থনৈতিক বৈষম্যের পথে নয় দুই ভাইয়ের পৃথক হয়ে যাওয়ায় মূলে ছিল জমিদার কন্যা বিন্দুবাসিনীর সাময়িক উত্তেজনা। নিজের অজ্ঞাতসারেই সে জমিদারী অর্থের অহংবোধকে ব্যক্ত করেছে। আর এরই ফলে মাধব ও যাদবের পৃথক হওয়া এবং পেটের

দায়ে যাদবের চাকরীর সন্ধানে প্রৌঢ় বয়সে পথে নেমে পড়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। শেষে মান-অভিমান প্রশমিত হলেও একান্তবর্তী পরিবার হয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। 'রামের সুমতি' কিংবা 'বৈকুণ্ঠের উইল'-এ ভাইদের পৃথক হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে পরিবারের বাইরের লোকের ভূমিকা ছিল। 'রামের সুমতি'তে নারায়ণীর নিজের মা আর 'বৈকণ্ঠের উইল'-এ মনোরমার বাবা এই বিচ্ছেদকে ত্বরান্বিত করেছিল। শরৎচন্দ্রের পারিবারিক টানাপোড়েনের গল্প হিসেবে প্রতিনিধি স্থানীয় উপন্যাস হিসেবে 'বিরাজবৌ', 'পণ্ডিতমশাই', 'অরক্ষণীয়া' এবং 'শুভদা' কে চিহ্নিত করা যায়। 'বিরাজবৌ' উপন্যাসটিকে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'শ্রেষ্ঠ গল্প' হিসেবে উল্লেখ করলেও ড. ক্ষেত্র গুপ্ত এটিকে 'সতীত্ব-অসতীত্ব : এক দুর্ভাবনা' শীর্ষক শিরোনামে আলোচনার সূচনাতেই স্পষ্টই লিখেছেন—"বিরাজবৌ একটি অতি দুর্বল উপন্যাস। গল্পের কোন আকর্ষণী শক্তি নেই। ঘটনা বিন্যাসে হেতুবাদের একান্ত অভাব। উপন্যাস ব্যক্তি মানুষের কাহিনী, তাদের হৃদয়ের টানাপোড়েনে গড়ে ওঠে। সর্বজনীন যুক্তি সেখানে না চললেও ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতিরও একটা নিজস্ব যুক্তিবাদ আছে। সেটা লেখককেও মেনে চলতে হয়। বর্তমান উপন্যাসে তার বালাই নেই বললেই চলে।"[৫৯]

এই উপন্যাসে লেখক বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' ও কৃষ্ণকান্তের উইলে'র মতই চিরাচরিত পথেই দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েনকে অংকন করেছেন। নীলাম্বর ও বিরাজের আদর্শ ও ঐকান্তিক দাম্পত্য সম্পর্কের বর্ণনা দিয়ে বঙ্কিমের ধারাকেই অনুসরণ করেছেন। স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালনের অক্ষমতার ফলে মনোবেদনা থেকেই বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে নীলাম্বর স্ত্রীর সতীত্বের প্রতি সন্দেহ করেছে। এই পথেই উপন্যাসের শেষে ট্রাজেডির রস ঘনীভূত হয়েছে। উপন্যাসটি সম্পর্কে ড. অশ্রুকুমার সিকদার লিখেছেন—" 'শুভদা' ও বিরাজবৌ' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র সামন্ততান্ত্রিক ভারতের হিন্দু আদর্শের সতী স্ত্রীর চরিত্র এঁকেছেন, যে স্ত্রী সর্বসময়ে ও সর্ব অবস্থায় স্বামীর অনুগামী।"[৬০] শরৎচন্দ্রের উপন্যাস প্রধানতঃ ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। সেই গ্রামকেন্দ্রিক জীবনের এক অনবদ্য দলিল 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসটি। এতে পূর্বে বিবাহিতা ও পরিত্যক্তা স্ত্রীকে পুনর্গ্রহণের পাশাপাশি গ্রামসমাজের ছবিও ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। এর কাহিনীতে দেখা যায় বৃন্দাবন কুসুমকে প্রথমে বিবাহ করলে, পরে কুসুমকে তাড়িয়ে দিয়ে বৃন্দাবন পুনর্বিবাহ করে। কুসুমের আশ্রয় হয় কুঞ্জ ফেরিওয়ালা। বৃন্দাবনের মা কুসুমকে পুনরায় ফিরিয়ে নিতে চাইলেও আত্মাভিমানী কুসুম রাজী হয়নি। এদিকে বৃন্দাবনও ভাঙ্গে তবু মচকায় নি। কুসুমের

অভাব তীব্র হলে সে যখন বৈরাগী হতে চেয়েছে, তখন কুসুমও তার সঙ্গে বৈরাগিনী হতে চেয়েছে। এখানে কাহিনীটি বাস্তবতাকে অতিক্রম করে আদর্শলোকের দিকে অগ্রসর হয়েছে। এই মতের সমর্থন পাই অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাতেও—"... শেষের দৃশ্যগুলিতে বৃন্দাবনের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসটিও বাস্তবতাকে অতিক্রম করিয়া আদর্শের উর্ধ্বলোকে উঠিয়া গিয়াছে—যে নীতি প্রাধান্য শরৎচন্দ্র বঙ্কিমের কোনো কোনো উপন্যাসের ত্রুটি বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাই তাঁহার নিজের উপন্যাসকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।"[৬১]

ছোটগল্প না উপন্যাস—এই বিতর্কে ড. সুকুমার সেন 'অরক্ষণীয়া'কে উপন্যাসই বলেছেন। এতে একটি পারিবারিক ছবি, তার মধ্যে সামাজিক রীতি-নীতির প্রশ্ন ঢুকে এটিকে সামাজিক কাহিনী নির্ভর উপন্যাস করে তুলেছে। উপন্যাসটির আলোচনায় ড. ক্ষেত্র গুপ্ত দেখিয়েছেন, এখানে লেখকের দরদীমন যতটা সক্রিয়, শিল্পী মানসিকতা ততটা নয়। প্রসঙ্গত তিনি লিখেছেন— "শরৎচন্দ্রের যে সমস্ত লেখা তাঁর দরদী মনের এবং সামাজিক পারিবারিক বাস্তবতা বোধের নিদর্শন, অবাধ কারুণ্য সৃষ্টিতে এক সময়ে পাঠকের মন অশ্রুসজল করে দখল করে বসত তার মধ্যে অরক্ষণীয়া।"[৬২] উপন্যাসটির নায়িকা জ্ঞানদা। অর্থকৌলিন্য ও রূপ এই দুইয়ের অভাবে বিবাহযোগ্যা মেয়েরা যখন সমাজের চোখে বিয়ের বয়স অতিক্রম করে যায়, তখন ঘরে বাইরে ঐসব মেয়েদের জীবনে যে মানসিক পীড়ন চলে তারই অনিবার্যতা এতে পরিলক্ষিত হয়। স্বামীহারা বিধবার সংসারযাত্রা নির্বাহের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট একদিকে দুর্গামণির দৃষ্টান্তে পরিদৃশ্যমান, আর একদিকে এক অনূঢ়া মেয়ের সংসারাশ্রমের দ্বারপ্রান্তে অনুপ্রবেশের জন্য অসহায় অনুমতি প্রার্থনার রূপ জ্ঞানদার বৃত্তান্তে প্রতিফলিত হয়েছে।

পারিবারিক জীবন প্রবাহেরই একটি বিশেষ পর্যায় দাম্পত্য বিরোধ। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিত্বের পার্থক্য সূত্রেই এই বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে এবং তার পরিনাম চিত্রিত হয়ে থাকে। এরকমই দাম্পত্য সংঘাতের বিশিষ্ট উপন্যাস 'গৃহদাহ' (১৯২০)। এতে হিন্দু ও ব্রাহ্মদের প্রাথমিক দ্বন্দ্বের পথ ধরে দাম্পত্য জীবনের মধ্যে তৃতীয় পুরুষের উপস্থিতিতে ট্রাজেডি ঘণীভূত হয়েছিল। মহিম-অচলার দাম্পত্য জীবনে সুরেশের অনুপ্রবেশে দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙ্গে গেছে। 'ঘরে বাইরে'র বিমলার মত অচলা স্বামী নাকি স্বামীর বন্ধু সুরেশ—এই দু'জনের মধ্যে শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্ব ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। বিমলা শেষপর্যন্ত স্বামীর কাছে ফিরে এলেও অচলার

জীবন ট্রাজেডির অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল। এর মূল্যায়ন ক'রে সমালোচক ড. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখেছেন— "...অচলার জীবনে ছিল একটা মূলীভূত অসঙ্গতি। সুরেশের ভালোবাসা ছিল তাহার বিড়ম্বনা, তাহার সম্পদ, তাহার সম্বল। ইহাতে অগৌরব থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে মিথ্যার ফাঁকি নাই। নারী হৃদয়ের এই যে বিরোধ ও অসঙ্গতি ইহার বিশ্লেষণেই শরৎচন্দ্রের বিশেষত্ব।"[৬৩] দাম্পত্য জটিলতার আর এক নবতর সংযোজন 'নববিধান' (১৯২৪) উপন্যাসটি। এখানে দুই বিপরীত কালচারের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে। পাশ্চাত্য জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত শৈলেশের সঙ্গে প্রাচীন পন্থী, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পরিবারের মেয়ে উষার বিবাহ হয়। উভয়ের অনৈক্যের জন্য শেষ পর্যন্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়। শৈলেশের দ্বিতীয় বার বিবাহ, স্ত্রীর মৃত্যু এবং পুনর্বিবাহের আলোচনাকালে শৈলেশ তার প্রথমা স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে আসে। উপন্যাসটির মূল্যায়ন করে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন— "...এই ক্ষুদ্র কাহিনীটির মধ্যে কোনো গভীর জীবনসত্য, মানব চরিত্রের কোন স্মরণীয় বিকাশ লক্ষ্য করা যায় না। শৈলেশের দুর্বল প্রথানুগত্য ও আচরণের দুই বিপরীত প্রান্তের মধ্যে দোলায়িত অস্থিরতা সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।"[৬৪]

শরৎচন্দ্র ছিলেন যতটা শিল্পী, ততোটাই সমাজ সংস্কারক। মার্কসবাদী চিন্তাবিদ শিবদাস ঘোষ এই সমাজ সংস্কারকের মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছেন— "... আমাদের দেশে সাহিত্যের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রই একমাত্র সাহিত্যিক, যিনি তখনকার দিনে সমাজ বিপ্লবের ঝাণ্ডাকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন, সমাজ বিপ্লবের কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য একনিষ্ঠ ভাবে লড়েছেন।"[৬৫] মূলত তিনটি উপন্যাসে লেখকের এই ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬), 'বামুনের মেয়ে' (১৯২০) এবং 'দেনাপাওনা' (১৯২৩)। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য 'দেনাপাওনা'র পরিবর্তে 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৫) -র কথা বলেছেন। শরৎচন্দ্র শুধুই সমাজ শক্তির কেন্দ্র বিন্দুটিকে স্পষ্ট করেননি, এর পোষণ ও সমর্থনের স্বার্থ দুষ্ট অংশটিরও উন্মোচন করেছেন। তিনটি উপন্যাসেই তিনি সামাজিক ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে খড়্গ হস্ত হয়েছেন। 'পল্লীসমাজ'-এ লেখক প্রথমে তিনটি দিককে তুলে ধরেছিলেন— পল্লীবাংলার দুরবস্থা, গ্রাম সংস্কার আর সমাজপতিদের কীর্তিকলাপ। পরে এরসঙ্গে রমা-রমেশের প্রেমকে যুক্ত করেছেন। সমাজপতি বেণী ঘোষালদের যাবতীয় অপকীর্তি, গ্রামীণ মানুষের চরিত্র, জাতপাত, শিক্ষা দারিদ্র এসব লেখক খুব কাছ থেকে দেখেছেন। সেইসঙ্গে বিধবা রমা ও রমেশের প্রেম, আর রমেশের হাত ধরে গ্রাম সমাজের উত্তরণ দেখিয়েছেন। এই উত্তরণের ভিন্নতর চিত্র পাই

'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসে। উপন্যাসের জমিদার চরিত্র গোলক চাটুয্যে প্রিয় মুখুয্যের মেয়ে সন্ধ্যাকে বিয়ে করতে পারেনি বলে কীভাবে সন্ধ্যার বিয়ের আসরে সেই তথ্য ফাঁস করে একটি পরিবারকে ধ্বংস করে দিয়েছিল তারই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এরই পাশে অরুণের সংগ্রামের দিকটি অনুজ্জ্বল রেখে অসহায় মানুষের দুঃখগ্লানি ও পুঞ্জীভূত বেদনার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন লেখক। 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে দেখা যায় অত্যাচারী জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী কেমনভাবে প্রাক্তন স্ত্রী ষোড়শী তথা অলকার সংস্পর্শে আমূল বদলে গেছে সেটাই দেখিয়েছেন লেখক। জীবানন্দের ন্যায় শোষক অত্যাচারী জমিদার, কুচক্রী শয়তান নায়েব এক কড়ি নন্দী, সহযোগী ধনী জোতদার জনার্দন রায়, ব্রাহ্মণ পুরোহিত সর্বেশ্বর শিরোমণি ও তারাদাস চক্রবর্তী—আর একদিকে আছে দরিদ্র, দুঃস্থ, নিপীড়িত প্রজাবৃন্দ। চণ্ডীর ভৈরবীকে নিয়েই এই উপন্যাস। এখানে ধর্মের মোহ বড় কথা না, তার থেকে বড় মন্দিরের সম্পত্তি নিয়ে স্বার্থপর লোকেদের ঘৃণ্য চক্রান্ত। আর এখানেই উপন্যাসটি সামাজিক আবেদন সমৃদ্ধ। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গত লিখেছেন—"...'অরক্ষণীয়া', 'বামুনের মেয়ে' ও 'পল্লীসমাজ'—এই তিনটি উপন্যাসে সামাজিক অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাদের মধ্যে যে সামান্য রকমের প্রণয়চিত্র আছে, সমাজের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতাকে ফুটাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই তাহাদের অবতারনা করা হইয়াছে।"[৬৬]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'মানসী' কাব্যের 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটির শেষে লিখেছিলেন—

'ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী,
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।
শান্ত সন্ধ্যা স্তব্ধ কোলাহল
নিবাও বাসনা বহ্নি নয়নের নীরে
চলো ধীরে ঘরে ফিরে যাই।"[৬৭]

এই প্রেম মধ্যবিত্তের কাছে প্রকৃষ্ট ভাব বিলাসের উপাদান। যা অনির্বাচনীয়, যা দুরধিগম্য, যা বিমূর্ত তার প্রতি মধ্যবিত্তের অন্তরের টান অত্যন্ত প্রবল। প্রেমের অনতিস্পষ্ট চেহারাটিকে ঘিরেই মধ্যবিত্তের রোমান্টিক কল্পনার পরিমান সর্বাধিক। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে এই প্রেমের

মূলতঃ দুটি বিশেষ দিক ধরা পড়েছে মধুর প্রেম আর নিষিদ্ধ সমাজবিরোধী প্রেম। সেদিক থেকে রোমান্টিক প্রেমোপাখ্যানের বিষয় ভিত্তিক উপন্যাস হিসেবে 'দেনাপাওনা', ছাড়াও 'বড়দিদি' (১৯১৩), 'চন্দ্রনাথ' (১৯১৬), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'দেবদাস' (১৯১৭), 'দত্তা' (১৯১৮), 'পরিনীতা' (১৯১৮), 'বিপ্রদাস' (১৯৩৫) প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যায়। এইসব রচনায় লেখকের ভাবনায় প্রেমের স্বচ্ছতোয়া ধারাটি ছোট ছোট উপল খণ্ডের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এখানে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা খুব বেশী নেই। বিষয় সম্পত্তিগত ব্যবধান শরীকী বিরোধ সূত্র, লোকনিন্দার ভয়, অন্তরশায়িনী নিগূঢ়রসংস্কার এগুলি ছিল প্রণয়পথের পরিকল্পিত বাধা। এইসব বাধা সাময়িক, কিন্তু দীর্ঘাস্থায়ী হয়নি। এমনকি দেবদাস উপন্যাসের ক্ষেত্রেও।

শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'বড়দিদি' (১৯১৩)। সমাজ নিষিদ্ধ বিধবার প্রেম ও জমিদারের অত্যাচারের কাহিনী এতে রয়েছে। উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র জমিদার ব্রজলাহিড়ীর কন্যা মাধবী। বিধবা হয়ে পিতার সংসারে ফিরলে তার সঙ্গে আত্মভোলা গৃহশিক্ষক সুরেন্দ্রনাথের সম্পর্কের টানাপোড়েন লক্ষ্য করা যায়। এই প্রেমের মূল্য দিতে গিয়ে মাধবীকে গৃহত্যাগ করতে হয়েছে। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙনকে কুমুদিনীর সন্তান সম্ভবনার মধ্যদিয়ে আটকে ছিলেন, তেমনি শরৎচন্দ্রও তাঁর 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসে বিচ্ছেদ অতিক্রম করতে সন্তানের ভূমিকা প্রয়োগ করেছেন। উপন্যাসে সরযূর প্রতি চন্দ্রনাথের প্রেমে কোনো অভাব ছিল না ঠিকই, কিন্তু সরযূর পরিচয় উদ্ঘাটনের পর বিরূপ চরিত্রের রাশ টেনে ধরেছে আসন্ন পিতৃত্বের প্রসঙ্গ। এই গল্পের মধ্যে সনাতন আদর্শের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখ'র উপন্যাসে বাল্যপ্রণয়ের অভিসম্পাতের জন্যই প্রতাপ শৈবলিনীর বিচ্ছেদ অনিবার্য ছিল। সেই একই পথে হেঁটে শরৎচন্দ্র তার 'দেবদাস' উপন্যাসে দেবদাস ও পার্বতীর বিচ্ছেদকে ত্বরান্বিত করেছিলেন শেষপর্যন্ত। উপন্যাসটির উপসংহারে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন— ''এখন এতদিনে পার্বতীর কি হইয়াছে, কেমন আছে জানি না। সংবাদ লইতেও ইচ্ছা করে না। শুধু দেবদাসের জন্য বড় কষ্ট হয়। তোমরা যে কেহ এ কাহিনী পড়িবে, হয়ত আমাদেরই মত দুঃখ পাইবে। তবু যদি দেবদাসের মত এমন হতভাগ্য অসংযমী পাপিষ্ঠের সহিত পরিচয় ঘটে, তাহার জন্য একটু প্রার্থনা করিও। প্রার্থনা করিও, আর যাহাই

হোক যেন তাহার মত এমন করিয়া কাহারও মৃত্যু না ঘটে।"[৬৮] এই উপন্যাসেই শরৎচন্দ্র প্রথম বারবণিতার চিত্রাঙ্গন করেছেন। যদিও চন্দ্রমুখী তথাকথিত বারবণিতা হলেও হৃদয়ানুভূতিতে কোনো সামাজিক নারীর চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এই চন্দ্রমুখীর মধ্যদিয়ে লেখক নারী জীবনের মর্মান্তিক সত্য উদ্ঘাটিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গোরা' (১৯১০) উপন্যাসে যেভাবে ব্রাহ্মদের প্রসঙ্গ এনেছিলেন তাঁরই প্রভাবে শরৎচন্দ্র তার 'পরিণীতা' (১৯১৪) উপন্যাসে প্রথম ব্রাহ্ম সমাজকে এনেছিলেন—যার পূর্ণরূপ আমরা দেখি 'দত্তা' এবং 'গৃহদাহ' উপন্যাসে। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটির আলোচনায় লিখেছেন— "'পরিণীতা' গল্পটিতে (১৯১৪) প্রেমের অকুণ্ঠিত মহিমা একটু নূতনভাবে ঘোষিত হইয়াছে। ললিতা শেখরকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়া সেই সম্পর্ককে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অব্যাহত রাখিয়াছে।"[৬৯] প্রাত্যহিক জীবন যাত্রায় গোপন প্রেম কীভাবে সঞ্চারিত হয়েছে তারই উপর দাঁড়িয়ে আছে গল্পটি। এই গল্পে যে ব্রাহ্ম প্রসঙ্গ রয়েছে তারই এক ভিন্নতর রূপ দেখি 'দত্তা' (১৯১৮) উপন্যাসে। এই উপন্যাসে ব্রাহ্ম সমাজের কথা শুধু পটভূমিকায় নয় কাহিনীর মধ্যে ঢুকেছে, চরিত্রকেও আশ্রয় করেছে বনমালী, রাসবিহারী এবং জগদীশ —এই তিনবন্ধুর কথা কাহিনীর পটভূমিতে রেখে কাহিনীতে বনমালীর কন্যা বিজয়া, রাসবিহীর পুত্র বিলাস এবং জগদীশের পুত্র নরেনের পারস্পরিক সম্পর্ককেই লেখক বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনা প্রসঙ্গেই এসেছে বাংলাদেশের গ্রামসমাজ, ধনতান্ত্রিক ইংরেজী সভ্যতা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার তৎকালীন চিত্র তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে হিন্দু-ব্রাহ্ম সুপ্ত বিরোধের নিরীখে লেখকের ব্রহ্মবিদ্বেষ প্রচ্ছন্ন থাকেনি। অধ্যাপক জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গত লিখেছেন— "...শরৎচন্দ্র সংস্কারবাদী হয়েও হিন্দু সমাজের জাতিত্বের ভিত্তিটাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেননি। তাই জাতিত্বের অন্ধ সংস্কারের দিকটির প্রতিবাদ করেও এই সামাজিক ব্যবস্থাপনার অন্য মহনীয়তার দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন।"[৭০]

ভবঘুরে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার আলোকে শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প উপন্যাসে সমাজ যাদের 'চরিত্রহীন' বলে সেইসব নরনারীর কথা প্রায়ই বলেছেন। কিন্তু সমকালীন সমাজকে অনেকটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে ফেলে তিনি এরপর উপন্যাসেরই নামকরণ করেন 'চরিত্রহীন' (১৯১৭) এখানে তিনি সমাজকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। সমাজ যাদের চরিত্রহীন

হিসেবে চিহ্নিত করে দেয়, লেখক সেই সমাজকেই পরোক্ষে চরিত্রহীন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ড. ক্ষেত্র গুপ্ত প্রসঙ্গত লিখেছেন— ''...সমাজকে তার প্রথাসিদ্ধ নীতিবোধে দাঁড় করিয়ে এভাবে আক্রমণ করা ঔপন্যাসিকের কাজ নয়। উপন্যাসের মধ্যে তিনি সেভাবে ভর্ৎসনাও করেননি। মানুষের মনস্তত্ত্ব নিয়েই কারবার করেছেন। তবে নামকরণ লেখকের প্রতিবাদকে ধরে রেখেছে।''[৭১] নায়িকা প্রধান এই উপন্যাসে সাবিত্রী এবং কিরণময়ী এই দ্বি-নায়িকার প্রকৃতিকে উল্লেখ করেছেন লেখক। সাবিত্রী কুলত্যাগিনী বিধবা, কিরণময়ী বিদূষী নারী। মেসের ঝি সাবিত্রীকে মহান নারী করে তুলেছেন লেখক। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর যে নিম্নস্তরে স্থান তাতে লেখক ব্যথিত ছিলেন। তাই সতীশ, সাবিত্রী, কিরণময়ী, উপেন্দ্র, দিবাকর, অনঙ্গ ডাক্তার, সুরবালা কেন্দ্রিক এই কাহিনীতে তথাকথিত সমাজ প্রেক্ষাপটে কিরণময়ী আর সাবিত্রীর নারীত্বের মর্যাদাকে প্রতিনিত করেছেন। অবশ্য শেষপর্যন্ত সতীসাধ্বী নারী সুরবালাকেই লেখক অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ড. অশ্রুকুমার সিকদার প্রসঙ্গত লিখেছেন— ''কিরণময়ী অসামান্য বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবত্তার অধিকারিণী। রুগ্ন স্বামীর সে মৃত্যু কামনা করে। সে আত্মা মানে না, বেদে তার পূর্ণ আস্থা নেই। কিন্তু তার সমাজ বিদ্রোহ স্বামীর মৃত্যুর পরে হয়ে দাঁড়ায় চিরাচরিত বিধবার সমস্যা। কিরণময়ীকে যতোই রক্তিম রক্তিম দীপশিখা করে তুলুন সে নিষ্প্রভ হয়ে যায় মূর্তিমতী সতীত্ব সুরবালার কাছে।''[৭২] রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' (১৯২৯) উপন্যাসের ছায়াবহ উপন্যাস 'বিপ্রদাস' (১৯৩৫)। এটি লেখকের শেষ পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। অতিকঠোর আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব মুখুজ্যে পরিবারের সঙ্গে স্বল্পকাল স্থায়ী সংস্রবে আধুনিক শিক্ষা প্রাপ্তা বন্দনার চিত্তজগতে যে গুরুতর বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল তারই ইতিহাস এতে বর্ণিত হয়েছে।

শরৎচন্দ্র তাঁর 'তরুণের বিদ্রোহ' প্রবন্ধটির একজায়গায় লিখেছিলেন— ''...অন্ধের মত নয়; মহাত্মাজী হুকুম করলেও নয়; কংগ্রেস সমস্বরে তার প্রতিধ্বনি ক'রে বেড়ালেও নয়। কাঠের চরকা দিয়ে লোহার যন্ত্রকেও হারানো যায় না এবং গেলেও তাতে মানুষের কল্যাণের পথ সুপ্রশস্ত হয় না।''[৭৩] এই ভাবনারই উত্তর সন্ধান করতে গিয়ে তাঁকে 'পথের দাবী' (১৯২৬) লিখতে হয়েছে। সন্ত্রাসবাদী মতাদর্শ থেকে স'রে এসে অহিংসপন্থায় পরিবর্তনের ধারাটিকে গুরুত্ব দেখানোর জন্য লেখকের 'পথের দাবী'র পরিকল্পনা করা হয়েছিল। পরাধীন ভারতমাতাকে মুক্তির জন্য রাসবিহারী বসুর মত বিদেশের মাটিতে 'পথের দাবী'র

সংগঠন পরিকল্পনা ছিল রাজনৈতিক কর্মী শরৎচন্দ্রের মনে। আসলে পরাধীনতার গ্লানি মুক্ত একটি দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। উপন্যাসটি প্রকাশের পর ১৯২৭ সালের ৪ঠা জানুয়ারী ব্রিটিশ সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি ক'রে বইটি বাজেয়াপ্ত করেন। এই নিষেধাজ্ঞা নিয়ে শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মনোমালিন্যও হয়েছিল। উপন্যাসটির মূল্যায়ন করে ড. সুকুমার সেন যথার্থই লিখেছেন— ''পথের দাবী'তে (১৯২৬) বাঙ্গালার বিপ্লব আন্দোলনের ঢেউ বঙ্গোপসাগরের পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব উপকূলে আছড়াইয়া পড়িয়া কিভাবে একটি অস্ফুট প্রেম কাহিনীর মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে তাহারই চিত্র আঁকা হইয়াছে।"[৭৪] তবে উপন্যাসটিতে অপূর্ব ও ভারতীর প্রেম রহস্যময় গম্ভীর ভীষণ পরিবেশে জমে ওঠেনি। ঘরকুনো বাঙালী ভদ্রঘরের ছেলেটি না পেরেছে আদর্শ প্রেমিক হতে, না বিপ্লবী। সেই তুলনায় ভারতী অনেক সপ্রতিভ। সব্যসাচী ও সুমিত্রার সম্পর্ক রহস্যঘেরা আন্দোলনের রূপরেখা ব্যর্থ হলে সব্যসাচী আবার বেরিয়ে পড়েছিল নতুন করে সংগঠন করার সংকল্প নিয়ে।

উপন্যাস হিসেবে 'শেষ প্রশ্ন' (১৯৩১) নিঃসন্দেহে বিতর্কিত। উপন্যাসটির আলোচনায় ড. সুকুমার সেন লিখেছেন— '' বইটি উদ্দেশ্য লইয়া লেখা। তবে সে উদ্দেশ্য আগেকার উদ্দেশ্য নয়—সাধারণ পাঠক ভোলাইবার জন্য লেখা নয়। তবে ইহাও টেক্কা দিবার জন্য লেখা 'অতি আধুনিক' সাহিত্যিকদের।"[৭৫] উপন্যাসটিতে প্রেম, নারী পুরুষের সম্পর্ক, ধর্ম-সংস্কার, প্রাচীন ভাবাদর্শের যৌক্তিকতা প্রভৃতি বিষয়ে লেখক প্রশ্ন রেখেছিলেন। কতগুলি আপাত বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমন্বয়ে এর কাহিনী রচিত হয়েছে। নায়িকা কমল প্রচলিত ধারণা, বিধবা নারীর সতীত্ব —এসবের চাইতে মনুষ্যত্বকেই গুরুত্ব দিয়েছে। কমল একা, তার প্রতিপক্ষ অনেক। তাঁর সম্পর্কে ড. অশ্রুকুমার সিকদার লিখেছেন— ''...শেষ প্রশ্নের কমল সবচেয়ে বড় বিদ্রোহিনী। তার জন্মের অসামাজিকতায় তাকে প্রথম থেকেই সমাজের বাইরের মানুষ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে সমাজকে তার আঘাত বাইরের দিকের আঘাত বলেই গণ্য হয়। বাইরের আঘাত স্বভাবতই জোরালো হতে পারে না। আর এই বিদ্রোহিনী কমলও শেষ পর্যন্ত হিন্দু বিধবার মতো কৃচ্ছ্রসাধনা করে।"[৭৬] এই কমলকে কেন্দ্র করেই রাজেন ও অজিত চরিত্র আবর্তিত হয়েছে। শিবনাথের সঙ্গে কমলের এবং মনোরমার সম্পর্ক উপন্যাসের আর একটি বিশেষ দিক। অবিনাশ বাবু, অক্ষয়বাবু, হরেন, নীলিমা সকলেই প্রায় বাদ-প্রতিবাদের উদ্দাম ঝড়ে আবর্তিত। নারী নির্যাতন সম্পর্কে লেখকের কোনো সুস্পষ্ট মতবাদ না থাকলেও

কমল চরিত্রটি যেন সেই প্রতিবাদী সত্তার প্রতিমূর্তি।

শরৎচন্দ্রের আত্মস্মৃতিমূলক উপন্যাস হল চার খণ্ডে (১ম পর্ব ১৯১৭, ২য় পর্ব ১৯১৮, ৩য় পর্ব ১৯২৭ এবং ৪র্থ পর্ব ১৯৩৩) বিভক্ত 'শ্রীকান্ত'। এটি লেখকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ভবঘুরে জীবন অভিজ্ঞতার পরিপূর্ণ ফসল এটি। যদিও উপন্যাসটির আলোচনায় অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন— "...ইহাকে ঠিক উপন্যাস বলা চলে কিনা, তাহা একটু বিবেচনার বিষয়। উপন্যাসের নিবিড়, অবিচ্ছিন্ন ঐক্য ইহার নাই; ইহা কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদের সমষ্টি। কিন্তু ইহার গ্রন্থন সূত্রটা যতই শিথিল হউক না কেন, গ্রথিত পরিচ্ছেদগুলি এক-একটি মহামূল্য রত্ন।"[৭৭]

উপন্যাসটির প্রথম পর্বে রয়েছে শ্রীকান্তের জীবনের সমান্তরালে ইতিহাসের নানা মর্মস্পর্শী কাহিনী। লেখকের বাল্য জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনা সূত্রেই এসেছে ইন্দ্রনাথ, অন্নদাদিদি, নিবুদিদি, রাজলক্ষ্মী, মেজদা প্রভৃতি চরিত্রের কথা। ইন্দ্রনাথ চরিত্রটির সঙ্গে বাস্তবের মানুষের মিল থাকলেও চরিত্রটির ভূমিকার আয়োজন নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। তাকে অনেকটা রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' গল্পের তারাপদর মতো বোহেমিয়ান মনে হয়। দ্বিতীয় পর্বটি ব্রহ্মদেশের পটভূমিকায় লেখা মূলতঃ অভয়া কেন্দ্রিক কাহিনী। এখানে সমুদ্রযাত্রা বর্ণনা, জীবন সমালোচনা আর সূর্য পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। সেইসঙ্গে ব্রহ্মদেশের নারী স্বাধীনতা, অভয়ার স্বামীর পত্নী বাৎসল্য, কাপুরুষ বিশ্বাসঘাতক স্বামী কর্তৃক ব্রহ্মস্ত্রীকে পরিত্যাগ প্রভৃতি ঘটনাকে তুলে ধরেছেন লেখক। তৃতীয় পর্বটিতে শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মী একটা স্থির লক্ষ্যে এসে পৌঁছেছে। এই অংশের বিশিষ্ট চরিত্র বজ্রানন্দ—তিনি যেন দেশপ্রীতির নিবিড় বেদনাবোধের প্রতিমূর্তি। আর শেষ পর্বটিতে নারীর জীবন সমস্যাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। এই অংশে কমললতার ট্রাজেডি সবচেয়ে বেশী হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে তোলে। এই নারী জীবনের মূল্যায়ন করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর 'নারীর মূল্য' শীর্ষক প্রবন্ধের সূচনাতেই লিখেছেন—"মণি-মাণিক্য মহামূল্য বস্তু, কেন না, তাহা দুস্প্রাপ্য। এই হিসাবে নারীর মূল্য বেশী নয়, কারণ সংসারে ইনি দুষ্প্রাপ্য নহেন। জল জিনিসটা নিত্য প্রয়োজনীয় অথচ ইহার দাম নাই। কিন্তু যদি কখন এটির একান্ত অভাব হয়, তখন রাজাধিরাজও বোধকরি এক ফোটার জন্য মুকুটের শ্রেষ্ঠ রত্নটিই খুলিয়া দিতে ইতস্তত করেন না। তেমনি ঈশ্বর না করুন যদি কোনদিন সংসারে নারী বিরল হইয়া উঠেন, সেই দিনই ইহার যথার্থ মূল্য কত, যে তর্কের

চূড়ান্ত হইয়া যাইবে। আজ নহে। আজ ইনি সুলভ।"[৭৮] এখানেই রাজলক্ষ্মীর কাহিনী পূর্ণতা পেয়েছে। আসলে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের জীবনের মূল্য জলের মতই। কেননা তাদের অভাব বোধ করে না সমাজ। তাই মেয়েদের আত্মহত্যা করা ছাড়া অন্যপথ খোলা থাকে না। কিংবা আত্মসম্মান নিয়ে সমাজ বৃত্তের বাইরে গিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করতে হয়। তাইতো কমললতাকে দেখা যায় অর্থের জন্য বৃন্দাবনের দিকে ফিরে গেছে আর রাজলক্ষ্মী গঙ্গামাটি পোড়া মাটিতে জমিদারী কিনেছে। এককথায় নারীর দুর্গতির আর প্রতিকারহীন লাঞ্ছনার কাহিনী বর্ণনা করেই লেখক কাহিনীতে ইতি টেনেছেন। কাহিনীটিতে ধারা বাহিকতা থাকলেও উপন্যাসের সংহত ও অখণ্ড রূপ এতে ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতার বিবর্তনের ধারায় শরৎচন্দ্রই নির্ণায়ক হবেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। আর -এর প্রতি-মূল্যায়নে ড. অশ্রুকুমার সিকদার যথার্থই লিখেছেন— "...তিনি (শরৎচন্দ্র) গতিনিয়ামক হয়েছেন একথা দুর্ভাগ্যজনক ঐতিহাসিক সত্য। আবার এটাও ঐতিহাসিক সত্য যে, জগদীশচন্দ্র গুপ্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁরাই বাঙলা সাহিত্যে আধুনিকতাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, তাঁরা শরৎচন্দ্রের প্রভাব মুক্ত হয়েছিলেন বলেই তা করতে পেরেছেন।"[৭৯]

তথ্যসূত্র :

১. বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) — ড. ক্ষেত্র গুপ্ত, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃ. ।

২. Dictionary of Literary Terms & Literary Theory, J. A. Cuddon, Penguin Reference Fourth edition 1998, England, p. 160.

৩. A Glossary of Literary Terms : M. H. Abrams Thomson, Seventh Edition, p. 190.

৪. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১৯।

৫. সাহিত্য সন্দর্শন, অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র দাশ, বামা পুস্তকালয়, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৯১।

৬. সূচনা, চোখের বালি, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৮৬, পৃ. ৩৭৩।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

৮. বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র ঃ ড. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃ. ৩৫৭।

৯. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঃ বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত, ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা সম্পাদিত, শিলালিপি, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৩৯।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮।

১১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, আনন্দ সংস্করণ, ১৯৯৪, পৃ. ১৬৬।

১২. বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন, বিবিধ প্রবন্ধ (দ্বিতীয় খণ্ড), বঙ্কিম রচনাবলীর, তুলিকলম, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ২৭২।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

১৭. ভূমিকা অংশ, বঙ্কিমরচনাবলী (প্রথম খণ্ড), তুলি কলম, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৮০।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮।

১৯. প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত, বিবিধ প্রবন্ধ (প্রথম খণ্ড), বঙ্কিম রচনাবলী, তুলিকলম, কলকাতা, পৃ. ১৮৮।

২০. বাংলা সামাজিক উপন্যাসের দুই স্থপতি, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৯।

২১. সাহিত্য, বিশ্বভারতী, গ্রন্থন বিভাগ, পুনর্মদ্রণ, ১৯৯৯, পৃ. ১৬১।

২২. বঙ্কিম রচনাবলী, তুলিকলম, পৃ. ৬২১-২২।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭-৫৮।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০।

২৬. সাম্য, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪০১।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১।

২৮. সুলভ শরৎসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড), ড. সুকুমার সেন সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ২১৬০।

২৯. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ. ১২৮।

৩০. বঙ্কিম মানস, পুস্তক বিপণি, ২০০3, পৃ. ১১৮।

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬০।

৩২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯২।

৩৩. বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ঃ শিল্প রীতি, গ্রন্থনিলয়, ১৯৯৬, পৃ. ২৩৯।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

৩৫. বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, সাহিত্যের পথে, বিশ্বভারতী, পৃ. ২৫৫।

৩৬. রবীন্দ্র রচনাবলী, পৃ. ।

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫।

৩৮. রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯০৩, পৃ. ৬০৩।

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৩।

৪০. রবীন্দ্র উপন্যাসের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ২৩৪।

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ। ৭০১।

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।

৪৩. প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৭৩।

৪৪. গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী, ১৯৭৬, পৃ. ৪৫৪।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৭৩।

৪৬. প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৭৩।

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪।

৪৮. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, গ্রন্থনিলয়, ২০০০, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ৩৮৪।

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।

৫০. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ, ১৯৯৫, পৃ. ১৫৬।

৫১. আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮৮, পৃ. ১২।

৫২. রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, নিউ এজ পাবলিশার্স, ২০০৩, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৬৪।

৫৩. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সী, ২০১০ পরিবর্ধিত সংস্করণ, পৃ. ৪৪৭।

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭।

৫৫. রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪২৭।

৫৬. প্রাগুক্ত, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, গ্রন্থনিলয়, ২০০১, পৃ. ৪১৫।

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২৩।

৫৮. শরৎ সাহিত্যে ব্যক্তি ও সমাজ, করুণা প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ. ২৯।

৫৯. বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, গ্রন্থনিলয়, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ৪০।

৬০. আধুনিক ও বাংলা উপন্যাস, অরুণা প্রকাশনী, পৃ. ৪৭।

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯।

৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

৬৩. শরৎচন্দ্র, এ মুখার্জি এণ্ড কোং, কলকাতা, ২০০০, সপ্তদশ সংস্করণ।

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫।

৬৫. শরৎ মূল্যায়ন প্রসঙ্গে, ১৯৮৮, পৃ. ৯।

৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১।

৬৭. রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৪২।

৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৮।

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩।

৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০।

৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

৭৩. শরৎ রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯৫৪।

৭৪. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২২৮।

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮।

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯।

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২৯।

৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জগদীশ গুপ্তের জীবন অভিজ্ঞতা : তাঁর উপন্যাসের ভিত্তিভূমি

সাগরের ঢেউগুলি যখন তীরের বুকে আছড়ে পড়ে, তখন সাগরের ভগ্ন তরঙ্গের জলরাশি আর সৈকতভূমির বালুকার মাঝে ক্ষণিকের জন্য একটা সূক্ষ্ম রেখা রচিত হয়ে যায়। পরমুহূর্তেই আবার নতুন ঢেউয়ের আঘাতে সেইরেখার বিলয় ঘটে এবং আরেকটি রেখা সৃজিত হয়ে যায়। জলরাশি আর তীরভূমির সন্ধিস্থলের ক্ষণিক রেখাটি মানব জীবনে যথার্থ সুখের মুহূর্ত নির্দেশ করে। আর অনন্ত জলরাশি এবং সুবিস্তৃত তীরের সুদূর দিগন্ত পর্যন্ত যে পথ চলে গেছে তার দ্বারা দুপারেই চিত্রিত হয়ে যায় অপার দুঃখের অবিশ্রান্ত কাল-বিভাজিকা। আমরা স্বীকার করি আর নাই করি, জানি বা নাই জানি আমাদের জীবনে সুখ-দুঃখের কালসীমা এভাবেই নির্ণীত হয়ে যায়। সেই জীবন ধারাটাই নানাভাবে, নানারূপে সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়—দেশ থেকে দেশান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে। প্রবহমান এই জীবন থেকেই আপন আপন অভিজ্ঞতার আলোকে সৃষ্টিশীল লেখকেরা নিজেদের মতো করেই সময়ের ক্যানভাসে জীবনচিত্র এঁকে যান। তাঁদের এই স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিভূমি রচিত হয়ে যায় তাঁদের নিজস্ব জীবন ধারা আর ঘর ও বাইরের প্রতিবেশের প্রভাবেই। সেই ভিত্তিভূমির উপরেই দাঁড়িয়ে থাকে তাঁদের যাবতীয় চিন্তা, কাজকর্ম তথা সৃষ্টি প্রক্রিয়া—কী শিল্পে, কী সাহিত্যে। প্রকৃত শিল্পী এভাবেই তাঁর অভিজ্ঞতার ভিতকে মজবুত করে তোলেন। এযেন পরিপূর্ণ এবং শক্তপোক্ত ভিতের উপরেই বহুতল নির্মাণের প্রক্রিয়া জারি রাখা। ক্ষেত্র বিশেষে এর ব্যত্যয় ঘটলেই সমস্ত পরিকল্পনাটাই বাইরের যে কোন বড় আঘাতের কাছে অসহায়ত্ব বোধ করে এবং নিজের শেষ পরিণতির স্বপ্নকে বাস্তবায়িত হতে দেখে। সেই বহুতল ভিতের মজবুতির সাপেক্ষ শর্তেই নিজের স্থায়ীত্বের নিশ্চয়তা দিতে পারে। এরকমই বহুস্তর বিশিষ্ট জীবনে জগদীশ গুপ্ত আপন অভিজ্ঞতার আলোকে যে সাহিত্যসৌধ নির্মাণ করেছিলেন, তা বাহ্য কারুকার্যের অভাবে বেশী সংখ্যক মানব মনকে জাগিয়ে দিতে পারেনি। অথচ তাঁর নির্মাণের ভাবনায় যে কোনো অসঙ্গতি বা ত্রুটি প্রথমাবধি ছিল না, সেটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। তাঁর সম্পর্কে সমালোচক

আবুল আহসান চৌধুরী তাই যথার্থই লিখেছেন— ''রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রীয় রুচি, রূপ, রীতি ও বিশ্বাসকে অগ্রাহ্য ও বিচূর্ণ করে আধুনিক বাংলা কথা সাহিত্যে যে পালাবদল এসেছিল, জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬—১৯৫৭) ছিলেন তার প্রধান ঋত্বিক। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার কার্যকারণ সূত্রে পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক কাঠামোর অন্তর্গত সংকট ও সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে জীবন অন্বেষা ও সমাজ বাস্তবতার যে শিল্প ভুবন নির্মিত হয়েছিল, তিনিই ছিলেন তার উদ্বোধক ও শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।''[১]

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী অখণ্ড বাংলাদেশের নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার গড়াই নদীর তীরবর্তী গ্রাম আমলা পাড়ায় জগদীশ গুপ্ত জন্মেছিলেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রায় 'অদেখা' এই মানুষটির জন্মক্ষণ নিয়েও যথেষ্ট ধোঁয়াশা রয়েছে। ১২৯২ বঙ্গাব্দের ২২ শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার গ্রামের সম্ভ্রান্ত এক বৈদ্য পরিবারে তাঁর জন্ম বলে উল্লেখ রয়েছে। অন্য আরেকটি সূত্র থেকে জানা যায় ১৮৮৬ সালের জুলাই মাসে অর্থাৎ ১২৯৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে তাঁর জন্ম হয়েছিল।[২] আবার 'জগদীশ গুপ্ত'র কথা সাহিত্য ঃ ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের আলোকে' গ্রন্থে ড. প্রবীর কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন— 'ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ মহকুমার বালিয়াকান্দি থানার অন্তর্গত খোর্দ মেঘচামী গ্রামে জগদীশ চন্দ্রের জন্ম ১২৯২ সালের আষাঢ় মাসে, ইংরেজির ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩ জুন।'[৩] এই তথ্যটি দেওয়ার সঙ্গে ড. চট্টোপাধ্যায় পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন— ''সাহিত্যিক ভাতার জন্য আবেদন পত্রে প্রদত্ত তথ্য থেকে গৃহীত। অন্য একটি তথ্য অনুযায়ী জগদীশ গুপ্তের জন্ম ১৮৮৬ খ্রীঃ জুলাই মাসে কুষ্ঠিয়ায় জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী ১ম খণ্ড, তথ্যপঞ্জি ও গ্রন্থ পরিচয়, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ।''[৪]

প্রবীর বাবুর দেওয়া তথ্যটিকে মেনে নিলে জগদীশগুপ্তের জন্মক্ষণ নিয়ে শুধু নয়, জন্মস্থান নিয়েও মতান্তর থেকে যায়। সেদিক থেকে জগদীশ গুপ্তের স্ত্রীর দেওয়া তথ্যসহ অধিকাংশ গবেষক সমালোচকের মতকে প্রামান্য দিলে প্রবীরবাবুর তথ্যটিকে ভুল বলে উল্লেখ করতে হয়। এহেন মানুষটির জীবনে স্বভাবতই বিতর্ক পিছু ছাড়েনি। আজীবন তিনি পরিজনদের কাছে এবং সাহিত্যিক হিসেবে সমকালের পাঠক সমালোচকদের কাছে বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব হয়েই ছিলেন।

বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ মহকুমার অন্তর্গত খোর্দ মেঘচামী গ্রাম ছিল জগদীশগুপ্তের পৈত্রিক নিবাস। চন্দনা নদীর তীরবর্তী গ্রামটির প্রকৃত নাম ছিল

'মেঘচুম্বী' — যা লোকমুখে ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে 'মেঘচামী' নামে পরিচিতি পেয়েছিল। ছেলে বেলায় জগদীশগুপ্তের ডাকনাম ছিল 'নারায়ণ'। বাস্তবিক নবরূপে নারায়ণেরই আবির্ভাব ঘটেছিল সেদিন—যার দুচোখ প্রত্যক্ষ করেছিল মানব জীবনের বিচিত্রতর স্তর পরম্পরাকে। কবি জীবনানন্দ দাশ যেমন আসলে পূর্বে 'দাশগুপ্ত' পদবিধারী ছিলেন তেমনি জগদীশ গুপ্তরও কৌলিক পদবী ছিল সেনগুপ্ত। কিন্তু তিনি সাহিত্য চর্চা করতে শুরু করলে পদবীর 'সেন' অংশটি কখনো ব্যবহার করেননি। অবশ্য এই 'সেনগুপ্ত' পদবীটি তাঁর পূর্বপুরুষদের ব্যবহার করতে দেখা যায়নি তেমনভাবে। প্রথমদিকের দু-একটি লেখায় লেখকের নাম হিসেবে 'জগদীশচন্দ্র গুপ্ত' নামটি ব্যবহার করেছেন তিনি। ১৩৩২ বঙ্গাব্দে কল্লোল পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ সংখ্যায় তাঁর 'দৈবধন' নামে যে গল্পটি বেরিয়েছিল; কিংবা পরে 'কল্লোল' সহ 'কালিকলম' ও 'উত্তরা' পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি মাত্র গল্পেই লেখকের নাম পাওয়া গেছে জগদীশচন্দ্র গুপ্ত। ব্যতিক্রমী জীবন ভাবনায় অভ্যস্ত মানুষটি অল্পকালের মধ্যেই নিজের নামের মাঝের 'চন্দ্র' অংশটিও বর্জন করেছেন অবহেলায়। এভাবেই নিজেকে চিনিয়ে দিয়েছেন সমকালে প্রায় অবজ্ঞাত এই মানুষটি। নাম সংক্ষিপ্তকরণ বিষয়ক পরিচিতি আমরা পেয়ে যাই তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'বিনোদিনী'র বিজ্ঞাপণে। এবিষয়ে ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায় স্পষ্টতই তথ্য দিয়ে জানিয়েছেন— ''কালি কলম পত্রিকার চৈত্র ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেখা যায়।''[৫] জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্পের বই 'বিনোদিনী'র আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল এরই সঙ্গে।

জগদীশ গুপ্তের পিতামহ আনন্দমোহন ছিলেন তৎকালের ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ মহকুমার ডাকসাইটে আইন ব্যবসায়ী। সেই সঙ্গে তাঁদের ছিল জোতদারী—মেঘচামী গ্রামে তাঁদের ছিল দিগন্ত বিস্তৃত শস্য ক্ষেত্র — যার ফসল উঠলে উৎসব ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে গৃহের প্রায় সকলেই গ্রামের বাড়ীতে যেতেন। সকলের মিলনের আনন্দে পরিবেশটাই সম্পূর্ণ বদলে যেত। এই আনন্দ মোহনই ছিলেন কৌলিক বৃত্তি গ্রহণকারী গুপ্ত পরিবারের শেষ পুরুষ। যদিও আবুল আহসান চৌধুরী তাঁর গ্রন্থে— [জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬—১৯৫৭)] জগদীশ গুপ্তের পিতামহের নাম উল্লেখ করেছেন আনন্দমোহন নয়, আনন্দ চন্দ্র গুপ্ত। এই আনন্দ মোহন বা যাই হোন না কেন, তাঁর নামানুসারেই জগদীশ গুপ্তের পৈত্রিক বাড়ীটির নাম ছিল 'আনন্দ ভবন'। একান্নবতী পরিবারে জগদীশ গুপ্তের পিতা কৈলাস চন্দ্ররা ছিলেন দুই ভাই— কৈলাসচন্দ্র ও প্রসন্নচন্দ্র। এঁরা দু'জনেই ছিলেন প্রসিদ্ধ আইন ব্যবসায়ী— কুষ্ঠিয়া জেলা

আদালতে তাঁরা যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রসার লাভ করেছিলেন। সমকালের ব্রাহ্মধর্মের ঢেউ এসে 'আনন্দভবন' -এ লেগেছিল। যার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে জগদীশ গুপ্তের পিতা কৈলাসচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করতেন এবং তিনি দীক্ষিত ব্রাহ্ম হলেও ব্রাহ্মসমাজের সভা সমিতিতে নিয়মিত যোগ দিতেন। এবিষয়ে তাঁর সহযোগী ছিলেন প্রতিবেশী আইনজীবী দুর্গাচরণ বিশ্বাস এবং রাইচরণ দাস। এরকম ব্রাহ্ম সমাজের পরিমণ্ডলে আবদ্ধ কৈলাসচন্দ্র ও তাঁর সহধর্মিণী সৌদামিণী দেবী ছয় সন্তানের পিতামাতা ছিলেন। এই ছয় জনের মধ্যে পাঁচজনই পুত্র সন্তান এবং একজন কন্যা সন্তান ছিল। যদিও অগ্রজ যতীশচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ জগদীশ ছাড়া অন্যান্য ভাই বোনেরা অকালেই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে দিয়েছিল। গৃহের সবচেয়ে কনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে জগদীশ ছিলেন সকলের আদরের দুলাল। তাঁর অগ্রজ যতীশচন্দ্র ওকালতিতে যথেষ্ট প্রতিপত্তি করেছিলেন। এরকম একটি 'আইন বিষয়ক' পরিবারে জগদীশ গুপ্ত ছিলেন মূর্তিমান ব্যতিক্রম।

জগদীশ গুপ্তের পিতৃব্য কৈলাসচন্দ্রের শাশুড়ি দাক্ষায়ণী দেবী ছিলেন বালক জগদীশের কবি হয়ে ওঠার প্রেরণা নামক সোপান। এই মহিলা প্রথাগত লেখাপড়া বিশেষ জানতেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রবল সাহিত্যানুরাগী। শুধু তাই নয় একজন স্বভাব লেখিকা হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল এতদ্‌ঞ্চলে। তিনি নাকি ভালো কবিতা রচনাই শুধু করতেন তাই নয়, সেইসঙ্গে চৈত্রসংক্রান্তির গাজন উৎসবের জন্য গান বেঁধে নিজেই সুর দিতেন। লেখাপড়ার বাতাবরণ বিশিষ্ট 'আনন্দ ভবন' আর এরকম একজন বিদূষী মহিলার সাহচর্য পেয়ে জগদীশ গুপ্তের মনোভূমিতে উত্তরকালের সাহিত্য বীজটি উপ্ত হয়ে গিয়েছিল। উপরন্তু লেখকের মা সৌদামিণী দেবীও ছিলেন লেখাপড়া জানা সভ্য পরিবারের সন্তান। আবার গল্প-উপন্যাস পাঠেও তাঁর সমান আগ্রহ ছিল — যাবতীয় প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে তিনি বিভিন্ন লেখকের রচনাবলী সংগ্রহ করে পড়তেন। এবিষয়ে উত্তর কালে লেখকের স্ত্রী চারুবালা দেবী স্মৃতি চারণা করতে গিয়ে বলেছেন— ''শ্বশুর বাড়ী কুষ্ঠিয়া আসিয়া দেখিলাম শ্বশ্রূমাতার কেনা অনেক উপন্যাস। বঙ্কিমবাবুর, মধুসূদন দত্তের, রমেশ চন্দ্রের গ্রন্থাবলী ঘরে অনেক।''[৬]
প্রসঙ্গত জীবনানন্দ দাশের মা কুসুমকুমারী দেবীর কথা মনে পড়ে। ইনি সমকালের একজন কবি হয়ে উঠেছিলেন— যিনি অনায়াসেই লিখেছিলেন—

''আমাদের দেশে সেই ছেলে হবে কবে

কথার চেয়ে যে কাজে বড়ো হবে।"[৭]

এই সুপ্ত বাসনা হয়তো সৌদামিণী দেবীরও ছিল। আনন্দ ভবনের সেই মুক্ত পরিবেশে, মায়ের স্নেহের ছায়ায় বেড়ে ওঠা জগদীশ গুপ্ত পরবর্তীকালে শৈশবের সেই পরিবেশ থেকেই সাহিত্য চর্চা করার অন্তর্প্রেরণা নিশ্চয়ই পেয়ে থাকবেন।

প্রসঙ্গত জগদীশগুপ্তের জীবনী বিষয়ক একটি বংশ তালিকার উল্লেখ করা যায়।

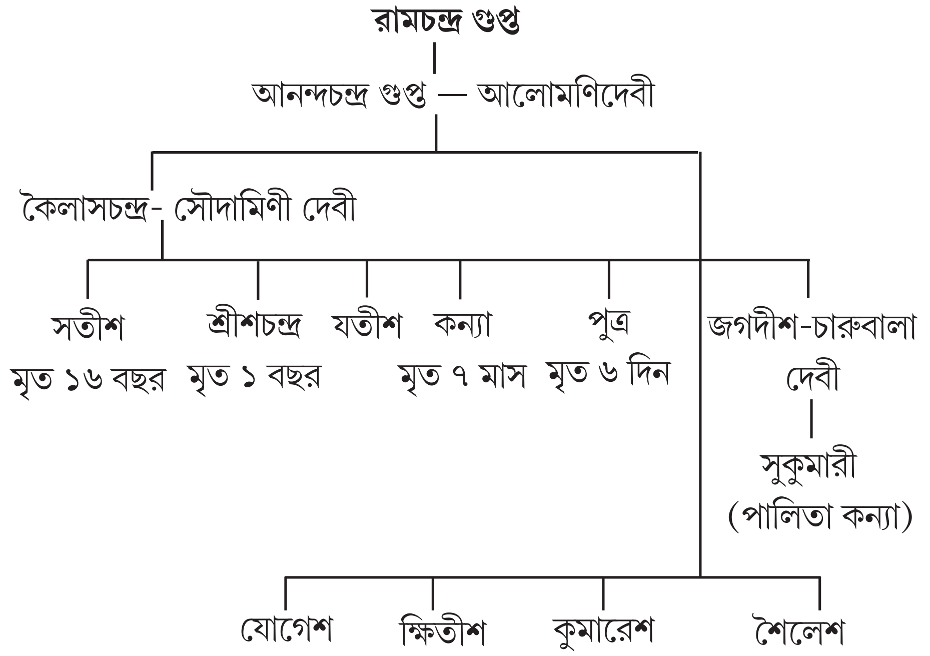

কুষ্ঠিয়ার 'আনন্দভবন' ছিল বালক জগদীশের জীবনের এক বিশেষ কেন্দ্রবিন্দু। এই গৃহেরই সন্তান হিসেবে তিনি মায়ের অপরিসীম স্নেহের পাশাপাশি পেয়েছেন পরিবারের সকলের কোমল সাহচর্য। সেইসঙ্গে প্রকৃতিও যেন তার ডালা ভ'রে নজরানা সাজিয়ে দিয়েছিল। ফুল ফলের বাগান পরিবেষ্টিত সেই গৃহের বিবরণ দিতে গিয়ে সাহিত্যিক কুমারেশ ঘোষ লিখেছেন— "কুষ্টিয়ায় আমাদের আমলা পাড়ায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডান দিকের পথ ধরে বাঁয়ে ঘুরলেই বাঁ হাতে যে কাঁচা বাড়িটা ছিল, তার প্রাচীরের ভেতরে ছিল একটা বেগন ভোলিয়ার গাছ। তার ডাল এসে ঝুঁকে পড়তো বাইরে। আর তাতে ফুটে থাকতো অজস্র লালরঙের পাতা ফুল।... তার পাশেই বাইরে শুকনো ড্রেনে ঝরে পড়তো ফুলগুলো। আমরা সেগুলো কুড়িয়ে আনতাম। আর মনে মনে ভাবতাম, ঐ ফুলগাছের মালিকের কি সৌভাগ্য।"[৮] প্রকৃতির ভালোবাসার স্পর্শধন্য এই বাড়ীটি থেকে জগদীশ গুপ্তের বিচ্যুতি ঘটেছিল

কালবৈশাখীর ঝড়ে বৃন্তচ্যুত মুকুলের মতই। তাঁর অগ্রজ যতীশচন্দ্র পিতামহের নামাঙ্কিত স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এই বাড়ীটি পরবর্তীকালে বিক্রি করে দেন। এবং ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর এপার বাংলার কলকাতার কাছে বেলঘরিয়ায় তাঁর ছেলের কাছে এসে আশ্রয় নেন। হাতবদল হয়ে বাড়ীটির রূপও বদলে যায়। জগদীশের চেতনায় তার বেদনাবহ একটা ছাপ মুদ্রিত হয়ে যায়। আনন্দভবন থেকে, প্রিয় মাতৃভূমি থেকে তাঁর চিরবিচ্ছেদ ঘটে গেল। এর উপরে তাঁর নিজের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সবই যেন নিয়তি নিয়ন্ত্রিত।

প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যেমন 'পথের পাঁচালী'র অপুর প্রথম পাঠগ্রহণ শুরু হয়েছিল, তেমনি জগদীশ গুপ্তের বিদ্যাশিক্ষার সূচনা হয় কুষ্টিয়ার তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিত রামলাল সাহার বিদ্যামন্দিরে। সেই সময়ের কৃতী কুষ্টিয়াবাসী বঙ্গসন্তানেরা প্রায় সকলেই এই পাঠশালায় পড়াশুনা করেছিলেন। রামলাল সাহা আবার হিন্দুধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডীকে ভেঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নিজে কাব্য চর্চা করতেন। এঁরই প্রেরণাতেও বালক জগদীশের মাথায় কবিতার ভূত চেপেছিল। উত্তরকালে কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত 'দীপিকা' (১৯৩২) পত্রিকায় রামলাল ও জগদীশের কবিতা ছাপা হয়েছে। পাঠশালায় পাঠরত অবস্থাতেই অপুর মধ্যে বিশ্ব প্রকৃতিকে জানবার যে নিরন্তর ক্ষুধা পেয়ে বসেছিল বালক জগদীশের মধ্যেও তারই পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। তবে দিদি দুর্গার সাহচর্যে যখন বিশ্বপ্রকৃতির সান্নিধ্যে অপুর মধ্যে একটা কবিসত্তার বিকাশ ঘটতে শুরু করেছিল; জগদীশ গুপ্তের সেই ক্ষুধা জাগ্রত হয়েছিল— কিন্তু তার মধ্যে অপুর সেই অনাবিল ভাবনা প্রবাহ বয়ে যায় নি। বরং মানব সম্পর্কের নিষিদ্ধ দিকটাতেই তার অনাবশ্যক কৌতূহল জন্মেছিল। পাঠশালার শিক্ষা শেষ করে জগদীশগুপ্ত যখন কুষ্টিয়ার হাইস্কুলে পড়তে শুরু করলেন তখন তাঁর সেই নিষিদ্ধ কৌতূহলের গোপনে অঙ্কুরোদ্গম হতে থাকে। ছাত্র হিসেবে তিনি মেধাবী হলেও পড়াশুনায় কোনো কালেই খুব বেশী মনোযোগী ছিলেন না। বরং সাহিত্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ এই সময় থেকেই লক্ষ্য করা যায় প্রবলভাবে। স্কুলে পাঠ্য বইয়ের তলায় বাড়ী থেকে নিয়ে আসা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রেখে তিনি চুপিচুপি সেইসব বই গ্রোগ্রাসে গিলতেন। একথার সমর্থন রয়েছে বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত 'জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলীর' লেখক পরিচিতি অংশে। এই পরিচিতিতে আমরা দেখি— ''তাঁহার সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটে হাইস্কুলের ছাত্রাবস্থায় ১৫/১৬ বৎসর বয়সেই, আর ভারি অনুচিত উপায়ে। স্কুল পাঠ্য সংস্কৃত পুস্তকের

পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্নকৃত অর্থপুস্তকের কলেবর ছিল বিরাট পি.এম. বাক্‌চির ডাইরেক্টরী পঞ্জিকার মত। এই অর্থ পুস্তক সামনে খুলিয়া রাখিয়া জগদীশ তাহার নীচে রাখিতেন মায়ের কেনা বঙ্কিমবাবুর কালো কালো মলাটের উপন্যাস।"[৯] এই অনধিকার চর্চাহেতু অকাল পরিপক্কতার জন্য শাস্তি তাঁকে পেতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর অন্তরস্থ সত্তায় সাহিত্য ক্ষুধার কোনো ক্ষণিক নিবৃত্তিও হয়নি। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে গোপনে চলতে থাকে তাঁর কবিতা চর্চা। এক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ কবি ছিলেন সমকালের রবীন্দ্রচেতনার বিপরীত বলয়ের কবি ব্যক্তিত্ব ঢাকার ভাওয়াল পরগণার কবি গোবিন্দ চন্দ্র দাস। ইনি নারীর শরীরী সত্তা মিশ্রিত প্রেমেরই জয়গান গেয়েছিলেন। অস্থি মাংসসহ নারীকে ভালোবাসার কথা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। তাঁরই প্রেরণাতেই জগদীশ গুপ্ত তাঁর কবিতাতেও অভ্রান্ত নারী তৃষ্ণার কথা নিয়ত লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছিলেন তাঁর গোপন খাতাটিতে। কিন্তু অচিরেই বাড়ীর অভিভাবকদের হাতে সেই খাতাটি ধরা পড়ে। তাঁরা সেইসব কবিতা পড়ে শুধু অবাক নয়, পড়ে শিউরে উঠলেন এবং কবিতার স্রষ্টাকে কঠোর শাস্তি দিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেননি। অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী সেই কবিতা চর্চার ইতিহাস প্রসঙ্গে লিখেছেন— "স্কুলে পড়বার সময়ে ১৫/১৬ বছর বয়স থেকেই কবিতা লিখে সাহিত্য সরস্বতীর সেবা আরম্ভ করেন গোপনে। কারণও ছিল। ধরা পড়ে যাবার পরে অভিভাবকেরা আবিষ্কার করেছিলেন, সেসব কবিতা ছিল 'কুঅভিলাষপূর্ণ।"[১০]

নারীর শরীরী ভালোবাসা সম্বলিত সেইসব 'কুঅভিলাষপূর্ণ' কবিতা চর্চার কারণে তাঁকে অচিরেই কুষ্ঠিয়া ছাড়তে হয়েছিল। কিন্তু তার পরেও তিনি কবিতা তথা সাহিত্য চর্চা ছাড়েন নি। গল্প উপন্যাস রচনার পাশাপাশি কবিতা রচনা তিনি করে গেছেন। তাঁর অন্তত দুটি কবিতার বইয়ের কথা জানা যায়— 'অক্ষরা' (১৯৩২) এবং 'কশ্যপ ও সুরভী' (১৯৩৭)। এছাড়াও তাঁর 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী' (১৯৩৫) গল্পগ্রন্থে 'তুলসী' নামে আরেকটি কবিতা গ্রন্থের বিজ্ঞাপন ছিল, কিন্তু সেই বই প্রকাশের কোনো প্রমান পাওয়া যায় না। উত্তরকালে তাঁর এই কবিতা লেখা সম্পর্কে স্ত্রী চারুবালা গুপ্ত জানিয়েছেন— "কবিতা ইনি খুব লিখিতেন, আমি কুষ্টিয়া এসে দেখলাম কবিতা লেখেন। ২/১টা নিয়ে পড়তাম। তখন কাহারও বিবাহ হলে প্রীতি উপহার লিখে দিতে হত। এই প্রকার বন্ধু বান্ধব অনেকেই আসত কিন্তু কাকেও নিরাশ করতেন না। কবিতা লেখার জন্য অনেক সময় বকুনিও খেতে হত—এসব বোধহয়

লুকিয়েই হত। ছেলে কবিতা লিখে ফাজিল হয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি।"[১১] অভিভাবকেরা দৃঢ় হাতে 'ফাজিল' ছেলেটিকে মানুষ করবার স্বপ্ন নিয়ে সুশিক্ষার জন্য কুষ্ঠিয়া থেকে কলকাতায় পাঠালেন। ১৯০৪ খ্রীঃ তাঁকে ভর্তি করানো হল সিটি কলেজিয়েট স্কুলে। এই স্কুল ছিল সেই সময়ের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব অধ্যক্ষ হেরম্ব চন্দ্র মৈত্রর কঠোর নিয়মশাসিত নীতিনিষ্ঠার অচলায়তন। সেইসঙ্গে মামা ও দাদাদের কঠোর তত্ত্বাবধান এবং নজরবন্দীতে তাঁকে বাঁধার চেষ্টারও ত্রুটি রাখা হল না। এ বিষয়ে জানা যায়— "জগদীশ কলকাতায় নির্ব্বাসিত হইলেন (১৯০৪)। মেসের সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতর কঠিন শাসনের অধীনে তাঁহাকে রাখা হইল—গতিবিধি ও সংযোগ নিয়ন্ত্রিত হইল।"[১২] স্বাধীন জীবনে অভ্যস্ত জগদীশ গুপ্ত শহরের ইট-কাঠ-পাথরের জান্তব জীবনে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার সংগ্রামে নেমে পড়লেন। ১৯০৫ খ্রীঃ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হন।

স্বভাবের দিক থেকে বরাবরই খামখেয়ালি জগদীশ গুপ্ত এরপর বিপন কলেজে (যার বর্তমান নাম সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) এফ.এ তে ভর্তি হন। কিন্তু দুবছরের মাথায় ১৯০৭ খ্রীঃ পরীক্ষা না দিয়েই তিনি পড়াশুনায় ইতি টানলেন। পরীক্ষার আগে দীর্ঘ চল্লিশ দিন টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে কলেজে যেতে পারেননি। জ্বর ছাড়লেও দুর্বলতা কাটিয়ে তিনি কলেজ মুখো হতেই পারলেন না। বেশিদিন কলেজ কামাই করার জন্য সে বছর কলেজ কর্তৃপক্ষ আর ওঁকে পরীক্ষায় বসতে অনুমতি দেয়নি। তখন তিনিও আর রাগ করে পড়লেন না। যদিও তাঁর মামা তাঁকে নিয়ে এরপর বিভিন্ন কলেজে ভর্তির জন্য ঘুরলেন। কিন্তু কোনো কলেজেই সিট না থাকায় তাঁর আর ভর্তি হওয়া হল না। তখন তিনি মনঃকষ্টে আর না পড়ার কথা তাঁর মামার কাছে ব্যক্ত করেন। মামা একথা শুনে দুঃখ পেলেন এবং তিনি কুষ্ঠিয়ার বাড়ীতে সে কথা জানিয়েও দেন। আইনজীবী পিতার স্বপ্ন ছিল কনিষ্ঠ পুত্রকে নিশ্চয়ই ওকালতি বা মোক্তারী পড়াবেন। কিন্তু ছেলের এহেন সিদ্ধান্তে তিনি যারপরনাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে পরিবারের অন্যান্যরাও ক্ষুব্ধ হলেও জগদীশ গুপ্ত তাঁর সিদ্ধান্তেই অটল থাকেন। মাঝপথে এভাবে পড়া ছেড়ে কুষ্টিয়ায় ফিরলে পিতাপুত্রের মধ্যে এনিয়ে যে কথোপকথন হয়েছিল, সে সম্পর্কে চারুবালা দেবী জানিয়েছেন— "কুষ্টিয়ায় আসার পর শ্বশুর মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন 'কিরে তুই আর পড়বি না!' তারপর দুই-একবার জিজ্ঞাসা করবার পর কথার জবাব পাওয়া গেল। শ্বশুর মহাশয় বললেন যে, 'পড়বি না খাবি কি করে?' জবাবে বললেন সর্টহ্যাণ্ড

শিখব। শ্বশুর মহাশয় আর কিছু না বলে সরে গেলেন।"[১৩]

পিতা কৈলাসচন্দ্র পুত্রের এক গুঁয়েমি স্বভাব সম্পর্কে সবিশেষ পরিচিত ছিলেন বলেই আর কোনো উচ্চবাচ্য করেননি ছেলের পড়াশুনা ছেড়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ব্যাপারে। প্রথাগত শিক্ষায় ছেদ টেনে দিয়ে জগদীশ গুপ্ত কুষ্টিয়া থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন নতুন ভাবে জীবন গড়ার ভাবনা নিয়ে। বাংলাদেশের আর পাঁচজন সাধারণ ছেলেদের মতই নিজের জীবন সম্পর্কে একটা পরিকল্পনার ছক করলেন। সমকালে বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ 'আনন্দভবনে'র মানুষজনদের কতটা প্রভাবিত করেছিল তা বিশেষ জানা যায় না। কেননা জগদীশ গুপ্ত যখন পড়াশুনায় ইতি টানছেন তখন লর্ড কার্জন সাহেবের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছিল। যা চলেছিল ১৯১১ খ্রীঃ পর্যত। অথচ ১৯০৭ সালে দাঁড়িয়ে পড়াশুনার পাট চুকিয়ে জগদীশবাবুর মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলন কোনো জড় তুলেছিল কিনা তার কোনো পরিচয় তাঁর ব্যক্তি জীবনে কিংবা সাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায় না। 'বাংলার মাটি বাংলার জল' তাঁর মনের গহনে কতটা আলোড়ন তুলেছিল সে সম্পর্কে তিনি নীরবই থেকেছেন। সেজন্যই তাঁকে আর পাঁচজন সাধারণের সঙ্গেই উপমিত করলাম। ভাবতে অবাক লাগলেও একথা সত্যি যে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ তেমন ভাবে হয়তো কুষ্টিয়ার সেই বাড়ীটিতে এসে পৌঁছায় নি কখনো। তবে এটুকু জানা যায় তখন গান্ধীবাদী কংগ্রেস নেতা ও সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় জগদীশ গুপ্তের বাড়ীতে আসতেন এবং তাদের পরিবারের সঙ্গেও একটা সুসম্পর্ক বজায় ছিল। এই তারাশংকরই পরে ভারতসরকারের কাছে এই মানুষটির জন্য সাহিত্যিক ভাতার সুপারিশ করেছিলেন— একথা পরে আলোচনায় আসবে। জগদীশ গুপ্ত এরপর পিতৃব্যর মতো কিংবা অগ্রজের পথ ধরে প্রতিষ্ঠিত উকিল না হতে চেয়ে কলকাতার কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউট থেকে শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপ শিক্ষায় নির্দিষ্ট কোর্স পাশ করেছেন। কিন্তু তারপরেও দীর্ঘ সময় তিনি বেকার অবস্থাতেই কাটিয়েছেন কুষ্টিয়ার বাড়ীতে বসেই। তাঁর পিতা তখনো নিয়মিত আদালতে যেতেন। চাকরীর যা খবর-টবর আসতো তা অনেকটাই দূরদেশের বলে তাঁর পিতামাতা মত দেননি। প্রথম চাকরীর সুযোগ এসেছিল শিলং থেকে, ৫০ টাকা মাইনের কিন্তু তাঁর পিতামাতার কেউ চাননি ছেলে দূরদেশে গিয়ে একা একা থাকুক।

রিপন কলেজে পড়বার সময়ই জগদীশ গুপ্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন কুষ্টিয়ারই

খোকসা থানার ওসমানপুর গ্রামের যদুনাথ সেনগুপ্তের কন্যা চারুবালার সঙ্গে। এই বিবাহের স্মৃতি কিংবা অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জগদীশগুপ্ত নিজে থেকে কোনো কথাই বলে যাননি। এ বিষয়ে যা কিছু জানা যায় সবই তাঁর স্ত্রীর দেওয়া তথ্য থেকেই। বিয়ের সময়—১৩১৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাস — সেই হিসেবে জগদীশবাবুর বয়স তখন ২১ আর তাঁর স্ত্রীর বয়স ১২। বরাবর কম কথা বলায় অভ্যস্ত লাজুক প্রকৃতির এই মানুষটির বিবাহানুষ্ঠানে অনেকেই 'প্রীতি উপহার' হিসেবে কিছু লিখে এনেছিলেন। সেইসব আমন্ত্রিতরা জানতেন বর একজন ভালো কবিতা লিখিয়ে। তাই যারা কবিতা লিখে এনেছিলেন, তারা বরবেশী জগদীশ বাবুকে সেইসব কবিতা দেখিয়ে জানতে চেয়েছেন— কেমন হয়েছে কবিতা। একবারমাত্র সলজ্জ চোখ বুলিয়েই তিনি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেছেন— 'বেশ ভালো।' সংক্ষিপ্ত এই উত্তর শুনেই প্রশ্নকর্তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ীতে যাওয়া এবং সেখানে নববধূর বরণ বিষয়ে স্মৃতি চারণায় চারুবালা দেবী জানিয়েছেন— ''বিবাহের পর দেশের বাড়ীতেই যাইতে হইল। আমাদের বাড়ী হইতে নদীর ঘাট বর্ষাকালে দুই মিনিটের রাস্তা, সেই টুকুন রাস্তা দুজনে একসঙ্গে পালকীতে আসিতে হইল সঙ্গে বাবা এবং আরও অনেকেই ছিলেন। পালকী মাটিতে রাখিতেই বাবা এসে হাত ধরে পালকী হইতে নামিয়ে নিয়ে নৌকার কাছে গেলেন। প্রকাণ্ড পানসী নৌকা। শ্বশুর মহাশয় নৌকার উপর হইতে 'এসো মালক্ষ্মী এসো' বলে হাত ধরে নৌকায় তুলে নিলেন।''[১৪]

পড়াশুনার মাঝেই পিতার ইচ্ছায় বিয়েটা সেরেই জগদীশবাবু বিবাহের আটদিন পরেই কলকাতায় ফিরে যান। কারণ কলেজ কামাই হয়ে যাবে—এটা তাঁর পিতা চাননি। ফলে নববধূকে একাকিনী কয়েকদিন শ্বশুর বাড়ীতেই কাটাতে হয়। এবং দিন কয়েকবাদে তিনিও ওসমানপুরে পিত্রালয়ে ফিরে যান। সে সময়ের সামাজিক জীবনে বাঙালী পরিবারে পর্দাপ্রথা ছিল ভীষণ কড়াকড়ি ভাবেই। অন্তঃপুরের অন্তরালেই মেয়েদের কাটাতে হত। চারুবালা দেবীর ক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যত্যয় হয়নি। এবিষয়ে আবুল আহসান চৌধুরীও লিখেছেন— ''গুপ্ত পরিবারে পর্দার কড়াকড়ি ছিল। পুত্রবধূ শ্বশুরের বাক্যালাপ হয়নি কখনো। অন্তঃপুরের মধ্যেই মেয়েদের জগৎ ছিল সীমাবদ্ধ।''[১৫] বিয়ের পর সুদীর্ঘকালের (প্রায় পঞ্চাশ বছর) দাম্পত্য জীবনে জগদীশবাবু একজন আদর্শনিষ্ঠ স্বামীর মতই তাঁর দায়িত্ব কর্তব্য পালন করে গেছেন। অত্যন্ত সংযমী এই মানুষটির জীবনের এই বিশেষ পর্বেও তাঁর স্বভাবের কোনো

পরিবর্তন হয়নি। স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশে তাঁর কোনো আতিশয্য ছিল না। কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থলে এই সম্পর্কের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতিবোধ ছিল। নিঃসন্তান এই দম্পতি পরস্পর পরস্পরকে আন্তরিকভাবেই ভালোবাসতেন। তাঁদের প্রতিদিনের জীবনে কোথাও কোনো অশান্তির কালো মেঘ জমে ওঠেনি কিংবা মনের গহীন লোকে কোনো মানসিক অশান্তিও ছিল না। স্ত্রীর প্রতি নিঃশব্দে সমস্ত কর্তব্য পালন করে গেছেন জগদীশবাবু। অসুস্থ স্ত্রীর জন্য নিজে হাতে রান্নাবান্না করা, স্ত্রীর অসম্মানের কারণ ঘটলে দৃঢ়চিত্তে তার প্রতিকার করা এমনকী কখনো কোনো ব্যাপারে স্ত্রীর কোনো সিদ্ধান্ত মনঃপুত না হলেও তাকে খুশি মনে মেনে নেওয়ার মত উদারতা জগদীশ গুপ্ত দেখিয়েছেন। এবিষয়ে তার মধ্যে একজন সহৃদয় দায়িত্বশীল স্বামীকে অনায়াসেই খুঁজে পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ীর খ্যাতনামা আইনজীবি ছিলেন জগদীশ গুপ্তের শ্বশুর মশাই যদুনাথ সেনগুপ্ত। বসবাসের জন্য রাজবাড়ী চত্বরেই বাড়ী নির্মাণ করেছিলেন যদুনাথ বাবু। একদিকে পর্দাপ্রথা অন্যদিকে সেইসময় সেখানে মেয়েদের লেখাপড়ার খুব ভালো ব্যবস্থা ছিল না। উপরন্তু প্রায় বাল্যবিবাহের কারণেও চারুবালা দেবীর পড়াশুনা খুব বেশী এগোয়নি। বিদ্যালয়ের সীমিত বিদ্যাকে সম্বল করেই শ্বশুর গৃহে তিনি পড়াশুনার পরিবেশ পেয়ে নতুন করে পড়াশুনায় আগ্রহী হয়ে উঠেন। বাড়ীতে রামায়ণ-মহাভারতের মতো ধর্মগ্রন্থাদিতেই জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকলেও শ্বশুরবাড়ীতে শাশুড়ীর সাহচর্যে সাহিত্য পাঠে তাঁর নিজস্ব চিন্তায় দুয়ার খুলে যায়। এরফলে তিনি স্বামীর সাহিত্য রচনার প্রেরণা যেমন হয়ে ওঠেন তেমনি স্বামীর লেখারও অনুরক্ত হন। মধুসুদন-বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রের পাশাপাশি হেমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের রচনাও তিনি আত্মস্থ করেছিলেন। এসব ক্ষেত্রে স্বামী হিসেবে জগদীশ গুপ্ত স্ত্রীর সাহিত্য চিন্তার প্রসারে এবং রুচিবোধ গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কখনোই প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠেননি।

জগদীশ গুপ্তের ছেলেবেলা থেকেই তিনি সকলের চাইতে কোথাও যেন একটু স্বতন্ত্র —এই বোধের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলেন। বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ফুটবল ছিল তাঁর প্রিয় খেলা। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনি যে ছেলেবেলায় শুধু ফুটবল খেলেছেন তাই নয় চল্লিশ পেরিয়ে গেলে যখন সকলে প্রায় খেলা ছেড়ে দেন সেই বয়সেও তিনি কিশোর ও যুবকদের সাথে অনায়াসেই খেলায় যোগ দিতেন। ছোটদের সঙ্গে নির্দ্বিধায় ফুটবলের সঙ্গে

সঙ্গে মার্বেল দিয়েও খেলেছেন। তবে যখনি দেখেছেন, মাঠে কোনো খেলোয়ার অন্যায় আচরণ করছে তৎক্ষণাৎ তিনি তাকে যোগ্য শাস্তি দিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। এই ভাবেই বালক জগদীশ আর পাঁচজনের মতো হলেও শেষ পর্যন্ত তাদের থেকে আলাদাও হয়ে উঠেছিলেন। জীবনের যেকোনো ক্ষেত্রেই এই রকম অন্যায়, অপরাধের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ চিত্তে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে পিছুপা হননি। আমৃত্যু তিনি তাঁর এই ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বকে ধরে রেখেছিলেন।

সমাজের যেকোনো স্তরের নারীদের প্রতি জগদীশ বাবুর যে সম্ভ্রমবোধ তারও ভিত গড়ে উঠেছিল তাঁর ছেলেবেলাতেই। এক্ষেত্রে তাঁর মায়ের প্রভাব ছিল তাঁর জীবনে সবচেয়ে বেশী। সমাজে পতিতা বলে যারা অপাংক্তেয় তাদের সম্পর্কেও জগদীশবাবু শ্রদ্ধার মনোভাব ব্যক্ত করেছেন আজীবন — কী সাহিত্যে কী ব্যক্তিগত জীবনে। এইসব পতিতা নারীদের সঙ্গে একেবারে ছোট্টবেলা থেকেই তাঁর একটা সংযোগ গড়ে ওঠার অবকাশ সৃষ্টি হয়েছিল। কুষ্ঠিয়ায় তাঁদের বাড়ীর খুব কাছেই একটা পতিতা পল্লী ছিল। সেখানে অনেক ঘর পতিতার বাস ছিল। নিজস্ব বৃত্তির পাশাপাশি ঐসব নারীরাই লোকের বাড়ীর ঝিয়ের কাজ করত, আঁতুর পাহারা দিত। জগদীশ বাবু জন্মাবার পর তাঁর পাঁচ ছয়মাস বয়সের সময় থেকেই এইসব নারীরা শিশুটিকে তাদের কাছে নিয়ে সারাদিন রেখে দিত। আদর যত্ন করে খাওয়াত একটু বড় হলে মালাচন্দন দিয়ে কৃষ্ণঠাকুর সাজিয়ে হাতে বাঁশি ধরিয়ে দিতে আনন্দ করত। একবার অল্প বয়সে জগদীশবাবু ড্রেনের মধ্যে পড়ে গেলে ওরাই তাকে ড্রেন থেকে তুলে বাঁচিয়ে ছিল। পরে আগুন লেগে ওদের ঘরগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেলে ওরা তখন বাধ্য হয়ে অন্যত্র চলে যায়। এইসব নারীদের মধ্যে গিরিবালা নাম্নী এক নায়েব রক্ষিতার কথা চারুবালা দেবী বলেছেন, যে ছোট্ট জগদীশকে ভীষণ স্নেহ করত। মাঝে মাঝে তাদের বাড়ীতেও চলে আসত গিরিবালা। এবং জগদীশ বাবুর খোঁজ করত। চারুবালা দেবী এ বিষয়ে জানিয়েছেন— ‘‘গিরিবালা মধ্যে মধ্যে মা মা করে বাড়ীতে এসে শাশুড়ির সঙ্গে কথা বলত। এঁর খোঁজ খবর লইত ছোড়দা কোথায় প্রভৃতি, কোলকাতায় কলেজে পড়ে শুনে খুব খুশী।’’[১৬]

এই গিরিবালাই উত্তরকালে ‘লঘুগুরু’ উপন্যাসের উত্তম রূপে প্রতিভাত। কিংবা সুন্দরী চরিত্রের বেশে উঠে এসেছে। এক্ষেত্রে জগদীশ গুপ্তের চেতনায় শৈশবের এই নারীরা কতটা জাগরূক ছিল উত্তম-সুন্দরী কিংবা টুকীর পাপের পথে নেমে যাওয়ার মধ্যদিয়ে লেখক সেটাই

চিত্রিত করেছেন। শুধু তাই নয় সেইসব পতিতাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধা হয়ে তাঁদের বাড়ীর কাছাকাছি রাস্তার ধারে মুড়ি মুড়কি বাতাসার পসরা সাজিয়ে নিয়ে বসলে বালক জগদীশ তার ভালোবাসার টানে নানা সময়ে তাকে বিরক্ত করতে ছুটতো ভাইয়েরা মিলে। তাদের দুরন্তপনায় অতিষ্ঠ সেই বৃদ্ধা জগদীশ বাবুর মায়ের কাছে নালিশ করে তবেই রেহাই পেতেন। আবার অনেকদিন ছেলেদের না দেখলে নিজে থেকেই ডেকে নিয়ে 'পকেট ভর্তি করে মুড়ি মুড়কি' প্রভৃতি খাবার তুলে দিয়ে তৃপ্তি বোধ করতেন। পতিতার মাঝেও মাতৃরূপের এই প্রকাশের দ্বারাই উত্তমকে সৃষ্টি করেছিলেন জগদীশ গুপ্ত।

পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের প্রতিপত্তি ও মর্যাদার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ সামান্য টাইপিষ্টের চাকরী দিয়ে জগদীশ গুপ্তের কর্মজীবনের পথ চলা শুরু হয়েছিল। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন একক সিদ্ধান্তের অধিকারী। সকল লোকের মাঝে বসে নিজের মুদ্রা দোষে একা আলাদা হয়েছেন, নিজের জীবন পথে বারবার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন, কিন্তু হাল ছাড়েননি। দূরত্বের কারণে যেমন চাকরী নিয়ে শিলং যাওয়া হয়নি, তেমনি কুষ্ঠিয়া আদালতেও তিনি চাকরী পেয়েও সে চাকরী করতে পারেননি সম্ভবত পারিবারিক কারণেই। কেননা তাঁর পিতা ছিলেন কুষ্টিয়া আদালতের আইনজীবী সেইসঙ্গে শিলাইদহ ঠাকুর এস্টেটের আইনি উপদেষ্টা। তাঁর অগ্রজও ছিলেন সেই আদালতেরই উকিল এবং তৎকালীন বিখ্যাত মোহিনী মিলের নিযুক্ত আইনজীবী, এছাড়া জগদীশ বাবুর খুড় শ্বশুরও ছিলেন একই আদালতের আইন জীবী। সুতরাং সেইরকম পরিবারের পুত্র কিংবা জামাতা একই আদালত চত্বরে সামান্য টাইপিষ্ট বা কেরাণীর পদে বসে চাকরী করবেন—এটা দুই পরিবারের পক্ষেই মর্যাদার কারণ নিশ্চয়ই হয়েছিল। পারিবারিক ক্ষেত্র থেকেই এই তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় শুরু হয়েছিল জগদীশ বাবুর জীবনে। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে তিনি আইনজ্ঞ পরিবারের সন্তান হলেও সামান্য বৃত্তি গ্রহণে মোটেই লজ্জিত ছিলেন না। তাঁর এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাবের সমর্থন রয়েছে ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের আলোচনাতেও— "... আপাত নিরীহ এবং প্রায় নীরব এই মানুষটির আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল অতিপ্রখর। এই কারণেই বারবার তাঁকে চাকরি ছাড়তে হয়েছে, চাকরি ছেড়ে অকিঞ্চিৎকর ব্যবসায় মনোনিবেশ করতে হয়েছে, নিদারুণ অর্থকষ্টে পড়তে হয়েছে এবং জনপ্রিয়তার সমস্ত প্রলোভন বর্জন করতে হয়েছে। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে এই অসাধারণ আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন অভিমানী মানুষটিকে খুঁজে পাওয়া যায়।"[১৭]

জগদীশ গুপ্তের প্রথম কর্মস্থল বীরভূমের শিউড়ি আদালত। ১৯০৮ - ০৯ সালে সিউড়ির জজকোর্টে জব-টাইপিস্ট হিসেবে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এটি তাঁর স্থায়ী চাকরী ছিল না। আদালতের প্রয়োজনীয় লেখাপত্র টাইপ করে দিয়ে প্রতি শব্দ হিসেবে পারিশ্রমিক পেতেন। যা সামান্য আয় হত তাই দিয়েই সংসার নির্বাহ করতেন। এ নিয়ে তাঁর কোনো আক্ষেপ ছিল না। স্ত্রী চারুবালাও ছিলেন এব্যাপারে যোগ্য সহধর্মিণী। এযেন কালকেতু ফুল্লরার রাজযোটক। পাত্রের অভাবে ফুল্লরা ঘরের মেঝেতে পান্তা ভাত রেখে দিত। কিন্তু দাম্পত্য শান্তির বাতাবরণে সেই ভাতের স্বাদ বিন্দুমাত্র কমেনি কখনো। দারিদ্র রূপ কালবৈশাখী তাদের জীবনের সুখী গৃহকোণটির ভিত কখনো টলাতে পারেনি। চারুবালা দেবীও এহেন স্বামীর সাহচর্যে কখনোই কোনো আক্ষেপের মধ্যে দিন অতিবাহিত করেননি। এভাবেই অস্থায়ী অনিশ্চিত উপার্জন ব্যবস্থায় ৪/৫ বছর অতিক্রম করেন তাঁরা। তবে তাঁদের এই প্রথম সংসার যাত্রার সঙ্গী ছিলেন জগদীশ বাবুর মা সৌদামিণী দেবীও। মা ছিলেন একেবারে ছেলে অন্তপ্রাণ। ছয় পুত্র কন্যার মধ্যে চারজনই অল্প বয়সে মারা যাওয়ায় মায়ের স্নেহের অবলম্বন ছিল কনিষ্ঠ জগদীশ। সেজন্য তিনি ছেলেকে ছেড়ে একা থাকতে একেবারেই পারতেন না। কলকাতায় ছেলে পড়তে চলে যাবার সময় মা ও ছেলের চোখের জল 'আনন্দভবন'কে বিরহাকুল করেছে। রিপন কলেজে পড়ার সময় পরীক্ষার পূর্বে যখন জগদীশবাবু টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে বাড়ীতে এসেছিলেন তখনো মা স্নানাহারের কথা ভুলে ছেলেকে নিয়েই পড়ে থাকতেন। মায়ের এই বন্ধনের কথা উত্তরকালে 'রোমন্থন' (১৯৩১) উপন্যাসে ছোটবাবুর কথার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে—

''... তোদের খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হবে। ছোট'র ত' বিছানার চাদর শোবার আগে ঝেড়ে না দিলে সে রাত্রে আর ঘুম হয় না। তুই কেন যাচ্ছিস্ তুই থাক্। বলিয়া গৃহিণী ছোট ছেলের দিকে আকুল নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। ছোটবাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন ঐ করেই ত তোমরা মায়েরা বাঙালী ছেলের মাথা খাও।...''[১৮] —এই মা আসলে সৌদামিনী দেবীরই ছায়ামূর্তি। স্বভাবতই বাড়ী ছেড়ে প্রথম নতুন সংসারে মা কিছুতেই পুত্র-পুত্রবধূকে একা ছাড়েননি। সেখানকার মাসিক তিন টাকার ভাড়া বাড়ীতে মাস ছয়েক থেকে সংসার গুছিয়ে দিয়ে তারপর তিনি কুষ্ঠিয়ায় ফিরে এসেছেন। আসবার সময়ও হিন্দুস্থানী বৃদ্ধা বাড়ীওয়ালিকে তিনি বারবার অনুরোধ করে এসেছেন ওদের দেখাশোনা করার জন্য। জগদীশ বাবু প্রথম চাকরী পান ১৯১২ সালে—টাইপিস্ট হিসেবেই। কর্মস্থল উড়িষ্যার সম্বলপুরের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের

অফিস। মাসিক বেতন ৪০ টাকা। সিউড়ির সংসার পর্ব শেষ করে এবার তাঁরা যখন সম্বলপুরে এলেন সেখানেও সেই মায়ের বাঁধন। তবে এবারে শুধু সৌদামিনী দেবী একা নন, স্বামীকে সঙ্গী করলেন। ফলে সম্বলপুরের সংসার শুরু হয় বাবা মা এবং স্ত্রীকে নিয়ে। স্বচ্ছল না হলেও সুখের কোনো কমতি ছিল না। মাসিক সাত টাকার ভাড়া বাড়ীতে তাঁদের জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হল। এ যেন কুষ্টিয়ার আনন্দভবন এর একটু করো স্মৃতি। সেখানকার প্রতিবেশ এবং সাংসারিক চিত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে চারুবালা দেবী লিখেছেন— "... সামনে পূবের দিকে খোলা বারান্দা, বারান্দায় দাঁড়াইলে মহানদী দেখা যায়, রূপার মত সুন্দর নদীর জল। নদীর মধ্যে মাঝে মাঝে পাথরের স্তুপ দেখা যেত, তারপর নদীর ওপারে শ্রেণীবদ্ধ পাহাড় দেখা যেত, পাহাড়ের উপর অনেক বড় বড় গাছও দেখা যেত। তখন সম্বলপুরে কয়লা ছিল না, কাঠে রান্না করতে হত, কাঠ খুব সস্তা। বাজারে মাছ প্রভৃতি সব জিনিসপত্রই সস্তা।"[১৯]

সম্বলপুর কর্মস্থলটির প্রধনা অফিস ছিল রাঁচীতে। সেখানকার বড় সাহেব সম্বলপুরের অফিসে এসে জগদীশ বাবুকে রাঁচীর অফিসে বদলীর নির্দেশ দেন। সেইমত সম্বলপুরের পাট চুকিয়ে রাঁচী যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। নতুন জায়গায় নতুন করে ঘর বাঁধবার প্রস্তুতি যখন শেষ পর্বে সেই সময় পাটনা হাইকোর্ট তাঁকে কটক অফিসে নিযুক্ত করে। এরফলে রাঁচী না কটক—কোথায় কাজে যোগ দেবেন তা দিয়ে দ্বিধার মধ্যে পড়েন। সকলের পরামর্শ মতো রাঁচী যাওয়ার সিদ্ধান্ত বদলে কটকেই যাওয়া স্থির করলেন। চলেও গেলেন একদিন। কিন্তু এখানে এসে সাধ ও সাধ্যের মধ্যে প্রথমে বাড়ী খুঁজে পাচ্ছিলেন না; পরে যাও বা পেলেন কিন্তু উপার্জন প্রায় হচ্ছিলই না। কারণ এখানেও সরকারী তরফে কাজ দেওয়া হত কত শব্দ হচ্ছে সেই অনুযায়ী পরিশ্রমিকের বিনিময়ে। স্বাভাবিকভাবে অনিশ্চিত জীবন তাড়না করে জগদীশবাবুকে। সুতরাং আবার বদলীর জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন। সেই আবেদন মঞ্জুর হলে ১৯১৮-১৯ খ্রীঃ নাগাদ পাটনায় ফিরে আসেন। চাকরী সেই টাইপিস্টের। পুনরায় মাথা গোঁজবার জন্য বাড়ী অনুসন্ধান পর্ব। এবারে আর বাবা মা কেউ এলেন না। পাটনার অধ্যায় বর্ণনা করতে গিয়ে চারুবালা দেবী লিখলেন— "খুব ভাল জায়গা। প্রথমে বাড়ী ভাড়া করলেন বাঁকীপুর গঙ্গার ধারে।... সেখানে বৎসর খানেক থাকার পর নূতন কোয়ার্টার্স হইলে আবেদন করার পর কোয়ার্টার্স একটা পাওয়া গেল। বেশ ভাল বাড়ী, প্রতিবেশী অনেক এবং সব ভদ্র পরিবার।"[২০]

পাটনা হাইকোর্টে কর্মরত অবস্থার সময়েই জগদীশ গুপ্তের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য অনেকটাই বেড়েছিল। মাসে তৎকালীন অর্থের মানদণ্ডে ২০০/২৫০ টাকাও আয় হয়েছে। এই সময়েই তাঁর সখের সঙ্গীতচর্চা এবং বন্ধু-বান্ধবদের মজলিশ জমে উঠেছিল। স্বভাবে চাপা এবং অন্তর্মুখীন হলেও সঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্রেও যে তিনি নীরবতা পালন করতেন এমন নয়। সম্বলপুরে থাকার সময়েই পিতামাতার সঙ্গে তাঁর কিশোর ভ্রাতুস্পুত্র জ্যোতির্ময়ও গিয়েছিল। জগদীশ বাবু ভালো এসরাজতো বাজাতেনই, সেইসঙ্গে হারমোনিয়াম, বাঁশি এবং বেহালাতেও তাঁর দক্ষ হাত ছিল। জ্যোতির্ময়কে তিনি গান শিখিয়েছিলেন, জ্যোতির্ময় গান গাইত আর তিনি এসরাজ বাজাতেন। এরপর পাটনায় কোয়ার্টারে বাস কালে গড়ে উঠেছিল কনসার্ট পার্টি যাতে জগদীশ বাবু বেহালা বাজাতেন। তাঁর এই সঙ্গীতচর্চা প্রসঙ্গে স্মৃতি চারণায় চারুবালা দেবী বলেছেন— ''গানবাজনায় এঁর স্ফূর্তি চিরদিনই দেখে এসেছি। সম্বলপুরেও মধ্যে মধ্যে রাত্র করিয়া বাড়ী ফিরলে জিজ্ঞাসা করলে শুনতাম হরিসভা হয় সেখানে বেহালা বাজাচ্ছিলাম। ছোটবড় সবাই এঁর বন্ধু। ... সিউড়িতেও ঐ গান বাজনার আড্ডা ছাড়া আর কোন নেশা ছিল না। ... পাটনা যেয়েও বাজনার সখ খুব।''[২১] পাটনায় অবস্থান কালে একদিন লর্ড সিংহী সপরিবারে এসেছিলেন হাইকোর্ট পরিদর্শনে। সাদা চামড়ার শাসকের আপত্তি অগ্রাহ্য করে সেই কনসার্ট পার্টির সকলে প্যান্ট কোর্টের পরিবর্তে ধুতিচাদর পরেই পার্টিতে হাজির হলেন। সেখানে তাদের পরিবেশিত সংগীতে মুগ্ধ হয়ে লর্ড সিংহীর কন্যা কুড়ি টাকা পুরস্কার স্বরূপ দিয়েছিলেন। এই বেহালাকে সম্বল করেই তিনি কখনো কখনো থিয়েটারে চাকরীর প্রত্যাশাও ব্যক্ত করতেন। এরই ফাঁকে চলেছিল তাঁর লেখালেখি। এই গানের আড্ডা প্রথম জীবনে কুষ্টিয়াতেও বসত প্রতিবেশী বন্ধু নন্দলাল সরকারের বাড়ীতে। এই বন্ধু বৎসলতার আড্ডা চিত্র তাঁর গল্প উপন্যাসে নানা প্রসঙ্গে উঠে এসেছে। তবে ভাবতে অবাক লাগে যিনি বেহালায় দক্ষ শিল্পী ছিলেন তিনি তাঁর জীবনের সুরটি কীভাবে একই খাতে বইয়ে দিতে পেরেছিলেন। হয়তো বেহালার করুণ সুরটাই তাঁর জীবনকে একটা নির্দিষ্ট স্কেলে আবদ্ধ রেখেছিল বলেই তিনি তাঁর রচনায় আগাগোড়া তিক্ত অভিজ্ঞতার কথাই ব্যক্ত করে গেছেন।

এক ধরনের নিঃসঙ্গ প্রিয়তা ও আত্মমগ্নতার কারণে তিনি কেমন যেন একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের অধিবাসী করে তুলেছিলেন নিজেকে। কিন্তু তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে কোথায় যেন তবু একটা মানুষের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করতে চাওয়া মানুষ বাস করত। সেই অন্তরস্থ মানুষটিই

তাঁকে ‘কালিকলম’ পত্রিকায় মুরলীধর বসু, ‘কল্লোল’ পত্রিকার দীনেশ রঞ্জন দাস কিংবা ‘উত্তরা’ পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর মতো মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বের নিবিড়তা গড়ে তুলেছিল। এই বন্ধুর তালিকায় ছিলেন ছেলেবেলার বন্ধু ড. রাধাবিনোদ পাল — যিনি উত্তর কালের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনবিদ এবং শিক্ষাবিদ। কর্মসূত্রে যেখানেই গেছেন সেখানে তাঁর অনেক বন্ধু হয়েছে; কোথাও কোথাও তাঁর অনুযাগীর দলও গড়ে উঠেছিল। তবে তাঁর এই আড্ডা প্রিয় স্বভাবটি সংগীতের আসরে যেভাবে প্রকট হয়েছে সাহিত্যের আসরে ঠিক ততোটাই প্রচ্ছন্ন থেকেছে। এবিষয়ে আবুল আহসান চৌধুরী জানিয়েছেন— ‘‘জগদীশ গুপ্তের ভেতরে প্রচ্ছন্ন ছিল একটা আড্ডাপ্রিয়—মজলিশি মানুষ; কিন্তু সংকোচ কুণ্ঠা-আত্মকেন্দ্রিকতা নির্লিপ্ততা অতিক্রম করে তা প্রায়শই প্রকাশিত হতে পারতো না—সঙ্গীতের মজলিশে যদিও বা তা উন্মোচিত হতে পারতো কিন্তু সাহিত্যের আসরে তা প্রকাশিত হতে পারেনি। মনে মনে কিন্তু সাহিত্যের আড্ডার প্রতি তাঁর একটা আকর্ষণ ছিল, কিন্তু স্বভাব সংকোচের অথবা স্থান-বিচ্ছিন্নতার একটা যেন বাধা ছিল।’’[২২] এই সংকোচের বিহ্বলতা নিয়েই তিনি বন্ধুদের মাঝে মাঝে খাওয়ানোর নিমন্ত্রণ দিতেন। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডায় চা আর সিগারেটের ধোঁয়ায় জীবনের বিচিত্র পথটা তাঁর শিল্পী চেতনা নাড়িয়ে দিয়ে দেত।

পাটনা হাইকোর্টে কাজকর্ম ভালোই চলছিল। জগদীশগুপ্ত নিয়মিতই অফিসে কাজে যোগ দিতেন। অফিসে কাজের ব্যাপারে তিনি সর্বদাই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কু-নজরে যাতে পড়তে না হয় সে ব্যাপারে ওয়াকিবহাল ছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ কাজ করেছে। কিন্তু যা হবার ছিল তাই হতে খুব বেশীদিন সময় লাগল না। পাটনা হাইকোটের চাকুরী থেকে তিনি ইস্তফা দিলেন মূলত এই আত্মসম্ভ্রম বোধের কারণেই। স্থূল চিন্তার আর পাঁচজন মানুষের পক্ষে যে ঘটনা অত্যন্ত নগণ্য সেই ঘটনাটাই সংবেদনশীল মানুষটির কাছে অসহ্যবোধ হল। উর্ধ্বতন সাদা চামড়ার সাহেবের সঙ্গে একটি ইংরেজি শব্দ নিয়ে মতান্তর হয়। ইংরেজি শব্দটির প্রথম অক্ষর বড় হরফে হবে কি ছোট হরফে হবে তা নিয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত উর্ধ্বতন ইংরেজ সাহেবের কাছে অত্যন্ত ঔদ্ধত্য মনে হয়েছে—উপরন্তু একজন সামান্য টাইপিস্টের এই পণ্ডিতী মেনে নিতে পারেননি ইংরেজ প্রভুটি। পরিবর্তে জগদীশ বাবুর উপর অকারণ রূঢ় ব্যবহার অনাবশ্যক বাক্যবাণ নিক্ষিপ্ত হয়। আজীবন দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের অধিকারী প্রতিবাদী সত্তার অধিকারী এই মানুষটিও কোন অংশে কম যান না। তিনি কোনো অবস্থাতেই

মাথা নত করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে চাকরীটা ছেড়ে দিলেন। শুধু এই চাকরী নয়, জেদ ধরলেন জীবনে আর কোনোদিন চাকরীই করবেন না। চাকরী ছেড়ে তিনি কিছুদিনের জন্য কুষ্টিয়ায় আসেন। সেটা ১৯২৫/২৬ সাল। সাংসারিক স্বচ্ছলতার শীর্ষ বিন্দু থেকে তাঁকে আবার চরমতম দারিদ্র্যের মুখোমুখি নেমে আসতে হয়।

সাময়িকভাবে কুষ্টিয়ায় অবস্থানের পর জীবিকার টানে জগদীশ গুপ্ত পুনরায় কলকাতায় চলে আসেন। স্ত্রী চারুবালা গুপ্তের স্মৃতি চারণার সাক্ষ্যে আবুল আহসান চৌধুরী বলেছেন—পাটনায় থাকাকালীন জগদীশ বাবুর মাসিক আয় ছিল ২০০/২৫০ টাকা। কিন্তু ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায় সেই আয় উল্লেখ করেছেন ৩৫০/৪০০ টাকা।[২৩] তবে আয়ের পরিমান নিয়ে বিতর্ক থাকলেও তখন তাঁদের পারিবারিক স্বচ্ছলতা নিয়ে কোন দ্বিমত ছিল না। আজ থেকে আট দশকেরও বেশী সময় আগে একটি ছোট্ট পরিবারের পক্ষে এই পরিমান অঙ্ক উপার্জন বেশ ভালোই বলা যায়। নিঃসন্তান দাম্পত্য জীবনে তাদের সাংসারিক অভাবের কোনরকম রন্ধ্র পথই ছিল না। কিন্তু তেল কমে গেলে প্রদীপের আলো যেমন ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসতে থাকে তেমনি নিয়মিত উপার্জন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সংসারের স্বাচ্ছন্দ্যের আলোটাও কমে আসতে থাকে। এমতাবস্থায় চাকরি না করার শপথ যখন করেছেন জগদীশ বাবু একবার; তখন তাঁর স্বভাবের প্রকৃতি অনুযায়ী সে পথে আর হাঁটবেন না এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং বিকল্প রাস্তা হল ব্যবসা করা।

কলকাতায় বসে তখন সম্মানজনক ব্যবসা অর্থে একটা রাস্তা ছিল 'পত্রিকা' প্রকাশ করা। স্বল্পভাষী জগদীশ বাবু সেই পথেই অর্থ উপার্জনের প্রত্যাশা রেখে প্রকাশ করলেন পত্রিকা—নাম দিলেন 'গুপ্তের গল্প'। তিনি নিজে তখনো লেখক হিসেবে বিশেষ পরিচিতি পাননি। তবে ছোটগল্প লেখা শুরু করেছেন। কৈশোরে নিষিদ্ধ কবিতা দিয়ে জগদীশ বাবুর যে সাহিত্য চর্চা শুরু হয়েছিল তার প্রথম প্রকাশিত রূপ একটি অনুবাদ গল্প। ১৯১১ খ্রীঃ তৎকালীন 'ভারতী' পত্রিকায় জোসেফ এ্যাডিসন রচিত 'ভিসন অব মির্জা' অবলম্বনে 'মির্জার স্বপ্নদর্শন' নামে সেই গল্পটি প্রকাশ পেয়েছে। 'বিজলী' পত্রিকায় প্রকাশিত (২৯ শে ফাল্গুন ১৩৩১) 'পেয়িংগেস্ট' গল্পটিকে তাঁর প্রথম মৌলিক রচনা বলে ড. সুকুমার সেন উল্লেখ করেছেন। পরে এটিও তাঁর প্রথম গল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। কিন্তু এই তথ্যটি নির্ভুল নয়। তাঁর প্রথম মৌলিক গল্প 'তিনটি চুমু' — প্রকাশিত (১৭ই মাঘ ১৩৩১) হয়েছিল 'বিজলী'

পত্রিকাতেই। যদিও তাঁর প্রথম লিখিত ছোটগল্প ‘জহর’ — যা পরে কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল। এইরকম সাহিত্য চর্চা দ্বারা তিনি সেইসময় সার্বিক পরিচিত তেমন ভাবে পাননি, অবশ্য কোনো কালেই তাঁর এইরকম পরিচিতি গড়ে উঠেনি। এর কারণ অনুসন্ধান করে ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন— ‘‘... জনপ্রিয় লেখক তিনি কোনকালেই হতে পারেননি, কারণ যে নৈব্যক্তিক বস্তুধর্মিতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন — আবেগ নির্ভর সাধারণ পাঠকের কোনদিনই তা খুব প্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু পাঠকের অনীহা জগদীশ গুপ্তের মধ্যে কখনোই অনাস্থার ভাব জাগাতে পারেনি — আত্মপ্রত্যয়ে তিনি ছিলেন অবিচল।’’[২৪] সেই আত্মপ্রত্যয় নিয়ে ‘গুপ্তের গল্প’ প্রকাশ করে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই বাস্তবটা উপলব্ধি করতে পারলেন। পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় তিনি নিজের কয়েকটি লঘুচালে লেখা গল্প প্রকাশ করতেন। কিন্তু পাঠক সেইসব লেখাকে ভালোভাবে নেয়নি বলে পত্রিকাটির ধারাবাহিক প্রকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। লাভের মধ্যে লাভ এতটা হলো যে সঞ্চিত অর্থের কিছু অপচয় হল, আর জীবন সম্পর্কে মানুষ সম্পর্কে লেখকের বাস্তব জ্ঞানের পথটাও খানিকটা স্পষ্টতর হলো। এই পত্রিকার ভূত মাথায় না চাপলে তাঁর মতো দক্ষ টাইপিস্টের সেইসময় একটা কাজ জুটিয়ে নেওয়া তেমন অসম্ভব ছিল না। কিন্তু ঐ যে জেদ করেছেন চাকরী আর জীবনে করবেন না সেই একগুয়েমি স্বভাবই তাঁকে আবার একটা ভুল পরিকল্পপনাকে বাস্তবায়নের পথে চালনা করল।

পাটনা হাইকোর্টে চাকরিকালে সঞ্চিত অর্থের একটা বড় অংশ পত্রিকার পেছনে চলে যাওয়ার পর জগদীশ বাবু আবার একটা নতুন উপদ্রবকে তাঁদের জীবনে আহ্বান জানালেন। ঠিক করলেন ফাউন্টেন কলমের কালি তৈরী করবেন। যেমনি ভাবনা তেমনি কাজ। যেটুকু সঞ্চিত ছিল পুরোটাই লগ্নি করে নিজে কালি তৈরী করলেন — নাম দিলেন 'Jago's Ink'। উপার্জনের তাগিদে এই পেশাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তিনি সাময়িক ভাবে লেখালেখিও ছেড়ে দিয়েছিলেন। এসম্পর্কে ‘কালিকলম’ পত্রিকার সম্পাদক মুরলীধর বসুকে একটি পত্রে লিখেছেন— ‘‘...Ink Manufacture -এর কাজটা পুনরুজ্জীবিত করিব, স্থির করিয়াছি। Jago's Ink।

সুতরাং কালি-কলমের লেখক হিসাবে যদি আমার সাক্ষাৎ আর না পান তবে আমাকে অপরাধী কবিবেন না—ইহাই আমার সর্বান্তঃকরণের অনুরোধ।’’[২৫] শুধু লেখার প্রতি মনোযোগ

না দেওয়া নয়, কালিটিকে বাজারে জনপ্রিয় করে তোলার সমস্ত রকম কৌশলের মধ্যে তিনি ডুবে যান। শহরের বড় রাস্তার পাশে দেওয়ালে দেওয়ালে বিজ্ঞাপন যেমন দেওয়া হয়, তেমনি সুদূর জার্মানি থেকে কালির দোয়াত আনার ব্যবস্থাও করেছিলেন। কালিটির গুণগত মান যথেষ্ট ভালো ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিছক ব্যবসায়িক বুদ্ধি না থাকার জন্য তিনি ব্যবসা পরিচালনা করতে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই ব্যবসায় নেমে তার সর্বস্বান্ত হওয়ার কোন অবশিষ্টই আর থাকল না। উপরন্তু এই দুঃসময়েই তাঁর পিতাও মারা যান। ফলে ব্যক্তিগত সঞ্চয় যেমন নিঃশেষ হয় তেমনি 'আনন্দভবন' থেকেও আর অর্থপ্রাপ্তির কোনোরকম সুযোগ থাকে না। কপর্দক শূন্য জগদীশ গুপ্তের জীবনে নেমে আসে এক সুগভীর তমসা। সেই তমসার অতলে তিনি নিয়ত ডুবে যেতে থাকেন।

ড. প্রবীর কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর জগদীশগুপ্ত বিষয়ক গ্রন্থে পাটনা হাইকোর্টে চাকরী ছেড়ে দেবার পর প্রথমে জগদীশ বাবু কালি তৈরীর ব্যবসায় নামেন, তারপর পত্রিকা 'গুপ্তের গল্প' প্রকাশ করেন বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায় এবং আবুল আহসান চৌধুরীর মত প্রথম শ্রেণীর জগদীশগুপ্ত গবেষকরা কিন্তু এর বিপরীত কথাই বলেছেন। আমি আমার আলোচনায় প্রবীর বাবুর তথ্যটিকে গ্রহণ না করে অন্য দুজনের দেওয়া তথ্যানুযায়ীই লেখকের জীবনের এই সময়ের কথা উল্লেখ করেছি। তবে পত্রিকা আগে না কালি তৈরীর ব্যবসা — এনিয়ে বিতর্ক যাই থাক না কেন, এই দুই ব্যবসায় অনভিজ্ঞতার কারণে যে জগদীশ বাবু সর্বস্ব খুইয়েছেন, সে বিষয়ে সকলেই সহমত পোষণ করেছেন। নিঃসন্তান দাম্পত্য জীবনে স্ত্রী চারুবালা দেবী তাঁদের জীবনের এই সংকটাপন্ন সময়ে দাঁড়িয়ে স্বামীকে নতুন করে পথ চলার প্রেরণা যোগান। স্বভাবতই অন্ধকারময় জীবন সৈকত ভূমিতে দাঁড়িয়েও উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষোভের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী পুনরায় ঝাঁপিয়ে পড়েন।

জীবনের তাগিদেই জগদীশ বাবু আপন শপথ ভেঙ্গে নব্য ভাবনার আলোকে সরে আসেন। পুনরায় আদলতের টাইপিস্টের কাজে যোগ দেন। এবারে বোলপুর আদালত চত্বর হল তাঁর স্থায়ী ঠিকানা। বোলপুর আদালতে যোগদানের সময় তিনি জীবনের প্রায় উনচল্লিশটি বসন্ত অতিক্রম করে চলে এসেছেন। বিচিত্র মানুষ বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতা তখন তাঁর ভাণ্ডারে। পাটনার চাকরীটা ছেড়ে দেবার পর একের পর এক গল্প লিখে গেছেন। উত্তরা-প্রবাসী-ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকায় লেখা দিয়েছেন কোনরকম পারিশ্রমিক ছাড়াই। এমনকী কেউ নতুন কোন

পত্রিকা বের করার জন্য লেখা চাইলে তাকেও নিরাশ করেননি। বোলপুর আদালতে তাঁর কাজের প্রকৃতি কীরকম ছিল তা স্পষ্ট নয়। শ্রী যতীন্দ্র সেন মহাশয় এই চাকরী সম্পর্কে লিখেছেন— ‘‘এরপর জগদীশচন্দ্র টাইপিস্টের কাজ আরম্ভ করেন বোলপুর কোর্টে। এই কাজ সম্ভবত নিয়মিত সচেতন নয়। যতদূর মনে হয় অর্থের বিনিময়ে কোর্টের মক্কেলদের মামলার কাগজ পত্রের টাইপরূপ নকল প্রস্তুত করে দিতেন।’’[২৬] আবার মুরলীধর বসুকে দুটি পত্রে তিনি এই সময় তাঁর গল্প না লেখার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন—

‘‘কোর্টের কাজে বেগার দিতে হয় যথেষ্ট। নূতন লোক পাইয়া ঠকাইতেছে। ভয়ে ভয়ে না বলিতেও পারি না। সকালবেলা ৭টা হইতে বিকাল ছ’টা পর্যন্ত কাজ—মাঝে ১০টা হইতে ১১টা পর্যন্ত খাওয়ার সময়।’’[২৭]

‘‘গল্প লিখিবার সময় নাই—৭টা হইতে ১০টা এবং ১১টা হইতে ৫টা পর্যন্ত অফিস। তারপর, বন্ধুদের জোর করিয়া হাকিমদের গল্প শোনানো। তারপরে হোটেলে খাওয়ার গর্ভযন্ত্রণা। যে ঘন্টাগুলি কাছারীতে কাটাই, সবগুলি কাজের এবং উৎকণ্ঠার। সুতরাং লিখিবার যে একটা সংস্কার জন্মিয়াছিল, তাহার এখন মূর্ছিতাবস্থা।’’[২৮]

শ্রীসেন এবং জগদীশ বাবুর পত্র দ্বয় থেকে পরিস্কার যে কোর্টের কাজের প্রকৃতি যাই হোক, সেই কাজের চাপের কাছে তাঁকে সাময়িকভাবে হলেও নতিস্বীকার করতে হয়েছে। জীবন জীবিকার তাড়নায় এছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিল না। এতকাল অর্থকষ্ট তাঁকে যেভাবে পীড়িত করেছিল, অর্জন করতে হয়েছিল নিয়ত তিক্ত অভিজ্ঞতা। সেই দুঃসময়ে লেখালেখি থেকে প্রাপ্ত আয় তাঁকে মুক্তি দিতে পারেনি সেই ভয়াবহ যন্ত্রণা থেকে। সেই নৈরাশ্য ও বেদনা থেকে তিনি ঐ পত্রে আরও লিখেছেন— ‘‘নিরুপায় পক্ষে যেমন তেমন একটা উপজীবিকার উপায়ের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এইটে আসিয়া পড়ায় মনটা কঠোর বাক্য এবং বন্দী দশার মধ্যেই বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। গল্প অন্ন দেয় নাই, দিবে, এ আশাও দেয় নাই; কিন্তু, এই কাজটা দিতেছে।’’[২৯]

বোলপুর আদালতের কর্মসূত্রে তিনি আবার সস্ত্রীক বীরভূমের লালমাটির সঙ্গে, এখানকার মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে থাকেন। পাটনা কোর্টে চাকরী ছেড়ে যখন তিনি কুষ্টিয়ায় ‘আনন্দ ভবনে’ ফিরে গেছিলেন তখন সেই ‘আনন্দভবন’ আর নতুন করে তাঁর জীবনে আনন্দের বার্তা বয়ে আনতে পারেনি। পিতা বার্ধক্যজনিত কারণে ৭৬ বছর বয়সে

মারা গেছেন। পিতৃহীন সেই আনন্দ নিকেতনে গ্রাসাচ্ছাদনেরও কোন নিশ্চয়তা ছিল না। এমতাবস্থায় বোলপুরে চলে আসাটা তাঁর জীবনে নিয়তির নিদের্শের মতই অনিবার্য ছিল। এখনকার লালমাটি আর সবুজে ঘেরা জনজীবনে তখনো শহুরে বাতাস পুরোপুরি ঢোকেনি। তবে মানুষের চেতনার সবুজ ক্ষেত্রটি মূল্যবোধের অবক্ষয়ে —ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেছে। সেই নিদারুণ সংকটের আবর্তের মাঝে দাঁড়িয়েও তিনি খুঁজেছেন সুস্থ জলহাওয়া। ৫টি পীঠস্থানের জেলা বীরভূমকে তাঁর মনে হয়েছে একটা প্রকাণ্ড কামরূপ কামাখ্যা।

বোলপুর চৌকি আদালতে চাকরী গ্রহণ এবং সেখানে সপরিবারে অবস্থিতির কথা প্রসঙ্গে আবুল আহসান চৌধুরী লিখেছেন— ‘‘... প্রায় সর্বস্বান্ত জগদীশকে জীবিকার প্রয়োজনে ১৯২৭ সালে আবার চাকরিতে ফিরে যেতে হয়। এই সময় তিনি বোলপুর চৌকি আদালতে টাইপিস্টের কাজ নেন। এখানে দীর্ঘ ১৭ বছর চাকরি করার পর ১৯৪৪ সালে অবসরগ্রহণ করেন।’’[৩০] কিন্তু জগদীশ বাবুর স্ত্রীর দেওয়া তথ্যানুযায়ী বোলপুরে তারা ১০ বছর ছিলেন। এবং স্ত্রীর অসুখের জন্যেই জগদীশ বাবু চাকরী ছেড়ে দিয়ে বোলপুর ছেড়ে পুনরায় কুষ্টিয়া চলে যান। কালিকলমের সম্পাদক মুরলী ধর বসুকে স্ত্রীর অসুস্থতার কথা উল্লেখ করে একটি চিঠিতে প্রসঙ্গত তিনি লিখেওছেন— ‘‘আমার স্ত্রীর শরীর ভাল নাই—পেটের অসুখ আর সর্বশরীরে ব্যথা।... অনেক কষ্টে রাঁধিতেছি।’’[৩১]

স্ত্রীর এই অসুস্থতা তাঁকে বড়বেশী বিচলিত করে তুলেছিল। একদিকে আদালতে প্রচণ্ড কাজের চাপ, অন্যদিকে পারিবারিক এই অস্থিরতায় তিনি প্রতিনিয়ত ছটফট করেছেন অন্তরে অন্তরে। এইখানে অবস্থান কালেই তিনি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি সৃষ্টি করেছেন। লিখতে লিখতে মানসিক উত্তেজনা কাটাতে কখনো কখনো লেখা থামিয়ে মাঝপথে খানিকক্ষণ বেহালা বাজিয়ে নিতেন। একথা তাঁর স্ত্রীর রচনা সাক্ষ্যে জানা যায়।

১৯২৭ সালে বোলপুরে যখন শেষবারের মত টাইপিস্টের চাকরী নিয়ে এসেছেন, সেই বছরই তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘বিনোদিনী’র আত্মপ্রকাশ ঘটে। ‘আনন্দভবন’ -এর স্নিগ্ধ শান্তির পরিবেশ থেকে ‘কুঅভিলাষপূর্ণ’ কবিতা রচনার জন্য যে কিশোরের নির্বাসন হয়েছিল কলকাতায়, তখনই তাঁর — ভবিষ্যৎ জীবন পথের রূপরেখা স্থির হয়ে গিয়েছিল বলা যায়। তারপর পড়াশুনার মাঝেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, মাঝপথে পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়া, বিখ্যাত আইনজ্ঞ পরিবারের সন্তান হিসেবে সামান্য টাইপিস্টের পদে কর্মজীবনের সূচনা,

বারবার জীবিকার স্থান পরিবর্তন, মাঝে বৃত্তিরও পরিবর্তন আদালতে কর্মসূত্রে বিচিত্র মানুষকে স্বচক্ষে দেখার দুর্লভ অভিজ্ঞতা —এসব কিছু মিলিয়ে যে যন্ত্রণা জটিল জীবনধারা জগদীশ গুপ্তকে অতিক্রম করতে হয়েছে — সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতারই এক অনন্য প্রকাশরূপ তাঁর গল্প উপন্যাসগুলি। পাটনা আদালতের কাজ ছেড়ে আসার পর বেকার জীবনে ডুবে থাকা মানুষটিকে যখন আলস্য গ্রাস করছিল সেইসময় তার স্ত্রী চারুবালা দেবী তাঁর গল্প সৃষ্টির বীজ বপণ করে দেন নিজেরই অজ্ঞাতসারে। 'বিনোদিনী' গল্প গ্রন্থের ভূমিকায় 'গল্প কেন লিখিলাম' —এ লেখক তার সংক্ষিপ্ত অথচ হাস্য কৌতুককর বিবরণ দিয়েছেন—যার মধ্য দিয়ে তাঁর সৃষ্টির দুয়ার উন্মোচনের কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।

অলসতার মধ্যদিয়ে তিনি যখন দিন অতিবাহিত করছেন সেইসময় তার স্ত্রী নানা কাজের অজুহাতে বাজারে পাঠাতেন তাঁকে—আসা যাওয়া মিলিয়ে বাজার পুরো সওয়া ঘন্টার পথ। কোনোদিন পান, কোনোদিন কাঁচালংকা, কোনোদিন সোডা, কোনোদিন বা মউরি ইত্যাদির প্রয়োজনে তাঁকে যখন বাজারে ছুটতে হচ্ছিল, তখন তিনি একটা 'ফন্দি' অবলম্বন করলেন তাঁর 'প্রিয়ম্বদা'কে ব্যস্ততা দেখাবার জন্য। কাগজ পেন্সিল নিয়ে গল্প রচনার বাহানায় কখনো উর্ধ্বাকাশে তাকিয়ে রইলেন, কখনো চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বসে রইলেন। এই ফাঁকি ধরা পড়ে স্ত্রীর কাছে প্রকাশ পেল গল্পের অদ্ভুত সেই খসড়া—

''গল্পের প্লট্ যাহার উপর লিপিবদ্ধ করিবার অভিপ্রায় ছিল, সেই কাগজখানা প্রিয়ম্বদা ফস্ করিয়া টানিয়া লইয়া সশব্দে পড়িতে লাগিলেন, শ্রী শ্রী দুর্গাপূজার ঘটনা, হাইকোর্ট, ওয়াটার-টাওয়ার; এক পয়সার মিঠেকড়া তামাক; ঢোঁড়া মিঞা; মালিনী তোর রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে যায়; পয়সায় দুটো শশা; বিভূতি চৌধুরী, রামনবমী; তারি সনে দেখা হ'লে; হাতুড়ে...''[৩২] স্ত্রীর সামনে লেখকের 'দুর্গতির' পথ ধরেই একটা ব্যতিক্রমধর্মী গল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল সেদিন। বোলপুরে যখন কর্মসূত্রে বাস করতে শুরু করেন, তখন মাসিক পত্রের মাধ্যমে ক্রমে জানাজানি হয়ে যায় জগদীশ বাবু একজন লেখক। সেইসূত্রে তাঁর দু-চারজন গুণগ্রাহী অনুরাগী বন্ধুও জুটে গেল। এদের মধ্যে দুজন হলেন শ্রী ভোলানাথ সেনগুপ্ত এবং শ্রী শান্তিরাম চক্রবর্তী। এই দুজনের পীড়াপীড়িতে লেখক গল্পের বই প্রকাশে সম্মতি দিলেন। আর তার প্রকাশের জন্য ব্যয়ভার হিসেবে 'শ আড়াই' টাকা উপস্থিত শ্রীব্রজজন বল্লভ বসু ওরফে কানুবাবু বহন করার দায়িত্ব নেন নির্দ্বিধায়। কানুবাবুর টাকায়— 'বিনোদিনী'র আত্মপ্রকাশ

ঘটে। বিনোদিনীকে পাঠক সেদিন সেভাবে গ্রহণ করেনি। এনিয়ে লেখকের আক্ষেপ হয়তো ছিলই, কিন্তু তার চেয়েও বেশী আক্ষেপ তিনি করেছেন কানুবাবুর অর্থ ধ্বংস করবার জন্য। এ বিষয়ে তিনি স্পষ্টতই জানিয়েছেন—

''বিনোদিনী গল্পের বই ছাপা হইল

৩০/৩৫ খানা বই এঁকে ওঁকে দিলাম, অবশিষ্ট হাজার খানেক বই, আমার আর কানুবাবুর 'বিনোদিনী' প্যাকিং খামের ভিতর রহিয়া গেল, পরে কীটে খাইল।

লেখক এবং সামাজিক মানুষ হিসাবে আমার আর কোনো অনুশোচনা নাই, কেবল এই মানসিক গ্লানিটা আছে যে, কানুবাবুর শ' আড়াই টাকা নষ্ট করিয়াছি।''[৩৩]

বিনোদিনীর এই পরিণতি লেখকের দিক দিয়ে যতটা না বেদনাবহ তার চাইতে অনেক বেশি বেদনাদায়ক এবং দুর্ভাগ্যজনক যে সেদিনের মধ্যবিত্ত মানসিকতার পাঠককুল এই গ্রন্থকে অস্বীকার করেছিল। আসলে সমকালের যুগের আবেদনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলেই সেদিনের বড় অংশের পাঠকের কাছে এই গ্রন্থ এবং তাঁর লেখক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেনি। অথচ লেখক বাস্তবপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিজের দ্বিধা এবং তাঁর অভিজ্ঞতা লব্ধ মানুষের জীবনবোধের রসায়নে এতে নির্মাণ করেছেন যে শিল্পলোক তা মানব ইতিহাসের একটি বিশেষ সময়েরই যথার্থ অভিজ্ঞাত—যাকে গ্রহণ করতে উত্তরকালের বাংলা সাহিত্য পাঠকের অনেকটাই সময় লেগেছিল।

মুরলীধর বসুকে ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে কুষ্টিয়া থেকে জগদীশ গুপ্ত একটি চিঠিতে জানাচ্ছেন।—

'উপন্যাস লেখা আমার পক্ষে দুরূহ—অসম্ভবই।'[৩৪] অথচ এই মানুষটি তাঁর বিজাতীয় জীবন অভিজ্ঞতার আলোকে যখন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'অসাধু সিদ্ধার্থ' রচনা করেন—এই মন্তব্যের তিন বছরের মধ্যেই তখনই তিনি প্রমাণ করেছেন মুরলী বসুকে লেখা মন্তব্য ছিল নিছক কথার কথা মাত্র। তাঁর এই প্রথম উপন্যাসের মধ্যদিয়েই তাঁর নিজস্বতার গণ্ডী নির্ণীত হয়ে যায়। কর্মসূত্রে সম্বলপুর কটক, পাটনা এবং বোলপুরের আদালতে প্রতিদিন যেসব মানুষ এবং ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেছেন, সেগুলিরই টুকরো টুকরো দৃশ্য ও চরিত্র মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে তাঁর 'অসাধু সিদ্ধার্থ' থেকে মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'কলঙ্কিত তীর্থ' (১৯৬০) উপন্যাসে।

জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থগুলির প্রকাশ কালের নিরীখে বিচার করলে দেখা যায় প্রথম উপন্যাস ১৯২৯ খ্রীঃ প্রকাশ পায় এবং ১৯৩৯ খ্রীঃ মধ্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির প্রকাশ ঘটে যায়। কিছু কিছু গ্রন্থ তিনি তাঁরও আগেই রচনা করেছিলেন, যেগুলি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ পেয়েছে। সেদিক থেকে লেখকের ৩৫—৫৩ বছর বয়সের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময়কালের মধ্যে তিনি কুষ্টিয়ায় কাটিয়েছেন অনেকগুলো বছর, বোলপুরে দশ বছর। তবে তিনি তাঁর জন্মভূমি গ্রাম মেঘচামীর কথাও বিস্মৃত হননি। আসলে গ্রামীণ পরিবেশের প্রতি ছিল তাঁর সহজাত আকর্ষণ। এই গ্রাম জীবনের নানা অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে। মেঘচামী গ্রামে বসেও তিনি দুটি বিশিষ্ট উপন্যাস লিখেছিলেন—এ বিষয়ে তাঁর স্ত্রী চারুবালা দেবীর সাক্ষ্য থেকে জানা যায়—

“... বোধ হয় ১৩৩২ সাল হইবে সেইসময় বোলপুর হইতে ৬ মাসের জন্য অফিসে ছুটি লইয়া দেশের বাড়ী খোদ মেঘচামী গ্রামে থাকেন, সঙ্গে আমিও ছিলাম সেইসময় ‘দুলালের দোলা’ আর ‘রোমন্থন’ বই দু’খানি লেখেন।”[৩৫]

মেঘচামী গ্রাম সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রা, চন্দনা নদীর স্নেহস্পর্শে ধন্য এই গ্রামের পরিবেশই তাদের নানা রীতি-নীতি আচার-আচরণ-সংস্কার-বিশ্বাস সহ এই উপন্যাস দুটিতে উঠে এসেছে। বাস্তবিক জগদীশবাবু গ্রামকে বড়ই ভালোবাসতেন। তাঁর স্বতন্ত্র দৃষ্টি দিয়ে দেখা গ্রাম সমাজের নগ্ন বীভৎস চেহারাটা গল্প উপন্যাসে তাই অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবেই ধরা পড়েছে। পূর্বসূরী শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের গ্রাম সমাজ চিত্রাঙ্কণের যে প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় তাঁর উপন্যাসে; তাতে একটা পরিপূর্ণ রূপ ছিল না; সেই রূপ কাঠামো সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই তা আবেগের দ্বারা প্লাবিত হয়ে যেত — সেখানে জগদীশ বাবুর গ্রাম সমাজ অনেকটাই পরিপূর্ণ ভাবনা দ্বারা ঋদ্ধ।

জগদীশ গুপ্তের অধিকাংশ রচনাতেই মূলত গ্রামীণ সমাজজীবন এবং শহরতলির জীবনই মুখ্য হয়ে উঠেছে। তিনি নিজেও চাকরী সূত্রে শহরাঞ্চলের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও মূলত গ্রামীণ নিম্ন মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনই তাঁর উপন্যাসের বাস্তব ভিত্তি রচনা করেছে। মেঘচামী গ্রাম থেকে কুষ্টিয়া হয়ে যে জীবনের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল তা শেষ হয়েছে পুনরায় কুষ্টিয়ায় এসেই। স্বাভাবিকভাবেই চারপাশে দেখা মানুষগুলিই তাঁর রচনায়, বিশেষ করে উপন্যাসগুলিতে ভিড় করেছে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সেইসব মানুষকে কাছ

থেকে যেমন দেখেছেন, তেমনি দেখার চেষ্টাও করেছেন আজীবন। সেইসব চোখে দেখা মানুষগুলি বলতে পারে লেখকের প্রকৃত ভূমিকা কোথায়। সেই মানুষগুলির চিত্র কীভাবে তাঁর মনোগহনে এঁকে নিতেন এবিষয়ে চারুবালা দেবী লিখেছেন— ‘‘... তখন তো পর্দা প্রথা ছিল। কখনো হয়তো একগলা ঘোমটা দিয়ে ওঁর সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়েছি। দুজন নিম্নশ্রেণীর পুরুষ বা মেয়েমানুষ রাস্তায় ঝগড়া করছে, উনি দাঁড়িয়ে পড়ে যতক্ষণ সম্ভব ঐ ঝগড়া শুনতেন। আমাকেও রাস্তায় এভাবে ঘোমটা মাথায় কলা বউ-এর মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হতো।’’[৩৬]
বাস্তবিক গ্রামকেই তিনি বড় ভালোবাসতেন। সুযোগ পেলেই তিনি মাঝে মাঝে গ্রামে চলে যেতেন। অনাবিল প্রকৃতি ঘেরা গ্রামকে নিছক রোমান্টিক দৃষ্টি দিয়ে নয়, নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তির সাহায্যে তিনি মাটির কাছাকাছি মানুষগুলিকে দেখেছেন। গ্রামে গিয়ে মনের মত মানুষ পেলে তার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপনে তার বিন্দুমাত্র বিলম্ব হত না। মেঘচামীর চন্দনা নদী ঘেরা গ্রামের বাড়ীতে আইজদ্দি নামে একজন মানুষকে তিনি পেয়েছিলেন, যার সঙ্গে তার আন্তরিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। তাঁর কাছে বিচিত্র সব গল্প শুনতেন, অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হতে হতে মনের ক্যানভাসে নানারকম ছবিও তিনি এঁকে ফেলতেন। এই আইজদ্দি চরিত্রেরই এক ভিন্নতর প্রকাশ আমরা দেখি ‘দুলালের দোলা’ উপন্যাসের পিরু নামক চরিত্রটিতে। এইভাবে পল্লী বাংলার জীবন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক তাঁর ত্রয়ী উপন্যাস — ‘রোমন্থন’, ‘দুলালের দোলা’ এবং ‘যথাক্রমে’। এগুলিতে গ্রামজীবনের যে বীভৎস নগ্নরূপ ব্যক্ত হয়েছে —তাঁর সঙ্গে জগদীশ বাবুর প্রত্যক্ষ সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। এই ত্রয়ী উপন্যাসের প্লট তাই কোনো ভাবেই পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে যে ধার করা নয়—তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বোলপুর আদালতে চাকরী করার সময়েই শত ব্যস্ততার মাঝেই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসটি রচনা করেন—‘লঘুগুরু’ (১৯৩১)। এই উপন্যাসে বর্ণিত যে অন্ধকারময় জীবন তার সঙ্গে জগদীশ বাবুর প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল, ছিল ছেলেবেলাকার স্মৃতি। পতিতা পল্লীর দুর্বিসহ জীবনকে তিনি যেভাবে দেখেছেন, যে জীবন থেকে পতিতারা চাইলেও কোন ভাবেই বেরিয়ে আসতে পারত না। সুস্থ জীবনের স্বপ্ন অধরাই থেকে যেত। জীবন সায়াহ্নে দাঁড়িয়েও তাদের পথের প্রান্তেই কাটাতে যে হোত, তার সরাসরি চিত্র তিনি আপন অভিজ্ঞতা থেকে তুলে এনেছেন। উপন্যাসের সুন্দরী চরিত্রটি ছেলেবেলার সান্নিধ্য পাওয়া গিরিবালা নাম্মী রক্ষিতাটিরই প্রতিরূপ। কিংবা উত্তম যে টুকীর মধ্যদিয়ে আবার পাপের পথেই নেমে গেল সেই বিবর্তনের মধ্যে

শৈশবের সেই বিগত যৌবনা মুড়ি-মুড়কি বিক্রেতা পতিতার জীবনের ছায়া লক্ষ্য করা যায়। এই উপন্যাসটিকে তিনি সমালোচনার জন্য বোলপুরের আনন্দবাদী ব্যক্তিত্ব শান্তিনিকেতনের মধ্যমণি রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছিলেন গজেন্দ্র মিত্রের অনুরোধে। বইটি পড়ে এর লেখার রীতি নিয়ে প্রশংসা করলেও উপন্যাসে বর্ণিত সমাজকে বাংলাদেশের পরিচিত সমাজ বলতে অস্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথ— "... এ দেশে লোকালয়ের যে চৌহদ্দির মধ্যে এতকাল কাটালুম এই উপন্যাসের অবলম্বিত সমাজ তার পক্ষে সাত সমুদ্র পারের বিদেশ বললেই হয়, দূর থেকেও আমার চোখে পড়ে না। লেখক নিজেও হয়তো বা অনতিপরিচিতের সন্ধানে রাস্তা ছেড়ে কাঁটাবনে পেরিয়ে ও জায়গায় উঁকি মেরে এসেছেন।"[৩৭]

এই জাতীয় অভিযোগ সত্ত্বেও বলা যায়, 'অনতিপরিচিতের সন্ধানে রাস্তা ছেড়ে কাঁটাবন' পেরিয়ে লেখককে অন্যত্র যেতে হয়নি। তিনি তাঁর জীবন অভিজ্ঞতার যে বৃত্তের মধ্যে এতকাল কাটিয়েছেন সেখানেই এই ছবি প্রত্যক্ষ করেছেন। পল্লী গ্রামের সোঁদা মাটির গন্ধ নিয়ে অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রাম্য মানুষগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র গড়ে ওঠার ফলেই তিনি এই সমাজ প্রেক্ষাপটকে উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন। প্রসঙ্গত জগদীশবাবু নিজেই তাঁর এই অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছেন— "লোকালয়ের যে চৌহদ্দির মধ্যে এতকাল আমাকে কাটাইতে হইয়াছে সেখানে 'স্বভাবসিদ্ধ ইতর' এবং 'কোমর বাঁধা সয়তান' নিশ্চয়ই আছে এবং বোলপুরের টাউন প্ল্যানিং -এর দোষে যাতায়াতের সময় উঁকি মারিতে হয় নাই, 'ও জায়গা' আপনি চোখে পড়িয়াছে।"[৩৮]

এই বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতাই তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়েছে। শৈশবে চন্দনা নদী তীরবর্তী গ্রাম মেঘচামী থেকে শুরু করে কুষ্টিয়া হয়ে নানা স্থানে 'ভ্রাম্যমান জীবন' কাটিয়ে বোলপুরে অবস্থান কালে এই মানুষের প্রকৃত স্বরূপকে তিনি আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন।

সংগীত চর্চার পাশাপাশি খেলাধূলার প্রতি জগদীশ বাবুর প্রবল আগ্রহের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই খেলার সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁর কোনোরকম শুচিরায়ু গ্রস্ততা ছিল না। ফুটবল খেলোয়ার হিসেবে শুধু কুষ্টিয়াতেই নয়, তিনি প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলতে গেছেন কুমারখালি রাজবাড়ি, গোয়ালন্দেও। একবার কুষ্টিয়ার দলে কুমারখালির সঙ্গে ফুটবলের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইতে তিনি শেষ মুহূর্তে দলের হয়ে গোল করে দলকে জিতিয়েছিলেন। এহেন জয়ী ফুটবলার জীবনের প্রতিযোগিতায় বারবার কেন জানি বড় বেশী

নিস্পৃহ থেকেছেন। হৈ-হল্লোড় হাসি ঠাট্টায় কাটানো এই মানুষটি ধীরে ধীরে বদলে যেতে থাকেন। নিজের অন্তরস্থ দুঃখ ব্যথা বেদনাকে গোপন করে রাখতেন। সুরের প্রতি অনুরাগী এই মানুষটির ব্যক্তি জীবনেই বেসুরো পদধ্বনি শোনা যেতে থাকে। একটা অনিবার্য দুঃখবাদী ভাবনা তাঁকে ক্রমশ গ্রাস করতে থাকে। আনন্দভবন থেকে কর্মসূত্রে বিচ্যুত মানুষটির জীবনে যেন নিরানন্দ ধীরে ধীরে গ্রাস করতে থাকে। কদর্য মনোভাবের নানারকম স্থূল চিন্তার মানুষদের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিন আদালত চত্বরে কাটাতে গিয়ে তিনি বড় বেশী নিষ্প্রাণ হয়ে পড়তে থাকেন। ১৯০৯ সালে সিউড়ি আদালতে কাজ করার সময় তিনি তাঁর এক খুড়িমার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে কিছুদিনের জন্য তাঁর শৈশবের গ্রাম মেঘচামীতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসেছিলেন তখনকার মারণরোগ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে। সেই জ্বরে তিনি দিনের পর দিন কাহিল হয়ে পড়েছেন, কিন্তু মা কিংবা স্ত্রীকে সেই যন্ত্রণার কথা বুঝতে দিতে চাননি। এভাবেই নিজেকে বারবার আড়াল করার চেষ্টা করতেন। তবে নিজের কষ্টের বিষয়ে যথেষ্ট দৃঢ়চেতা মানসিকতার অধিকারী হলেও প্রিয়জনদের রোগে শোকে তিনি যথেষ্ট কোমল হৃদয় বৃত্তির মানুষ যে ছিলেন তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। একবার তাঁর স্ত্রীর হাতে একটা ফোঁড়া হয়েছিল বোলপুরে থাকার সময়ে। ডাক্তার সেই ফোঁড়া অপারেশন করবার যাবতীয় প্রস্তুতি সেরে ঘরের দরজা বন্ধ করে জগদীশগুপ্তকে তাঁর স্ত্রীর হাতটা ধরতে বলেছিলেন। কিন্তু স্বচক্ষে স্ত্রীর কষ্ট প্রত্যক্ষ করতে হবে ভেবে তিনি ডাক্তারের কথায় রাজী হননি। সংবেদনশীল বন্ধু বৎসল, পরিহাস-রসিকতায় বন্ধুদের সঙ্গে কাটাতে অভ্যস্ত এই মানুষটির জীবন বীণার তার যেন সহসা কেটে যায়। প্রথম জীবনের সেই প্রাণোচ্ছ্বলতা কালক্রমে তাঁর মধ্যে ম্লান থেকে ম্লানতর হতে থাকে। খেলাধূলা এবং সঙ্গীতচর্চার আসর থেকে তিনি নিজেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে আনেন। বাহ্য আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় যেন শামুকটা তার খোলার ভেতরে ঢুকে যায়।

পাটনা হাইকোর্টের চাকরী করবার সময়েই জগদীশবাবুর মধ্যে একাকীত্ব চলে এসেছিল। বন্ধু মহলে তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিতে শুরু করেন। নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে তাঁর ভালো লাগত না। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে তিনি সেই প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতেন। চারুবালা দেবীর স্মৃতি চারণায় জানা যায়—

“কুষ্টিয়াতে দেখেছি বন্ধুরা এসে নানারকম কথা বলত। তাঁকে দেখেছি নির্বাক। জানালার পর্দা সরিয়ে দেখতে পেতাম, মানুষটার কোন সাড়াশব্দ নাই। আমি কিছু বললে

হাসতেন, কখনও বলতেন, ওরা বলুক না যা খুশি, ওরা যদি আনন্দ পায় বলে যাক। আমি ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নিই।...”[৩৯]

আত্মপ্রচার বিমুখ এই মানুষটি কর্মসূত্রে বোলপুরে যাবার পরও তাঁর কাছে বন্ধু বান্ধবরা এসে নিজেদের সম্পর্কে গল্প গুজব করতেন। কিন্তু জগদীশবাবু শুধু সবার কথা শুনে যেতেন। নিজের সম্পর্কে তিনি প্রায় কিছুই বলতেন না। একদিন ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকা থেকে ‘মানি অর্ডার’ কোর্টের মধ্যে গেলে সকলের পীড়াপীড়িতে তিনি বললেন ‘গল্পটল্প লিখি, তাই পত্রিকা দপ্তর থেকে টাকা এসেছে। এই মানি অর্ডারের ব্যাপারটির জন্য উপস্থিত সকলে তখন জানতে পেরেছিল—আদালতের এইসব কাজের ফাঁকে এই মানুষটি আবার সাহিত্য চর্চাও করেন। স্বভাবতই এহেন মানুষটি সম্পর্কে শ্রদ্ধা আরও অনেকগুণ বেড়ে যায়।

১৯০৮-০৯ খ্রীঃ বীরভূমের সিউড়ি আদালতে যে কর্মজীবন শুরু হয়েছিল জব-টাইপিস্ট হিসেবে — সেই জীবনের ইতি টেনে দেন জগদীশ গুপ্ত ১৯৪৪ খ্রীঃ বোলপুর চৌকি আদালত থেকে টাইপিস্ট হিসেবেই অবসরের মধ্যদিয়ে। এই দীর্ঘ সময়ের বিচিত্র কর্মের অভিজ্ঞতা মানুষটিকে যথার্থ অর্থেই পরিপূর্ণতা দিয়েছে। বোলপুর ছেড়ে এসে তিনি কুষ্টিয়ায় বসবাস শুরু করেন, তবে পৈত্রিক বাড়ীতে তিনি বেশীদিন থাকেননি। দাদা যতীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি পৈত্রিক বাড়ীর কাছেই ঘোষপাড়ায় বাড়ী ভাড়া করে স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন। এখানে দেশ স্বাধীন হওয়ার অল্পকাল পূর্ব পর্যন্ত কাটিয়ে ছিলেন। এইসময় কুষ্টিয়া কলেজে বাংলার অধ্যাপক হয়ে এসেছিলেন শ্রী সুধীর রায়। ইনি জগদীশবাবুর সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক ছিলেন। আত্মকেন্দ্রিক জগদীশবাবু কুষ্টিয়ায় সাহিত্য প্রেমী মানুষের কাছে ছিলেন ‘গেঁয়ো যোগী’র মত। তাঁকে এখানকার কোনো সাহিত্যলোচনা, সভা-সমিতিতে কেউই আমন্ত্রণ জানাত না। কিন্তু অধ্যাপক রায় উদ্যোগী হয়ে কুষ্টিয়াতে ‘চিন্তয়নী’ নামে একটি সাহিত্য গোষ্ঠী গড়ে এক আলোচনায় জগদীশবাবুকে আমন্ত্রণের প্রস্তাব দেন। কিন্তু সমবেত অন্যান্যরা তাতে আপত্তি তোলেন। এবিষয়ে তাঁদের যুক্তি ছিল— ক. সাহিত্য সম্পর্কে জগদীশবাবু ভাষণ দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট দক্ষ বক্তা নন এবং খ. তাঁর সাহিত্যে ছিল যৌনতার প্রবল ছাপ—যাকে এইসব তথাকথিত সাহিত্য রসিকেরা ভালোভাবে নেননি।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের কিছুকাল আগে সস্ত্রীক জগদীশবাবু কুষ্টিয়া ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন স্থায়ীভাবে। আর কখনোই তিনি কুষ্টিয়ায় ফিরে যাননি। কলকাতায় এসে প্রথমে

ওঠেন পরাশর রোডে অবস্থিত জেঠতুতো ভাইদের আশ্রয়ে। কিন্তু আজীবন প্রবল আত্মমর্যাদা বোধের অধিকারী মানুষটি সেখানে না থেকে অল্প সময়ের মধ্যেই যাদবপুরের কাছে রামগড় কলোনিতে নিজস্ব বাড়ী করে উঠে আসেন। অবশ্য এই বাড়ী নির্মাণের কৃতিত্ব পুরোটাই ছিল তার স্ত্রী চারুবালা দেবীর। বাড়ী তৈরীর আগে পর্যন্ত তিনি এর বিন্দু বিসর্গও জানতেন না। স্বামীকে না জানিয়ে যথেষ্ট কাঠখড় পুড়িয়ে চারুবালা দেবী স্থানীয় মুকুল নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রায় রাতারাতি ঘর তোলার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই বাড়ী ক্রয়ের ইতিহাসের স্মৃতিচারণায় চারুবালা দেবী জানিয়েছেন— ‘‘১৯৫০ সালে স্বামীর বিনা অনুমতিতে পিতৃপ্রদত্ত অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া যাদবপুর সন্নিকট রামগড় কলোনীতে রিফিউজি হিসাবে জবরদস্তি জমিতে বাড়ি করি। কলোনির প্রেসিডেন্ট প্রভৃতিকে ৪৫.০০ টাকা দিতে হয়। ঘর তোলা প্রভৃতি বাবদ খরচ আলাদা। রামগড়ে যাইবার পর দেখা গেল স্বামী খুব খুশী।’’[৪০] নিঃসন্তান কিন্তু সুখী এই দম্পতি তাঁদের জীবনের শেষ দিনগুলো রামগড় কলোনীর এই বাড়ীতেই কাটিয়েছেন। জগদীশবাবু আমৃত্যু অন্তরালেই থেকে গেছেন। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে অধ্যাপক সরকার আব্দুল মান্নান লিখেছেন— ‘‘... জগদীশ গুপ্তের ব্যক্তিজীবনের যেটুকু জানা যায়, তাতে মনে হয়, তিনি সাহিত্যিক বন্ধুদের আড্ডায় যেতেন না এবং নিজেকে তুলে ধরার ব্যাপারে তিনি সর্বদাই ছিলেন নির্মোহ ও অনাগ্রহী। ফলে অনিবার্য ভাবেই সাহিত্যিক হিসেবে আলোচিত হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উপস্থিতি ও অবলোকনের যে রীতি তা থেকে তিনি স্বভাবগত ভাবেই ছিলেন অনেক দূরে।’’[৪১] এই বক্তব্যের মধ্যে পুরোপুরি সত্যতা হয়তো নেই। কেননা দক্ষিণ কলকাতায় কবিশেখর কালিদাস রায়ের পি ২৩০-৩ বসন্ত রায় রোডের বাড়ীতে ‘রসচক্র’ নামে একটি সাহিত্য আড্ডার আসর বসত প্রতি বুধবার। এই সভার সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সুরেন দাশগুপ্ত। জগদীশ বাবু এই সভার স্থায়ী সদস্য না হলেও এখানে নিয়মিত যোগ দিতেন যখনি তিনি কলকাতায় আসতেন। রামগড় কলোনীর বাড়ী থেকেও এই সভায় তাঁর আগমনের কথা জানা যায়। এই সাহিত্য সভায় আসা-যাওয়ার কালেই তিনি রচনা করেন ‘রতি ও বিরতি’, ‘সুতিনী‘ প্রভৃতি উপন্যাস। এবং এখান থেকেই প্রকাশিত ‘বারোয়ারী’ উপন্যাসের একটি পরিচ্ছেদ তিনি লিখেছিলেন। এই বারোয়ারী উপন্যাসের সম্পাদক ছিলেন কালিদাস রায়। জগদীশবাবু ছাড়া বাকী এগারোজন লেখক হলেন— শরৎচন্দ্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব,

রাধারাণী দেবী, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, মনোজ বসু, বিশ্বপতি চৌধুরী, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় এবং নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। জগদীশবাবু এই উপন্যাসের নামকরণ করেছিলেন 'জয়া'। তবে সাহিত্য সভায় যোগ দিয়ে এইভাবে উপন্যাসাদি রচনা করলেও তিনি যে চিরকালই নিজেকে তুলে ধরার ব্যাপারে নির্মোহ এবং অনাগ্রহী ছিলেন একথা নিঃসন্দেহে মেনে নিতে হয়।

দেশ ভাগের প্রাক্-মুহূর্তে কুষ্টিয়া ছেড়ে এসে সস্ত্রীক জগদীশবাবু যখন কলকাতার পরাশর রোডে তাঁর পিতৃব্য-পুত্রদের গৃহে সাময়িক ভাবে আশ্রয় নেন, তা অল্পদিন আগে তাঁর পিতৃব্য পুত্র শৈলেশ চন্দ্র স্ত্রী, দুটি মেয়ে এবং একটি ছেলেকে সংসার সাগরে ভাসিয়ে অকালে মারা যায়। ছোট মেয়েটির বয়স তখন নয় মাস—নাম তার সাকু। এহেন অসহায় অবস্থায় তাঁরা মাতৃহারা সাকুকে তাঁদের বুকে টেনে নেন। নিঃসন্তান থাকার দুঃখটা এবার দূর হয় সাকুর ভালোবাসার টানে। সেই সময়ের স্মৃতি-চারণায় চারুবালা দেবী জানিয়েছেন—
''...আমরা এসে ছোট মাতৃহারা কন্যাটির মায়ায় পড়িয়া গেলাম। আমরা দু'জনাই আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লইলাম। মাতৃহারা মেয়ে মায়ের দুধ পায় নাই। সর্বদা মা মা, আর খাইবার চেষ্টা। ক্রমশঃ একটু বড় হইয়া পায়ে পায়ে চলতে শিখেই মা মা করে আমার পায়ে পায়ে বেড়ায়। কি আর করি, যতদূর পারি, কচি মেয়ের আবদার পালন করি।''[৪২]
এই সাকুকে নিয়ে পরিবারের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং কোনরকম ঝগড়া বাধার পূর্বেই জগদীশবাবু সাকুকে নিয়ে যাদবপুরের কলোনীর বাড়ীতে চলে যান সস্ত্রীক। এই সাকুই হয়ে উঠেছিল তাঁদের আদরের কন্যা সুকুমারী ওরফে উত্তরকালে যিনি সরলা গুহ নামে পরিচিত হয়েছেন। জগদীশবাবু তাঁর আদরের কন্যা সাকুকে নিয়ে বেশ কয়েকটি গল্প ও কবিতা লিখেছেন, লিখেছেন তাঁর 'আলুনী আলু' (১৯৫০) নামক উপন্যাসটিও।

ব্যক্তি মানুষ হিসেবে জগদীশবাবু সহজ সরল আড়ম্বরহীন জীবন যাপনে বিশ্বাসী ছিলেন। কোনোরকম শৌখিনতা বা বিলাসিতা তাঁর স্বভাব বহির্ভূত ছিল। সেইসঙ্গে পোষাক-পরিচ্ছেদ ইত্যাদির ব্যাপারেও তিনি উদাসীনই ছিলেন বলা যায়। আদালত চত্বরে কাজের যে জগৎ তাঁর ছিল সেখানে নানারকম ন্যায়-অন্যায় তিনি প্রত্যক্ষ ক'রে ক'রে জীবনটাকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন— যার প্রমান তাঁর সৃষ্টি ধারায় রয়েছে। আত্মকেন্দ্রিকতার বৃত্তের মধ্যেই তিনি আজীবন কাটিয়েছেন। নিজেকে অনাবশ্যক রূপে প্রকাশ করার তাগিদ কোন

কালেই তিনি অনুভব করেননি। অন্তর্মুখিতা এবং কুণ্ঠা ছিল মানুষটির স্বভাবের বড় বৈশিষ্ট্য। যেজন্য তিনি 'বিচিত্রা' পত্রিকার দপ্তরে গেলেও সংকোচ বশতঃ শেষ পর্যন্ত অচিন্ত্য সেনগুপ্তের সঙ্গে দেখা করেননি। দপ্তরের কর্মী ক্ষিতিশবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলেই একরকম পালিয়ে চলে এসেছিলেন। পরে এই ঘটনার কথা তিনি চিঠিতে অচিন্ত্যবাবুর কাছে জানিয়েও ছিলেন। এই ভাবে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ায় অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ব্যক্তিগত পরিচিতির সূত্রে তাঁদের আড্ডা না হওয়ার জন্য দুঃখ করেছেন। এ সম্পর্কে অচিন্ত্যবাবু তাঁর 'কল্লোল যুগ' বইটির একজায়গায় লিখেছেন— "...একবারও কুণ্ঠার চৌকাঠ পেরিয়ে অন্তঃপুরে না এলে আড্ডা জমাই কী করে? খবর পেলে আমি হয়তো যেতাম কিন্তু সেখানে গিয়ে আড্ডা বসালে সেটা তো আর বিচিত্রা অফিসের আড্ডা হত না।"[৪৩] জগদীশবাবুর এই কুণ্ঠার কথা সাগরময় ঘোষের স্মৃতিচারণাতেও আমরা পাই। সম্পাদকের বৈঠকে বইতে সাগরময় ঘোষ জানিয়েছেন—একবার তিনি জগদীশগুপ্তের কাছে জানতে চেয়েছিলেন অনেক কবি লেখকরাই শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে চান, নানা পরামর্শ আশীর্বাদ নিয়ে আসেন। অথচ অতো কাছে থেকেও জগদীশবাবু শান্তিনিকেতনে যেতেন না কেন। এর বিনীত উত্তর জগদীশ গুপ্ত দিয়েছেন সাগরময় ঘোষকে। সেই উত্তরের দুটি বিচ্ছিন্ন অংশ এরকম—

ক. "প্রতিদিন ভোরে উঠে আমি সূর্য প্রণাম করি। আসলে সে প্রণাম কবিগুরুর উদ্দেশ্যেই। তবে কি জানো, অতবড় একজন মহাপুরুষের কাছে আমার যেতে বড়ই সংকোচন হয়। আমার মুখ দিয়ে তো কথাই বেরুবে না।"[৪৪]

খ. "... আসলে তো আমি লেখকই নই। লেখক হতে গেলে যে নিষ্ঠা, যে সাধনা, যে অনুশীলনের প্রয়োজন আমি তার কিছুই করিনি। তোমার কাছে বলতে লজ্জা নেই, স্রেফ ফোকটে আমি লেখক হয়ে পড়েছি। আমার এই জোচ্চুরিটা পাছে ধরা পড়ে যায় সেই কারণেই কোথাও যেতে আমার এত ভয়।"[৪৫]

—বস্তুতঃ এইসব স্বীকারোক্তি যে তাঁর অতি বিনয়েরই প্রকাশ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আসলে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নির্মোহ ভাবনাই তাঁকে এই প্রকৃতির মানুষ করে তুলেছিল। এই বাগাড়ম্বরহীন বিনয় ও নম্রতা শুধু নিজের ব্যক্তিসত্তা কিংবা লেখক সত্তা সম্পর্কেই নয় নিজের লেখালেখি সম্পর্কেও তিনি কখনোই কোনোরূপ অহংবোধের কথা ভুলেও উচ্চারন করেন নি।

জগদীশ গুপ্তের আপাত শান্ত-সংযতবাক্ রাশভারী স্বভাবের অন্তরালে ফল্গুস্রোতের মতো একটি রসিক ও বন্ধুবৎসল মনও ছিল। বিচ্ছিন্ন দু-একটি ঘটনার মধ্যদিয়ে সেই রসিক চিত্তের পরিচয় ফুটে উঠেছে। একবার 'কালি-কলম' -এর সম্পাদক তথা তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু মুরলীধর বসু কুষ্টিয়ার বাড়ীতে বেড়াতে আসতে চেয়েছিলেন। উত্তরে জগদীশবাবু তাঁর অক্ষমতার কথা অত্যন্ত রসিকতার ছলে ব্যক্ত করে লিখেছিলেন— ''...আমাকে বোধহয় বড় জোর বসিয়া গল্প করিতে হইবে—বেড়াইতে পারিব না।''[৪৬]

এই মুরলী বসুকেই আরেকবার একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন যে বিভিন্ন পত্রিকায় তো তাঁর গল্পটল্প—ছাপা হচ্ছে, কিন্তু বিনিময়ে তিনি কোনো সাম্মানিক পাচ্ছেন না। এই সাম্মানিক বা পরিশ্রমিক কথাটার পরিবর্তে জগদীশবাবু অত্যন্ত মজার ছলে 'দক্ষিণা' শব্দটি লিখে তার পাশে উঁচানো বুড়ো আঙুলের একটি ছবিও এঁকে দিয়েছিলেন। যেন গল্প ছাপাবার পর দক্ষিণা হিসেবে কিছুই না দিয়ে পত্রিকাগুলি তাঁকে 'বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ' দেখাচ্ছে। প্রবল রসবোধ ছাড়া এই কাজ করা সম্ভব নয়। সেইসঙ্গে গোয়েন্দা গল্প রচনাকে কেন্দ্র করে প্রকাশককে পাঠানো 'ছিন্নমস্তা' তাঁর যে ছবির কথা পূর্বে বলা হয়েছে—সেই বর্ণনার মধ্যেও আমরা আপাত নীরস লোকটির মধ্যে একজন নিখুঁত হাস্যরসিককে খুঁজে পাই। আসলে আতিশয্য ও উচ্ছ্বাসহীন, অকপট বক্তব্য তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই ছিল। কোনোরূপ ভান ভণিতা' তিনি করেননি। এপ্রসঙ্গে 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষকে তিনি লেখক হয়ে ওঠার যে গল্প শুনিয়েছেন—সেই কাহিনীকে চারুবালা গুপ্ত নিছক 'ফাজলামী' বলে উল্লেখ করেছেন। শুধুমাত্র লেখক হিসেবেই নয় স্বামী হিসেবেও তাঁর আপাত শান্ত স্বভাবের আড়ালে রয়েছে একজন ভীষণ রসিক মানুষ। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর প্রবল ঝগড়া বলতে যা বোঝায় সেটা কোন কালেই হয়নি। তবে সাংসারিক খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে স্ত্রী রাগ করে থাকলেও জগদীশবাবু তৎক্ষণাৎ সেই 'মানভঞ্জন' করতেন অত্যন্ত মজাচ্ছলে। এবিষয়ে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে চারুবালা দেবী লিখেছেন— ''...এমনিতেই খুব কম কথার মানুষ হলেও আসলে ছিলেন ভীষণ রসিক। আমি কখনও রাগ করলে কানের কাছে বেহালা এনে গ্যাঁ গ্যাঁ করে বাজাতেন। বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে পারতুম না, হেসে ফেলতুম।''[৪৭]

এইসব ঘটনা ছাড়াও 'বিনোদিনী' গল্পগ্রন্থে 'গল্প কেন লিখিলাম' শীর্ষক কৈফিয়ৎ মূলক লেখাটিতে তাঁর লেখক হয়ে ওঠার যে অভিজ্ঞতাটি লিপিবদ্ধ করেছেন সেটা তাঁর হাস্যরসিক

মনেরই পরিচায়ক। তাঁর স্ত্রী যখন অলস মানুষকে দেখতে পারতেন না, তখন সেই আলস্যকে সঙ্গী করেই জগদীশবাবু লেখালেখি শুরু করেছিলেন।

প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস এবং আচার-আচরণ বিষয়ে জগদীশবাবু প্রায় নির্লিপ্তই ছিলেন বলা যায়। তাঁর মধ্যে কোনোরূপ গোঁড়ামী ছিল না। সনাতন হিন্দু-ধর্ম এবং শাস্ত্র প্রথার প্রতি তাঁর এই ভাবনার কথা জানাতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী চারুবালা দেবী জানিয়েছেন— ''কোনোরকম সংস্কার ওর মধ্যে কখনো দেখিনি। এমনকি ঠাকুর দেবতা সম্পর্কেও ওর কোনো বাড়াবাড়ি কখনো দেখিনি।''[৪৮] তবে ব্যক্তিগত জীবনে এই ধর্মাধর্ম বিষয়ে তাঁর উদারতা এবং উদাসীনতা যাই থাক না কেন —তাঁর সৃষ্ট-সাহিত্যগুলির মধ্যে অবগাহন করলে বোঝা যায়—ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ইতিবাচক মোটেই ছিল না, বরং খানিকটা নেতিবাচকই ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন অনেক বিতর্কিত কথা সরাসরি না বলে কমলাকান্ত চক্রবর্তীর মত চরিত্র সৃষ্টি করে তার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, তেমনি জগদীশবাবুর সৃষ্ট এরকম একটি চরিত্র অচ্যুতানন্দ। এই নামটিকে সামনে রেখে জগদীশগুপ্ত বেশ কিছু কবিতা লিখেছিলেন। এইসব কবিতায় তাঁর জীবনদর্শনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। ঈশ্বরে না বিশ্বাস থেকেই এরকম একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন—

''অর্থাৎ যখন নিজের চেষ্টায় হালে পায় না পানি
তখন আমরা রঙ্গভূমে ভগবানে টানি...
কল্পনা তা শুধু—, কল্পনাতেই পাই
নিরালম্ব নিমজ্জমান প্রাণের একটা ঠাঁই।''[৪৯]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন বিধবা বিবাহকে আইন সম্মত করার আপ্রাণ লড়াইয়ে ব্যস্ত সেইসময় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের সূর্যমুখী চরিত্রকে দিয়ে বিদ্যাসাগরকে মুর্খ বলিয়েছেন — একইভাবে জগদীশবাবু তাঁর উপন্যাসের চরিত্র দ্বারাই বাংলাদেশের সমাজে বিবাহ সনাতন হিন্দুধর্মের সম্পর্কে তাঁর ভাবনা চিন্তাকে ব্যক্ত করে দিয়েছেন—

ক. 'দুলালের দোলা' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নীরদবরণ সরকার হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে বলেছিলেন—''... শাস্ত্রে প্রথায় গরমিল, শাস্ত্রে শাস্ত্রে পদে পদে গরমিল, কাজে কথায় গরমিল — চারিদিককার অসংখ্য সেই গরমিলের গোলক ধাঁধার মধ্যে প্রবেশ করিবার অনিচ্ছাতেই আরো দশজনের মত, আমিও হিন্দুর, এমন কি মানুষেরই ধর্মাধর্ম আচার-বিচার বিষয়ে একেবারে নিস্পৃহ।''[৫০] এই উক্তির মধ্যে লেখকের মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে।

জগদীশ গুপ্ত তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি কাটিয়েছেন যাদবপুরের নিকটস্থ রামগড় কলোনীর বাড়ীতেই। স্ত্রী এবং পালিতা কন্যা সুকুমারীকে নিয়ে একরকম কেটে যেত তাঁর দিনগুলি। এই সময় ধীরে ধীরে তাঁর দৃষ্টিশক্তি কমতে শুরু করে। এই অবস্থাতেও তিনি লেখার জন্য কতটা আকুল ছিলেন, সেটা তাঁর স্ত্রীর সাক্ষ্যেই জানা যায়— ‘‘আমরা যখন রামগড়ে বসবাস শুরু করলাম আমার স্বামীর দৃষ্টিশক্তি তখনই বেশ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তবু এরই মধ্যে দিনে রাতে লিখে উনি দুটো উপন্যাস শেষ করেন। ... যখনই সময় পেতেন, তখনই লিখতেন। অবসর সময়ে সন্ধ্যে-টন্ধের দিকে বসে এস্রাজ বাজাতেন।’’[৫১]

আসলে তাঁর শরীর স্বাস্থ্য কোনকালেই বিশেষ ভালো ছিল না। ছেলেবেলায় ঘি অধিক পরিমানে খাওয়ার ফলে লিভারটা যথেষ্ট দুর্বল হয়ে যাওয়ায় লিভারের বিভিন্ন উপসর্গে প্রায়ই ভুগতেন। এছাড়া তাঁর ছিল উচ্চ-রক্তচাপ—যা তাঁকে প্রায়ই যন্ত্রণা দিত। অম্লশূলের ব্যথাও ভোগ করতে হত প্রায়ই। পাটনায় থাকাকালীন আরেকটি নতুন সমস্যা যোগ হয়েছিল—তীব্র মাথাধরা। এসব নিয়ে জরাজীর্ণ মোটর গাড়ির মত চরাই-উৎরাই সমন্বিত জীবন পথ তিনি অনায়াসেই অতিক্রম করেছেন। শেষ বয়সে চোখে ছানি পড়ায় লেখা বা পড়া একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। কাউকে কাছে পেলে তাকে দিয়ে দু-একটা কবিতা লিখিয়ে নিতেন। লেখালেখি করার জন্য ছটফট করতে থাকতেন। আর প্রায়ই আক্ষেপ করে বলতেন, তাঁর লেখাগুলি যদি কেউ তাঁকে পড়ে শোনাত। এত অসহনীয় অবস্থাতেও তিনি ডাক্তার দেখাতে চাইতেন না। চোখের ছানি অপারেশন করানোর কথা বললেও রাজি হননি। লিখতে বা পড়তে না পারার জন্য অবসাদে আক্রান্ত হন। একথার সমর্থন রয়েছে আবুল আহসান চৌধুরীর লেখায়— ‘‘দৃষ্টিক্ষীণতা, শারীরিক অসামর্থ্য ও যোগ্য স্বীকৃতি সম্মানের অভাবে তাঁর লেখক মনে অবসাদ ও ক্লান্তি জমেছিল, লেখার প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলেন।’’[৫২]

এহেন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটি নিজের শরীর সম্পর্কে খুব একটা যত্ন নিতেন না এবং কাউকে বিব্রতও করতেন না। ক্ষীণদৃষ্টির কারণেই একদিন বিছানা থেকে নামবার সময় নিচে পড়ে যান এর ফলে তাঁর হিপ বোন ভেঙ্গে যায়। এই অবস্থায় চিকিৎসার জন্য তাঁকে তাঁর জেঠতুতো ভাইয়ের পরাশর রোডের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়। প্লাস্টার করা অথর্ব দেহটাকে নিয়ে আর নড়াচড়া করতে পারেন না, বুকে দোষ ধরা পড়ে, আক্রান্ত হন নিউমোনিয়ায়। শারীরিক অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। এবং যাবতীয় প্রচেষ্টাকে বিফল প্রমান করে

‘অনুপস্থিত’ মানুষটি নীরবেই চলে যান ১৯৫৭ খ্রীঃ ১৪ই এপ্রিল।

তথ্যসূত্র :

১. জগদীশ গুপ্ত (১৯৮৬—১৯৫৭), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭, পৃ. ৯।

২. বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতা— জগদীশ গুপ্ত, ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বরাণী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩, পৃ. ১০৯।

৩. বেস্ট বুক্‌স্‌, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৯২, গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ১৭।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

৫. বিচিত্র মানুষ ঃ বিচিত্র জীবন, জগদীশ গুপ্ত, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, ২০০০, পৃ. ২০।

৬. জগদীশ গুপ্তর কথাসাহিত্য ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের আলোকে, পৃ. ১৭।

৭. জীবনানন্দ : গোপালচন্দ্র রায়, পারুল, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৩।

৮. কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরী, প্লাটিনাম জুবিলী স্মারক গ্রন্থ ঃ সম্পাদনা আবুল আহসান চৌধুরী, ডিসেম্বর, ১৯৮৫, পৃ. ৫১।

৯. জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী (প্রথম ভাগ), দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশকালের উল্লেখ নেই।

১০. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (চতুর্থ পর্যায়), দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ২৭৪।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

১২. জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী (প্র.ভা), বসুমতী সাহিত্য মন্দির।

১৩. চারুবালা গুপ্ত ঃ জগদীশ গুপ্তের জীবনকথা, ‘সাহিত্য ও সংস্কৃতি’, কার্তিক-পৌষ, ১৩৮০, পৃ. ২৭২।

১৪. সাহিত্য ও সংস্কৃতি, কার্তিক-পৌষ ১৩৮০, চারুবালা গুপ্ত ঃ জগদীশ গুপ্তের জীবন কথা, পৃ. ২৭২।

১৫. জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬—১৯৫৭), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫।

১৭. জগদীশ গুপ্ত, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, ২০০০, পৃ. ২১।

১৮. জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ, পৃ. ১৬০।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮।

২১. প্রাগুক্ত পৃ. ২৭৯।

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

২৪. বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতা : জগদীশগুপ্ত, পৃ. ১১০।

২৫. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, প্রথম ভাগ, পত্রগুচ্ছ, পৃ. ৬০৬।

২৬. জগশীশ গুপ্ত : আবুল আহসান চৌধুরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২৫।

২৭. পত্রগুচ্ছ, পৃ. ৬১৩।

২৮. পত্রগুচ্ছ, ঐ, পৃ. ৬১৪।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ। ৬১৪।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

৩১. পত্রগুচ্ছ, পৃ. ৬১৬।

৩২. জগদীশগুপ্ত, রচনাবলী, পৃ. ৪৩৫।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

৩৪. পত্রগুচ্ছ, পৃ. ৬০৮।

৩৫. চারুবালা দেবীর খাতা থেকে গৃহীত।

৩৬. স্ত্রীর চোখে লেখক জগদীশগুপ্ত, বারোমাস শারদীয়া ৮, অশোক সেন সম্পাদিত, পৃ. ৪৫।

৩৭. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী (প্রথম ভাগ), পৃ. ৪৩৭।

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৮।

৩৯. সাহিত্য ও সংস্কৃতি, পৃ. ২৮০-২৮১।

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯।

৪১. জগদীশ গুপ্তের রচনা ও জগৎ, পৃ. ১৫।

৪২. সাহিত্য ও সংস্কৃতি, পৃ. ২৮১।

৪৩. কল্লোল যুগ, পৃ. ১৪৮।

৪৪. সম্পাদকের বৈঠকে, পৃ. ১৪২।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২।

৪৬. জগদীশ গুপ্ত, পৃ. ২৭।

৪৭. বারোমাস, পৃ. ৪৪।

৪৮. বারোমাস, পৃ. ৪১।

৪৯. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রা. লি., কলকাতা, পৃ. ২০৬।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২।

৫১. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫১৯।

৫২. জগদীশ গুপ্ত, পৃ. ৩৭।

তৃতীয় অধ্যায়
উপন্যাসে বর্ণিত সমাজ ধারায় প্রতিকূল স্রোত

"জগদীশ গুপ্তের অভিজ্ঞতায় ছিল বিংশ শতকের বাঙালি বিত্তহীন সমাজ। দারিদ্র্য, অভাব অনটন তিনি খুব কাছ থেকেই দেখেছেন। আর দেখেছেন দরিদ্র মানুষের মনের গড়ন এবং তিনি ভালো করেই জানতেন যে, গ্রামীণ সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ—যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়, তাদের চিন্তার সিংহভাগ জুড়ে থাকে নষ্টামি, ইতরতা, বিকার, বীভৎসতা এবং পরশ্রীকাতরতা দুষ্টু প্রবৃত্তি। আর সেই মানুষগুলিই জগদীশ গুপ্তের কথাসাহিত্যের মানুষ।"[১]

বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র থেকে স'রে এসেছিলেন জগদীশ গুপ্ত। তিনি পূর্বসূরীদের তথাকথিত সমাজ ভাবনায় একটা নতুন ধারা বইয়ে দিয়েছিলেন। আসলে সমাজ হল একটি বিমূর্ত ধারণা। স্পর্শেন্দ্রিয় বা দর্শনেন্দ্রিয়ের গণ্ডীর ভেতর তাকে পাওয়া যায় না। কেননা এই সমাজের কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যিক অবয়ব নেই। সেদিক থেকে সমাজ একটি অনুভূতির বিষয়। সমাজবদ্ধ মানুষ নিজেদের প্রয়োজনেই একদিন এই সমাজ গড়েছিল। ইংরেজী 'Society' র বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে সমাজ কথাটি প্রচলিত। ল্যাটিন শব্দ 'Socius' থেকে ইংরেজি 'Society' শব্দটির উৎপত্তি। 'Socius' কথার অর্থ হল 'সাহচর্য' বা 'সঙ্গীত্ব'। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে সমাজ হল—সম-অচ্ + ঘঙ্ যোগে সমাজ। বর্ণে বর্ণে মিলনে যেমন সন্ধি হয় তেমনি মানুষে মানুষে একত্রে গমন, একত্রে বসবাসের ফলে গড়ে ওঠে সমাজ। মানুষ হল এই সমাজবদ্ধ জীব। আবির্ভাবের সেই আদিম অবস্থা থেকেই মানুষ হল যূথবদ্ধ। সমাজবদ্ধতার মূল ভিত্তি হল এই যূপবদ্ধতা। ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন রকম কাজকর্মের স্বার্থে এবং আশা আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির প্রয়োজনে মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতার উপর নির্ভর করে থাকে। পারস্পরিক এই নির্ভরশীলতার প্রয়োজনীয়তা থেকেই সমাজবদ্ধ জীবনের সৃষ্টি হয়। তবে মনুষ্যেতর প্রাণীর তুলনায় মানুষের সামাজিক সম্পর্ক হয় অধিকতর জটিল প্রকৃতির। সাদৃশ্য ও সমতার ভিত্তিতে গোষ্ঠীবদ্ধতা এবং বৈসাদৃশ্য বা বিভিন্নতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পারস্পরিক স্বেচ্ছা সম্পর্কের মাধ্যমেই মানুষ সমাজের বুনিয়াদ গড়ে তোলে। এই সামাজিক সম্পর্ক ক্রমশ বিচিত্র ও জটিল আকার ধারণ করে। এই মানুষের মধ্যে আবার বেশীরভাগ মানুষ জন্মগ্রহণ করে, খেয়ে পড়ে বেড়ে ওঠে, আবার বংশবিস্তার করে একদিন

ম'রে যায়। কিছু মানুষ এদের থেকে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। এরা সমাজে বাস করেও নিজের বৃত্তের সঙ্গে সমাজবৃত্তের একটা সংঘাত অনুভব করে নিয়ত। ফলে সেইসব একক মানুষের জীবন হয়ে ওঠে মূল সমাজের গণ্ডীর মধ্যে আবার স্বতন্ত্র একটা গণ্ডীর বেড়াজালে আবদ্ধ। জীবন হয়ে ওঠে—মূল সমাজের গণ্ডীর মধ্যে আবার স্বতন্ত্র একটা গণ্ডীর বেড়াজালে আবদ্ধ। জীবনানন্দ দাশ এইসব মানুষের সম্পর্কে স্পষ্টতই লিখেছেন—

''জন্মিয়াছে যারা এই পৃথিবীতে
সন্তানের মতো হয়ে—
সন্তানের জন্ম দিতে দিতে
যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময়,
কিম্বা আজ সন্তানের জন্ম দিতে হয়
যাহাদের ; ....
— তবু কেন এমন একাকী?
তবু আমি এমন একাকী।''[২]

এইভাবে অনায়াসেই মেরুকরণ হয়ে যায়। পরিবর্তিত সমাজ ভাবনার নিরীখেই সাহিত্যে নিয়ত পরিবর্তনের সুর শোনা যায়। সচেতন শিল্পী -সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে তাঁর সমকালের জীবনের সুরটি অনায়াসেই ধরতে পারেন। বাংলা সাহিত্যে সমকালীন জীবনের এই মেঠো সুরটি প্রথম পাওয়া যায় মধ্যযুগের সূচনায় বড়ুচণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে। তারপর মঙ্গলকাব্যের, বিশেষ করে মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলের দৈবী পরিমণ্ডলের ভেতরেও এই সুরের অনুরণন আমরা পেয়ে যাই। অভয়ামঙ্গলের কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী তো সেই কালে লিখেও ঔপন্যাসিকের মর্যাদা আদায় করে নিয়েছেন। সময়ের বেগে এই ধারাও বেগবতী হয়েছে। ভারতচন্দ্রে এসে একটা স্বতন্ত্র বেগও অনুভূত হয়। এরপর বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসে নিয়ে এসেছিলেন নিজস্ব ঘরানা। বঙ্কিমচন্দ্র হয়ে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসে বাংলাদেশের যে জীবন উঠে এসেছে, তাতে বিচ্ছিন্নভাবে থাকলেও গ্রামীণ জীবন প্রায় অনুপস্থিত। যেটুকুও রয়েছে তার বেশীরভাগটাই রোমান্টিক কল্পনা প্রসূত। কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের ছোটগল্পগুলিতে বাংলাদেশের গ্রাম জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। এমনকি রবীন্দ্র পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে, বিশেষ করে সমাজ সমস্যা মূলক উপন্যাসগুলিতে গ্রাম সমাজ উঠে

এসেছে—তাতেও রয়েছে সেই আদর্শায়িত রূপ। তবে যা কিছু গ্রামীণ জীবন ধারা তার প্রথম পরিচয় আমরা শরৎ উপন্যাসেই পাই। তিনিই প্রথম বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের আভিজাত্যপূর্ণ বাঙালী জীবন ছেড়ে অনাভিজাত্যের স্তরে নেমে এসেছিলেন। এ কথার সমর্থন রয়েছে ড. সরোজমোহন মিত্রের অভিমতে—"শরৎ সাহিত্যের আলোকে সমাজকে অতি নীচু স্তরে এনে পৌঁছে দিয়েছে। ফলে সাহিত্যের বিষয়বস্তু এবং গঠন কৌশলের রূপান্তর দেখা দিল। শরৎচন্দ্রের গল্পের শেষে পাঠক চিত্তে নিছক সুখ বা দুঃখানুভূতি দেখা দেয় না, এক তীব্র বিক্ষোভ জাগে। সমাজ পরিবর্তনের এক স্পৃহা জাগিয়ে তোলে। এই লক্ষ্য নিয়েই গল্প রচনা করেছেন বলে আঙ্গিকগত সীমাবদ্ধতা থাকলেও সামাজিক এবং উদ্দেশ্যগত সিদ্ধি লাভ ঘটেছে।"[৩] উত্তর-শরৎ বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে প্রথম যার রচনায় বাংলাদেশের গ্রাম জীবন একেবারে আঁকাড়া বাস্তব নিয়ে উঠে এসেছে তিনি নিঃসন্দেহে জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭)। পূর্ব প্রচলিত সমস্ত ভাবনাকে পাল্টে দিয়ে জগদীশ গুপ্ত তাঁর উপন্যাস সাহিত্যে গ্রাম বাংলার মানুষকে দেখেছিলেন একেবারে জান্তব বাস্তবতার দৃষ্টিতে। ফলে তাঁর দেখা গ্রামীণ জীবন ছিল একেবারে রক্ত মানুষের জীবন্ত চরিত্র। এই জীবনের দুটি সুস্পষ্ট রূপরেখা লেখক অংকন করেছেন—

- গ্রামীণ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার নির্মোহ উপস্থাপন। এবং
- মানুষের জৈব প্রবৃত্তিকে অমানবীয় স্বরূপে অন্বেষণ করা।

আসলে উপন্যাসের আধারে ভৌগোলিক ভূ-খণ্ডের মানুষগুলির পূর্ণাঙ্গ জীবন তুলে ধরা খুব কষ্টসাধ্য কাজ। জগদীশগুপ্ত তাঁর উপন্যাস সাহিত্যে জীবনের এই রূপ দুটির যথাযথ উপস্থাপন করেছেন। এবং বৈপরীত্য পূর্ণ গ্রাম জীবনের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করেছেন। এই পরিচয়ের যথার্থতা উপলব্ধির জন্য সমকালীন বাংলাদেশের গ্রাম জীবনকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অন্বেষণ করে দেখা দরকার।

বাস্তবিক জগদীশ গুপ্ত জন্মেছিলেন বাংলাদেশের যে গ্রামীণ পরিবেশে, তার অতীত শিকড় বহুদূর পর্যন্ত প্রোথিত ছিল। এয়োদশ শতকের সূচনা থেকে বিংশ শতকের প্রায় প্রথমার্ধ পর্যন্ত দীর্ঘ সাড়ে সাতশ বছরের বিদেশী শাসনে বাঙালী জাতির মেরুদণ্ডটাই ভেঙ্গে গিয়েছিল। তারও অনেককাল আগে আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ জয়ের ইচ্ছা করেছিলেন, তখন মগধের সান্নিধ্য পর্যন্ত এসে ফিরে গিয়েছিলেন। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন সেই ইতিহাস বিবৃত করতে

গিয়ে জানিয়েছেন—''তাঁহার (আলেকজাণ্ডারের) সৈন্যেরা মগধাধিপতের সৈন্য সংখ্যা ও বীরত্ব প্রভৃতির যে সংবাদ পাইয়াছিল, তাহাতে তাহারা আর এক পাও অগ্রসর হইবে না, এরূপ সঙ্কল্প করিয়া বসিল। আলেকজাণ্ডারকে ঘোরতর অনিচ্ছার সহিত ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল।''[৪]

অতীতের সেই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের প্রথম ছেদ পড়ে এয়োদশ শতকের সূচনাতেই বখ্‌তিয়ার খলজির নেতৃত্বে তুর্কী আক্রমণ এবং সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে রাজা লক্ষ্মণসেনের ভীরু কাপুরুষের মত সিংহাসন ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া বর্ণিত হয়েছে। সতেরজন অশ্বারোহী নিয়ে বঙ্গ বিজয়ের এই কাহিনী বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম প্রশ্ন তুলেছিলেন। বঙ্কিম তাঁর 'মৃণালিনী' (১৮৬৯) উপন্যাসে এই বিজয়ের কাহিনী বর্ণনা করেছেন ঐতিহাসিক মিনহাজ উদ্দীনের বিবৃতি অনুসরণ করে। কিন্তু তিনি এই কাহিনী বিশ্বাস করেননি। সে জন্য সমগ্র হিন্দু জাতির কলঙ্ক মোচনের জন্য এই উপন্যাসে ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণ করে দেখাতে চেয়েছেন, এই পরাজয়ের অন্তরালে সক্রিয় ছিল লক্ষ্মণসেনের প্রধান অমাত্য পশুপতির হীন ষড়যন্ত্র। এই অভাবনীয় পরাজয়ের পেছনে পশুপতির মত দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতা একেবারে অকল্পনীয় বা অসম্ভব নয়। এই সূত্রেই তিনি বাঙালীর দুর্বলতারও কারণ নির্ণয় ক'রে তার মূলান্বেষণ করেছেন। তবে বঙ্কিমের বিশ্বাস-অবিশ্বাস যাই থাক না কেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ এটাই আমাদের ইতিহাস। মেনে নিতে হয়েছে। এরপর দীর্ঘ সময় মুসলমানি শাসন বজায় ছিল। বাঙালীর দাস বৃত্তিও চলেছে দীর্ঘ পথ পরিক্রমার মধ্যদিয়ে। তুর্কী আক্রমণের ইতিহাসগত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক যাই থাক না কেন, এই বিজয় অভিযান এদেশে কেবলমাত্র একটি বৈদেশিক আক্রমণের ঘটনামাত্র ছিল না। তাদের ভারতে আসার ফলে এদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ঘটে। সেদিক থেকে এই আক্রমণ শুধু বিজয় অভিযান ছিল না; একে বিপ্লবও বলা যায়। এই বিজয় সম্পর্কে অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাইতি লিখেছেন— ''... তুর্কী বিজয়ের পর ভারতে পুনরায় কেন্দ্রীয় শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। তুর্কী সুলতানের সিংহাসন ছিল এই কেন্দ্রীয় ক্ষমতার আধার। একে কেন্দ্র করে ভারতে পুনরায় রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ঐক্য ফিরে আসে।''[৫]

বস্তুত এই তুর্কী আক্রমণের প্রচণ্ড আঘাতে বাঙালীর জীবন নানা দিক থেকে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। হোসেন শাহের রাজত্বকালে ধীরে ধীরে সমাজ জীবনে শান্তি ফিরে আসে।

ইতোপূর্বে দেশে কৌলিন্য প্রথা বর্ণভেদ আর জাতিভেদ খুব কঠোর ভাবে বাংলাদেশের সমাজ দেহে স্থায়ী ব্যাধির আকার নিয়েছিল। সমাজের তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হৃদয়ের কোনো সংযোগ ছিল না। চর্যাপদের ৩৩ সংখ্যক পদে ফুটে উঠেছে সেই অবক্ষয়িত বিচ্ছিন্ন সমাজচিত্র। যেখানে আমরা দেখি নিম্নবর্ণের মানুষগুলির ঠাঁই হয়েছিল মূল গ্রাম সমাজের বাইরে।

''টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।''[৬]

শুধু তাই নয় উচ্চশ্রেণীর মানুষরা সব সময়ই শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী শ্রেণীর মানুষদের অবজ্ঞার চোখে দেখত। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা তখন দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। সেই অবক্ষয়ের কালবেলায় দাঁড়িয়ে উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের চৈতন্যোদয় হয়। তারা হিন্দু জাতি, হিন্দু ধর্ম আর সংস্কৃতিকে ইসলামের আগ্রাসন থেকে বাঁচাতে তৎপর হয়ে ওঠে এবং নিম্নবর্ণের সঙ্গে ভেদাভেদ ভুলে মিলিত হবার জন্য সবকিছু বিসর্জন দিয়ে এগিয়ে আসে। উচ্চ-নীচ শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে একত্র মিলিত হয়ে সবাই এক অখণ্ড বাঙালী জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ পেল। ইসলাম ধর্মের প্লাবনকে ঠেকাতে গিয়ে সকলে মিলে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। হিন্দু সংস্কৃতির বড়ো আশ্রয় রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবত ইত্যাদি পৌরাণিক গ্রন্থাদি বাংলায় অনুবাদ করে আপামর জনসাধারণের হাতে তুলে দিতে সমাজপতিরা প্রয়াসী হয়েছিলেন।

তুর্কি আক্রমণ পরবর্তীকালে দুই স্বতন্ত্র সত্যতা সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির মনোভাব থেকেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃতির সেতুবন্ধ রূপে সত্যপীরের পূজা ইত্যাদির প্রচলন হয়। এই অধ্যায়টি পরবর্তী সময়ের পট পরিবর্তনের ধারা বইতে থাকে দীর্ঘ দুশো বছর ব্যাপী। মাঝে দিল্লীর সুলতানী শাসন থেকে শুরু করে হোসেন শাহের এবং তার পরে তাঁর পুত্র নুসরৎ শাহের শাসনে বাংলায় সমাজ ও সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে। এবং আবির্ভূত হন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩)। চৈতন্য রেনেসাঁর পথে বাংলাদেশে একটি নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল। এরপর ১৫২৬ খ্রীঃ পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের জয় লাভের মধ্যদিয়ে এদেশে মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠা ঘটে।

মুঘল সম্রাট বাবর থেকে আকবর হয়ে মূলতঃ ঔরংজেব পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশের

সমাজ ও সভ্যতায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিল। এই পরিবর্তনের ধারা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ বলেছেন যে, একমাত্র ব্রিটিশ শাসনে বাংলার আধুনিকীকরণ ছাড়া এরকম গভীর পরিবর্তন আর দেখা যায়নি। বস্তুতঃ এই সময়ের আগে বাংলাদেশ অবশিষ্ট ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন সুলতানির অধিনস্থ ছিল। মুঘল যুগে এসেই সেই বিচ্ছিন্নতা দূর হয়ে এদেশের সমাজ জীবন সমগ্র ভারতভূমির মূল স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়। সম্রাট আকবরের শাসনকাল থেকেই বাংলার সমাজজীবনে এই পটপরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশ শাসনের জন্য বিভিন্ন সরকারী পদে দিল্লী থেকে বিশিষ্ট মুসলিম আমলারা এসেছিলেন। তাঁদের শাসনের মধ্যদিয়ে বাংলার সমাজ-সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন অধ্যায় সূচিত হয়ে যায়। এই মুঘল আমলে সারাদেশের সমান্তরালভাবে বাংলার অর্থনীতিও মূলত তিনটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়েছিল কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য। আবুল ফজলের ‘আইন-ই-আকবরী’ গ্রন্থ সূত্রে জানা যায় বাংলার প্রধান কৃষিজ ফসল ছিল ধান। এই ধান থেকে জাত চাল দেশের অন্যান্য স্থানে রপ্তানি পর্যন্ত করা হত। বঙ্গভূমির কোনো কোনো অঞ্চলের কৃষিকাজ এত উন্নত ছিল যে সেখানের অধিকাংশ জমি ছিল তিন ফসলী। সেই সঙ্গে ধান ছাড়াও আখ, নারকেল, আম, পাট, তামাক, সরষে, নীল ও সুপারি ইত্যাদি উৎপাদিত হত। অন্যান্য সম্প্রদায়ের পাশাপাশি ব্রাহ্মণরাও এই কৃষিকাজের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর ‘অভয়ামঙ্গল’ কাব্যসূত্রে এবিষয়ে বিস্তৃত জানা যায়। প্রসঙ্গত কবির পূর্বপুরুষদেরই জীবিকা ছিল কৃষিকাজ করা।

সম্রাট আকবরের শাসনাধীনে বাংলাদেশের সমাজজীবনের সংস্কার শুরু হলেও তা ব্যাপকতা লাভ করে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমল থেকেই। এই সময়ের বাংলাদশে বস্ত্র ও রেশম শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়। এখানকার উৎপাদিত বস্ত্র এদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও বাংলার প্রায় ঘরে ঘরে উৎপন্ন সরবতী, মলমল, নয়ন সুখ, তঞ্জীব প্রভৃতি সৌখিন শাড়ি বিদেশেও রপ্তানি হত। বাংলার বণিকেরা সেসব জাহাজে এবং বড়ো বড়ো ডিঙ্গায় বোঝাই করে সমুদ্রপথে বিদেশে বাণিজ্য করতে যেত। মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত, বিশেষ করে মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগর ও চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি সওদাগরের ‘সপ্তডিঙা মধুকর’ ভাসিয়ে বাণিজ্যে যাবার বিবরণ পাওয়া যায়। এই বাণিজ্য সূত্রেই বাংলায় ইউরোপীয় বণিক জাতিগুলি মূলতঃ জাহাঙ্গীরের সময় থেকেই বাংলায় আসতে শুরু করেছিল। এই বাণিজ্যের ফসল

হিসেবে ইউরোপীয় বণিকরা ছাড়াও মুঘল রাজ-কর্মচারীরা বাংলার উদ্বৃত্ত অর্থ নিয়ে যেতে শুরু করেছিল। সেইসঙ্গে দিল্লীতে নিয়মিত মোটা অঙ্কের রাজস্ব পাঠাতে হত। এই সংক্রান্ত দু'একটি তথ্য দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে—

- বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খাঁ ২২ বছরে ব্যক্তিগত ভাবে ৩৮ কোটি টাকা নিয়ে চলে গিয়েছিল।
- সুবেদার আজিম উস্-শান ৮ কোটি টাকা নেন।
- মুর্শিদকুলি খাঁ বছরে রাজস্ব বাবদ ১ কোটি টাকা দিল্লীতে পাঠাতেন।
- সুজাউদ্দিন খান বছরে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা পাঠাতেন।

এরকম ভাবে বাংলার অর্থ অবিরাম চলে যাবার ফলে এখানকার মানুষের দুর্দশা বাড়ে। তবে অর্থের একটা বড় অংশ বণিক ও শাসক শ্রেণীর হাতে জমা হয়ে এই বাংলায় এক ধনী ও বিলাসী শ্রেণীর উদ্ভবও হয়েছিল। ফলে মূল্য দিতে হয়েছে মূলতঃ সাধারণ মানুষকে। তাদের উপর জোর জুলুম করে স্থানীয় শাসক অর্থ আদায় করত। খাজনা দিতে না পারলে প্রজাদের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি, স্ত্রী কন্যা পুত্র ইত্যাদিও নিলাম করে দেওয়া হত। এই দুর্দিনের পরিচয় আছে মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে—

''সরকার হইলা কাল খিলভূমি লিখে লাল
বিনি উবগারে খায় ধুতি।
পোতদার হইল যম টাকায় আড়াই আনি কম
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি।
ডিহিদার আবুদ খোজ টাকা দিলে নাগ্রি রোজ
ধান্য গোরু কেহ নাগ্রি কেনে।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইলা বন্দী
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে।''[৭]

পাশাপাশি সাধারণের দুর্বিসহ জীবনেরও পরিচয় কবি দিয়েছেন তাঁর আত্মজীবনের বিবরণের মধ্যেও—

- ''উইচারা খাই আমি নামেতে ভালুক।
  নেউগি চৌধুরী হই না করি তালুক।।''[৮]

■ " তৈলবিনা করি স্নান কেবল উদক পান
শিশু কান্দে ওদনের তরে।
আশ্রয়ি পুখুর আড়া নৈবেদ্য শালুক নাড়া
পূজা কৈল কুমুদ প্রসূনে।"[৯]

কিংবা ফুল্লরার বারমাস্যার মধ্যেও আছে সেই দৈন্যতার দারিদ্র যন্ত্রণার কথা।

■ "দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান
আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।"[১০]

অথবা,

■ "পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠমাস পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস
বেঙচের ফল খাইআ করি উপবাস।"[১১]

বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার এই অসম বন্টনের মধ্যদিয়ে শুধু অবক্ষয়িত সমাজের চিত্রই নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতায়তনের ক্ষেত্রটিরও পরিবর্তন ঘটে। এই বাণিজ্যের হাত ধরেই ইংরেজদের বাণিজ্য কেন্দ্র কলকাতা নগরের দ্রুত উন্নতি, এবং সেই সঙ্গে ফরাসী বাণিজ্যকেন্দ্র চন্দননগর, ডাচ বাণিজ্য ঘাঁটি চুঁচুড়ার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়ে মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছিল। মুঘলযুগে শিল্প বাণিজ্য আর কৃষির প্রভূত উন্নতির ফলে কেবল বাংলার সমাজদেহেই পরিবর্তনের ঢেউ লাগেনি, সমাজের আরেকটি অংশ হিসেবে মানুষের ধর্মীয় ভাবনার জগতেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই মুঘল আমলেই এদেশে ১৪৮৩-১৫৩৩ খ্রীঃ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়কালে আবিভূত হয়েছিলেন এক যুগাবতার—তিনি চৈতন্য মহাপ্রভু। তিনি তাঁর ভক্তি ধর্ম প্রচার করে ১৫৩৩ খ্রীঃ মারা যান। চৈতন্যদেব তাঁর ধর্মীয় ভাবনাকে স্থায়ীত্ব দেবার প্রয়াসে কোন সংগঠন বা সম্প্রদায় গড়ে যাননি। সেই কাজটি করেছিলেন পরে নিত্যানন্দ প্রভু। বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামী শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব গোস্বামী, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট এবং গোপাল ভট্ট মিলে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মের ভাবধারা পৌঁছে দিতে থাকেন। এই সময়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাইতির কথায়— "... বৈষ্ণবধর্মের সরল অনাড়ম্বর ভক্তিবাদ, বাংলার জনসাধারণের ধর্মে পরিণত হয়। বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে পশুবলি কারণবারি পান বা সুরাপান প্রভৃতি প্রথা থেকে লোকে বহুল পরিমাণে মুক্ত হয়। সাধারণ লোকের মধ্যে নৈতিক

মান বাড়ে। জাতিভেদ প্রথার তীব্রতা কমে। সমাজের নিম্নবর্ণের অশিক্ষিত, অবহেলিত শ্রেণীগুলি বৈষ্ণব ধর্ম থেকে সামাজিক মুক্তির আস্বাদ পায়।"[১২] এইভাবে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার বাংলার হিন্দু সমাজে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। বৈষ্ণব ধর্ম তার শ্রেষ্ঠত্বের গুণে বাংলা সীমানা ছাড়িয়ে আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরায় প্রবেশ করে। ফলে এই ধর্মের বিস্তৃতি হয় উড়িষ্যা থেকে আসাম পর্যন্ত। কিন্তু মহাকাল বড়ো নিষ্ঠুর। কালোর ধর্ম মেনেই বৈষ্ণবীয় ভাব জগতেও মালিন্য প্রবেশ করতে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের সমাজ পুনঃরায় পানা পুকুরে ভ'রে যায়, মজে যায়।

বৈষ্ণবধর্মের সমান্তরালে বাংলাদেশে রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম তার দাঁত নখ বার করে আপন অস্তিত্বের পরিচয় দিয়েছে। এই ধর্মের বর্ণ ভেদাশ্রমের নিরীখে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের সঙ্গে কায়স্থ ও বৈদ্যরা কর্তৃত্ব করত। এদের মধ্যে কৌলিন্য প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। এই প্রথার সুযোগ নিয়ে বর্ণ কুলীনেরা ইচ্ছেমত বিয়ে করত। আট-দশ বছরের মেয়েদের 'গৌরীদানে'র নামে বাল্যবিবাহ দিতে হত। কুলীন বৃদ্ধ স্বামীর অনিবার্য মৃত্যুর পরেই নেমে আসত 'সহমরণের' অভিশাপ। শিক্ষার আলো থেকে মেয়েদের অনেক দূরে রাখা হত। একটা সময়ের পর 'সহমরণ' বিলোপ হয়ে যায়। এবং বিধবাদের বেঁচে থেকে জীবন যন্ত্রণার পরিক্রমণ শুরু হয়ে যেত। অভিশপ্ত জীবন নিয়ে বিধবারা পূজার্চনা, পাঁচালী পাঠ কথকথা আর ন্যায়শাস্ত্র নীতিশাস্ত্র নিয়ে জীবনের বাকী দিনগুলো অতিবাহিত করতে হত।

১৭৫৭ সালে বাংলার ভাগ্যাকাশে পট-পবির্তন ঘটে যায়। 'বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড রূপে' দেখা দিলে আপামর বঙ্গবাসীর জীবন থেকে স্বাধীনতা সূর্য ডুবে যায়। শুরু হয় পরাধীনতার যন্ত্রণা ভোগ করবার নিরন্তন লড়াই। এই পরাধীনতার পঙ্কে নিমজ্জনের জন্যে কেবল মীরজাফরকেই দায়ী করা যায় কি? সে-ও সমাজ ইতিহাসের এক করুণ অলিখিত ইতিহাস। ১৭৬৪ সালে মীরকাশিম শেষ চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হলে রবার্ট ক্লাইভের হাতে বঙ্গবাসীর ভাগ্য নির্ধারণের পুরো ক্ষমতা বর্তায়। এবং ১৭৬৫ সালে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের মধ্যদিয়ে 'ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর'। তবে স্বাধীনতা সূর্য ডুবে গেলেও ব্রিটিশ শাসনাধীনে বঙ্গবাসীর মরচে পড়া চেতনার দুয়ারে কড়াঘাত লাগল খুব সজোরে। ৩৪৫ বছরের অর্গল ভেঙে ফাটল ধরল অচলায়তনে, মধ্যযুগীয় বাঙালীর মানসিকতায়। স্বপন বসু প্রসঙ্গত লিখেছেন—"অচলায়তনে ফাটল ধরল, অচলায়তনের নাম মধ্যযুগীয়

বাঙালি সমাজ। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের স্থিতিশীল, মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, নিজস্ব এক সাংস্কৃতিক জগতের অধিবাসী গ্রামীণ বাঙালি হিন্দু সমাজের কাছে বাইরের বৃহত্তর জগতের পরিচয় ছিল অনেকটাই অজানা। আর তাই প্রথা জীর্ণ, অবসাদগ্রস্ত, বহু প্রকার বিধি-নিষেধ ও সংস্কারে আচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় বাঙালি সমাজ অচলায়তনেরই আর এক নাম।"[১৩]

ইংরেজ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষমতায়নের পর বাংলাদেশের সমাজ ও বাঙালীর চেতনার অচলায়তন শুধু ভাঙল তা নয়, একটা নতুন ভোরের আলোর উত্তেজনায় বাঙালীর নবজন্ম ঘটে গেল বলা যায়। দেওয়ানী লাভ পরবর্তী ব্রিটিশ শাসিত বাংলার বুকে ঘটে গেল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। এতোকালের অর্থনীতির বুনিয়াদ ভেঙে গিয়ে বাঙালী সমাজে কেবল অগণিত মানুষের মৃত্যু হল এমন নয়, বাংলার প্রাচীন অভিজাত যে বংশ ছিল তারাও নিমূল হয়ে গেল। নবজাগরণের সেই পরমলগ্নে ইংরেজদের স্তাবকতাকারী একশ্রেণীর ভুঁইফোড় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হল। এতদিন বাঙালীর পরিচয় ছিল বংশ কৌলিন্য—যে কৌলিন্যের কথা বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা উল্লেখ করেছেন—

"কুল মরিয়াদ কপাট উদঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠকি বাধা।"[১৪]

কিংবা চণ্ডীমঙ্গলে ভাড়ুদত্ত 'মহামণ্ডলে'র পদপ্রাপ্তির যোগ্যতা হিসেবে উল্লেখ করেছিল আপন বংশ গৌরবের কথা—

"ঘোষ বউষের কন্যা দুই নারী মোর ধন্যা
মিত্রে কৈল কন্যা বিতরণ।
গঙ্গার দুকূল কাছে জতেক কায়েস্ত আছে
মোর ঘরে করয়ে ভোজন।"[১৫]

এই বংশ মর্যাদার নিরীখে সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গেল। শুরু হল আর্থিক কৌলিন্যের মাপকাঠি—যা এই একবিংশ শতাব্দীতেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। রাতারাতি অর্থলাভ আর কাজ চালানো গোছের ইংরেজী শিখে এইসব ছিন্নমূল বাঙালী নিজেদের অতীতের সমস্ত শিকড় ভুলে গেল। ডিরোজিওর নব্যবঙ্গ ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত তরুণদের মতো এইসব বিত্তকুলীন বংশ মর্যাদা শূন্য হঠাৎ নবাবদের রুচিবোধ ছিল অত্যন্ত স্থূল। তারা বাঈজি নাচ দেখতেন, ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে মদ-মাংস খেয়ে লাম্পট্য করতেন, ছেলেমেয়েদের বিয়ে কিংবা

বাবা-মায়ের শ্রাদ্ধে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে খরচ করতেন। ঘটা করে বাঁদরের বিয়ে দিতেন। দুর্গোৎসবের সময় সাহেবদের নিমন্ত্রণ করে মদ-মাংস খাওয়াতেন। মিথ্যা, বলে, ঘুষ দিয়ে কিংবা খেয়ে জাল-জুয়াচুরি করে অর্থ উপার্জনের দ্বারা সমাজের একজন হয়ে উঠতেন। একইভাবে হিন্দু কলেজে পড়া তরুণ তুর্কীর দল এতকালের সংস্কারকে ভাঙ্গার খেলায় মেতে উঠেছিল। এবিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন—

‘‘...তাহারা রাজপথে যাইবার সময়, মুণ্ডিত মস্তক ফোঁটাধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিলেই তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিবার জন্য ‘আমরা গরু খাইগো আমরা গরু খাইগো’ বলিয়া চীৎকার করিত। কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় ভবনে ছাদের উপর উঠিয়া প্রতিবেশীগণকে ডাকিয়া বলিত, ‘এই দেখ মুসলমানের জল মুখে দিতেছি’ এই বলিয়া পিতা, পিতৃব্য প্রভৃতির তামাক খাইবার টিকা মুখে দিত।’’[১৬]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এইভাবে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের কারণে বঙ্গসন্তানেরা রক্ষণশীল—প্রগতিবাদী এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সহমরণ বাল্যবিবাহ, কৌলিন্যপ্রথা থেকে শুরু করে বিধবা বিবাহ, নারী শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি দিয়েছে। রাধাকান্তদেব বাহাদুর থেকে রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ নানা দলে-উপদলে ভাগ হয়ে গেলেন। ১৮২৮ খ্রীঃ এদেশে নতুন শাসক হয়ে এলেন উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক। ইংলণ্ডে থাকাকালীন সময়েই তিনি সতীদাহ প্রথা বিষয়ে অবহিত হয়েছিলেন। শাসনভার নিয়েই পরের বছর সতীদাহ প্রথা আইন করে বন্ধ করে দিলেন। রাজা রামমোহন ছিলেন এবিষয়ে তাঁর সবচেয়ে বড় সমর্থক; দেশব্যাপী নানারকম প্রতিক্রিয়া হল। একজন খ্রীষ্টান শাসকের নেতৃত্বে এভাবে সতীদাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রক্ষণশীল হিন্দুরা সনাতন ধর্ম লোপের আশংকা করতে লাগলেন। পত্র-পত্রিকা মারফত নানা বিতর্ক হলেও শেষ পর্যন্ত মধ্যযুগীয় ধারণাকে ভেঙ্গে বাঙালী নিজেদের জীবন থেকে সতীদাহ প্রথাকে বর্জন করতে পেরেছিল। এরপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যোগে নারী শিক্ষা আর বিধবা বিবাহ আইন প্রনয়ণের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। যথারীতি বিরুদ্ধ পক্ষ গড়ে ওঠে। সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বরগুপ্তের মতো সেদিনের কলকাতার প্রথম সারির নাগরিকরা নারী শিক্ষার বিরোধিতায় নামেন। গুপ্ত কবি এই নিয়ে ব্যঙ্গ করে তাঁর কবিতায় লিখলেন—

"আগে মেয়ে গুলো, ছিল ভালো,
ব্রত ধর্ম্ম কোর্তো সবে।
একা 'বেথুন' এসে, শেষ কোরেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে?
যত ছুঁড়ী গুলো, তুড়ী মেরে
কেতাব হাতে নিজে যবে।
তখন 'এ.বি.' শিখে বিবি সেজে
বিলাতী বোল কবেই কবে।"[১৭]

বিধবা বিবাহের ক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রক্ষণশীল ভাবনা থেকে অত্যন্ত কৌশলে বিদ্যাসাগরকে 'মূর্খ' বলে অভিযুক্ত করেছিলেন। তিনি তাঁর 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের নায়িকা সূর্যমুখীকে দিয়ে কমলমণির কাছে চিঠি লিখিয়ে ছিলেন—

"ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবা বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?"[১৮]

রক্ষণশীল এই মানসিকতা ঈশ্বরগুপ্তেরও ছিল। তিনিও বিদ্যাসাগরের বিবাহ বিবাহের উদ্যোগকে সমর্থন জানাতে পারেন নি। বরং তীব্র আক্রমণ করে তাঁর কবিতায় লিখেছিলেন—

"অগাধ বিদ্যার বিদ্যাসাগর
তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা।
তাতে বিধবাদের 'কুলতরী'
অকূলেতে কুল পেলে না।
কূলের তরী থাকলে কুলে,
কুলের ভাবনা আর থাকে না।।
সে যে অকূল-সাগর, দারুণ-ডাগর,
কালাপানি বড় লোনা।
যখন সাগরে ঢেউ উঠেছিলো,
তখনি গিয়েছে জানা।।"[১৯]

যাবতীয় প্রতিকূলতা কাটিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিচার করে দেখিয়েছিলেন বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত। এবিষয়ে তিনি তাঁর 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' পুস্তিকাটির একেবারে শেষে জানিয়েছেন—দুর্ভাগ্য ক্রমে যারা বাল্যকালে বিধবা হয়ে থাকে, তাদের সারাজীবনই এই বৈধব্যের অসহায় যন্ত্রণা ভোগ করে, সেটা যাদের মেয়ে, বোন পুত্রবধূ প্রমুখ অল্প বয়সী বিধবা আছে তাঁরা খুব ভালো করেই জানে; অনেক অনেক বিধবা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে ভ্রূণহত্যার মতো পাপ কাজে লিপ্ত হচ্ছে। এবং তারা স্বামী, শ্বশুর এবং মাতৃকুল কলঙ্কিত করছে। তাই বিধবা বিবাহ নিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুক্তি ছিল—''বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা, ব্যাভিচারদোষ ও ভ্রূণহত্যা পাপের নিবারণ ও তিনকুলের কলঙ্ক নিরাকরণ হইতে পারে। যাবৎ এই শুভকরী প্রথা প্রচলিত না হইবেক, তাবৎ ব্যাভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত, কলঙ্কের প্রবাহ ও বৈধব্য যন্ত্রণার অনল উত্তরোত্তর প্রবল হইতেই থাকিবে।"[২০] বাস্তববাদী বিদ্যাসাগর মহাশয় বুঝেছিলেন বিধবা বিবাহকে কাগজ কলমে শাস্ত্র সম্মত প্রমাণ করা সম্ভব হলেও, সমাজ ও রাষ্ট্রের সমর্থন ছাড়া একে কার্যকর করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সেই অনুযায়ী তিনি যাবতীয় প্রক্রিয়া চালিয়ে যান এবং ২৬ শে জুলাই ১৮৫৬ খ্রীঃ বিধবা বিবাহ আইন সম্মত হয়। কিন্তু আইন প্রণীত হলেও সমাজের মাটিতে দীর্ঘকাল ধরে প্রোথিত সংস্কারকে সহজে মূলোচ্ছেদ করা সম্ভব হয়নি। তবে এই আইন প্রণয়ন বাংলাদেশের সমাজ সাহিত্যে এক যুগান্তকারী ঘটনা। একবিংশ শতাব্দীর এই প্রান্তে দাঁড়িয়েও সকল বিধবার বিবাহ সমাজ মেনে নিতে পারে না। তবুও এই ঘটনা বাংলা উপন্যাসের ধারাকে একটা বিশেষ বাঁকে পৌঁছে দিয়েছিল। সতীদাহ প্রথা রদ থেকে বিধবা বিবাহ (১৮২৯-১৮৫৬), সেইসঙ্গে বাল্যবিবাহ রদ, কৌলিন্য প্রথার বিলোপের আন্তরিক প্রয়াস আর নারী শিক্ষার পরিসর রচিত হতেই বাংলা উপন্যাসের বিশেষ করে সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে আমরা প্রথম সার্থক বাংলা উপন্যাস পেলেও প্রাক্-বঙ্কিম স্তরেই তার পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছিল। বিশেষ করে সামাজিক প্রেক্ষাপটে লেখা হ্যানা ক্যাথারিন মুলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২), প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), লাল বিহারী দে'র লেখা 'চন্দ্রমুখীর উপখ্যান' (১৮৫৯) প্রভৃতি রচনায় সমাজজীবনের চিত্র বিক্ষিপ্তভাবে হলেও ফুটে উঠেছে। মূলতঃ খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও মুলেন্সের রচনাটিতে সমাজের একটা চিত্র পরিস্ফুট

হয়েছে। দুটি বাঙালী খ্রীষ্টান পরিবারের মধ্যে ফুলমণির পরিবার ধর্ম মেনে চলে বলে তারা শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করে। আর করুণার পরিবার ধর্ম না মানার ফলে তাদের জীবনে নেমে এসেছে ট্রাজেডির ঘোর অন্ধকার। রচনাটি সম্পর্কে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—" 'ফুলমণি ও করুণা' গ্রন্থটির প্রধান কৃতিত্ব হইল যে, ইহা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের খিড়কি দরজা দিয়া উপন্যাসের উচ্চমঞ্চে প্রবেশ করে নাই। ইহা সর্বপ্রথম জীবনের গভীর সমস্যা, পারিবারিক জীবনের সুখ শান্তি, জীবনের সুমিত নীতি নিয়ন্ত্রণ, দুষ্প্রবৃত্তির উন্মুলন প্রভৃতি অবলম্বনে রচিত কাহিনী।"[২১] অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকের কলকাতা ও শহরতলীর চিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ অঙ্কিত হয়েছে। কুশিক্ষা ও সৎসঙ্গের অভাবে মানুষের অধঃপতন এবং যথোচিত শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের ফলে সেই অধঃপতন থেকে মুক্তি—মতিলাল চরিত্রটির বিবর্তনের মধ্যদিয়ে লেখক এটাই তুলে ধরেছেন। সেসময় বাবু রামবাবুর মতো আলালরা নানাভাবে অপরিমিত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে বাবুগিরিতে যে গা ভাসিয়েছে এবং তাদের নৈতিকতা ও মনুষ্যত্ব যে ছিল না সেটা লেখক যথাযথভাবে বিবৃত করেছেন। বাবুরামের জীবন যাত্রার অপরিহার্য অঙ্গরূপে ধনীর প্রসাদলোভী ব্রাহ্মণ পুরোহিতের চিত্রও লেখক অংকন করেছেন। প্রচলিত সংস্কার প্রথা, অনুষ্ঠানের অনুরাগী বাবু রামবাবু কৌলীন্য প্রথার সমর্থক ছিলেন। লেখকের খানিকটা বর্ণনা এরকম—"বাবুরামবাবু বলরাম ঠাকুরের সন্তান, এজন্য জাতি-রক্ষার্থে কন্যাদ্বয় জন্মিবামাত্র বিস্তর ব্যয় ভূষণ করিয়া তাহাদের বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু জামাতারা কুলীন, অনেক স্থানে দার পরিগ্রহ করিয়াছিল—বিশেষ পারিতোষক না পাইলে বৈদ্যবাটীতে উঁকি মারিত না।"[২২] কলকাতার বাবু সমাজের ব্যাভিচারের দলিল এই গ্রন্থ। লাল বিহারী দে সম্পাদিত 'সম্বাদ অরুণোদয়' নামক পাক্ষিক পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাটি পরে লালবিহারী দে'র লেখা 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' (১৮৫৯) হিসেবে প্রমাণ করেছেন অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য। চন্দ্রপুর গ্রামের মেয়ে চন্দ্রমুখীর বেড়ে ওঠা, তার পড়াশুনা করা শত বিরোধিতার মধ্যেও, তারপর হেমচন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ, ধীরে ধীরে হেমচন্দ্রের 'বাবু' হয়ে ওঠা; শেযে কুসঙ্গে পড়ে তার অধঃপতিত হওয়ার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে গ্রন্থটিতে। উনিশ শতকের বাঙালী জীবন ও মননের পরিচয় আছে এই রচনায়। 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর মতিলাল বাবু সমাজের প্রতিনিধি কিন্তু এই রচনার হেমচন্দ্র ধনীর দুলাল নয়; পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিঘাতে পরিবর্তিত জীবনবোধের একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত তার মধ্যে ছিল। প্রাক্-বঙ্কিমপর্বের

এই রচনাগুলি বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। এই দিকটির ওপর আলোকপাত করে ড. বেলা দাস লিখেছেন—"... বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ'-এর নগেন্দ্রনাথ, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' -এর গোবিন্দলাল চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে দেখিয়েছেন সুশীল ও সৎ চরিত্র নায়কেরা কোন পথে অধঃপাতে তলিয়ে গেছেন। এদিক দিয়ে দেখলে বঙ্কিমের উপন্যাসে 'আলালের ঘরের দুলাল' এর মতিলাল অপেক্ষা হেমচন্দ্রের পরোক্ষ হলেও ক্রম পরিণতির একটা ছায়া অনুভব করা যায়।"[২৩] এরই সঙ্গে সমসাময়িককালের ঘটনা যেমন নারী শিক্ষা, বিধবা বিবাহ, সামাজিক বর্ণ বৈষম্য, পারিবারিক রীতিনীতির বর্ণনা, নানা আচার অনুষ্ঠানের বিবরণ ইত্যাদির নিরীখে সমাজ ও পরিবার জীবনের দলিল হয়ে উঠেছে রচনাগুলি।

বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশ নন্দিনী'—'সীতারাম' বাংলা উপন্যাসকে একটা শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। বিশেষ করে সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাস দুটি মূল স্তম্ভ স্বরূপ। এরপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসের সমাজ ভাবনা দিয়ে সেই স্তম্ভের ওপর গৃহ নির্মাণ করেছেন এবং শরৎচন্দ্র এসে তাকে পূর্ণাঙ্গ গৃহের রূপ দিয়েছেন সাজিয়ে গুছিয়ে। তবে এই তিন লেখকের উপন্যাসগুলির অন্দরমহলে প্রবেশ করলে একটা সুস্পষ্ট রূপরেখা আমরা পেয়ে যাই। এঁদের প্রত্যেকের প্রতিনিধি স্থানীয় উপন্যাস, বিশেষত সামাজিক উপন্যাস হিসেবে একটা করে উপন্যাসকে তুলে ধরে প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যকে অনায়াসেই চিহ্নিত করা যায়—

- 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭২)
- 'চোখের বালি' (১৯০৩) এবং
- 'পল্লী সমাজ' (১৯১৬)

'বিষবৃক্ষে' লেখক দেখিয়েছেন বিধবা রমণী যদি বিবাহিত পুরুষের প্রতি আসক্ত হয় তাহলে সেই সম্পর্ক সমাজের মাটিতে বিষবৃক্ষের বীজ বপণ করে। এখানে তিনি বিবাহিত নগেন্দ্রর সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর বিয়ে দিয়ে সেই সমস্যাকেই প্রকট করে দেখিয়েছেন। এবং সমাধান কল্পে বিধবা কুন্দকে বিষ খাইয়ে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। এখানে বিধবার বিবাহ সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে চিহ্নিত হয়েছে। 'চোখের বালিতে' রবীন্দ্রনাথ বিধবা বিনোদিনীর প্রেমকে স্বীকৃতি দিয়েছেন কিন্তু বিহারীর সঙ্গে তার বিবাহ দেননি। আসলে তিনি চেয়েছিলেন সমাজ সমাজ আগে বিধবার প্রেমকেই স্বীকৃতি দিক, তারপর তার বিয়ের কথা ভাবা যাবে।

আর শরৎচন্দ্র বিধবা রমা আর রমেশকে নিয়ে একটিমাত্র মধুর মুহূর্ত সৃষ্টি করলেন—সেটাও পরিচিত বাংলার সমাজ বৃত্তের বাইরে। কুঁয়াপুর ছাড়িয়ে তারকেশ্বরে—যেখানে রমা রমেশকে কেউ চেনে না। তারপর রবীন্দ্রনাথের মতো রমাকে বিনোদিনীর পথে কাশী পাঠালেন। কিন্তু উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য সত্ত্বেও আপাতদৃষ্টিতে পরিণতি একইরকম মনে হয়। বিধবাদের নিয়ে তিন লেখকের এই তিনরকম পরিণতিকে একটি উপমার সাহায্যে তুলে ধরা যেতে পারে। ধরা যাক 'সমাজ' হল একটি টেবিল—যার শরীরময় ঘুণপোকা বাসা বেঁধেছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রক্ষণশীল ভাবনা থেকে এই টেবিলকে অক্ষতই রাখতে চেয়েছেন। কোনোরকম সংস্কার বা পরিবর্তন তাঁর কাঙ্ক্ষিত ছিল না। আর যে বা যারা এই পরিবর্তনের পথে হেঁটেছে সেইসব চরিত্রকে তিনি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছেন অনায়াসেই। 'কুন্দনন্দিনী' কিংবা 'রোহিণীর পরিণতি'; এমনকি দেবেন্দ্রর কদর্যরোগে মৃত্যু আর হীরাদাসীর উন্মাদিনী হয়ে যাওয়া কিংবা শৈবলিনীর পরিণতি তারই বার্তা বহন করে। আর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ধীরে ধীরে পরিবর্তনের পক্ষে। তিনি পা ভেঙ্গে যাওয়া কিংবা ওপরের ছাউনির দু-একটি করে কাঠ বদলে দিয়ে দিয়ে এগোতে চেয়েছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র ছিলেন ঘুণ ধরা টেবিলটি সম্পূর্ণ বাতিল করে নতুন টেবিল আনার পক্ষে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবনার পথ ধরেই এগিয়ে গেছেন।

বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের এই পৃথক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি যদি তাঁদের উপন্যাসে বর্ণিত সমাজের দিকে আলোকপাত করি তাহলে দেখা যাবে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সামাজিক উপন্যাসের নায়করা সকলেই উচ্চবিত্ত, অনেকেই জমিদার, পড়াশুনা জানা মানুষ। নগেন্দ্রনাথ কিংবা গোবিন্দলাল সম্পন্ন জমিদার। হীরাদাসীর মতো গৌণ চরিত্রকে বাদ দিলে মাটি ঘেঁষা জীবনের পরিচয় বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাসে নেই বললেই চলে। রবীন্দ্রনাথের মহেন্দ্র বিহারী থেকে সন্দীপ-নিখিলেশ কিংবা মধুসূদন এদের কারও সঙ্গেই মৃত্তিকার খুব একটা সংযোগ নেই। প্রত্যেকেই প্রায় শিক্ষিত ও ধনীক শ্রেণী। এরপর শরৎচন্দ্রেই প্রথম বাংলাদেশের মাটির গন্ধ পাওয়া যায় তাঁর উপন্যাসে। 'বড়দিদি' থেকে 'বিপ্রদাস'—সব সামাজিক উপন্যাসগুলিতেই বাস্তবতার ছোঁয়া আছে। কিন্তু সেই বাস্তবতা যতটা রক্তমাংসের জীবনের সঙ্গে অন্বিত, তার চেয়ে অনেক বেশী আদর্শায়িত এক কল্পলোকের উত্তাপ রয়েছে। যাবতীয় কুসংস্কার-অশিক্ষা-জাতপাতের উর্ধে উঠে রমেশ যে আদর্শ সমাজের নায়ক বা জমিদার হয়ে উঠেছে তাঁর বাস্তব ভিত্তি কতটা? বরং উপন্যাসের শেষে বেণী ঘোষালের মতো জমিদারের

অন্তর্নিহিত স্বরূপের কোন পরিবর্তন ঘটে নি। তা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের চরিত্রেরাই মাটির কাছাকাছি অবস্থান করেছে—একথা অস্বীকার করা যায় না। আসলে শরৎচন্দ্র বাঙালী পাঠকের ভাবাবেগে আঘাত করে গল্প লিখেছেন। তিনি জানতেন কীভাবে পাঠকের অশ্রুগ্রন্থি থেকে লোনা জল বের করতে হয়। সেজন্যে এখনো তিনি সমান জনপ্রিয়।

শরৎচন্দ্রের 'মানসপুত্র' হিসেবে জগদীশবাবু তাঁর উপন্যাসে যে সমাজের ছবি অংকন করেছেন, তার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা পাঠকের ছিল না বললেই চলে। বাংলাদেশের গ্রাম সমাজকেন্দ্রিক জীবন নিয়ে লেখা তাঁর তিনটি উপন্যাস—'রোমন্থন' (১৯৩১), 'দুলালের দোলা' (১৯৩১) এবং 'যথাক্রমে' (১৯৩৩)। এই তিনটিকে একত্রে 'ত্রয়ী' উপন্যাসও বলা যায়, যেগুলোতে গ্রাম সমাজ তার নিজের স্বরূপে প্রথম ধরা পড়েছে। এই তিনটি উপন্যাস ছাড়াও 'অসাধু সিদ্ধার্থ', 'গতিহারা জাহ্নবী', 'লঘুগুরু', 'নন্দ আর কৃষ্ণা', 'কলঙ্কিত তীর্থ' প্রভৃতি উপন্যাসেও এক নগ্ন সমাজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আসলে ব্যক্তিগত জীবন গ্রামের দূষিত জলহাওয়ায় বেড়ে উঠেছিল জগদীশবাবুর। তিনি খুব কাছ থেকে অশিক্ষা-দারিদ্র-জাতপাত। মানুষের লোভ লালসার কদর্যতম দিকগুলো প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সাহচর্য পেয়েছিলেন গণিকাদের। গ্রাম্য দলাদলি এবং তার বিষময় পরিমাণ তিনি আদালতে টাইপিস্টের কর্মসূত্রে রোজই দেখতেন। সেইসব চোখে দেখা জগৎই তাঁর এই ধারার উপন্যাসের মূল ভিত্তি। উনিশ শতকের শেষার্ধে একদিকে নবজাগরণের আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে গেলেও পুনরায় বাংলাদেশের গ্রাম জীবনে অবক্ষয়ের ভাঙন শুরু হয়ে গিয়েছিল। একদিকে আর্থিক স্বচ্ছলতা আর অন্যদিকে সামাজিক সৌহার্দ্য সম্প্রীতির বন্ধন থেকে মানুষের জীবনের গতি বদলে যায় অনিশ্চয়তার অন্ধকারের দিকে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষের নিঃসঙ্গতা ও একাকীত্বের যন্ত্রণা। সেই 'অদ্ভুত আঁধার'ময় সমাজের মানুষ সম্পর্কে সমালোচক সরকার আবদুল মান্নান লিখেছেন—"...দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধের নানামুখী প্রভাব প্রতিক্রিয়ায় গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে তাদের অজান্তেই এক নিরুদ্দিষ্ট ছিন্নমূল অবস্থানে এনে দাঁড় করায়। ফলে পুঁজিবাদী ও শিল্প সর্বস্ব ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থায় alienation বা বিচ্ছিন্নতাবোধ নামক যে অসুখ পুরো সমাজ-সংগঠনকে রুগ্ণ ও নিস্প্রাণ করে তুলেছিল, ঠিক অনুরূপ অর্থে না হলেও বিশ শতকের গোড়া থেকেই আমাদের গ্রামীণ জীবনে চলছিল যথাসর্বস্ব অনিকেত অবস্থা।"[২৪] সমাজবদ্ধতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে নানা বিচ্যুতির আঘাতে

সমাজ মানুষের এই নিঃসঙ্গতা ও 'অনিকেত অবস্থা' অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। বিচ্ছিন্নতার এই গড়পরতা অবস্থা আর অশিক্ষা এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য বাংলাদেশের মানুষগুলোকে মূল্যবোধ থেকে, নৈতিকতা থেকে দূরে নিক্ষেপ করে দেয়। জগদীশবাবু অত্যন্ত নির্মোহ দৃষ্টি দিয়ে মানুষগুলিকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন।

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই জগদীশগুপ্ত বুঝেছিলেন কল্পনার রঙীন চশমার পরিবর্তে, আবেগের ফানুসে না ভেসে চারপাশের সমাজকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। স্বভাবতই তিনি যখন বাংলাদেশের গ্রাম সমাজের চিত্রাঙ্গণ করতে নিয়েছেন তাঁর 'রোমন্থন' উপন্যাসে তিনি ভূমিকাতেই শুধু উপন্যাসটির আঙ্গিকগত দিকটি বিষয়েই তাঁর অকপট মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন এমন নয়, বিষয়ের দিকটি সম্পর্কেও তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত ছিল। তিনি মনে করতেন ঘটনার কল্পনায় গভীরতা থাক বা না থাক, পল্লীজীবনের সঙ্গে মনের নিবিড় 'আত্মীয়তা জন্মিবার পক্ষে তাহা সুদূরাগত বা প্রত্যক্ষ অন্তরায় হইতে পারে কিনা তাহাই বিবেচ্য'। ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রবোধের কারণে পল্লীবাংলার সঙ্গে কোনো মানুষেরই নিবিড় আত্মীয়তা গড়ে ওঠা সম্ভব নয়; কারণ কুসংস্কারে জরাজীর্ণ পল্লীর জীবনই এই আত্মীয়তার পক্ষে বাধা-স্বরূপ এটা জগদীশবাবুর মত প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। পল্লী সমাজের সেই কদর্য রূপের ছবি শরৎচন্দ্রও এঁকেছিলেন; কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত ভাব-কল্পনার পথেই অগ্রসর হয়েছেন। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে যে বিশ্বেশ্বরী বা শরৎচন্দ্রের অন্তর্গত সত্তা রমেশকে জ্ঞানের আলো জ্বালাবার কথা বারবার বলেছেন, তাঁকে রক্তমাংসের সজীব মানুষ বলে মনেই হয় না। তিনি যেন একটি আদর্শের প্রতিমূর্তিমাত্র। অথচ জগদীশবাবু তাঁর 'রোমন্থন' উপন্যাসে বাংলার সমাজের যে কদর্য রূপ তুলে ধরেছেন এবং ডাক্তার নিত্যাপদর মানসিকতাকে শেষ পর্যন্ত পর্যুদস্ত করেছে যে ক্লেদ-পঙ্কিলতা—তা অত্যন্ত বাস্তব সম্মত এবং নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিজাত। উপন্যাসটির 'মুখবন্ধে' শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ খুব স্পষ্ট করেই সেকথা জানিয়েছেন—''রোমন্থনে' পল্লীর কদর্য্যতা ক্ষুদ্রতা ও ক্লেদ ফুটেছে একটু বেশি বস্তুতান্ত্রিকতা ঘেঁষে, অপদার্থ ধনী সহুরে বাবু তিনটির আশেপাশে অভয় কালোশশী প্রাণনাথ মদন ও গ্রাম্য মানুষগুলি আসছে যাচ্ছে এক বিচিত্র দৈন্যের ছবি ফুটিয়ে। সুন্দরকে ছেড়ে বৃহতের মহিমাকে ছেড়ে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে একেবারে সঙ্কীর্ণতা ও রিক্ততার পঙ্কে তা' 'রোমন্থনে' দেখানো হয়েছে অপূর্ব্ব করে।"[২৫] উপন্যাসের কাহিনীতে

আমরা দেখি, কলকাতাস্থ একই পরিবারের তিন ভাই—বড়বাবু, মেজবাবু ও ছোটবাবু লণ্ডন প্রবাসী জেঠা মশায়ের আদেশে কলকাতা থেকে ৪২ মাইল দূরে মান নগর গ্রামে আসেন তাদের আদি নিবাসে। 'ইহাদের পিতামহ সেই পল্লীভবনের মাটিতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি এবং তাহার পত্নী চিতায় উঠেন কলিকাতায়'। চিরকুমার জেঠা মশায় আসন্ন পার্লামেন্ট মহাসভার প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী না হতে পারলে পাকাপাকিভাবে দেশে ফিরে গ্রামের বাড়ীতেই এসে থাকবেন। সেজন্য যাবতীয় ব্যবস্থা তদারকি করতেই তিন ভ্রাতুস্পুত্রের গ্রামের বাড়ীতে আগমন। গ্রাম জীবনে পোকা-মাকড় সাপ-জোঁক, মশা-মাছি প্রভৃতি মনুষ্যেতর প্রাণী আর অসুখ-বিসুখ সম্পর্কে ভ্রাতৃত্রয়ের শহরবাসী হিসেবে একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল। কলকাতাস্থ বাড়ীর বৈঠকখানায় ডাক্তার মনোজবাবু গ্রামীর পরিবেশের চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর উপদেশাত্মক কথার মধ্যদিয়ে—

''মনোজবাবু বলিলেন,—কিন্তু 'জার্ম' লোকের বিছানাতেই বজ্‌বজ্ করছে—বিছানা ত কাচে না, রোদে দেয় না কোনো কালে! আত্মীয়তা করে' হঠাৎ তাদের বাড়ীতে গিয়ে উঠো না যেন।''[২৬]

কিংবা ''মশারি নিতে ভুলো না—পাড়াগাঁয়ের মশা খুব সেয়ানা! খুব শক্ত মশারি নিও, যেন সুতো ঠেলে ঢুকতে না পারে।''[২৭]

এইভাবে গ্রামজীবন সম্পর্কে পূর্ব কিছু অভিজ্ঞতা আর উপদেশ নিয়ে তারা গ্রামে আসেন। কিন্তু গ্রাম-সমাজের মানুষকে তারা যথার্থই চিনতেন না। এখানে এসে সেই নীচতা দৈন্যতা হীনতার সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। এ যেন হারানো অতীতের স্মৃতি রোমন্থন। কলকাতার বাড়ী থেকে একটা দীর্ঘ প্রস্তুতি শেষে অনেকটা রোমাঞ্চকর অভিযানের মতো তারা গ্রাম জীবনে প্রবেশ করেছেন। এই জীবনের কৃষক প্রতিনিধি একজন সহায় সম্বলহীন অসহায় কৃষক অভয়। তাকে কেন্দ্র করেই সামগ্রিক রোমন্থন বর্ণিত হয়েছে। এই অভয়দের জীবন বর্ণনায় লেখক সমস্ত পূর্বসূরীদের অভিজ্ঞতার জগৎকে অতিক্রম করেছেন। এইসব মানুষদের দেখার মধ্যে কোনো কল্পনা বিলাসী মন কিংবা ভাববিলাসী চিন্তা নেই। এ একেবারে সাদা চোখে দেখা। রঙীন চশমা খুলে ফেলে সরাসরি দেখা বলতে যা বোঝায়। অভয়রা জীবন ধারণের সমস্ত মানবিক উপাদান হারিয়ে কোনো রকমে বেঁচে আছে। লেখক অভয়দের জীবনে 'হাসি'র ব্যাখ্যা করেছেন অত্যন্ত নিপুণ ভাবে—''অভয়ের পিতা অঘোর প্রথম বয়সে হাসিয়া

ছিল, তাহাকে হাসি বলা যায়। ... সে হাসি তার প্রৌঢ়াবস্থায় বক্র হইয়া উঠিয়াছিল। হাসির শৈশব আছে, যৌবন আছে বার্দ্ধক্য আছে; কিন্তু হাসি যখন অসহায় হইয়া আতঙ্কে বাঁকিয়া চুরিয়া দেখা দেয়, হাসির তখন মুমুর্ষু অবস্থা, অঙ্গুরীর মত চতুর্দিকে নিরন্ধ্র কারায় বেষ্টন করিয়া অন্ধকার যখন দীপশিখাটিকে বায়ুর তীর মারিয়া মুহুর্মুহু; আঘাত করিতে থাকে, এ হাসি তখনকার সেই দীপশিখাটির মত, মৃত্যুর দিকে চলিয়াছে।"[২৮] চণ্ডীমঙ্গলের ভাঁড়ুদত্তের উত্তরসূরীর মতো ঠকবাজ কালোশশী পাটের দামে অভয়কে ঠকায়। ভাঁড়ু যেমন রাজা কালকেতুকে সন্তুষ্ট করার নানা ফন্দি আঁটতো এই কালোশশীও তেমনি। বাবুদের আগমনে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নিজে যেচে এসে বাবুদের অভ্যর্থনার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে। ফলে গ্রাম সমাজ ত্রিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে—যার এদিকে বাবুরা, মাঝে কালোশশীর মতো সুবিধাবাদী আর অন্যদিকে অভয়ের মতো ছিন্নমূল মানুষ। এই ত্রয়ী-সম্প্রদায় সম্পর্কে সমালোচক ড. সরকার আবদুল মান্নান লিখেছেন—"বাবুদের বিশ্রাম আছে, নিশ্চিন্ততা আছে, অস্তিত্বকে নানাদিকে বিলিয়ে দেয়ার অবকাশ আছে। কালোশশীরও আছে। কিন্তু অভয়দের তা নেই। বাবুদের সঙ্গে তার এই ঐক্য এবং অভয়দের সঙ্গে এই স্বাতন্ত্র্য বুঝিয়ে দেয়ার জন্য কালোশশী চৈতন্যের কোনো এক গোপন ইন্ধনে বাবুদের অভ্যর্থনা দেয়ার জন্য মেতে ওঠে।"[২৯] আসলে গ্রামীণ মানুষের দারিদ্র্যের বর্ণনা করা লেখকের উদ্দেশ্য নয়, তিনি মানুষগুলোর অন্তরের অন্ধকার জগতে প্রবেশ করে তুলে এনেছেন একের পর এক অবাক করা চিত্র।

'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র পল্লীবাংলার বর্তমান অবক্ষয়ের কালে দাঁড়িয়ে এর যে একটি সোনালী অতীত ছিল সেকথাও স্মরণ করেছেন এবং শেষে শাসক শ্রেণীর মানসিকতার পরিবর্তন আর জ্ঞানের আলো জ্বালানোর মাধ্যমে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করেছিলেন। 'পল্লীসমাজ' থেকে 'রোমন্থন' মাত্র দেড় দশকের ব্যবধান। জগদীশবাবুও অভয়ের স্মৃতিচারণায় খুঁজেছেন সেই হারানো পল্লীকে—"সে ঝাউবন নাই—অভয়ের মনে হইল পল্লীর ক্রোড় নিঃস্ব করিয়া যত কিছু সামগ্রী একে একে বিচ্যুত হইয়া গেছে তাহাদের সকলের বড় বাল্যকালের সেই ঝাউবনটি।"[৩০] স্মৃতিগুলো এভাবেই আসে, তবে তারা একেবারেই নির্জীব বাহু বাড়াইয়া আলিঙ্গন করিতে চায়—প্রেতমূর্ত্তির সে মূক মুখে তার ভাষা নাই—মনকে সে বিচলিত করে না।' অথচ একসময় কত ইচ্ছা ছিল। সেসব কল্পলোক এখন অন্ধকার, অচঞ্চল। সেইসব স্মৃতিশক্তির আজ আর কোনো মূল্য নেই। মৃতের আত্মা, যেমন দূর থেকে পরিত্যক্ত

দেহটাকে দেখে তেমনি নিরর্থক দৃষ্টি নিয়ে মাঝে মাঝে স্মৃতির জগতে মন ছুটে চলে। মনে হয় সেইসব দিন যদি আবার ফিরে আসে। কিন্তু বত্রিশ বছর বয়স্ক অভয়ের কাছে এশুধুই স্মৃতিমাত্র। 'এই বয়সেই সে পুরাতন জগতের দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে।' ভাঙনের স্মৃতির পারে দাঁড়িয়ে অভয়ের সমান্তরালে মূল্যবোধশূন্য নৈতিকতা বিহীন কালেশশীর উদ্দেশ্যে বড়বাবু আশ্বাস বাণী দিয়ে জানিয়েছেন—

■ ''পল্লী ছাড়া কি আমাদের গত্যন্তর আছে? ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে আমরা খুব ভাবছি; আর চাষের কথাও আমাদের সভায় মাঝে মাঝে আলোচিত হয়—বিশেষজ্ঞ আছেন। খবরের কাগজে দেখে থাকবে।''[৩১]

■ ''... ম্যালেরিয়া আর গোচারণ ভূমিই আমাদের প্রথম লক্ষ্য হবে। একটিকে তাড়াব, আর একটিকে তৈরী করব। জিজ্ঞাসা করবে, কেমন ক'রে তৈরী করব? ফসলের জমি যদি ফসল বেশী দেয়, ঢের বেশী, তবে লোকে খানিকটা জমি গরুর জন্যে উদ্ধৃত ক'রে রেখে দিতে অক্লেশেই পারবে। ভূমিকে উর্ব্বরা করে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।''[৩২]

বাবুদের এই জাতীয় মানসিকতার ফলে শহরের মানুষের মধ্যে গ্রামের মানুষ সম্পর্কে দেখা দিয়েছে একদিকে ঘৃণা, উন্নাসিকতা ও অবিশ্বাস; অন্যদিকে পল্লী প্রকৃতি সম্পর্কে রূপময়ী সৌন্দর্য লক্ষ্মীরূপে রোমান্টিক কল্পনা। এই দুটি ধারণাই তাঁদের অনভিজ্ঞতাজাত আর নিছক কল্পনা প্রসূত। এই জাতীয় মানসিকতার মানুষদের লেখক তীব্র ভাষায় ধিক্কার জানিয়েছেন। শরৎচন্দ্র যেখানে একটা কাল্পনিক ভাবনা পথে গ্রাম সমাজের উত্তরণের কথা বলেছেন সেখানে তাঁরই প্রতিভার মানসপুত্র জগদীশবাবু গ্রাম বাংলার নৈতিক অবক্ষয় আর অর্থনৈতিক দুর্দশার কারণটি অনুসন্ধান করে তার প্রকৃত রূপটিকে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের বড়বাবু হিসেবী, বুদ্ধিমান, সংযমী। মেজবাবু স্পষ্ট বক্তা আর ছোটবাবু বিলাসী, দার্শনিক, প্রকৃতি প্রেমিক। এদের হাতে পড়ে গ্রাম বাংলার উত্তরণ যে একটি বড় প্রশ্ন চিহ্নের সম্মুখীন সেকথা লেখক স্পষ্টভাবে জানাতে দ্বিধা করেননি।

'রোমন্থন' উপন্যাসেরই ভিন্ন পিঠ হিসেবে 'দুলালের দোলা' উপন্যাসেও বাংলাদেশের গ্রাম সমাজের এক স্বতন্ত্র প্রতিফলন ঘটেছে। উপন্যাসটির বিচ্ছিন্ন কাহিনীর তিনটি অংশ। 'ঘটনাগুলিও পরস্পর বিচ্ছিন্ন, কিন্তু একস্থানে যাইয়া ফল প্রসব করিতেছে'। অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতার মাঝেও একটা যোগসূত্র অন্বেষণ। সেইসূত্রে লেখকের মূল বক্তব্য হল, বাংলাদেশের সমাজ,

বিশেষ করে পল্লী বাংলার ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের জাত্যাভিমানের অর্থহীনতা আর গৌরব দাবীর অসারতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। উপন্যাসের তিনটি পৃথক অংশের প্রথমটি পশ্চিম প্রবাসী নীরদবরণের তিক্ত অভিজ্ঞতা আর অন্য দুটি গ্রামস্থ বৃদ্ধ পিরুর মুখ দিয়ে বলা ঘটনার কোলাজ। প্রবাসী নীরদবরণের ঠাকুরদার গ্রামের বাড়ীতে বেড়াতে আসা উপলক্ষে তার পিসিমার ভাবনাভিব্যক্তি প্রকাশ সম্পর্কে উপন্যাসের সূচনাতেই লেখক নীরদবরণের জবানীতে জানিয়েছেন—''পিসিমা অনেকেরই আছেন; কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখিয়া কোনো পিসিমাই বোধকরি এমন করিয়া কাঁদেন না। কিন্তু আমার পিসিমার আমাকে দেখিয়া পুলকাশ্রু মোচন করিবার কারণ আছে। ... দেশের অধিকাংশ লোকের মত আমাদেরও নিবাস পল্লীগ্রামে। পল্লীগ্রামে বাস বলিয়াই আমরা নিতান্ত তারা কাটা আর একঘেয়ে জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছি ইহা সত্য নহে।''[৩৩]

এইভাবে নীরদবরণের চোখ দিয়ে লেখক গ্রাম জীবনের পরিচয় তুলে ধরেছেন। পিসিমার কাছে এসে নীরদবরণ গ্রাম দেশের মুক্ত প্রকৃতির অনাবিল রূপ উপভোগ করেছে। গ্রামের পথে বেরিয়ে প্রকৃতি তার কাছে মুক্তবেণী ছড়ানো চুলের দূরন্ত কিশোরীর মত ধরা দিয়েছে। এ যেন জন-অরণ্য কলকাতা থেকে পদ্মালালিত ভূ-খণ্ডে গিয়ে তরুণ রবীন্দ্রনাথের পদ্মা-প্রকৃতির রূপ আস্বাদন। নীরদবরণের চোখে দেখা প্রকৃতির কিছুটা অংশ এরকম—''রৌদ্র আর ছায়ার অমন সমাবেশ আমি কল্পনা করিতে পারিতাম না। ছায়া রৌদ্র ক্ষেত্র রচনা করে নাই, একটি সন্ধিস্থলে তাহারা সম্মিলিত হয় নাই—কালো জমির উপর কে যেন রোদে ফুল কাটিয়াছে। ... চঞ্চল আলোকখচিত স্থির ছায়া মণিদীপ্ত অন্ধকারের মত প্রসারিত হইয়া আছে এবং এই অপরূপ ভজনালয়ে পাখীর দিবাবন্দনা তখনও শেষ হয় নাই; দিনোদয়ের পুলকে পাখী তখনও মুক্ত কণ্ঠ!''[৩৪]

অনাবিল নির্মল এই প্রকৃতিই বাংলার জীবনের একমাত্র সম্পদ নয় এবং লেখক সেই দিকটিতেও অধিক আলোকপাত করেননি। বরং এই আলোকমালার বিপরীত যে অন্ধকার মানব জগত রয়েছে নীরদবরণের অভিজ্ঞতার নিরীখে লেখক সেই দিকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। নীরদবরণ দেখেছে ধর্ম-বর্ণের ভেদে পীড়িত গ্রাম জীবনের ক্লেদাক্ত রূপ; অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ গ্রামীণ মানুষের অশ্লীল রসিকতা আর অশ্রাব্য গানের নির্লজ্জ পরিবেশ। এসব তিক্ত অভিজ্ঞতা নীরদবরণকে হতাশ করেছে। ব্রাহ্মণ্য প্রধান গ্রাম জীবনের এক বীভৎস রূপ সে

প্রত্যক্ষ করেছিল নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে। তাকে কেন্দ্র করেই যে ভোজের আয়োজন সেখানে তাকে বাদ দিয়ে অন্যদের পূর্বে পরিবেশন করা হচ্ছিল। এর কারণ সহজেই পরিস্কার হয়ে যায় নীরদবরণের কাছে। ব্রাহ্মণ ভোক্তাকে বাদ দিয়ে তার মতো অব্রাহ্মণকে কোনো অবস্থাতেই আগে খেতে দেওয়া হবে না। শুধু তাই নয় খাবার পর তাকে নিজের এঁটো থালা নিজেকেই মেজে আসতে হয়েছে। এরপর গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ দ্বারিক ঠাকুরের প্রসাদ পাবার নিমন্ত্রণ নীরদ প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে জানিয়েছে—''আগে মানুষ, তারপর ভদ্র-অভদ্র, সকলের শেষে ব্রাহ্মণ-শূদ্র। সংস্কার আগে নয়, গুণ আগে—আপনাদের কথাটা মনে করিয়ে দেবার সময় এসেছে। আপনি আমাকে দিয়ে এঁটো বাসন মাজাতেন কিনা জানি নে, আপনি তা' করাবেন না' প্রতিশ্রুতি দিলেও আমি ব্রাহ্মণ বাড়ীতে খেতে যাব না।''[৩৫] নীরদবরণের এই অকপট সত্য-কথনের ফল ভালো হয়নি। পরদিন পরিধেয় বস্ত্রাদি ছাড়া নীরদের সমস্ত কিছু চুরি হয়ে যায়। 'বালক, তুমি ব্রাহ্মণকে চেন না'। বস্তুত দু'শো সিঁদেল চোরের সর্দার ব্রাহ্মণ দ্বারিক ঠাকুরকে চিনতে পারেনি নীরদবরণ। এইভাবে ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রাম সমাজের সংস্কার ঘেরা মৌচাকে জগদীশবাবুও প্রথম অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে ঢিল ছুঁড়ে ছিলেন।

উপন্যাসের অন্য দুটি ঘটনার বর্ণনা করেছে বৃদ্ধ পিরু। এই পিরু হলেন নীরদবরণের ঠাকুরদার বাল্যসঙ্গী। পিরু শুধু গ্রাম সমাজের নগ্ন চিত্রই বর্ণনা করেননি, সেই সঙ্গে তিনি গ্রামের 'পোড়া বৌ' নামকরণেরও কালো ইতিহাস বিবৃত করেছেন। লেখকের 'কলঙ্কিত সম্পর্ক' (১৯৬০) উপন্যাসের নায়ক সাতকড়ি নারীঘটিত অপরাধ করেও সমাজের চোখে দোষী সাব্যস্ত হয়নি। বরং তাকে গ্রহণ করতে না পাবার জন্যে স্ত্রী মাখনকে সমাজপতির ভূমিকা নিয়ে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে শাশুড়ি। এখানেও সেইরকম ঘটনারই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। স্বামী ভারতের কৃতকর্মের দায় মাথায় নিয়ে অন্তঃস্বত্বা যোগীশ্বরী দরজায় খিল এঁটে দিয়ে নিজের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। বাড়ি ভর্তি লোক কেউই খেয়াল করেনি। আগুন কিছুক্ষণ জ্বলার পর ঘরের ভিতর থেকে ধোঁয়া আর ধোঁয়ার সঙ্গে মানুষ পোড়ার দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে দেখে সকলে যখন দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে ততক্ষণে সবশেষ। সেই থেকে গ্রামের নাম হয়ে যায় 'পোড়া বৌ'। এইরকম এক মর্মান্তিক কাহিনী শুনিয়ে পিরু তার ছোট মনিব নীরদবরণের কাছে নারী পুরুষের সম্পর্কের প্রধান লক্ষ্য যে স্থূল জৈবিকতা সেটাও ব্যক্ত করতে ভোলেনি। তার কথায়—''আমি ভেবে দেখেছি, বাবু ধৰ্ম্মপত্নী, স'ধৰ্ম্মিনী, আরো অনেক কথার এম্‌নি

মানে নাই। মন্তর মেয়েকে বাঁধার কৌশল, তার দেহটাই আসল।"[৩৬] উপন্যাসের তিনটি কাহিনীর মধ্যে লেখকের একটি অভিপ্রায় লক্ষ্য করা যায়—তা হল বর্ণাভিমানের অসারতা দেখানো। এর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তবে জগদীশবাবুর দৃষ্টিভঙ্গিগত উগ্রতা শরৎচন্দ্রে পাওয়া যায় না। এখানেই তিনি তাঁর 'মানসপিতা'কে অতিক্রম করে গেছেন।

'রোমন্থন' এবং 'দুলালের দোলা' —এই দুটি উপন্যাসের সমাজ জীবন ভাবনা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে 'যথাক্রমে'র সঙ্গে মিলিত হবার মধ্যদিয়ে। তৃতীয় উপন্যাসটিতেও লেখক অত্যন্ত নির্মোহ দৃষ্টি দিয়ে গ্রাম সমাজের নগ্ন বাস্তবতাকে তুলে এনেছেন। উপন্যাসটিতে রয়েছে দুটি সমান্তরাল কাহিনী একটির কেন্দ্রে আছে দীনবন্ধু ও সাবিত্রী নামক ভাই ও বোন এবং অন্যটি নিত্যপদ ডাক্তারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। দুটি কাহিনীর মধ্যদিয়ে লেখক গ্রাম সমাজ সম্পর্কে সনাতন ধারণাগুলি ভেঙ্গে দিয়ে একটি বাস্তব ও নির্মম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন তাঁর পাঠকদের। উপন্যাসটির শুরুতেই লেখক পল্লীগ্রামের সঙ্গে তাঁর পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে লিখেছেন—"ছোট্ট নদীর ধারে হাট। গ্রামের নাম বেতডাঙ্গা, নদীর নাম চন্ননা, হাটের নাম চন্ননার হাট। নদীর বুক বৃদ্ধার স্তনের মত শুকাইয়া আসিতেছে, তবু স্তন্যের মায়ামধু কৃতজ্ঞ স্তন্যপায়ী সন্তানেরা ভুলিতে পারে না, চন্ননাকে ভাল বাসিয়া হাটের নাম দিয়াছে চন্ননার হাট।"[৩৭] কেবলমাত্র চন্ননা নদী নয়, এখানকার সবই ছোট—গ্রাম ছোট, হাট ছোট, হাটে যারা আসে তারাও ছোট। দোকানগুলি সর্বব্যাপী ছোট'র মাঝে ছায়াবাসী বৃক্ষ শিশুর মত খর্ব হয়ে আছে। সব মিলিয়ে বেতডাঙ্গা গ্রামটি উপন্যাসে একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে। এই চরিত্রটির ভেতরে আবার দুটি পৃথক গল্প। একটি মুদির দোকানের মালিক রামপ্রসাদ ও তার ছেলেমেয়েকে ঘিরে; অন্যটি ফণী ডাক্তার ও নিত্যপদ ডাক্তারের গল্প। প্রথম গল্পে আমরা দেখি ছেলেমেয়েদের ছোট রেখে রামপ্রসাদ মারা গেলে শ্রীমন্ত ঠাকুরের সহায়তায় তার ছেলে দীনবন্ধুর অবর্ণনীয় জীবন অভিজ্ঞতা যেমন বর্ণিত হয়েছে, তেমনি বিয়ের পর সাবিত্রীর শ্বশুর বাড়ীতে তার নিয়মিত দৈহিক ও মানসিক পীড়ন এবং সেইসূত্রে গ্রামীণ মানুষের নীচতা ও সংকীর্ণতা পরিস্ফুট হয়েছে। গ্রামীণ মানুষের জাতপাত ধর্মীয় বিভেদের লড়াই যেমন আছে তেমনি লেখক চরিত্রগুলির মনোলোকের কুৎসিত দিকটিকে পরিস্ফুট করেছেন। গ্রামের হাটে মতিলালের বানর আনাকে কেন্দ্র করে হাটে আগত মানুষগুলো

হিন্দু-মুসলমানে ভাগ হয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিল। এই বিবাদ রক্তারক্তি পর্যায়ে প্রায় পৌঁছেছিল, কিন্তু শ্রীমন্তের মধ্যস্থতায় তা মাঝপথেই থেমে গিয়েছিল। আবার পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের রমেশের মতোই দীনবন্ধু অনুধাবন করতে পেরেছিল গ্রামীণ মানুষগুলোর নীচতা ও স্বার্থপরতা। দোকানে বাকী নিয়ে ধার শোধ না দেওয়া থেকে শুরু করে সংসার বিষয়ে অনভিজ্ঞ দীনবন্ধুকে নানাভাবে ঠকানোর চেষ্টা মানুষগুলো করেছে। পিতার মৃত্যুর পরে পরেই দীনবন্ধু সংসারের মানুষগুলোর প্রকৃত স্বরূপ বুঝে গিয়েছিল—"... দীনুদের এই দুর্দ্দিনে তাহাদের শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া সবাই সৎপরামর্শ দিল যত, তাহাদের আগ্‌লাইবার কেহ নাই দেখিয়া ফাঁকি দিল তার ঢের বেশী। তাহাদের প্রাপ্য পয়সা আগ বাড়াইয়া কেহ দিতে আসিল না। খাতায় হিসাব উঠিত না; অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সজ্ঞান অপরাধের সাজা কঠিনতর জানিয়াও রামপ্রসাদের এই কাঁচা কাজের সুযোগ ত্যাগ করিলেন না।"[৩৮]

'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে মায়ের মৃত্যুর পর কাঙালী যেমন ঘন্টা দুয়েকের অভিজ্ঞতায় সংসারে বুড়ো হয়ে গিয়েছিল তেমনি দীনবন্ধুও ধীরে ধীরে ঠকতে ঠকতে পাকা ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছে অল্পকালের মধ্যেই। বোন সাবিত্রীকে সে ভিন গাঁয়ে বিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সাবিত্রীর শ্বশুরবাড়ীতে বিশেষ করে শাশুড়ি ও দেবরদের অত্যাচার বাংলাদেশের প্রায় ঘরে ঘরে পুত্রবধূ নির্যাতনের ভয়ংকর দৃশ্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' কিংবা 'হৈমন্তী' গল্পে যেভাবে অত্যাচারিতা গৃহবধূ ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছে এখানে তার বিপরীত অবস্থাকেই লেখক তুলে ধরেছেন। গৃহবধূ সাবিত্রী অত্যাচারিতা হতে হতে একসময় রুখে দাঁড়ায় এবং সংসারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অত্যাচারিতার এই ঘুরে দাঁড়ানোর মধ্যদিয়ে জগদীশবাবুর ভাবনার স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত হয়ে গেছে।

'পল্লী সমাজে'র রমেশ কিংবা 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র শশীভূষণ যেভাবে গ্রামীণ মানুষের সেবা করতে গিয়ে নানাভাবে উৎসাহের ভগ্ন তীর ধরে পেছন দিকে ফিরে আসতে শুরু করেছিল, এই উপন্যাসের ডাক্তার নিত্যপদর অবস্থাও তদনুরূপ। রমেশকে শেষ পর্যন্ত একটা কল্পিত আদর্শ সমাজের শীর্ষদেশে স্থাপন করেছিলেন শরৎচন্দ্র কিংবা শশী যেমন কবিরাজ যাদবের রেখে যাওয়া অর্থ দিয়ে গ্রামে হাসপাতাল গড়ার মধ্যদিয়ে উত্তরণের পথ খুঁজে পেয়েছিল, কিন্তু নিত্যপদ তেমন পথের দিশা পায় নি। ফলে পল্লী সমাজের মানসিকতা পরিবর্তনের কাল্পনিক পথ ছেড়ে লেখক নিত্যপদকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন নগ্ন বাস্তব মৃত্তিকার

ওপর। প্রথম দিকে অবশ্য তার মধ্যে রমেশের মতোই সুন্দর সমাজ গঠনের স্বপ্ন ছিল। তার সেই ভাবনা ব্যক্ত করে লেখক জানিয়েছেন—''নিত্যপদ মোহিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, লক্ষ্মী যে বৈকুণ্ঠবাসিনী তাহার প্রমাণ আমাদের পল্লী প্রকৃতি আর পল্লীবাসীর প্রকৃতি।... বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মীর এই কমনীয় অঞ্চলতল আশ্রয় করিয়া নিত্যপদ কায়েমী হইয়া বসিল।''[৩৯] কিন্তু নিত্যপদ'র স্বপ্নাচ্ছন্নতা খুব দ্রুত ভেঙ্গে যায় রমেশের মতোই। পল্লীবাসীর প্রকৃত স্বরূপ তার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়। গ্রামের স্বার্থান্ধ মানুষের সঙ্গে তার সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। গ্রামের প্রধান নিত্যপদর উদারতাকে সুকৌশলে ব্যবহার করতে থাকে। হাতুড়ে ফণী ডাক্তার ও গ্রাম পঞ্চায়েত মতিলাল যৌথভাবে নিত্যপদর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। নিজে রং মেশানো ওষুধ দিয়ে মানুষকে ঠকায় ফণী, কিন্তু নিত্যপদ মানুষের কাছে বিনা পয়সায় ওষুধ পৌঁছে দেয়। যাদের ওষুধের দাম দেবার সামর্থ নেই তারা পর্যন্ত মতিলাল আর ফণীর প্ররোচনায় পা দেয়। গ্রামের সকল স্তরের মানুষ সম্মিলিতভাবে ষড়যন্ত্র করে নিত্যপদর জীবন যখন দুর্বিষহ করে তুলেছে, তখন সেই চক্রব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে ফণী ডাক্তারের কৌশলকেই সঠিক বলে মনে করেছে নিত্যপদ। সহকারী কান্তিভূষণকে সে নির্দেশ দিয়েছে—''তোমার খুব ক্ষতি হল, কান্তি; তুমি শিখতে এসেছিলে, কিন্তু তা হ'ল না। ... আর ওষুধ বিতরণ করে' কাজ নাই। জল দিতে থাকো। ফণীবাবু দেশের লোকের নাড়ী ধরে আছেন—তাঁর ব্যবহারই ঠিক। আমরা ভুল পথে চলেছিলাম, ভাই।''[৪০]

শরৎচন্দ্রের 'মানসপুত্র' জগদীশবাবু তাঁর কথাসাহিত্যে যে প্রথা বিরোধী জীবন তৃষ্ণাকে বাহন করেছেন, এই কাহিনীতেও তার কোনো ব্যত্যয় ঘটে নি। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, বাইরে থেকে পল্লী প্রকৃতি ও পল্লীবাসীকে যতই শান্ত ও সুস্থির মনে হোক না কেন, তার ভেতরটা মাকাল ফলের অনুরূপ। এর প্রতিটি স্তরেই রয়েছে পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থপরতা, দারিদ্র্যের কশাঘাত, কুৎসা রটানোর মধ্যদিয়ে প্রবল আনন্দ ভোগ। উপন্যাসের দীনবন্ধু, সাবিত্রী, নিত্যপদ এরা প্রত্যেকেই সেই অবস্থাগুলোর সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে এবং বিরূপ সমাজের সঙ্গে লড়াই করতে করতে তারা শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকেই তাদের মতো করেই টিঁকে গেছে। ড. প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় উপন্যাসটি সম্পর্কে লিখেছেন—''জগদীশগুপ্তের দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল মূলতঃ নৈরাশ্য পীড়িত। তাঁর দৃষ্টিতে জগৎ সংসার অপরিশোধ্য পঙ্কিলতার ঘন অন্ধকারে নিমজ্জিত। এই সর্বগ্রাসী অন্ধকারের মধ্যে দু'একটি ক্ষীণ আলোকবর্তিকা যদিও

কখনও দৃষ্ট হয়, পারিপার্শ্বিকতার চাপে তা স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। এই হল তাঁর জীবনদর্শন। যথাক্রমের মধ্যেও সেটা দেখাতে চেয়েছেন।"[৪১]

গ্রাম সমাজজীবনকেন্দ্রিক 'ত্রয়ী' উপন্যাস ছাড়াও জগদীশবাবুর 'অসাধু সিদ্ধার্থ' 'গতিহারা জাহ্নবী', 'লঘুগুরু' 'নন্দ আর কৃষ্ণা' প্রভৃতি উপন্যাসে সমাজের কদর্য দিকটি উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে। 'অসাধু সিদ্ধার্থে'র নটবর ওরফে সিদ্ধার্থের কদর্য জীবন কাহিনী বর্ণনার মধ্যদিয়ে লেখক ক্ষয়ে যাওয়া মূল্যবোধের ফসিল একটা সময়কে তুলে এনেছেন। প্রচলিত সমাজ ধারায় সিদ্ধার্থের মতোই একেবারে কদর্য মানব রূপ প্রত্যক্ষ করি 'গতিহারা জাহ্নবী'র নায়ক 'অপদার্থ অকিঞ্চনে'র মধ্যেও—যার ভেতর কোনরকম শুভবোধের পরিচয় পাওয়া যায় না। নিজের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও যে অনায়াসেই স্ত্রীর 'সখী'র প্রতি লালায়িত হয় এবং 'বাবু' শ্রেণীর মতোই বে-পাড়ার নারীদের সঙ্গে কদর্য জীবনে মেতে উঠতেও দ্বিধা করেনি। আবার 'নন্দ ও কৃষ্ণা' উপন্যাসে মণীন্দ্রবাবু তার রক্ষিতা নিয়ে এক দুর্বিষহ জীবন শুধু যাপন করেনি, প্রকারান্তরে নন্দকেও ঠেলে দেওয়ার অবকাশ রচনা করেছে নিজে গৃহে অনুপস্থিত থেকে। রক্ষিতাকে নিয়ে সংসারে জীবনযাপনের কারণে সমাজ কখনোই মণীন্দ্রবাবুর ওপর অভিযোগের আঙুল তোলে নি। অথচ 'নিষেধের পটভূমিকায়' অভয়া তার মেয়েকে নিয়ে অতুলের সঙ্গে গৃহত্যাগ করলে সমাজ শুধু অভয়াকেই অভিযুক্ত করেনি, অতুলের প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরে শান্তি যখন তার আসল পিতার কাছে গেছে, তখনও তার পিতা সাংসারিক নিরাপত্তা আর সমাজের রক্তচক্ষুর ভয়ে কুলত্যাগিনী স্ত্রীর কন্যাকে গ্রহণ করতে চায়নি। অসহায় শান্তির জীবনে ক্ষণপ্রভাব মতো প্রত্যাশা জাগিয়ে ছিলেন তার গুরুজী ত্রিদিব। ত্রিদিব তার এক ধনী বন্ধু নিস্তারণ মজুমদারকে শান্তির আশ্রয়হীনতার কথা জানালে নিস্তারণ শান্তিকে পুত্রবধূ করে ঘরে তুলে নিল। যে পিতা আপন সন্তানকে পুনঃরায় গ্রহণ করে পরিচয় দিতে চায়নি, সেই বসন্ত এসেই যদিও কন্যা সম্প্রদান করেছে। এখানে নিস্তারণ মজুমদারের ভূমিকাটি জগদীশবাবুর ভাবনা প্রবাহের অনুবর্তী হয়নি। লেখক নিজেই যেন নিস্তারণের ভূমিকা নিয়ে শান্তিকে বলেছেন—''গভীরতম পঙ্কের খবর জানি, পর্ব্বত শিখরের খবরও জানি; পৃথিবীর এক পাই লোক বাদে সবারই চরিত্র, নীতি, অর্থ, মন, বৃত্তি, আশা কলুষিত। তা'রা তা' স্বীকার করে, সবাই তা' জানে তা-ও তা'রা জানে, এবং আনন্দ করে—তাদের প্রসারের অন্ত নেই। আর তুমি স্বয়ং কায়মনোবাক্যে নিষ্কলুষ হ'য়ে বলছ, নিজেকে প্রসারিত করবার স্থান তোমার

নেই।"[৪২] একরম ত্রুটি বিচ্যুতিটুকু বাদ দিলে জগদীশবাবু তাঁর সমাজ ভাবনার আদর্শেরই প্রতিফলন এখানেও ঘটিয়েছেন।

লেখকের একেবারে নিজস্ব সমাজ চিন্তার ফসল তাঁর 'লঘুগুরু' উপন্যাসটি। এই উপন্যাসে লেখক গণিকা নারীর জীবনের ট্রাজেডিকে তুলে এনেছেন অত্যন্ত নির্মোহ ভঙ্গীতে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্র—এমন গণিকা নারীর গল্প কাহিনী উপন্যাসে যতটা পরিবেশিত হয়েছিল সেসব ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে নীতিবাগীশ চিন্তা দ্বারা আক্রান্ত। এই নীতিবাগীশতার মূল্য দিতে হয়েছিল বাংলা উপন্যাসের প্রথম উল্লেখযোগ্য স্বৈরিণী নারী 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' রোহিণীর। গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলিতে রোহিণীকে মরতে হল। অথচ সমাজ গোবিন্দলাল কিংবা বিষবৃক্ষের নগেন্দ্রনাথের জন্য কোনো শাস্তি বিধান করেনি। যেন বিধবার কারণেই সমাজটা রসাতলে যেতে বসেছিল। বঙ্কিম এমন একটি ভাবনা থেকেই শিল্পীসত্তাকে টুটি চেপে ধরে নীতিবাদী সত্তাকে মুখ্য করে দিয়ে খড়্গাঘাত নামিয়ে এনেছিলেন। এরপর শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে'র রাজলক্ষ্মী কিংবা 'চরিত্রহীনে'র সাবিত্রী চরিত্রের মধ্যে যে গণিকা সত্তাটুকু প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেসব গৌণ হয়ে গিয়ে তাদের ভেতরের সতী নারী সত্তাকেই লেখক মুখ্য করে তুলেছেন। ফলে বাঈজী রাজলক্ষ্মী কিংবা মেসের ঝি সাবিত্রী মহীয়সী নারীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। ফলে বঙ্কিমী নীতিবাগীশতা, রাবীন্দ্রিক রোমান্টিকতা আর শরৎচন্দ্রের জ্যোৎস্নার আবেগ বিহ্বলতা অতিক্রম করে বাংলায় প্রথম যথার্থ শিল্পী মনোচিত নিরাসক্তি আর অনাবিলতায় ঋদ্ধ গণিকা চরিত্র নিঃসন্দেহে 'লঘুগুরু'র উত্তম ও সুন্দরী। আর উত্তমের করুণ পরিণতি ঘটেছে টুকীর পাপের পথে নেমে যাওয়ার মধ্যদিয়ে। উপন্যাসে উত্তম থেকে টুকী—গণিকা নারীর জীবন যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। এরই সাথে সুন্দরী নাম্নী রক্ষিতা নারীর কদর্য জীবন, আর 'স্বভাবসিদ্ধ ইতর' বিশ্বম্ভর এবং 'কোমর বাঁধা শয়তান' পরিতোষের কদর্য জীবনকে লেখক তুলে ধরেছেন। এইসব সমাজ মানুষের জীবন বর্ণনায় লেখক একেবারে স্বতন্ত্র চিন্তার পরিচয় রেখেছেন। এক সময়ের গণিকা উত্তম তার অতীতের যাবতীয় কদর্য-পঙ্কিল জীবন ছেড়ে প্রতিষ্ঠা পেতে চেয়েছে সংসারের গৃহী নারীর মতো গৃহস্থের গৃহান্তরালে। লেখক সেই উত্তমের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন—"... মানুষকে হাতে পাইয়া তাহাকে বশীভূত করিয়া খেলাইয়া খেলাইয়া পিশাচ করিয়া তুলিবার বিদ্যাটা সে চেষ্টা করিয়া ভিতরকার বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া শিক্ষা করিয়াছিল—তখন তার নাম ছিল

বনমালা—তারও আগের নাম যূথী। মানুষ সেই যূথীর শত্রু। কিন্তু যেদিন ঐ কাজে দুরন্ত ঘৃণা ধরিয়া গেল, আর যেদিন বিশ্বম্ভরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল ঐ দুদিনের ব্যবধান খুব অল্প তার হিংস্র পুরুষ বুভূক্ষা লুপ্ত হইয়া তখন পুরাতন গৃহ বুভুক্ষা জাগরিত হইয়াছে।"[৪৩]

সমাজের সঙ্গে নারী চরিত্রের তিনটি প্রবণতার সংগ্রাম ও পরিণতি উপন্যাসে দেখানো হয়েছে।

- নারী স্বভাবের অন্তরীণ গৃহবুভুক্ষা ও প্রেম প্রত্যাশাকারী নারী উত্তম।
- নারী স্বভাবের অপরিমেয় পুরুষবুভুক্ষা ও অর্থলোলুপতা—সুন্দরী। এবং
- নারীর স্বৈরিণী যাপনে বাধ্যকতা—মূলত সমাজের চাপেই তার এই পাপের পথে নেমে যাওয়া—টুকী।

বাস্তব সম্মত বর্ণনার দ্বারা, যা নিছক সাংবাদিকতা নয়, কাহিনীর রূপায়ণে জগদীশগুপ্ত সমাজের পচনশীলতা আর ছিন্ন মানবতাকে তুলে ধরেছেন উপন্যাসে। এই বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক তাঁর সংযমী মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। পাপের পথ ছেড়ে সুস্থ স্বাভাবিকতায় ফেরা উত্তমের অকলুষিত নারীত্বের পরিচিতির অবশ্য প্রয়োজনেই লেখক জানিয়েছেন—"... তার সদ্যস্নাত মুখমণ্ডলের উপর হইতে জল আর আলোর ইন্দ্রজাল তখনো একেবারে মুছিয়া যায় নাই। সিক্ত কেশ কাপড়ের উপর দিয়া পিঠের উপর ছড়াইয়া আছে, চোখের পাতা তখনো ভেজা, তাহাতে তাহাকে বিষন্ন দেখাইতেছে। গোটা কতক জড়ানো চুল ভুরুর উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

অতিশয় সংযত পবিত্র মূর্তি; পরিচয় না দিলে এ যে কি তাহা বুঝিবার যো নাই।"[৪৪] এ হেন গণিকার বদলে যাওয়া জীবন, সংসারে এসে ঘরে বাইরের মানুষের দ্বারা সমালোচিত বিদ্ধ হয়ে বারবার ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। তারই হাতে লালিত-পালিত টুকীর বারবার বিয়ে ভেঙে গেছে। সমাজ-মানুষের অদৃশ্য অঙ্গুলি হেলনে একটি সম্ভাবনাময় সুন্দর জীবনের ঠিকানা হয়েছে রক্ষিতা পরিবৃত পঞ্চাশোর্ধ বিপত্নীক পরিতোষের নরকতুল্য সংসারে। সেখানে টুকীর পিতার অর্থ আর শেষে টুকীর অভুক্ত যৌবনটির উপর লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে পরিতোষ আর সুন্দরীর। বিয়েতে দেওয়া নগদ টাকাগুলো অনেক অস্ফুট এবং নীরব ধস্তাধস্তির পর সুন্দরী আদায় করে নিয়ে নিজের বাক্সে বন্ধ করেছে। সেই অবসরে টুকীর নির্জনতা আর নিঃসঙ্গতার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বাড়ীর যে পরিবেশ চিত্রিত করেছেন তা নিছক পাশ্চাত্য 'রিয়ালিজমের

কারি পাউডার’ নয়, তাঁর চোখে দেখা জীবনের জলছবি—‘‘... এ বাড়ীর মাটিতে যেন স্ফূর্তি নাই দুস্তর বিস্তীর্ণ একটা আবরণ কোথায় যেন চাপিয়া আছে। ময়লার স্তর একটির পর একটি করিয়া জমিয়া তাহাদের ভিতর দুর্গন্ধ আবদ্ধ হইয়াছিল, সেই দুর্গন্ধ যেন এখন রন্ধ্র পাইয়া অল্পে অল্পে নিঃসৃত হইতেছে, কোথায় অবিরাম একটি সাঁই সাঁই শব্দ উঠিতেছে।’’[৪৫]

এমন পুঁতিগন্ধময় পরিবেশে অল্পকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করার পর টুকীর জীবনের অন্তিম সময় ঘণীভূত হয়েছে একদিন রাতের অন্ধকারে পরিতোষ ও সুন্দরীর আনিত খদ্দের অচিন্ত্যর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেহদানের সম্ভাবনার মধ্যদিয়ে। টুকীর সব স্বপ্ন, উত্তমের সমস্ত সোনালী স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। টুকীকে শেষ পর্যন্ত সুন্দরীর বাড়ীর চৌকাঠ পার হয়ে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে দাঁড়তে হয়। বৃত্ত সম্পূর্ণ হয় উত্তমের, পুনরায় গণিকা জীবনের ফিরে যাবার ব্যঞ্জনার মধ্যে। এইভাবে গণিকা নারীর সুস্থ গৃহী জীবনে ফেরার বাস্তবচিত্র আর বিশ্বম্ভর পরিতোষ সুন্দরীর নরকতুল্য জীবনের ছবি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সমালোচিত হয়েছে। এই উপন্যাসটির ‘পুস্তক পরিচয়’ লিখতে গিয়ে তিনি তৎকালীন ‘পরিচয়’ পত্রিকায় লিখেছিলেন—‘‘... এই উপন্যাসে যে লোকযাত্রার বর্ণনা আছে আমি একেবারেই তার কিছু জানি নে। সেটা যদি আমারই ত্রুটি হয়, তবু আমি নাচার। বলে রাখছি এদেশে লোকালয়ের যে চৌহদ্দির মধ্যে কাটালুম, এই উপন্যাসের অবলম্বিত সমাজ তার পক্ষে সাত-সমুদ্র পারের বিদেশ বললেই হয়। দূর থেকেও আমার চোখে পড়ে না। লেখক নিজেও হয়তো বা অনতি-পরিচিতের সন্ধানে রাস্তা ছেড়ে কাঁটাবন পেরিয়ে ও-জায়গায় উঁকি মেরে এসেছেন।’’[৪৬]

রবীন্দ্রনাথ এরূপ সমালোচনা করার পরেও কিন্তু স্বীকার করেছেন ‘তার লঘু-গুরু বইখানা পড়ে দেখলুম। লেখবার ক্ষমতা তাঁর আছে, একথা পূর্বেই জানা ছিল। এবারেও তার পরিচয় পেয়েছি।’[৪৭] ‘অনতি পরিচিতের সন্ধানে রাস্তা ছেড়ে কাঁটাবন পেরিয়ে যে লেখককে ‘ও জায়গায়’ উঁকি মেরে আসতে হয়নি, সেটা লেখকের আত্মপক্ষ সমর্থনের জবাবের মধ্যেই আছে। আসলে ছেলেবেলায় গণিকাদের যেমন প্রতিবেশী হিসেবে দেখেছেন, তাদের আদর-যত্ন-সাহচর্য পেয়েছেন সেই অভিজ্ঞতা তাঁর স্মৃতিতে জাগরুক ছিল। সেই সঙ্গে আদালতে টাইপিস্টের কর্মসূত্রে তিনি যেমন বিচিত্র মানুষকে দেখেছেন, সমাজের যে কদর্য বীভৎস চেহারা প্রত্যক্ষ করেছেন সেই অভিজ্ঞতাও তাঁকে এমন বাস্তবচিত্র বর্ণনায় সহায়তা করেছে। উপরন্তু শান্তিনিকেতনের খুব কাছেই যে বোলপুরের টাউন প্ল্যানিং সে পথ দিয়ে যাতায়াত

কালে ‘ও জায়গা’ লেখক এমনিতেই দেখেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টতই ‘আসামীর পরিবর্তে’ আসামীর জনককে আক্রমণ করার জন্য রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার উত্তরে বলেছিলেন—“লোকালয়ের যে চৌহাদ্দির মধ্যে একতাল আমাকে কাটাইতে হইয়াছে সেখানে ‘স্বভাবসিদ্ধ ইতর’ এবং ‘কোমর বাঁধা শয়তান’ নিশ্চয়ই আছে; এবং বোলপুরের টাউন প্ল্যানিং এর দোষে যাতায়াতের সময় উঁকি মারিতে হয় নাই, ‘ও জায়গা’ আপনি চোখে পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি আমার আপত্তি এই যে, পুস্তকের পরিচয় দিতে বসিয়া লেখকের জীবন কথা না তুলিতেই ভালো হইত; কারণ উহা সমালোচকের ‘অবশ্য দায়িত্বের বাইরে’ এবং তাহার ‘সুস্পষ্ট প্রমাণ’ ছিল না।”[৪৮]

এই ভাবে জগদীশ গুপ্ত তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সমাজজীবন সম্পর্কে আপন ভাবনার বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে আসেননি। বরং স্বমহিমায় বিরাজ করেছেন। গ্রাম সমাজের পট-পরিকল্পনায় তিনি জীবনকে একেবারে নগ্ন করে দেখিয়েছেন। যদিও তাঁর পূর্বসূরী শরৎচন্দ্রই প্রথম যথাযথভাবে গ্রাম জীবনকে সাহিত্যে তুলে এনেছিলেন তবু জগদীশবাবুর সঙ্গে তাঁর পূর্বসূরীর সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্র বিরোধিতার পথে গিয়ে ‘কল্লোল’ গোষ্ঠীর লেখকরা তাঁদের সাহিত্যে যে সমাজ বাস্তবতার পথে পাড়ি দিয়েছেন জগদীশবাবু জ্ঞানতঃ সেই বিরোধিতার পথ মাড়ান নি। বরং কল্লোলীয়দের চেয়ে বয়সে কিছুটা বড় এই মানুষটি নিজের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার নিরীখেই জীবন ও চারপাশকে যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তাতেই তিনি কল্লোলীয়দের থেকে স্বতন্ত্র যেমন হয়েছেন তেমনি নিজস্ব পথরেখাও নির্মাণ করে গেছেন। শরৎচন্দ্র যখন সমস্যার গভীরে ঢুকেছেন তখনও তিনি আবেগের উষ্ণ-অনুরাগের প্রলেপ লাগিয়ে দিয়েছেন সমাজের সব কোণে। সমাজের জাত-পাত ধর্ম-বর্ণ থেকে শুরু করে পতিতা নারীর জীবন সমস্যা—সর্বত্রই শরৎচন্দ্রের হৃদয়ের স্নেহধারা বর্ষিত হয়েছে। এখানেই জগদীশবাবু উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যতিক্রম। এককথায় তাই বলা যায় জগদীশবাবু বাংলাদেশের সমাজের যে চিত্র এঁকেছিলেন তাকে কোনোভাবেই ‘ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা’ বলা যায় না।

তথ্যসূত্র :

১. উপন্যাসে তমসাবৃত জীবন, ড. সরকার, আবদুল মান্নান , বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১২৬।

২. জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ভারবি, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১০০।

৩. শরৎ সাহিত্যে সমাজচেতনা, গ্রন্থালয়, প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ২২৪।

৪. বৃহৎ বঙ্গ, প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬, তৃতীয় মুদ্রণ, পৃ. ৫২৪।

৫. ভারত ইতিহাস পরিক্রমা, শ্রীধর প্রকাশনী, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৮, পৃ. ৩৪।

৬. চর্যাগীতি পরিচয়, ড. সত্যব্রত দে, জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ, ১৯৯৭ চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ১৮৩।

৭. কবি কঙ্কণ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, ড. সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, পৃ. ৩।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫।

১৩. বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, স্বপন বসু, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১৪ পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ৯৫।

১৪. বৈষ্ণব পদাবলী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, চতুর্দশ সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃ. ৫৩।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।

১৬. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৭, পৃ. ৭১।

১৭. দুর্ভিক্ষ, প্রথম গীত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ, সম্পাদনা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দে বুক স্টোর, ১৯৯৫, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৯১।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।

১৯. দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় গীত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

২০. বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

২২. প্যারীচাঁদ রচনাবলী, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, পৃ. ১৩০।

২৩. বাংলা উপন্যাসের উন্মেষ পর্ব, সাহিত্য শ্রী পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১০৭।

২৪. জগদীশ গুপ্তের রচনা ও জগৎ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৭৩।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫।

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২।

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪।

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১,

৪১. কথাসাহিত্যিক জগদীশ গুপ্ত, পৃ. ৬০।

৪২. দুষ্প্রাপ্য জগদীশ গুপ্ত - ১, রাজীব চৌধুরী (সম্পাদনা), সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৭।

৪৩. জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১।

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

৪৬. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৬৩৭।

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৭।

৪৮. জগদীশ গুপ্তের কথাসাহিত্য : ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের আলোকে, ড. প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, পরিশিষ্ট অংশ, পৃ. ২৫৪।

চতুর্থ অধ্যায়
সামাজিক নারী-পুরুষের সম্পর্ক : নতুন দিকের সন্ধান

''পুরুষের কাছে নারী এক অনন্ত অস্বস্তি; নারী তার চোখে দুই বিপরীত মেরু—আলো ও অন্ধকার; সুখ ও ব্যধি। পুরুষের চোখে নারী দেবী ও দানবী; প্রথমে দানবী, তারপর দেবী। নারী করালী দানবী পুরুষের কাছে, যে তাকে পাপিষ্ঠ ও স্বর্গচ্যুত করেছে; যে তাকে প্রলুব্ধ প্ররোচিত প্রতারিত ক'রে চলেছে। পুরুষ সারাক্ষণ ভয়ে থাকে যে ওই পাপীয়সী তার মতো দেবতাকে নামিয়ে দিতে পারে যে-কোনো রসাতলে। পুরুষ তাকে ভয় করে, তবে এড়িয়ে চলতে পারে না; কাম ও পার্থিব প্রয়োজনে সে নারীর সাথে জড়িয়ে আছে।''[১]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যুগ যুগ ধরে নারীর মূলতঃ দুটি পরিচয়ই প্রাধান্য পেয়েছে। হয় সে পুরুষের 'দাসী' কিংবা পুরুষের চোখে সে 'দেবী'। তবে নারীর দাসী সত্তাটিই মুখ্য হয়ে ধরা দেয়। এদেশে এখনো সনাতন ধর্মে পুরুষ বিয়ে করতে যাবার সময় মা'কে বলে যায় 'মা, তোমার জন্যে দাসী আনতে যাচ্ছি'। সংসারে বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যদিয়ে যে মেয়েটি ঘরে আসে তার প্রথম পরিচয় হয়ে ওঠে সে দাসী। সংসারের সকলের সেবা করাই তার জীবনের একমাত্র ব্রত। পুরুষের শারীরিক ও মানসিক সব চাহিদা পূরণ করার জন্যেই যেন নারীর জন্ম। সংস্কৃতে 'ভৃত্য' এবং 'ভার্যা' একই ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন অর্থাৎ 'ভৃ'-ধাতু মানে ভরণ পোষণ করা। এই ভরণ পোষণের দায় কাঁধে নিয়ে পুরুষ নারীকে ঘরে আনে দাসীর সেবা পাবার প্রত্যাশায়। আসলে এদেশের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা সকলেই ছিলেন পুরুষ। তাঁদের ভাবনা প্রসূত আদর্শ জগৎ মানেই পুরুষের জগৎ, তাদের সংস্কৃতি মানেই পুরুষ সংস্কৃতি। নারীর জন্যে পরিসর সেখানে খুবই কম বা নেই বললেই চলে। ফলে সেই প্রাচীনকাল থেকেই নারীকে উর্বর ভূমির সঙ্গে তুলনা করা হত। অর্থাৎ নারীর কাজই হল বংশ রক্ষা করা বা পুরুষসন্তান উৎপাদনের উপায়মাত্র সে। নারীর সমার্থক শব্দ—রমণী, বণিতা, অবলা, বামা ইত্যাদি সবই 'রমণ' বা রতিক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাকে পুরুষের সমকক্ষ ভাবার কোনোই প্রয়োজন নেই—ভরণ পোষণের বিনিময়ে তাকে ভোগ করা আর তার সেবা পাওয়াটাই শেষ কথা। প্রাচীন চিন্তায় নারীকে স্বভাবতই মনে করা হত অশুচি ও অমঙ্গলের উৎস। নারী মানেই বিশ্বাসের অযোগ্য। নারী মানেই নরকের দ্বার ইত্যাদি। নারীকে কখনোই 'পূর্ণ মানব' মনে করা হয়নি। প্রসঙ্গত

কিছু বিশিষ্ট পুরনো ধ্যান-ধারণা তুলে ধরা যায়—

■ বাল্মীকি রামায়ণে লঙ্কা যুদ্ধ জয়ের পর পুষ্পক রথে রামচন্দ্র ফিরছিলেন সীতাকে নিয়ে। সেই বিজয়ের গর্বে রামচন্দ্র সীতাকে কঠোরভাবে অপমান করেছিলেন। তিনি যেন সেই সময়ের পুরুষ প্রতিনিধি, যিনি আপন বীরত্ব আর বংশমর্যাদার রক্ষার জন্যই যেন সীতাকে উদ্ধার করেছিলেন এবং পরপুরুষ রাবণের আশ্রয়ে থাকা সীতাকে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল 'নোৎসহে পরিভোগায়' অর্থাৎ 'তোমাকে ভোগ করতে আমার আর উৎসাহ নেই'।

■ গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মত বহু ক্ষেত্রে আলোকপ্রাপ্ত মানুষটিও মনে করতেন, কিছু কিছু আবশ্যিক গুণাবলী না থাকার জন্যে নারী পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে না।

■ সন্ত টমাস অ্যাকুইনাসও বলেছিলেন, নারী হল অসম্পূর্ণ পুরুষ। নারী তার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে কখনোই পুরুষের সমান হয়ে উঠতে পারে না।

■ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র যদিও নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলেছিলেন তাঁর 'সাম্য' গ্রন্থে—কিন্তু তিনিও তাঁর রক্ষণশীল মানসিকতা থেকে নারীকে পুরুষের মতো পূর্ণ স্বরূপে প্রত্যক্ষ করেননি। তবে তিনি সরাসরি এমন কথা না বলে আদিম সেবী কমলাকান্ত চক্রবর্তীর ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন। তাঁর সৃষ্ট কমলাকান্ত নারীদের সম্পর্কে খুব অকপটে জানিয়েছিল—

"স্ত্রী জাতি অপেক্ষা যে পুরুষ জাতির সৌন্দর্য্য অধিক, প্রকৃতির সৃষ্টি পদ্ধতি সমালোচনা করিয়া দেখিলে আরও স্পষ্ট প্রতীতি হইবে। যে বিস্তীর্ণ চন্দ্রককলাপ দেখিয়া জলদমুকুট ইন্দ্রধনু হারি মানে সে চন্দ্রককলাপ ময়ূরের আছে, ময়ূরীর নাই। যে কেশরে সিংহের এত শোভা, তাহা সিংহীর নাই। যে ঝুটিতে বৃষভের কান্তি বৃদ্ধি করে, গাভীর তাহা নাই। কুক্কুটের যেমন সুন্দর তাম্রচূড়া ও পক্ষ সকল আছে, কুক্কুটীর তেমন নাই।"[২]

■ "রূপ, রূপ, করিয়া স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সকলেই ভাবে, রূপই কামিনীগণের মহামূল্য ধন, রূপই কামিনীকুলের সর্বস্ব। সুতরাং মহিলাগণ যাহা কিছু কাম্যবস্তুর প্রার্থনা করেন, লোকে কেবল রূপের বিনিময়েই দিতে চায়। ইহাতেই মনুষ্য সমাজের কলঙ্ক বারাঙ্গনা বর্গের সৃষ্টি। ইহাতেই পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোকের দাসিত্ব।"[৩]

এইভাবে শুধু রূপের সমালোচনাই নয়, মেয়েরা যে 'কুড়িতেই বুড়ি' হয় অর্থাৎ তাদের যৌবন ক্ষণস্থায়ী এবং তাদের বুদ্ধিও কখনও আধখানা 'বৈ পুরা' কমলাকান্ত অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র

দেখতে পান নি। এই রূপের মোহেই ‘বিষবৃক্ষে’র নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীতে ধাবিত, কিংবা ‘কৃষ্ণকান্তের উইলে’র গোবিন্দলাল রোহিণীতে আসক্ত হয়ে সংসারে অনিবার্য অশান্তি ঘনিয়ে তুলেছিল। এবং এর জন্য বিষময় ফল ভোগ করতে হয়েছিল। সুতরাং বঙ্কিমী ভাবনায় নারী মূলতঃ দাসীর স্তরেই ছিল, ‘প্রকৃত নারী’ হয়ে উঠতে পারেনি। আর হলেও তার মধ্যে দেবীত্ব আরোপিত হয়েছে। ‘দেবী চৌধুরাণী’ উপন্যাসে তাই দেখি ভাগ্‌বতগীতার অনুশীলন তত্ত্বের আলোকে সাধারণ নারী প্রফুল্ল দেবীরাণী হয়ে উঠেছিল যদিও শেষ পর্যন্ত তাকে লেখক ব্রজ বল্লভের গৃহে স্থাপন করে বাসন মাজিয়েছেন অর্থাৎ মহীয়সী দাসীতে রূপান্তরিত করেছেন।

বাংলা উপন্যাসে নারী-মুক্তির কথা প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ‘চোখের বালি’ (১৯০৩) উপন্যাসের বিনোদিনীকে প্রথম যথার্থ নারী বলা যায়, যে অনায়াসেই পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল। নারীদের ব্যক্তিসত্তার দুটি রূপের কথা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেছিলেন। একটি প্রিয়া এবং অন্যটি জননী সত্তা। এবিষয়ে তিনি তাঁর ‘দুই বোন’ উপন্যাসের একেবারে প্রথমেই ‘শর্মিলা’ অংশে জানিয়েছেন—

“মেয়েরা দুই জাতের, কোনো কোনো পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি।

এক জাত প্রধানত মা, আর-এক জাত প্রিয়া।

ঋতুর সঙ্গে যদি তুলনা করা যায়, মা হলেন বর্ষা ঋতু। জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ।... আর প্রিয়া বসন্ত ঋতু। গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায়, যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে, ঝংকারের অপেক্ষায়, যে ঝংকারে বেজে বেজে ওঠে সর্ব দেহে মনে অনির্বচনীয়ের বাণী।”[৪]

লেখকের প্রথমদিকের ‘দেনাপাওনা’ কিংবা ‘হৈমন্তী’ অথবা ‘করুণা’র মতো রচনায় যেখানে নারীত্বের প্রতি চরম অবমাননা করা হয়েছে, নারীকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ অর্থের চেয়ে কম মূল্যবান ভেবেছে সেই সময়ই নারীর কিংবা নারীর জন্যে পুরুষের প্রতিবাদ ধীরে ধীরে শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাইতো ‘দেনাপাওনা’ গল্পের নিরুপমার স্বামী ‘কেনাবেচা দরদামের কথা মানতে চায়নি, বিয়ে করতে এসে বিয়ে করে যেতে চেয়েছে’। কিংবা নিরুপমার মনে হয়েছিল সে কেবল একটা টাকার থলিমাত্র নয়। হৈমন্তীর স্বামী শেষ পর্যন্ত বুঝেছিল হৈমন্তী তার জীবনে সম্পত্তি নয়, ছিল সম্পদ। অন্যদিকে শিক্ষা সংস্কৃতি বর্জিত পুরুষ, ‘যোগাযোগ’

উপন্যাসের মধুসূদন কুমুদিনীকে মর্যাদা দেয়নি মূলতঃ অর্থের অহংকারে। শিক্ষা-দীক্ষাহীন স্বামীর লাম্পট্যে করুণা আত্মহননের পথ বেছে নিলেও দাদার শিক্ষা-দীক্ষায় শিক্ষিতা কুমুদিনী নিজেকে স্বামীর সংসার থেকে দূরে সরিয়ে নেবার কথা ভেবেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার গর্ভের সন্তান তাদের ভাঙা সম্পর্কের মাঝে সেতু স্বরূপ হয়ে উঠেছে। সন্তান না থাকার জন্যে নগেন্দ্র-সূর্যমুখী কিংবা গোবিন্দলাল-ভ্রমরের দাম্পত্য জীবন যেভাবে বিষিয়ে উঠেছিল, কুমুদিনী কিন্তু সেইস্তরে পৌঁছতে পারেনি তার সন্তানের কথা ভেবে। ফলে সম্পর্কটি ভাঙতে ভাঙতে জোড়া লেগে গেছে। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে নারী যখনি হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে তখন শুধু তারা নয়, সাধারণ গৌণ চরিত্রেরাও প্রতিবাদ করেছে। যোগাযোগের নবীন এমন একটি চরিত্র যে অনায়াসেই নারীর অবমাননার প্রতিবাদ করে বলেছে—''দেখো মেজো বউ, এ সংসারে অনেক লাঞ্ছনা পেয়েছি, এ বাড়ির অন্নজলে অনেকবার আমার অরুচি হয়েছে। কিন্তু এইবার অসহ্য হচ্ছে যে, এমন বউ ঘরে পেয়েও কী করে তাকে নিতে হয়, রাখতে হয় তা দাদা বুঝলে না,—সমস্ত নষ্ট করে দিলে। ভালো জিনিসের ভাঙা টুকরো দিয়েই অলক্ষ্মী বাসা বাঁধে।''[৫]

ব্যক্তি নারীর প্রতি এই সম্মাননা বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে 'গোরা' উপন্যাসে আনন্দময়ীর জননী সত্তার বিশ্বব্যাপ্তিতে। এই উপন্যাসের সুচরিতার কথাতেও ভারতীয় সমাজে মেয়েদের সঠিক অবস্থানের চিত্র ফুটে উঠেছে। এ দেশের পুরুষ মানুষ মনে করে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে মেয়েদের বাঁধতে বাড়তে আর ঘর নিকোতে দিলেই তাদের কর্তব্য শেষ হয়ে গেল। একদিকে এমন করে তাদের খাটো করে দেখা হবে, তারপর যখন তারা অজ্ঞানতাবশতঃ ভূতের ওঝা ডাকে তখনো তাদের ওপর পুরুষ রাগ করতে ছাড়বে না। যাদের পক্ষে দু'একটি পরিবারের মধ্যেই সমস্ত বিশ্বজগৎ তারা কখনোই সম্পূর্ণ মানুষ হতে পারে না এবং তারা মানুষ না হলেই পুরুষের সমস্ত বড়ো কাজকে বিনষ্ট করে অসম্পূর্ণ করে পুরুষকে তারা নিচের দিকে ভারাক্রান্ত করে নিজেদের দুর্গতির শোধ তুলতে পারে। এবিষয়ে তাই রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ১০৮ সংখ্যক কবিতায় লিখেছিলেন—

''তোমার আসন হতে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে
সেথায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে অবহেলে।
চরণে দলিত হয়ে

ধূলায় সে যায় বয়ে

সেই নিম্নে নেমে এসো, নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ।

অপমানে হতে হবে আজি তোরে সবার সমান।"[৬]

নারীর অধিকারের প্রশ্নে তিনিই বিধাতাকে সম্বোধন করে প্রশ্ন রেখেছিলেন, কেন নারীকে আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার দেওয়া হবে না? এই প্রশ্নেরই উত্তর সন্ধানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে 'স্ত্রীরপত্র' গল্পের মৃণাল সংসার ছেড়েছিলেন। এবং পুরুষের পদ দলিত না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নারী তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সে আর কিঙ্কিণী বাজিয়ে বাসর ঘরে যাবে না, যতক্ষণ সে প্রকৃত অর্থেই নারী হিসেবে মর্যাদা না পাচ্ছে। এইভাবে জগদীশবাবুর পূর্বসূরী রবীন্দ্রনাথ নারীকে পুরুষের 'দাসী' বা 'দেবী' হিসেবে নয়, পুরুষের সমকক্ষ স্থানে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের পর শরৎচন্দ্রেও নারীর প্রতি অবহেলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আছে। জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী যে অলকাকে একদিন ত্যাগ করেছিলেন পরে দেবদাসী সেই ষোড়শীর গুরুত্ব বুঝতে পেয়ে নিজেই বদলে গেছেন। জগতের মাঝে বিচিত্র রূপিনী নারীরা এইভাবে পুরুষের পদতলে শেষ পর্যন্ত 'দাসী' হয়ে থাকেনি। এই নারীরা কখনো রমণী বা প্রেয়সী হিসেবে, কখনো জননী হিসেবে তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়েছে। নারী চরিত্রগুলিকে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা গেছে। ফলে সেগুলি একদিক থেকে ভিন্নমাত্রা লাভ করেছে। সমাজের প্রথা ও আচারের যূপকাষ্ঠে যেখানে ব্যক্তি অসহায় হয়েও আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে সেখানেই শরৎচন্দ্রের সমর্থন দেখা গেছে। তিনি দরদী মন দিয়ে পুরুষের জীবনে নারীর মূল্য নির্ণয় করেছেন। কারণ তিনি জানতেন ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমাজ কখনোই টিঁকে থাকতে পারে না। তাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ঘরে ও বাইরে তাদের নারীদের ওপর খড়্গহস্ত হলেই শরৎচন্দ্রের দরদী প্রতিবাদ লক্ষ্য করা গেছে। তিনি নারীর মূল্য নির্ণয় করতে গিয়ে 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধের সূচনাতেই লিখেছিলেন—''মণি-মানিক্য মহামূল্য বস্তু, কেননা, তাহা দুষ্প্রাপ্য। এই হিসাবে নারীর মূল্য বেশী নয়, কারণ, সংসারে ইনি দুষ্প্রাপ্য নহেন। জল জিনিসটা নিত্য প্রয়োজনীয়, অথচ ইহার দাম নাই। কিন্তু যদি কখনো ঐটির একান্ত অভাব হয়, তখন রাজাধিরাজও বোধ করি এক ফোঁটার জন্য মুকুটের শ্রেষ্ঠ রত্নটি খুলিয়া দিতে ইতস্ততঃ করেন না। তেমনি—ঈশ্বর না করুণ, যদি কোনদিন সংসারে নারী

বিরল হইয়া উঠেন, সেই দিনই ইঁহার যথার্থ মূল্য কত, সে তর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে আজ নহে। আজ ইনি সুলভ।"[৭]

এইভাবে 'জলের' সঙ্গে উপমায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর মূল্য নিরূপিত হয়ে গেছে শরৎচন্দ্রের চিন্তা-চেতনায়। তিনি স্পষ্টতই উপলব্ধি করেছিলেন, সমাজে পুরুষের পাশ থেকে নারীর স্থান নেমে এসে নরনারী উভয়েই অনিষ্ট ঘটে। কারণ সমাজ মানে নর-নারী শুধু নরও নয়, শুধু নারীও নয়। 'সুসভ্য মানুষের সুস্থ সংযত শুভবুদ্ধি যে অধিকার রমণীজাতিকে সমর্পণ করিতে বলে, তাহাই মানবের সামাজিক নীতি এবং তাহাতেই সমাজের কল্যাণ হয়'[৮] এহেন শরৎসাহিত্যে পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কের নিরীখে নারীর বিচিত্র রূপ প্রতিফলিত হয়েছে—

■ বিবাহিতা, স্বামী বর্তমান অথচ অসামাজিক প্রেম চেতনায় অতৃপ্ত, জীবন বেদনায় কাতরা নারী। এই শ্রেণীর নারীদের মধ্যে 'গৃহদাহ' (১৯২০) উপন্যাসের অচলা অন্যতমা। 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬)-র বিমলা শেষপর্যন্ত স্বামী না স্বামীর বন্ধু—নিখিলেশ ও সন্দীপের মধ্যে শ্রেয় ও প্রেমের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে সন্দীপ সম্পর্কে তার মোহ দূর হয়েছে এবং সে স্বামীর কাছেই ফিরে এসেছে। কিন্তু অচলা স্বামী মহিম আর স্বামীর বন্ধু সুরেশ—এই দুই পুরুষের মাঝে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দোদুল্যমান থেকেছে। গৃহ দাহের পর স্বামীর সামনে স্বামীর বাড়ীর ভিটেতে দাঁড়িয়েই অবলা ঘোষণা করেছিল, যাকে সে ভালোবাসে না, তার ঘর করার জন্য সে এখানে পড়ে থাকবে না। সুরেশ যেন তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। আবার সুরেশের সঙ্গে কদর্য জীবনে ডুবে থেকে সে স্বামী মহিমের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিল। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরী হয়ে গেছে। ফলে বিমলার মত অচলার আর প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়নি।

■ বাল বিধবাদের সঙ্গে জীবন জিজ্ঞাসা ও প্রেম চেতনার সঙ্গে আজন্ম সংস্কারের দ্বন্দ্বমথিত হৃদয় বেদনায় জর্জরিতা নারী। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের রাজলক্ষ্মী, 'পল্লী সমাজ'-এর রমা আর 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের সাবিত্রী ও কিরণময়ী এই পর্বের নারী। বাল্যকালে দেবদাস ও পার্বতীর মত একই পাঠশালায় পড়ার কালেই রমা-রমেশ ও শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রতাপ ও শৈবলিনীর মতো 'বাল্য প্রণয়ের অভিশাপের' কারণে তাদের জীবন শেষপর্যন্ত অভিশপ্ত হয়েই থেকেছিল। এরা সকলেই ব্যর্থ প্রেমের গরল কণ্ঠস্থ করে হয়ে উঠেছিল নীলকণ্ঠ—শুধু রমেশ, দেবদাস কিংবা শ্রীকান্তই না, রমা, পার্বতী এবং

রাজলক্ষ্মীও। বিশেষ করে রমা ও রমেশের জীবনে যেখানে বাধাস্বরূপ ছিল পল্লীসমাজ, সেখানে শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর জীবনে অবাধ প্রেম আর সম্পর্কের গ্রন্থি বন্ধনে অন্তরায় ছিল রাজলক্ষ্মীরই অন্তরস্থ জীবন সংস্কার—একদিকে সে বিধবা এবং অন্যদিকে মৃতা সতীনের পুত্র বঙ্কুকে ঘিরে মাতৃত্ববোধ। বিশেষ করে এই মাতৃত্ববোধের প্রাবল্য তাকে শ্রীকান্তের জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। বড় প্রেম শুধু কাছে টানে না, তা অনেক সময় প্রিয়জনকে দূরেও ঠেলে দেয়---এই তত্ত্বেই শেষ হয়েছে রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্ত, রমা-রমেশ আর সতীশ-সাবিত্রীর সম্পর্কের পরিণতির যাবতীয় সম্ভাবনা। এইসব নরনারী ছাড়া কিরণময়ী চরিত্রটি আলাদা মর্যাদার দাবী রাখে। এই কিরণময়ী রোহিনীর মত শুধু দ্বি-চারিণী ছিল তাই নয়, ছিল বহুচারিণী এবং দেহ সম্ভোগে জ্বালাময়ী। এদিক থেকে সে যেন 'শেষপ্রশ্নের' কমলের পূর্বসূরী। দেহপিপাসা তাকে তিলে তিলে দগ্ধ করেছে এবং পরিণামে সে হীরাদাসীর মত উন্মাদিণীতে পরিণত হয়েছে। সরোজিনী-সুরবালার বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে এই নারী জীবন থেকে তার প্রত্যাশিত কিছুই পায়নি। চরিত্রটির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন—"...বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির মধ্যে যে গভীর অনৈক্য তাহাই মানব জীবনের একটা অমীমাংসিত রহস্য; এবং এই জ্ঞানের আলোকে আমরা কিরণময়ী চরিত্রের অসংগতিগুলিকে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। কেবল সর্বশেষে তাহার মস্তিষ্ক-বিকারের চিত্রটি অতি আকস্মিক হইয়াছে—উপেন্দ্রর আসন্ন মৃত্যুর সংবাদে যে মূর্ছা তাহার প্রেমের গোপন কথাটি সুবিদিত করিয়া ছিল, তাহার ঘোর যে তাহার বুদ্ধিকে চিরকালের জন্য আচ্ছন্ন ও অভিভূত করিবে তাহার ইঙ্গিত সেরূপ সুস্পষ্ট হয় নাই।"[৯]

■ ভীরু প্রণয়ে অসর্থক নারী হিসেবে 'পথের দাবী'র ভারতী ও সুমিত্রা ক্ষণপ্রভার মতো আমাদের চিত্তকে আলোড়িত করে। আসলে সমাজ ও জাতীয় জীবন সমস্যার বিপরীত মেরুতে ব্যক্তি জীবনের চাওয়া-পাওয়া শেষ পর্যন্ত গৌণ হয়ে গেছে এইসব নারীর পরিণতির মধ্যে। সেদিক থেকে শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট সবচেয়ে বিতর্কিত নারী হিসেবে 'শেষপ্রশ্নে'র কমল অনেক বেশী অভিনিবেশ দাবী করে। কমল তার ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া নিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চোখে একটা মূর্তিমান তালভঙ্গের মতো। একজন ইংরেজ সাহেবের ঔরসে বাঙালী জননীর গর্ভে যে মেয়েটির জন্ম, তার প্রথম যৌবনের বিবাহের পর বিধবা কমলের বিবাহ শিবনাথের সঙ্গে। কিন্তু তাতেও অতৃপ্তি জনিত কারণে কমল অজিতের সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ

হয়ে একটা মুক্তপক্ষ জীবন যাপন করতে চেয়েছে—যে যাপন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কোনকালেই মান্যতা দেয়নি। শরৎচন্দ্র তাঁর ভবঘুরে জীবন অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের প্রায় ঘরে ঘরে পৌঁছে যে ভাণ্ডারটি সঞ্চয় করেছিলেন তার পনের আনাই ছিল নারী-পুরুষের জীবন সমস্যা কেন্দ্রীক। কেবলমাত্র প্রেয়সী নারী চরিত্রের ক্ষেত্রেই নয়, জননী চরিত্র সৃজন করেও তিনি সমাজের ত্রিভূজে নারীকে ভূমিরূপে স্থাপন করেছেন এবং তাকে পুরুষের পাশে সম্মানের আসন দিয়েছিলেন। যে সম্মানের কথা কাজী নজরুল ইসলামও তুলে ধরেছিলেন তাঁর কবিতায়—

"সাম্যের গান গাই—
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই!
বিশ্বে যা-কিছু মহান্ সৃষ্টি চিরকল্যাণ-কর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"[১০]

নজরুল এইভাবে শুধু সৃষ্টির অর্ধেক কৃতিত্ব নারীর বলে দাবী করেননি, সমাজ যেসব নারীকে 'বারাঙ্গনা' বলে ঘৃণায় দূরে সরিয়ে রাখে তাদের প্রতিও তাঁর দরদ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। তিনি সমাজের ধর্মাচারী পুরুষকে উদ্দেশ্য করে স্পষ্টতই ঘোষণা করেছিলেন—

"শুন ধর্মের চাঁই—
জারজ কামজ সন্তানে দেখি কোনো সে প্রভেদ নাই!
অসতী মাতার পুত্র সে যদি জারজ পুত্র হয়,
অসৎ পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিশ্চয়!"[১১]

এইভাবে পুরুষ প্রধান সমাজে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার যে লড়াই শুরু হয়েছিল রাজা রামমোহন রায়-বিদ্যাসাগর-স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শায়িত পথে, সাহিত্যে সে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন—মাইকেল মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র থেকে কাজী নজরুল এবং পরবর্তীকালে অনেকেই; সেই ধারায় নারীকে নিয়ে পুরুষের যে চাওয়া-পাওয়া, যে সম্পর্কের দোদুল্যমানতা তার মূল্যায়ন করেছেন জীবনানন্দ দাশ তাঁর বোধের নিরীখে—

"ভালো বেসে দেখিয়াছি মেয়ে মানুষেরে
অবহেলা ক'রে আমি দেখিয়াছি মেয়ে মানুষেরে,
ঘৃণা ক'রে দেখিয়াছি মেয়ে মানুষেরে;

আমারে সে ভালোবাসিয়াছে,
আসিয়াছে কাছে,
উপেক্ষা সে করেছে আমারে,
ঘৃণা ক'রে চ'লে গেছে—যখন ডেকেছি বারে বারে
ভালোবেসে তারে;
তবুও সাধনা ছিলো একদিন—এই ভালোবাসা।"[১২]

নারী-পুরুষের এই ভালোবাসা ঘৃণা—পারস্পরিক টানা-পোড়েনের থেকে কবি সিদ্ধান্ত করেছেন—'তবু এই ভালোবাসা—ধুলো আর কাদা—' (প্রাগুক্ত, পৃ. ১২)

নারী ও পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানদণ্ড কী হবে? শরীর না মন? এমন প্রশ্ন জীবনে ও সাহিত্যে বারবার উঠেছে। কুসুমের শরীর সর্বস্বতায় বিরক্ত শশীভূষণ বলেছিল "শরীর! শরীর! তোমার মন নাই কুসুম?"[১৩] এর বিপরীতে শরীরী আবেদন প্রকাশ করে কুসুম খুব অকপটে শশীকে বলেছিল—"এমনই চাঁদনি রাতে আপনার সঙ্গে কোথাও চলে যেতে সাধ হয় ছোটোবাবু।"[১৪]

কিংবা, "আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটোবাবু?"[১৫]

ভাবনার প্রকাশের নিরীখে তাহলে কে সঠিক—কুসুম নাকি শশী? এই সম্পর্কের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন শরীরটাই আসল, বাকী সব গৌণ। রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভা আবার বলেছেন, তাকে ভালো বাসলেও, তার প্রেমে 'বলি' হলেও তাকে শরীরী সীমায় না চেয়ে তার আত্মাকে ভালোবেসো। অনেকে আবার দেহ ও আত্মার যৌথ অস্তিত্বকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাদের ভাবনায় দেহ আধার আর আত্মা হল আধেয়। অর্থাৎ একটি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব অসম্ভব। সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড বিবাহ জীবনে নারীর মনোভাবের কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন—"... নারীকে প্রেমপ্রবণ করার পূর্বে তাহাকে বিশ্বাসপ্রবণ করিতে হয়, আচার-ইঙ্গিত বাক্যে তাহার স্তুতি বা ব্যাজস্তুতি করিতে হয়, ছোটবড় কোন ত্যাগ দিয়া তাহাকে জয় করিতে হয়। তারপর একবার জয় করিলেই নারীকে জয় করা সম্পূর্ণ হয় না। নিত্যকার সম্মিলনে তাহাকে নূতন করিয়া জয় করিতে হয়। এক সালঙ্কারা কন্যাকে তাহার পিতার নিকট হতে বিবাহানুষ্ঠানের মধ্যদিয়া পাওয়া গেল বলিয়া তাহাকে সর্বতোভাবে জয় করা হইল মনে করা মূর্খতা।"[১৬]

ফ্রয়েড আরও মনে করেন, বিবাহ জীবনে সকল নারীই স্বামীকে পুরোপুরি দেহ দিতে বাধ্য হয়, কিন্তু কেউ কেউ মনের এক আনাও দেয় না। বিবাহ এদের, প্রেমের কবরক্ষেত্র রচনা করে; আজীবন তারা সেই কবরের উপর ফুল ছড়ায়। আর অধিকাংশ পুরুষের স্বভাব কিন্তু উল্টো। শ্রদ্ধা-বিশ্বাস ধার না ধেরেও মুহূর্ত মধ্যে আকৃষ্ট হয়ে তারা একটি স্ত্রীলোককে উপস্থিত ভাবে কামনা করে সুযোগ সুবিধা পেলেই তাকে সর্ব-ইন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করতে উৎসুক ও অগ্রসর হয়। দেহের দিক দিয়ে ভালো লাগলে তাকে দিন কয়েকের জন্য, মাস কয়েকের জন্যে, বছর কয়েকের জন্য ভালোবাসতে পারে আবার না-ও পারে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অবশ্য ব্যতিক্রম রয়েছে। নারী-পুরুষের অন্তর্গত এই দ্বৈত সত্তার কারণ মানুষ নিজেও অনেক সময় খুঁজে পায় না। তবু ধুলো ও কাদার মতো নারী-পুরুষের প্রেমের ধারা প্রবহমান। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উত্তরসূরী হিসেবে জগদীশ গুপ্ত তাঁর উপন্যাসের নারী-পুরুষের সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই ফ্রয়েডের কাছে ঋণী। আসলে জগদীশবাবু তাঁর চারপাশের মানুষগুলির কদর্যজীবন তুলে আনতে গিয়ে নারী পুরুষের সম্পর্কের এই অসুস্থ দিকটির ওপরে আলোকপাত করেছেন। সমাজের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ দাম্পত্য সম্পর্কগুলোর ভেতরের পলেস্তারা ঘসে পড়েছে। অন্যদিকে সমাজ যাদের পতিতা বলে ঘৃণায় দূরে সরিয়ে রাখে, সেইসব নারীর ভেতরেও পুরুষের জন্য বিশুদ্ধ প্রেমধারা বহমান। কিন্তু বাইরে থেকে সেই ফল্গুস্রোতের প্রকাশ একেবারেই থাকে না। ফলে জগদীশবাবুর সৃষ্ট পুরুষ ও নারী চরিত্রগুলোর সম্পর্ককে প্রচলিত ছকে বাঁধা যায় না। অন্ততঃ পূর্বসূরীদের সঙ্গে এবিষয়ে তাঁর সঙ্গে কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

লেখকের ‘লঘুগুরু’ (১৯৩১) গণিকা নারীর সঙ্গে পুরুষের এক অদ্ভুত সম্পর্কের কাহিনী। এই উপন্যাসে গণিকা উত্তম একদিন অন্তরের গৃহ-বুভুক্ষা নিয়ে কদর্য জীবন ছেড়ে বিশ্বম্ভরের হাত ধরে সংসারে স্থিত হতে চেয়েছে। সংসারে এসে তারই হাতে তারই শিক্ষা-দীক্ষায় লালিতা মাতৃহারা টুকীর বিয়ে হয়েছে পঞ্চাশোর্ধ পরিতোষের সঙ্গে। এই পরিতোষ আবার রক্ষিতা সুন্দরীর সঙ্গে কদর্য জীবনে লিপ্ত ছিল। শেষ পর্যন্ত টুকীকে পাপের পথে নেমে যেতে হয় পরিতোষ আর সুন্দরীর ষড়যন্ত্রে। ফলে গণিকা উত্তমের সংসারে ফেরা থেকে টুকীর মধ্যদিয়ে পুনরায় কদর্য জীবনে অবতরণের মধ্যে পুরুষের ভূমিকায় সম্পূর্ণ হয়েছে একটা জীবন বৃত্ত। এই কাহিনীর মধ্যে নারী পুরুষের সম্পর্কের তিনটি কোণ রয়েছে—

■ উত্তম-বিশ্বম্ভর

■ পরিতোষ-সুন্দরী এবং

■ টুকী-পরিতোষ।

লেখকের গণিকা নারীর সঙ্গে অনেকটা মাতৃসুলভ সম্পর্ক, গণিকাদের তাঁদের বাড়ীতে যাতায়াত সূত্রে গণিকাদের সঙ্গে তার একটি আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আত্মকেন্দ্রিক লাজুক প্রকৃতির এই মানুষটি চিরকাল ছিলেন আত্মপ্রচার বিমুখ। নিজের সম্পর্কে তিনি প্রায় কিছুই বলতে চান নি। তাঁর স্ত্রী চারুবালা দেবীর কাছ থেকে লেখকের এই পতিতা সংস্পর্শের কথা জানা যায়। কুষ্ঠিয়ার বাড়ীতে পতিতা নারীরা প্রায়ই আসত লেখকের মায়ের কাছে। এবং বালক জগদীশকে নিয়ে অনেক সময় পর্যন্ত ওদের কাছে রাখত। চারুবালা দেবী জানিয়েছেন—‘‘শ্বশ্রূমাতার কাছে শুনিয়াছি আমলাপাড়ায় আমাদের বাড়ীর ডান পাশ দিয়া অনেকঘর পতিতার বাস ছিল। উহারা লোকের বাড়ি ঝিয়ের কাজ করিত, আঁতুড় পাহারা দিত, কেহ কেহ ঘর ভাড়া করিয়াও থাকিত। ইনি (জগদীশ গুপ্ত) হইবার পর পাঁচ-ছয় মাসের পর ওরা নিজেদের কাছে রাখত, একটু বড় হইলে মালাচন্দন দিয়া সাজিয়ে বাঁশি হাতে দিয়া আনন্দ করিত। শ্বশ্রূমাতা নিজের বাড়ীর জানালা দিয়া দেখিয়াছেন; সময় মতো দিয়া যাইত।’’[১৭]

লেখক পত্নীর এই কথা থেকে বোঝা যায় নিকটস্থ পতিতা পল্লীর কোনো কোনো নারীর সঙ্গে জগদীশবাবুর মায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। গৃহী নারী আর পতিতা নারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য বালক জগদীশ দেখেননি সেদিন। স্বভাবতই পতিতা নারীর সঙ্গে তাঁর ঘৃণার কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি, বরং একটা মধুর সম্পর্কই স্থাপিত হয়েছিল। বালকটির সঙ্গে এইসব পতিতা নারীর সম্পর্ক ছিল একেবারে মাতৃস্থানীয়। সেই সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে ঐসব পতিতা নারীর ওপর বালক জগদীশ তাঁর দুষ্টু বুদ্ধি আর দুরন্তপনা প্রয়োগ করতেন। একবার অল্প বয়সে জগদীশবাবু ড্রেনের মধ্যে পরে গেলে ওরাই তাঁকে ড্রেন থেকে তুলে বাঁচিয়েছিল। এই নিবিড় সম্পর্ক ছাড়াও উত্তরকালে আদালতের টাইপিস্টের কর্মসূত্রে তিনি বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন। স্বভাবতই নরনারীর সম্পর্কের নানা কৌণিকতা তাঁর চোখে পড়েছিল। কখনো কখনো নতুন বৌ-স্ত্রীকে নিয়ে তিনি পথে বের হয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে যে কথোপকথন এমনকি ঝগড়াঝাটি হত, তিনি অদূরে দাঁড়িয়ে থেকে সেসবও দেখেছেন। এই বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতার ফসল তাঁর উপন্যাসের নারী-পুরুষের সম্পর্কের নানা জটিলতর

দিক।

উপন্যাসে উত্তমের গণিকা সত্তাটির পরিচয় দিতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেছেন—"... মানুষকে হাতে পাইয়া তাহাকে বশীভূত করিয়া খেলাইয়া খেলাইয়া পিশাচ করিয়া তুলিবার বিদ্যাটা সে চেষ্টা করিয়া ভিতরকার বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া শিক্ষা করিয়াছিল তখন তার নাম ছিল বনমালা—তারও আগের নাম তার যূথী। মানুষ সেই যূথীর শত্রু।"[১৮]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নিজের জৈবিক চাহিদা মেটানোর জন্যে সংসারের নারীকে পতিতা করে তোলে যে কোন মূল্যে। সংসারের যূথী নাম্নী মেয়েটি হয়তো এভাবেই একদিন পাপের পথে নামতে বাধ্য হয়েছিল। ফলে পতিতা জীবনে এসে যূথীর গৃহী পরিচয় হারিয়ে যায়। তখন সেই নারী অজস্র নামের আড়ালে তার মূল শিকড় হারিয়ে ফেলে। বহু পুরুষকে তৃপ্ত করে তাকে বেঁচে থাকতে হয় ছদ্ম পরিচয়ের আড়ালে। একা। যতদিন শরীরটা পুরুষের ভোগের উপযোগী থাকে ততদিন অর্থ-উপার্জন হয়। তারপর রসশূন্য আখের ছিবড়ের মতো হয়ে যায় সেই নারীর জীবন। তখন বিকল্প জীবিকার সন্ধান করতে হয়। সঞ্চয়ীকৃত অর্থ নিয়ে স্থায়ী ঠিকানার চিন্তা করতে হয়। উত্তম তাদেরই একজন। পতিতা জীবন ছেড়ে বর্তমানে একাই গৃহের অধিবাসী সে। চোখে তার স্বপ্ন স্থায়ীভাবে গৃহী জীবনের একজন হয়ে ওঠা। ভগিণী পতি লালমোহনের বাড়ী যাবার পথে বিশ্বম্ভর খেয়া নৌকায় উত্তমকে দেখে, তার মনে হয় 'এই তার মনের মানুষ', উত্তমও হয়তো এমনই ভেবেছিল। তারপর লালমোহনের মধ্যস্থতায় তাদের কাছাকাছি আসা। এই উত্তম ভোগী পুরুষের ক্ষুধা নিবৃত্তির নারী নয়। বিশ্বম্ভরের কাছ থেকে সে মাতৃহারা টুকীর কথাও শুনেছে। ফলে বিশ্বম্ভরের সঙ্গে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবার অভিপ্রায়ে সে তার স্থায়ী ঠিকানা ছেড়ে চলে এসেছে। কিন্তু স্ত্রী হিসেবে 'স্বভাবসিদ্ধ ইতর' বিশ্বম্ভর কোনোদিন উত্তমকে সম্মান করেনি। উপন্যাসে নানা ঘটনায় সেই অসম্মান, বঞ্চনা, মানসিক নির্যাতনের পরিচয় লেখক তুলে এনেছেন। উত্তমকে সংসারে নিয়ে এসে বিশ্বম্ভরের মনের যে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া তার মধ্যেই পুরুষসত্তার বীভৎসরূপ পরিস্ফুট হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ লেখক জানিয়েছেন—"...স্ত্রীর কাছে সে নিজে লক্ষ্মী ছাড়া আচরণের বড়াই করিত এ-ও স্ত্রীলোক; কিন্তু ইহার সম্মুখে তাহার সেই আচরণের ফল অত্যন্ত বীভৎস বলিয়া বিশ্বম্ভরের এখন মনে হইতে লাগিল।"[১৯]

উত্তমের আগমনে প্রতিবেশীদের কৌতূহলে বিরক্ত বিশ্বম্ভর জানিয়েছে নতুন মানুষের গন্ধ

পেলেই প্রতিবেশীরা দল বেঁধে দেখতে আসবেই। কিন্তু উত্তম তো নতুন বৌ নয়। অর্থাৎ শুরু থেকেই বিশ্বম্ভর উত্তমকে স্ত্রীর মর্যাদা দেয়নি। কিন্তু উত্তমের আচার-আচরণে সে বুঝতে পারে উত্তমকে সে যে বস্তু মনে করেছিল সে বস্তু নয়। এই নারী বাধ্য করতে জানে। স্ত্রী সে নয়। স্ত্রীর নবতর ও উৎকৃষ্টতর একটা রূপ সে। স্ত্রীকে গণ্ডীর মধ্যে ফেলে পিষতে পারা যায়; নিজের মনটাকে তৈরী করে নিলেই পেষণ অনায়াসসাধ্য। আর স্ত্রীতো গণ্ডীর বাইরে যাবে না। কিন্তু উত্তমের সেই সংকীর্ণতা নেই। সমস্ত পৃথিবী তার জন্য মুক্ত, সে স্বেচ্ছায় ডানা গুটিয়ে 'পিঞ্জরে' ঢুকেছে। অবশ্য এই গভীরবোধ ক্ষণিক। সুযোগ বুঝে বিশ্বম্ভর তার 'পুরুষরূপ' ধরেছে। অত্যন্ত নিস্পৃহ উদাসীনভাবে তারই কৃতকর্মের জন্য সে তার পূর্বপত্নী হিরণের মৃত্যু হয়েছে সেটা উত্তমকে জানালে 'উত্তম সত্যি ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে।' এই কান্না দেখে বিশ্বম্ভর হো হো করে হেসে উঠেছে এবং উত্তমকে অনায়াসেই বিড়াল-শকুনের সঙ্গে তুলনা করে বলেছে—''...কার শোকে কে কাঁদেরে বাবা তার দিশে পাওয়া ভার—মাছ মরলে বিড়াল কাঁদে, গরু মরলে শকুন; আর পদির পিসী কাঁদে পদি মারলে বলে উকুন।''[২০] ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে বাড়ীতে মদের আসর বসাতে চাইলে উত্তমের অনুমতি মেলেনি। বিশ্বম্ভর চেয়েছিল উত্তমও সেই আসরে থাকুক। তখন উত্তম জানতে চেয়েছে টুকীর মা-ও আগে থাকত কিনা। প্রত্যুত্তরে 'দাঁতে জিব কাটিয়া বিশ্বম্ভর বলিল,—না, না; সে ছিল বউ মানুষ'। এখানেও বিশ্বম্ভর উত্তমের নারীসত্তায় আঘাত করেছে। বন্ধুরা অনুমতি না পেয়ে উত্তমকে 'খাণ্ডারী' বললে বিশ্বম্ভর তার প্রতিবাদ করেনি। কেবল সেই সংবাদটি উত্তমের কাছে পরিবেশন করেছে উত্তমের নারী সত্তার কথা না ভেবেই। প্রতিবেশী মোক্ষর মা টুকীর কানে কানে বিষ ঢেলে বলেছিল—'তোর মা বেশ্যে ছিল। গয়না দিয়েছে হাজার লোকে—তোর এ বাবা দেয়নি।'[২১] একথা টুকীর কাছে শুনে বিশ্বম্ভর এর জন্য কোনো প্রতিবাদ না করে মেয়ের আকুলতা নিয়ে লালমোহনের সঙ্গে রসিকতা করে আসলে উত্তমকে অপমান করেছে নির্দ্বিধায়। প্রতিবেশীরা টুকীকে নিয়ে উত্তম পালিয়ে গিয়ে দেহ ব্যবসায় লাগাতে পারে—এমন আশংকাকে মৃদু সমর্থন জানিয়েছে বিশ্বম্ভর। উত্তমের শেখানো পথে টুকী 'কাপড় ছেড়ে রান্নার জল' দিচ্ছে দেখেও বিশ্বম্ভর উত্তমকে কটাক্ষ করতে ছাড়ে নি—''...তোমার শুচিবাই দিন দিন বাড়ছে দেখছি। গেরস্তের ঘরে ওটা কিছু কিছু থাকা ভাল; কিন্তু তুমি অনেক গেরস্তের বৌকেও হা'র মানিয়ে দিতে পার।''[২২] যে উত্তমের অর্থে বিশ্বম্ভর তার সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ ফিরিয়েছে সেই উত্তমের

কারণে যখন টুকীর বিয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছিল বারবার তখনো উত্তমকেই আক্রমণ করেছে অকৃতজ্ঞ বিশ্বম্ভর। একদিকে প্রথমা পত্নীঘাতী বিশ্বম্ভর এইভাবে উত্তমকে সংসারে নিয়ে এসে কোনদিন যথার্থ নারীর সম্মান দেয়নি। যদিও দু-একটি ক্ষেত্রে বিশ্বম্ভর যে উত্তমকে ভালোওবাসতো তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। উত্তমের বাড়ীর সম্পত্তি বিক্রির টাকা ও কাগজপত্রাদি দিয়ে ফেরার সময় লালমোহন উত্তমকে বলেছিল যে বিশ্বম্ভর বোকা কিন্তু উত্তমকে ভালোবাসে। এছাড়া বন্ধুরা মদ্যপানের আসর বসবার জন্য বিশ্বম্ভরকে দিয়ে উত্তমের কাছে পাঠিয়েছিল। কিন্তু উত্তম রাজি হয় নি। তখন ব্যর্থ মনোরথ বিশ্বম্ভরের উত্তমের প্রতি ভালোবাসা আর হারাবার ভয়ের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন—"...ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিবার সময় তার মনের গতি ফিরিল। তার মনে হইতে লাগিল, আমি তাকে ভালবাসি সেও ভালবাসে এককালে যে দশজনের পক্ষে-সুলভ ছিল বলিয়াই কেবল সেই কারণেই এখনও তাহাকে হাটের মধ্যে নিজেও ডাকিয়া আনিয়া সুলভ প্রাপ্যের দলে ছাড়িয়া দিতে হইবে, ইহাই বা কেমন কথা! তাহাতে কোন লাভ নাই, বরং লোকসানের ভয় আছে—তাহাকে চিরদিনের মতো হারাইবার ভয় আছে।"[২৩] এই ভয় থেকেই সে উত্তমের কাছে 'তেতলার বড়বাবুর'র গল্প শুনে গর্জন করে বড়বাবুকে 'শালা' সম্বোধন করে তাকে পথের মাঝে ধরে জুতো পেটা করতে চেয়েছিল। এইভাবে আত্মস্বার্থ-সর্বস্ব বিশ্বম্ভর স্ত্রীর প্রতি যে আচরণ করেছিল তাতে তাকে খাঁটি শয়তান না বললেও পুরোপুরি ভালো মানুষ বলা যায় না।

উপন্যাসে বিশ্বম্ভরের বিপরীতে স্ত্রী হিসেবে গণিকা উত্তম যেন মূর্তিমান তালভঙ্গ। গৃহ বুভুক্ষা উত্তমকে বিশ্বম্ভরের গৃহে এনেছিল। কিন্তু বিশ্বম্ভরের কথাতেই সে আর পাঁচজন বঙ্গ গৃহী নারীর মতো সংসারের ময়দানে ফুটবল মাত্র ছিল না—যাকে যেভাবে খুশি যেকোন দিকে লাথি মেরে উদ্দেশ্যের অভিমুখী গোলপোস্টে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। যূথী থেকে বনমালা আর বনমালা থেকে উত্তম সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির নারী। এই উত্তম বিশ্বম্ভরের মতো হীনমন্য স্বার্থপর-মাতাল-লম্পট মানুষকে ভালোবেসেই নিজের স্থায়ী আশ্রয় ছেড়ে চলে এসেছিল। সংসারে এসে মাতৃহীনা টুকীকে বুকে টেনে নিলে তার মধ্যে মাতৃসত্তারও জাগরণ ঘটেছিল। কিন্তু বিশ্বম্ভরের মতো পৌরুষ সম্পন্ন পুরুষদের কাছে সে সহজে মাথা নত করেনি। বিশ্বম্ভর সম্পর্কে নিজের ভাবনা ব্যক্ত করে সে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করতে চেয়ে বলেছে টুকীর সামনে ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে কোনমতেই গৃহে আসর বসানো চলবে না। তার মনের অবস্থা

ব্যক্ত করে লেখক জানিয়েছেন—‘‘...শত পুরুষের মুখে সহস্রবার সে এই পৌরুষের কথা শুনিয়াছে; স্ত্রী একেবারে ব্যক্তিত্ব বর্জিত পদানত কৃপাভিক্ষু বলিয়াই তাহাকে তার ভাল লাগে নাই—যেখানে প্রখর স্পষ্ট কথা, উদ্দামতা, কাড়াকাড়ি করিয়া পূর্ব্বোপভুক্ত সামগ্রী ভোগ করিবার দুর্দ্দমনীয় নেশা ঘূর্ণিত হইতে থাকে সেই স্থানটি তাহাদের এমন মধুর লাগে যে, আত্মবিস্মৃতিতে মৃত্যুভয় পর্য্যন্ত থাকে না—

এই ব্যক্তি তাহাদেরই একজন।”[২৪] ব্যক্তিত্বহীন স্বামী যখন বন্ধুরা স্ত্রীকে ‘খাণ্ডারী’ বললেও প্রতিবাদ করতে পারেনি তখন উত্তমের লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেছে এবং স্ত্রীকে বেড়ালের মত বস্তায় পুরে বিদেয় করা কিংবা দুধ মাছ দিয়ে পোষ মানানোর খেলাকে উত্তম ধীক্কার জানিয়েছে। বহু পুরুষচারিণী উত্তম সংসারের বৃত্তে এসে খুব অল্পদিনেই বিশ্বম্ভরকে চিনে নিয়েছে। পুরুষ হিসেবে বিশ্বম্ভরের মোহ জন্মে, কিন্তু অপছন্দ হলে গায়ে হাত তুলতেও তার বাধে না। নৈতিক মর্যাদার বিন্দুমাত্র বোধ নেই। সুখ দুঃখের অনুভূতির ধার সে ধারে না। বিদ্ধ করে ছেড়ে দিলে ঘুরে আসে। ‘পনের আনা মেরুদণ্ডহীন মানুষের এই চরিত্র’। কিন্তু শক্তি মানুষের চিরদিন থাকে না বলে উত্তমেরও আস্তে আস্তে সব সহ্য হয়ে যেতে থাকে। বিশ্বম্ভরের সব অপমান সে নীরবে সয়ে যায়। টুকীই হয়ে ওঠে তার ধ্যান-জ্ঞান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারই কারণে টুকীর বিয়ে ভেঙ্গে গেলে সে নিজেকে অপরাধী মনে করে টুকীর কাছে ক্ষমা চায়। তার আপত্তিকে গুরুত্ব না দিয়ে বিশ্বম্ভর পঞ্চাশোর্ধ বিপত্নীক পরিতোষের নরকে টুকীকে নিক্ষেপ করে। উত্তমের ভেতরের নির্মল শুভ্র নারী সত্তা টুকীকে শেষদিন পর্যন্ত সৎ পরামর্শ দেয়—‘‘...স্বামী পরমগুরু সাক্ষাৎ ভগবান; তাঁহাকে কিছুতেই অবহেলা করিবে না, ইহাই আমার একমাত্র কথা। কোনো অবস্থাতেই তাঁহাকে লঘু ভাবিও না; যদি অনুমতি দেন তবে তার চরণ পূজা করিও।”[২৫] এককথায় গণিকা উত্তম যেভাবে গৃহী নারীর অন্তরে নিজেকে নিয়ে গিয়েছিল, বাংলাদেশের বহু গৃহী নারীও সেই স্তরে পৌঁছতে পারে না।

উপন্যাসে উত্তম আর টুকীর মধ্যবর্তী গণিকা সত্তাটি হল সুন্দরী। বাহ্য সুন্দর নামের আড়ালে এই সুন্দরী বারাঙ্গনাটি যেন নিষিদ্ধ পল্লীর সব বেশ্যাদের কর্ত্রী, এক ধরণের মাসি চরিত্র যে গণিকাদের জন্য খদ্দের ঠিক করে কেবল জীবিকা নির্বাহ করে তা নয়, জৈবিক ক্ষুধা নিবৃত্তির এক পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করে নতুন মেয়েদের জন্য খদ্দেরের আমদানীর মধ্যদিয়ে। চ রিত্রটি যেন ‘নীলদর্পণ’ (১৮৬০) নাটকের পদী ময়রাণী চরিত্রটির উত্তরসূরী।

যদিও উপন্যাসে তার কোনো পূর্ব-পরিচয় লেখক দেননি। চরিত্রটি সম্পর্কে সমালোচক ড. সরকার আবদুল মান্নান যথার্থই লিখেছেন—''উপন্যাসে সুন্দরীর বেড়ে ওঠার কোনো ইতিহাস নেই। বংশানুক্রমিকভাবেই সে কোনো মানসিক বৈকল্য ধারণ করে নিয়ে এসেছে কিনা তাও জানা যায় না। কিন্তু যে সামাজিক পরিমণ্ডলগত বাস্তবতার মধ্যে সে বসবাস করে সেখানে এই মনোদৈহিক বিকৃতিই স্বাভাবিক। এক অপরিমিত যৌন অস্বাভাবিকতার মধ্যেই সে বেঁচে আছে।''[২৬] উপন্যাসে সুন্দরীকে আমরা দেখি পরিতোষের রক্ষিতা হিসেবে। বিপত্নীক পরিতোষের সঙ্গে তার দীর্ঘ ত্রিশ বছরের সম্পর্ক। চাকরী করার সময় পরিতোষের আয় ছিল ঢের, ফলে বাজে খরচ করেও কোনো আর্থিক সংকট দেখা দেয়নি। কিন্তু অবসরের পর নামকীর্তনে ডুবে থাকার কারণে সংসারে স্বভাবতই অনটন শুরু হয়। সুন্দরী আক্ষেপ করে বলেছে—''... তোমায় নিয়ে আমার চিরকালই দুঃখে গেল। দুঃখে ভাজা হয়ে গেছি।''[২৭] চাকরী সূত্রে পরিতোষ যখন উদ্ধবপুরে প্রথম বদলি হয়, সেই সময়ই সুন্দরীর সঙ্গে তার পরিচয়। তখন থেকেই তারা ডোমপাড়ায় একইসঙ্গে বসবাস করছে। এই বাড়ীঘর সুন্দরীর। তবে তিনখানা ঘরের একখানাকেই ঘর বলা চলে—বাকীগুলোর বিপর্যস্ত অবস্থা। আর একখানা ঘর নয়, বেড়ার সঙ্গে আধলা বাঁশ সারবন্দি করে টিনের আচ্ছাদন দেওয়া আছে সেখানায় রান্না হয়। এরকম বস্তির মতো অসুস্থ পরিবেশে দীর্ঘ ২৯ বছর ধরে তাদের অশ্লীল কদর্য জীবন যাপন। তবু পরিতোষ নামক পুরুষটি এতকাল ছিল তার একার। কিন্তু বঙ্কুর আনিত বিয়ের প্রস্তাবে সুন্দরীর অভিমানে আর ক্ষোভে শরীর জ্বলে যায়। পরিতোষের কথায় উত্তরে সে স্পষ্টতই জানিয়ে দেয়—''...আমার ওজর নেই, করো তুমি বিয়ে। আর পারিনে দিনরাত নেই নেই করতে—ইঁদুরে খুঁটে খাবে এমন দানাটিও নেই ঘরে। আমার মায়ের মা মরেছে পালঙ্কে শুয়ে, মা মরেছে পালঙ্কে শুয়ে; আমি ডোমপাড়ার ঘাটে মরব না—তুমি বিয়ে করো।''[২৮] সুন্দরী ভালোভাবেই জানত পঞ্চাশোর্ধ পরিতোষ টুকীকে বিয়ে করছে শুধুমাত্র অর্থের জন্য এবং যুবতী বউটিকে পেলে ভবিষ্যতে স্থায়ীভাবে সঞ্চয়ের একটি সুনিশ্চিত পথ তৈরী করবার জন্য। এই অসুস্থ ভাবনায় সুন্দরীরও সায় ছিল। কারণ তার কাছে পাপ-পুণ্য বলে কোন কিছু ছিল না, তার মনে হত শরীরের সুখই আসল সুখ। মনের সুখও শরীরের সুখ দিয়েই আসে। তাই টুকীর বিয়ের নগদ পণ বাবদ আঠারো শ' টাকা সে পরিতোষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু সেদিন রাত্রেই ঐ টাকা চুরি হয়ে গেলে সুন্দরী দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং

এরপর তার নজর পড়ে টুকীর উদ্ভিন্ন যৌবনের উপর। আপাদমস্তক পাপের পক্ষাঘাতগ্রস্ত সুন্দরীর মধ্যেও একটা শুভ চেতনা সম্পন্ন নারী ছিল যেটা পরিতোষ কোনদিন টের পায়নি। উত্তমের প্রতি সুন্দরীর সম্ভ্রমবোধ কিংবা বিশ্বম্ভরের পরিতোষের গৃহে আগমনের পর সুন্দরী লজ্জায় তার সামনে প্রথমে আসতে পারেনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিতোষ আর তার ষড়যন্ত্রে টুকীকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে খদ্দেরের কাছে।

সুন্দরীর সঙ্গে কদর্য জীবন কাটাবার আগে পরিতোষ বিয়ে করেছিল ছত্রিশ বছর আগে 'দুদিনের জন্য'। স্ত্রী অল্পদিনেই মারা যায়। ফলে স্বামী হিসেবে তার কোন সুস্থ সুন্দর পরিচয় প্রথমাবধি আমরা পাই না। এমনকি স্ত্রীর জন্যে তার মধ্যে কোনরকম তাপ-উত্তাপ দেখি না। ঠক প্রবঞ্চক 'কোমর বাঁধা শয়তান' এই চরিত্রটি সুন্দরীর যৌবনটুকু শুধু ভোগ করেছে। কোন নৈতিক কর্তব্য পালন সে করেনি। পরে তাই অনায়াসেই টাকার লোভে টুকীকে বিয়ে করতেও তার মনে কোনো দ্বিধা হয়নি। বিয়ের অল্পদিনের মধ্যেই টুকী বুঝে গিয়েছিল তার সুস্থ দাম্পত্য জীবনের স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। কারণ সুন্দরীর সম্পর্কে টুকী জানতে চাইলে অনায়াসেই পরিতোষ উত্তমের সঙ্গে তুলনা টেনে জানিয়েছে 'তোমার মা তোমার বাবার যা হয়।'[২৯] শুনে টুকীর মুখ পাংশু হয়ে গেছে। মায়ের মুখটা মনে করে তার চোখ জলে ভরে গেছে। নিজেকে সে সৌভাগ্যবতী ভেবেছে, অমন মায়ের হাতে মানুষ হতে পেরে। এবং পরিতোষ সম্পর্কে তার ধারণা স্পষ্ট হয়ে গেছে। লেখক তার মনোভাব ব্যক্ত করে জানিয়েছেন—"এই ব্যক্তি তাহার পিতার দুর্ব্বলতার সুযোগে তাহার মায়ের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছে। সঙ্গে সে আসিয়াছে আনুসঙ্গিকভাবে। সে পত্নী নয়, দায় মুক্তির দক্ষিণা।"[৩০] ঘুমন্ত স্বামীর রূপহীন দেহটা টুকীর কাছে অসহ্য লাগে। আর পাশের ঘরে সুন্দরীর বীভৎস নাক ডাকাকে মনে হতে থাকে সর্ব্বভূক্ রাক্ষসের সঘন উদ্‌গারের মত। টুকীর চোখের সামনে দেওয়ালে একটা ছবি ছিল যাতে, কোন এক সতী স্বামীর পাদপূজা করছে ফুল ঢেলে পা আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। পরিতোষ কিংবা বিশ্বম্ভর কেউই অমন স্বামী নয়। তবু উত্তম নিজের গুণে ঢেকে রেখেছিল বিশ্বম্ভরকে। তাই টুকীর কাছে পৃথিবীটা ছিল সুন্দর। মায়ের কথা খুব মনে পড়ে টুকীর এবং তারই শিক্ষায় শিক্ষিতা টুকী পরিতোষের যৌবনকালের একটি ছবিকেই টাঙিয়ে রেখে পূজা করত। কিন্তু পরিতোষ সেই পূজা পাবার যোগ্য ছিল না। সে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে একদিন সেসব টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। টুকীর অন্তরের নারীত্বটুকু সে যেন

এইভাবে গলা টিপে হত্যা করে। এরপরেই টুকীকে পাপের পথে নামানোর যৌথ আয়োজন চলে। এইভাবে 'স্বভাবসিদ্ধ ইতর' বিশ্বম্ভর, 'কোমরবাঁধা শয়তান' পরিতোষ আর শরীর সর্বস্ব পুরুষ অচিন্ত্যদের মিলিত প্রয়াসে উত্তম-সুন্দরী-টুকীদের জীবন অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। সম্পর্কের এই বীভৎস ও করুণ দিকটিকেই জগদীশবাবু বড় করে দেখিয়েছেন। এখানে তাঁর সৃষ্ট নারী-পুরুষের ভালোবাসার সম্পর্ক 'ধুলো আর কাদা' হয়ে ওঠেনি।

বাংলাদেশের সমাজ যে মেয়েদের কোনোকালেই মানুষ হয়ে উঠতে দেয়নি; মেয়ে করেই রেখেছিল, রাখতে চেয়েছে, পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠতে দেয়নি, তার যথার্থ উদাহরণ লেখকের 'সুতিনী' উপন্যাসটি। সমালোচক ড. ক্ষেত্র গুপ্ত উপন্যাসটি সম্পর্কে লিখেছেন—''সুতিনী একটি বহুমাত্রিক জটিল মানসিকতার উপন্যাস। বাঙালির পুরনো দিনের পরিবার জীবনে একটি মৃতবৎসা নারীর মনোকুটের বিভিন্ন স্তর এই লেখায় বেশ শৃঙ্খলার সঙ্গে বিন্যস্ত হয়েছে। বাঙালির সংসার সমাজে নারীর (এবং পুরুষেরও) যৌনতা ভিত্তিক মনোকুটের অর্থাৎ সেক্স-অবসেশনের এই উৎসটি সুপরিচিত। জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসে মনোবিকারের যে বিচিত্র চরিত্র-মূর্তি অঙ্কনের চেষ্টা তার মধ্যে সুতিনীর সমস্যাটি বিশেষভাবে বাঙালী জীবনের অঙ্গ।''[৩১]

এই বাঙালী জীবনেরই একটা বড় দিক নারী-পুরুষের সম্পর্ক। বিশেষ করে দাম্পত্য জীবনের বিচিত্র জটিল সমস্যার নিরীখে। সম্পর্কের সমীকরণ কেমনভাবে বদলে যায় সেসব একেবারে নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে এনেছেন জগদীশবাবু। এই উপন্যাসে রাজবালা ও দুর্গাপদর সংসারে একটা সময় পর্যন্ত শান্তি ছিল। কিন্তু রাজবালা পরপর চারটি মৃতপুত্র প্রসব করায় সংসারে অশান্তির কালোমেঘ ঘণীভূত হয়ে ওঠে। রাজাবালা মৃত সন্তান প্রসবের দায় স্বামীর ওপর চাপায়। স্বামীর ভগ্ন স্বাস্থ্য, শ্রীহীনতাজনিত কারণেই যেন চতুর্থ পুত্রের মৃত্যুর পর রাজবালার মূর্তি ভয়ংকর হয়ে ওঠে। একটা সময় স্বামীর প্রতি তাকে বলতে শোনা যায়—''সাত বছর গোঙালে আমায় নিয়ে তুমি—রোজ এমন চমকালে' এতদিন পাঁজরায় হাড় ফেটে প্রাণ বেরিয়ে যেত' তোমার। আমার অদ্দেষ্ট দেখে' তোমার চমকানই উচিত। তোমার বিবেচনা নাই এমন ত' নয়—আমার স্বামী-ভাগ্য আর তোমার সন্তান ভাগ্য দেখে স্বয়ং শনি চম্‌কে যাবেন—তুমি ত' মানুষ; শনির মতো তুমি মানুষের কাচা মাথা সত্যিই চিবিয়ে খাও না; কিন্তু আমার অদৃষ্ট তুমি পুড়িয়ে দিয়েছ।''[৩২] যে মেয়ে ছেলেবেলায় বেড়াল পোষা নিয়ে মায়ের

সঙ্গে ঝগড়া করতে ছাড়ে নি, সেই একগুঁয়ে জেদী মেয়েটি স্বামীর সুস্থ সন্তান দানের অক্ষমতা আর নিজের জরায়ুর সুস্থতা প্রমাণের জন্য সে মরীয়া হয়ে ওঠে। জেদের বশে নিজের বোন মধুবালার সঙ্গে স্বামীর বিয়ে দেয়। মুহূর্তের এই বিভ্রান্তি রাজাবালার জীবনে ট্রাজেডি ঘনিয়ে তোলে। বিয়ের মাসখানেকের মধ্যেই মধুবালা আর স্বামীর সম্পর্ককে ঘিরে রাজবালার জীবনে যে চরম বিপর্যস্ত অবস্থা দেখা দিল তারই পূর্ণরূপ প্রত্যক্ষ করা গেল মধুবালা পুত্রবতী হওয়ায়। অন্তরের সুপ্ত ঈর্ষা এখন আগ্নেয়গিরির মতো প্রবল অগ্ন্যুৎপাত শুরু করে। কেবল ঈর্ষা নয়, নিজের পরাজয়ের গ্লানি ও আত্মধিক্কার তাকে জর্জরিত করে তোলে। শেষ পর্যন্ত সে তার জরায়ু সংক্রান্ত মিথ্যা জনরবকে মিথ্যা প্রমাণ করার লক্ষ্যে সফল হয়েছে। আসলে দুর্গাপদ'র কাছে স্ত্রী হিসেবে নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠাই ছিল তার কাম্য। কিন্তু সেটা সে পারেনি। কারণ প্রতিষ্ঠার বেদী থেকে সে নিজেই নিজেকে বিসর্জন দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে সূর্যমুখী যখন নগেন্দ্রর কাছে কুন্দনন্দিনীর কথা শুনেছিল, তখন নিছক মজার ছলে চিঠিতে স্বামীকে লিখেছিল—''একটি বালিকা কুড়াইয়া পাইয়া কি আমায় ভুলিলে? অনেক জিনিষের কাঁচারই আদর। নারিকেলের ডাবই শীতল। এ অধম স্ত্রী জাতিও বুঝি কেবল কাঁচামিটে? নহিলে বালিকাটি পাইয়া আমায় ভুলিবে কেন? ... আর যদি কুন্দকে স্বয়ং বিবাহ করিবার অভিপ্রায় করিয়া থাক, তবে বল, আমি বরণডালা সাজাইতে বসি।''[৩৩]

এরপর স্বামীর মনোভাব বুঝতে পেরে সূর্যমুখীই স্বামীর সঙ্গে কুন্দর বিয়ে দিয়েছে কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'দুইবোন' উপন্যাসে শর্মিলার মনের অবস্থার সঙ্গে রাজবালার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেলেও রাজবালার এই প্রয়াস ছিল সম্পূর্ণই তার স্বেচ্ছাধীন এবং সুপরিকল্পিত। এই ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনার পরিণতিতে তার জীবনে ট্রাজেডি অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। এদিক থেকে রাজবালাকে শেকস্‌পীয়রের নায়কদের 'নারী সংস্করণ' বলা যায়। আসলে অসুস্থ দাম্পত্য সম্পর্কের বিষময় পরিণতিই লেখক তুলে ধরেছেন নায়কের বিপরীতে দুই নারীকে সামনে রেখে। লেখকের 'চন্দ্রসূর্য যতদিন' গল্পেও দেখি স্বামীত্বের অধিকারের প্রশ্নে ক্ষণপ্রভাব স্বামী যখন তার শ্যালিকাকে বিয়ে করে আনে, তখন থেকে ক্ষরপ্রভার সঙ্গে স্বামীর দূরত্ব তৈরী হয়। সন্তান নিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে উন্মাদ হয়ে যেতে দেখা যায় গল্পের শেষে—''হঠাৎ মেঘের ডাকে ঘুম ভাঙিয়া দীনতারণ দেখিল ক্ষণপ্রভা শয্যায় নাই, ছেলেটিও নাই, দরজা খোলা।... ঘরে নাই, বারান্দায় নাই, বাড়ির ত্রিসীমানায় নাই। কিন্তু কোথাও সে ছিল— ভোরবেলা

একজন তাহাকে ধারিয়া আনিয়া হাজির করিয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া দাড়াইল, সবাই মুখ ফিরাইল। এখন সে নগ্ন দেহ—
সম্পূর্ণ উন্মাদ; কিন্তু ছেলেটি বুকে আছেই।"[৩৪]
নারী-পুরুষের সম্পর্কের সমীকরণের এই জটিলতা আরও জটিল হয়ে উঠেছে লেখকের 'নিষেধের পটভূমিকায়' উপন্যাসে। প্রথমে এটি 'শঙ্কিতা অভয়া' নামে গল্পাকারে বেরিয়েছিল। কাহিনীটিতে অভয়া তার কন্যা শান্তিকে নিয়ে একদিন অতুলের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছিল। যুবতী শান্তির সঙ্গে তার সৎ পিতা অতুল নারী-পুরুষের সম্পর্কের সবদিক নিয়েও খোলামেলা আলোচনা করে। এমনকি শান্তিকে নিয়ে সিনেমায় পর্যন্ত যায়। এসব দেখে শুনে অভয়া ভীষণ শঙ্কিতা। রাত দশটা বেজে গেলেও তারা গৃহে ফিরছিল না দেখে অভয়া গভীর দুশ্চিন্তাবোধ করে। তারা ফিরে এলে শঙ্কিতা অভয়া শান্তির কাছে প্রশ্ন করে—"বল সত্যি করে শান্তি, ও তোকে নষ্ট করেনি তো?"[৩৫]
যে পুরুষের হাত ধরে স্বামীর সংসার ত্যাগ করেছিল অভয়া তার প্রতি বিশ্বাস রাকতে পারেনি। দাম্পত্যে পারস্পরিক বিশ্বাসটাই বড় কথা। এই বিশ্বাস না থাকলে সেই সম্পর্ক একটা অসুস্থ রোগগ্রস্ত সম্পর্কমাত্র। এবং তার ফল কখনোই ভালো হয় না। অভয়ার প্রশ্নে শান্তি শুধু বিস্মিত হয়েছে তাই নয়, সে তার প্রকৃত পরিচয় জানতে চেয়েছে। জানতে চেয়েছে কেন অভয়া তাকে তার বাবার কাছ থেকে নিয়ে চলে এসেছে। কেন বাবার কাছে তাকে রেখে আসেনি। এরপর শান্তি ফিরে গেছে তার প্রকৃত পিতার কাছে। কিন্তু যেখানে গিয়েও সে হতাশ হয়েছে। তার জন্মদাতাও আবার সংসার পেতেছে। ফলে সেখানে সৎমা ও সমাজের ভয়ে তার পিতা বসন্ত তাকে আশ্রয় দেয়নি। এইভাবে অসুস্থ দাম্পত্যের কবলে পড়ে একটি শিশুর ভবিষ্যৎ বিনষ্ট হয়ে গেছে। যদিও লেখক এরপর শান্তির উত্তরণ দেখিয়েছেন, কিন্তু সেটা যথেষ্ট বাস্তবোচিত হয়নি।

বিচিত্র রকম মানুষের সংস্পর্শে আসার সূত্রে লেখক সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্কের অসুস্থ দিকটি বারবার তুলে এনেছেন। বেশীরভাগ পুরুষ ভাবে স্ত্রী হল স্থায়ী মূলধন। সে তো ঘরে থাকবেই। যদি অতিরিক্ত কিছু স্বাদ বাইরে থেকে পাওয়া যায় তবে মন্দ হয় না। এরকম কদর্য মানসিকতার পুরুষ 'গতিহারা জাহ্নবী' উপন্যাসের অকিঞ্চন। বিবাহিতা স্ত্রীকে সে কোনোকালেই সম্মান দেয়নি। পাড়ার সমবয়সীদের সঙ্গে সে বেড়ে ওঠে; কিন্তু বন্ধুদের

থেকে ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয় তার জীবন। যথাসময়ে সে বিয়ে করে কিশোরীকে। 'অপদার্থ অকিঞ্চনের' স্ত্রীর পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন—''প্রবোধের স্ত্রী শীর্ণা, সুধীরের স্ত্রী স্থূলাঙ্গী, গণেশের স্ত্রী কৃষ্ণকায়া, ত্র্যম্বকের স্ত্রী স্থূলমধ্যা, অরুণের স্ত্রীর চক্ষু ক্ষুদ্র ইত্যাদি। অকিঞ্চনের স্ত্রীর নিখুঁত দেহ। চন্দ্রের মতো অশেষ তাহার দেহের লাবণ্য, অঙ্গের প্রভা, মুখের স্ত্রী, গঠন-সুষমা তাহার অতুলনীয়। অত্যন্ত সচেতন মনে সেই রূপ বেশীক্ষণ দেখা যায় না।''[৩৬]

কিন্তু কিশোরীর এই রূপ লাবণ্য ও সংবেদনশীল হৃদয়বৃত্তি অকিঞ্চনের মনকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। সে স্ত্রীকে ছেড়ে বন্ধু মহলেই পড়ে থাকে। এবং স্ত্রী সম্পর্কে বন্ধুদের প্রশংসায় খুবই নিস্পৃহ থাকে। স্থূল দেহসর্বস্ব বন্ধুদের চেয়েও অধম অকিঞ্চন। স্ত্রীর সম্পর্কে তার ভাবনা অত্যন্ত কদর্য। এই অপ্রীতিকর দৃশ্যের বর্ণনা করে লেখক জানিয়েছেন—''অকিঞ্চনের তরফ হইতে স্ত্রীর সম্বন্ধে একটা প্রবল উল্লাস আর উচ্ছ্বাস দেখিবার আশা করিয়া তারা কথাটা তোলে—প্রশ্নের মধ্যে তাদের নিজেদেরই একটা সূক্ষ্মতম অভাবের অনুভূতি যেন তৃপ্তি খুঁজিয়া বেড়ায়; কিন্তু অকিঞ্চনের সম্বিত নিদ্রিত কুম্ভকর্ণের মত, থাকিয়াও নাই, পৃথিবীর জীবনের জীবন যেরূপ সেই রূপের নাগাল পাইয়াও সে যেন উন্মীলিত চক্ষুর দৃষ্টির দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিতে চায় না।''[৩৭]

অকিঞ্চনের ভেতরে একটা চরম অস্থিরতা শুরু হয়ে যায়। কিশোরী তো তার স্থায়ী সম্পদ, কিন্তু সেই মেয়েটি একদিনের জন্যেও তার হল না ভেবে সে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। তার মরে যেতে ইচ্ছে করে। বন্ধুদের কাছে রসিয়ে বসিয়ে সেই গল্প করে। ফলে তার এই আদিমতার কথা সমস্ত গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামের বিধবা বৃদ্ধা কিশোরীর শাশুড়ির কাছে ধাবিত তেল শোধ দেবার নাম করে অকিঞ্চনের সেই আদিম লোলুপতার কথা তোলে। সমস্ত রটনার কথা অকিঞ্চনের কানে গেলেও সে নির্বিকার। স্ত্রীর কাছে সেই 'সই'য়ের কথা তোলে যাকে বিয়ের সময় দেখেছিল। এমনকি প্রচণ্ড আশংকা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে বাপের বাড়ী গেলে সেখানেও অকিঞ্চন অনায়াসেই স্ত্রীর কাছে তার সখি অপরার কথা তোলে—'তোমার সইকে দেখলাম না 'তো'? বজ্রাহত কিশোরী স্বামীকে চলে যেতে বলার জন্য মাকে সব জানায়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মা ও অন্যান্য শুভাকঙ্ক্ষীদের অনুরোধে কিশোরী শেষ পর্যন্ত শ্বশুর বাড়ীতে আসে। অকিঞ্চনের গল্প তখনো কিশোরীর বান্ধবীকে নিয়ে। বাগ্‌দিপাড়ায় 'খারাপ' মেয়েদের সঙ্গে

তার সম্পর্ক জানাজানি হয়ে গেছে। স্বামীর কবল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে কিশোরী বাপের বাড়ী চলে গেছে, আর ফিরে আসেনি শ্বশুরবাড়ীতে। কিন্তু দৈবনির্ধারিত পথেই সে দু'মাস যেতে না যেতেই গভীর বেদনার সঙ্গে অনুভব করে সে গর্ভবতী। সংসারের আর কোনো নারী জঠরে সন্তান আগমনের সংবাদ কেউ এমন যন্ত্রণার সঙ্গে গ্রহণ করেছে কিনা তার কোনো উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমন নিরর্থক অযাচিত ব্যাপার একদিকে হাস্যকর অন্যদিকে হৃদয় বিদারক হয়ে আর কোনো নারীর জীবনে কখনোই ঘটেনি। কিশোরীর মনে হয়— ''... এই সন্তান কি স্বামীর আত্মজ? স্বামী যাহা অকাতরে দান করিয়া করিয়া ইহকাল ও পরকাল ব্যাপী কলুষ মর্ম্মে আত্মায় পুঞ্জীভূত করিয়াছিল, এই সন্তান সেই অশেষ কলুষজাত, ইহা শুভ নহে, সার্থক নহে, ঈপ্সিত নহে, ইহা অবাঞ্ছিত এবং বর্জনীয় কলুষ।''[৩৮]

অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কিশোরী চরিত্রটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ' যোগাযোগ' উপন্যাসের কুমুদিনী চরিত্রের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। দু'জনের তুলনা করে তিনি লিখেছেন—''স্থূল স্বামী এবং আদর্শ রুচি, পত্নীর ব্যক্তিত্ব সঞ্জাত দ্বন্দ্বের আশ্চর্য শিল্পরূপ আমরা 'যোগাযোগ' উপন্যাসেও প্রত্যক্ষ করি। 'যোগাযোগের' ব্যক্তিসত্তাগুলি নিজ নিজ ইতিহাসের যোগফলে জগদীশবাবুর ব্যক্তিবৃন্দ অপেক্ষা বিরাটতর। উপন্যাসের উদ্দিষ্ট রসবস্তুকে শিল্পের ও জীবনের ন্যায়ে বন্দী করার প্রয়াসেও রবীন্দ্রনাথ অধিকতর অভিনিবেশের পরিচয় দিয়েছেন।''[৩৯]

পুরুষের চোখে নারীর অবমাননার এই চিত্র জগদীশবাবুর 'মহিষী' উপন্যাসটিতেও আমরা লক্ষ্য করি। পুত্রের জন্য পাত্রী নির্বাচন করতে গিয়ে ব্রজকিশোর পাত্রীর পিতার বিষয় সম্পত্তিকেই প্রাধান্য দেন। সেই বিকারে তিনি বাতাসপুরের মন্মথ চৌধুরীর কন্যাকে নির্বাচন করেন। বন্ধু মারফত পাত্রী দেখার প্রস্তাব পাঠিয়ে ছেলে অশোক ব্যর্থ হয়ে পিতার পছন্দের কালো মেয়েটিকেই বিবাহে সম্মত হয়, তা না হলে পিতার বিষয় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে হবে। স্ত্রীকে সে সমাদরেই গ্রহণ করে। কিন্তু যেদিন পিতার গোপন অভিসন্ধি জানতে পারে সেদিন থেকে নিরপরাধ জ্যোতির্ময়ীর প্রতি তার অন্যায় আচরণ বর্ষিত হতে থাকে। লাঞ্ছিতা অপমানিতা জ্যোতির্ময়ী পিত্রালয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। এবং স্ত্রীর চোখে যাবতীয় দায় চাপিয়ে দেয় স্বার্থপর অশোক। বন্ধুদের কাছে সে অনায়াসেই স্ত্রী সম্পর্কে বলেছে—''কালো বউ আরো আছে; কালো বউ নিয়ে সুখ-শান্তিতে আছে, এমন মানুষও আছে। কিন্তু এ একেবারে। ...

প্রবৃত্তি বড় জঘন্য, আর ঘেন্না বলে কোনো আবরণ তার নেই। হস্তিনী নারীর সব লক্ষণ তাতে বিদ্যমান।"[৪০]

এই রটনাক্রমে প্রচারিত হয়ে জ্যোতির্ময়ীর পিতা মন্মথনাথের কানে যায়। পিতার কাছে এই সংবাদ পেয়ে জ্যোতির্ময়ী শ্বশুর বাড়ী ফিরলেও অশোক তাকে গ্রহণ করেনি। ফলে তাদের শয্যা পৃথক হয়েছে। ব্যর্থ যৌবনের তাড়নায় একদিন অশোক স্ত্রীকে শারীরিক ভাবে পেতে চেয়েছে। কিন্তু জ্যোতি অত্যন্ত ঘৃণা ভ'রে স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করেছে। জ্যোতি বুঝেছিল অশোক তাকে ভালোবাসে না। শুধু তার শরীরটাকে ভোগ করতে চায়। সেজন্যে অশোক একটা মীমাংসাতেও আসতে রাজি। শরীর সর্বস্ব স্বামীকে সে জানিয়েছিল—"... দিতে না এসে নিতে আসা তোমাদের পক্ষেই সম্ভব; কিন্তু সম্পর্ক তাতে জন্মে না, আমরা তা পারিনে।... শয্যাংশ দিয়ে যদি আমায় কৃতার্থ করবার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে সে তোমার বৃথা আশা। ... তুমি যে ত্যাগ করেছিলে, সেইটেই সত্য। মাকে বলেছি ক'নে দেখতে।"[৪১]

মূলত জ্যোতিরই উদ্যোগে অশোক পুনঃরায় বিয়ে করে। এরপর শাশুড়ির কাছে পিত্রালয়ে যাবার ইচ্ছা পোষণ করেছে। স্বামীর কাছে বিদায় চাইতে গিয়ে সে দেখে অশোক নববধূর সঙ্গে রসালাপে মগ্ন। জ্যোতির্ময়ী অনুভব করে তার স্বামী ভোগ্যবস্তু পেয়ে গেছে। এইভাবে অসহনীয় দাম্পত্য জীবন থেকে জ্যোতির্ময়ী মুক্তি খুঁজেছে।

'দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা' উপন্যাসেও মল্লিকার অসুস্থতার কথা না ভেবে তার শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা বংশধর প্রত্যাশা করলে অসুস্থ মল্লিকা একটি মৃত সন্তান প্রসব করে। এবং পরে আর গর্ভধারণ করতে না চেয়ে পিত্রালয়ে চলে যায়। স্বামী তাকে ফিরিয়ে আনতে গেলে সে আর আসতে না চাইলে মামলা আদালত পর্যন্ত গড়ায়। এককথায় নারীর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল মা হওয়া —এমন একটি শাশ্বত ধারণা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে নারীর উপর। সেই গতানুগতিকতা ভেঙ্গে মল্লিকা আপন নারীসত্তাকেই বড় করে তুলেছে। পুরুষ প্রধান সমাজে নারীর এইভাবে নিজেদের স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত করার আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

"বাংলা কথাসাহিত্যে নারী চিত্তের সচেতনতা রবীন্দ্রনাথই প্রথম সূচিত করেন। নারী চরিত্রে মর্যাদার প্রতিষ্ঠায় শরৎচন্দ্রও পশ্চাৎপদ ছিলেন না— কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যা ছিল তাত্ত্বিক আদর্শবাদ ও মানবতত্ত্বের অখণ্ড প্রকাশ এবং শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ছকে ধৃত

মানস-কল্পনার প্রতিচ্ছবি, জগদীশগুপ্তের কলমে তা বাস্তবতার বিচক্ষণ দৃষ্টিতে সম্পৃক্ত হয়ে অন্য একটি মাত্রা লাভ করেছে।"[৪২]

লেখকের 'নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ' উপন্যাসে কুম্ভকর্ণ শশধর ছিল তার স্ত্রীর কাছে বীরপুরুষ। স্বামীর সম্পর্কে স্ত্রীর মনে মনে গর্বের সীমা ছিল না। কিন্তু তার অন্তরস্থ কুম্ভকর্ণ সত্তাটি যে শেষপর্যন্ত সংকটের আবর্তে পড়েও জাগরিত হয়নি এবং তার ফলে স্ত্রীর চোখে তার বীরসত্তার পতন ঘটেছে। আবাল্য ভীরুতা নিয়ে সমাজের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বেড়ে উঠেছিল শশধর। পরে শরীরচর্চা করে অসীম বলের অধিকারী হয় সে। স্থানীয় একটি ষাঁড়ের কবল থেকে সে দিনকর দে নামক বিপন্ন পথচারীকে রক্ষা ক'রে বিখ্যাত হয়ে যায়। চারদিকে তার বীরত্বের কথা ছড়িয়ে পড়ে। তার অনেক শিষ্য জুটে যায়। তার স্ত্রী নিজেকে 'ভীমের স্ত্রী' বলে গর্ব করতে শুরু করে। এমন অবস্থায় একটি রাতের ঘটনায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের পতন ঘটে। প্রতিবেশী নকুলের বাড়ীতে ডাকাত ঢুকেছিল। গতবছর এমন দিনেই দূরের একটা খড়ের বাড়ীতে আগুন লেগেছিল সন্ধ্যার পর। শশধর ভাতের থালা ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে একাই একশোজনের কাজ করেছিল। আগুনের গ্রাস থেকে অনেক সম্পত্তি রক্ষা করেছিল, দু'খানা ঘর ভেঙে ফেলেছিল প্রায় একাই। কিন্তু ডাকাতি পড়ার দিনের ঘটনায় শশধরকে ব্যগ্র হতে দেখা গেল না। সে শুয়েই রইল। ওঠার কোনো চেষ্টা সে করলো না। লেখক জানিয়েছেন—"একটি নারী কণ্ঠের আর্তনাদ কানে আসিল—আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করিয়া, জ্যোৎস্নালোক তামস তুহিন পুঞ্জে আবৃত করিয়া, জীবনের জাগৃতিকে শিহরিত করিয়া এবং বোধহয় অন্তরের দেবতাকে বিদ্ধ করিয়া সে শব্দ উত্থিত হইল এবং মিলাইয়া গেল। ... তারপর গুরুভার দ্রব্য পতনের শব্দ হইল; গুরুভার দ্রব্যটি বোধহয় মনুষ্য দেহ। ... এবং তারপরই একটা পুরুষ কণ্ঠ চীৎকার করিয়াই গোঙাইতে গোঙাইতে নিঃশব্দ হইয়া গেল।"[৪৩]

শশধরের স্ত্রী-স্বামীকে ছুটে যাবার কথা বললে 'দরকার নেই' বলে শশধর চোখ বন্ধ করে রাখে। তার চেতনার জাগরণ ঘটে না। পরদিন সকালে জানা গেল নকুলের বিধবা কন্যাকে অপরহণ করা হয়েছে। নকুলের পা ভেঙেছে। মানুষের বিপদে মানুষ এগিয়ে যাবে এটাই 'ঈশ্বর প্রদত্ত সহজ প্রবণতা'। কিন্তু শশধর প্রাণভয়ে সেই কাজ করতে পারেনি। সমবেত জনতার মনে প্রশ্ন জাগে, 'শশধর বাবু টের পান নি? অর্থাৎ শশধর জেগে থাকলে নিশ্চয়ই এমন ঘটনা ঘটতো না। কিন্তু স্ত্রীর কাছে শশধরের কাপুরুষত্বের কথা গোপন থাকেনি। স্ত্রী

তাকে অভিযুক্ত করে বলেছে—

■ "...তুমি এমন কাপুরুষ তা জানতাম না। আমি তোমার লজ্জায় তোমার মুখের দিকে চাইতে পারছিনে।"[৪৪]

■ "...সর্বনাশের জন্যে দায়ী তুমি—তুমি পাপী। তুমি যে যাও নি এ অন্যায়টা আমি কিছুতেই কোনো কৈফতের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছি নে। বড় কষ্ট হচ্ছে আমার।"[৪৫]

■ "... মানুষের অস্তিত্ব কেবল তার হাতের পায়ের গা-গতরের নড়াচড়ায় জানা যায় আর মনে থাকে ভেবেছ। অমন নড়া ভূতেরাও নড়ে—, জানোয়ারও নড়ে—সম্ভ্রমবোধ কতটা এই মানুষের অস্তিত্বের পরিচয়—তা তোমার নেই আর তোমার জন্যেই মানুষের তা নষ্ট হয়েছে। তোমার অস্তিত্বই আমি দেখছি নে।"[৪৬]

■ "... তোমার তরুণ ভক্তেরা তোমায় কি মনে করবে এখন? তাদের সামনে মুখ তুলতে পারবে? ... এ তোমার সাময়িক ভীরুতা নয়, তোমার মজ্জাগত চিরদিনের ভীরুতা। তোমার কোনো মূল্য নেই।"[৪৭]

নিজেকে নিস্ক্রিয় রেখে শশধর এইভাবে নিদ্রিত কুম্ভকর্ণের মতো পড়ে থেকে স্ত্রীর চোখে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে। একটি ঘটনার বিষময় ফল হিসেবে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের বাঁধন আল্‌গা হয়ে গেছে। যেখানে পৌঁছে স্ত্রীর মনে হয়েছে, তার কাছে তার স্বামীর আর কোনো মূল্য নেই।

লেখকের 'নন্দ আর কৃষ্ণা' উপন্যাসে নারী-পুরুষের সম্পর্কে ত্রিমুখী দিকের পরিচয় লেখক তুলে ধরেছেন। পুরুষের রূপজ মোহ ও তার সমস্যা নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। সম্পর্কের ত্রিমুখী কৌণিকতার কেন্দ্রগুলি হল—

- মমতা ও নন্দকিশোর
- কৃষ্ণা আর মণীন্দ্র এবং
- নন্দ আর কৃষ্ণা।

মণীন্দ্রবাবু তার প্রথম পক্ষের ছেলের গৃহ শিক্ষক হিসেবে নন্দকে নিযুক্ত করেন। আর নন্দ যাকে মণীন্দ্রবাবুর স্ত্রী বলে জানে সেই কৃষ্ণা আসলে মণীন্দ্রবাবুর রক্ষিতা। কাহিনীর প্রথম ভাগে কৃষ্ণার অনাবৃত দেহ আকস্মিকভাবে দেখে ফেলে নন্দ। তীব্র অপরাধবোধের তাড়না এবং শাস্তির ভয়ে সে পলায়ন করেছে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে গৃহের পরিবেশে স্ত্রীর মমতায়

স্নিগ্ধ সাহচর্যেও কৃষ্ণার রূপ ও যৌবনের আকর্ষণ ভুলতে পারেনি। এই আকর্ষণ শুধু নন্দর দিক থেকে নয়, কৃষ্ণাও পলায়নরত নন্দর উদ্দেশ্যে জানিয়েছে—''পালাবেন না; আমাকে আয়নায় যেমন দেখেছেন, তেমনি দেখা আমার ভালো লাগে, আপনাকে আরো—আপনি নির্ব্বোধ, তাই দিশে পান না, পালান্।''[৪৮] বিগত যৌবন মণীন্দ্রবাবুর সঙ্গে কৃষ্ণার কোনো জৈবিক মিলনের উত্তাপ উপন্যাসে নেই। কিন্তু মণীন্দ্রবাবুর মধ্যে বিকৃত কামের প্রকাশ আছে; আর তার রক্ষিতা কৃষ্ণার মধ্যে রয়েছে অতৃপ্ত কামনা। সেই কামনার আগুনেই কৃষ্ণা পুরুষদের মোহিত করে পোড়াতে ভালোবাসে। কিন্তু নন্দ কৃষ্ণার আহ্বান উপেক্ষা করেই পালিয়ে গেছে তার স্ত্রীর কাছে। যাবার সময় বিকৃতকাম মণীন্দ্রবাবু নন্দকে নির্দিষ্ট দিনের ছুটি মঞ্জুর করেছেন; কারণ তার মনে হয়েছে তেইশ বছর বয়সে বিয়ের পর কোনো পুরুষের পক্ষে একা থাকা খুব কষ্টকর আর এই কাজে বাধা দিলে তার অভিশাপ লাগবে। ছুটি মঞ্জুর নিয়ে দু'জনের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছে তাতে মণীন্দ্র'র বিকৃত রুচির প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

''...গৃহ শিক্ষকের আনন্দেই অনুকম্পাশীল অভিজ্ঞ ঐ ব্যক্তির আনন্দ কিনা তাহা নন্দ ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, যাবো?

— যাও; কিন্তু—

— দু'রাত্রি পাবে?

নন্দ জবাব দিল না—

মণীন্দ্র বলিলেন, দিনে গাড়ী কখন?

— তিনটেয়।

— তা হলে দুপুরটাও পাচ্ছ। বলিয়া মণীন্দ্র সম্পর্ক বিগর্হিত এবং বয়সের তারতম্য হিসাবেও অত্যন্ত অনুচিত একটা ইঙ্গিতের হাসিতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া তুলিলেন।''[৪৯] গৃহে পৌঁছে নন্দ স্ত্রী ও মায়ের জেরার মুখে পড়ে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। বলে পালিয়ে চলে এসেছে। স্ত্রীকে গভীর আগ্রহের সঙ্গে আলিঙ্গন করে। কিন্তু স্ত্রীর পাশে শুয়েও নন্দর অবচেতন মন কৃষ্ণার রূপকে ঘিরে স্বপ্ন দেখে। সেই স্বপ্নের প্রেক্ষাপট রচনায় লেখক জানিয়েছেন—

''নারীর রূপ আর আকর্ষণ, বিভ্রান্তিকর সেই মোহন ইন্দ্রজাল, পুরুষ অত সহজে আর অত সত্ত্বর ভুলিতে পারিলে পৃথিবীর বুক হাল্কা, কাব্য ক্ষুণ্ণ এমন কি মরণশীল, পুরাণ

অপাঠ্য, আর পাগলের সংখ্যা চৌদ্দ আনা হ্রাসপ্রাপ্ত হইত। তা যাতে না হয় সেই জন্যই বোধহয় নন্দকিশোর সেই রাত্রেই এক অভাবনীয় স্বপ্ন দেখিল।"[৫০] নন্দের স্বপ্নে ধরা দিয়েছে কৃষ্ণা, যার ভয়ে নন্দ বাক্স-বিছানা আর একুশ দিনের বেতন ত্যাগ করে পালিয়ে এসেছে; সেই কৃষ্ণা একটি অতি উজ্জ্বল সিংহাসনে বসে আছে, পা দুটো স্থাপিত হয়েছে সাদা গজদন্ত নির্মিত একখানি পাদপীঠের ওপর, অস্তগামী সূর্যের লাল আভার মত তার বসন এবং নন্দকিশোর তারই পদপ্রান্তে বসে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছে। এই স্বপ্নই নন্দকে যুবতী স্ত্রীকে ছেড়ে কৃষ্ণার কাছে টেনে এনেছে। মণীন্দ্রবাবু ব্যাঙ্কের কাজে এলাহাবাদে গেলে কৃষ্ণার প্রতি নন্দর যৌন অনুভূতি ও ভোগলালসা চরম আকার ধারণ করেছে। এর বিপরীতে কৃষ্ণার অন্তর্গত স্বরূপটিও লেখক উদ্‌ঘাটিত করেছেন। পুরুষকে এভাবে খেলাতেই তার চিত্ত সুখ হয়। তার ভেতরের বিকৃত সত্তাটি প্রকটিত হয়েছে কৃষ্ণার মায়ের কথাতেই। তিনি মণীন্দ্রর বাড়ী গিয়ে নন্দকে দেখেই ভয় পেয়েছিলেন। এই ভয়টা নন্দর দিক থেকে নয়, তার নিজের মেয়ের দিক থেকেই। নন্দর সহজ-সরল-কচি মুখটা তাকে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। নন্দকে তিনি অকপটে জানিয়েছেন—"তোমাকে বল্‌ব কি বাবা, মেয়েটা চিরকাল শয়তান। ... ভারি নিষ্ঠুরের মতো স্বভাব ওর। রূপ আছে, রূপের জোরে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলে মজা দেখা ওর মজ্জাগত অভ্যাস। কতজনকে যে মিছিমিছি পাগল করেছে তার ইয়ত্তা নেই। মনে হয়, কাউকে ভালোবাসে না, বাসতে পারেই না, ঈশ্বর ওকে সে ক্ষমতা দেন নাই। তোমাকে মণির বাড়ীতে দেখে আমার তৎক্ষণাৎ মনে হল, আর, ভারি ভয় হল যে, এই ভালো ছেলেটাকে বজ্জাত মেয়ে আমার কষ্ট না দিয়ে কিছুতেই ছাড়বে না।"[৫১] কৃষ্ণার মায়ের এই সতর্কবাতায় নন্দ'র চোখ খুলে যায়। কৃষ্ণার মাকে সে 'ঘেন্না' করে কিনা জানতে চাইলে সে 'না' সূচক মত দিয়েছে এবং সেইসঙ্গে কৃষ্ণার মাকে বলেছে—"আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন শৃঙ্খলমুক্ত করে' নবজীবন দান করেছেন, সুখী করেছেন।"[৫২] এই মুক্তির পরে পরেই তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে 'মমতার মুখচ্ছবি'। এইভাবে পুরুষের রূপজমোহ থেকে নন্দের মুক্তি ঘটেছে। নদীর পাড় ভাঙ্গাগড়ার মতো সম্পর্কের টানা পোড়েনের অবসান ঘটেছে এবং নন্দ ফিরে গেছে তার সুস্থ জীবনে।

'কলঙ্কিত তীর্থ' উপন্যাসটি প্রথমে 'নিরূপম তীর্থ' বা 'ত্রিলোকপতির তীর্থ ভ্রমণ', 'কলঙ্কিত সম্পর্ক' বা 'আহুতি' শীর্ষক বিভিন্ন ছোটগল্পাকারে বেরিয়েছিল। উপন্যাসটি আত্মপ্রকাশ

করে লেখকের মৃত্যুর পর। 'কলঙ্কিত তীর্থ' গল্পটিতে নারী ঘটিত অপরাধের ফলে সাতকড়ি জেলে যায়। দীর্ঘ দেড় বছর পর জেল থেকে ফিরে এলে বাড়ীর সকলেই তাকে গ্রহণ করে কিন্তু স্ত্রী মাখন তাকে মেনে নিতে পারে না। এই মেনে নিতে না পাবার জন্যে শাশুড়ি সমাজপতির ভূমিকা নিয়ে মাখনকে বাড়ী থেকে বের করে দেয়। এরপর উপন্যাসে মাখনকে উদ্ধার করে ত্রিলোকপতি এবং পরে বিগ্রহের সামনে পরপর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সাতকড়ি মাখনের সম্পর্কের দিকটি যতটা বিশ্বস্ত হয়েছে কিন্তু মাখন-ত্রিলোকপতির অধ্যায়টি ততখানি বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ী এলে সাতকড়ি বা সাতুর জীবনে সে হয়ে ওঠে সবচেয়ে কাছের মানুষ—এটাই প্রচলিত রীতি। শাশুড়িও তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন ছেলের বন্ধন সেই, জীবনের শৃঙ্খলা সে-ই, সৌষ্ঠব, স্ত্রী, সুখ, সৌন্দর্য-সবকিছু তারই হাতে। কিন্তু মধুডাঙার হাটে রাতের অন্ধকারে ইয়ার-বন্ধুসহ বাইশ তেইশ বছরের বিধবা মেয়েটির সঙ্গে 'ফুর্তি' করতে গিয়ে সাতকড়ি ধরা পড়ে। মাখনের পৃথিবী ওলোট-পালট হয়ে যায়। পুত্রকে মাখনের হাতে তুলে দিয়ে শাশুড়ি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। মাখনের অস্তিত্বই যেন হয়ে উঠেছিল অপরাজেয় অপরিহার্য শাসন বাণী; তাকে লঙ্ঘন করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু সাতকড়ি জেলে গেলে মাখনের মনে হয় সেই শাসনদণ্ড আজ শিথিল হয়ে ধুলোয় লুঠাচ্ছে। নিজেকে তার অতিতুচ্ছ ও অকর্মণ্য গুরুত্বহীন মনে হতে থাকে। তার এই মানসিক অসহায়তা ব্যক্ত করে লেখক জানিয়েছেন—''... দুনিয়ার লোকে কি বলিতেছে কি ভাবিতেছে সে জানে না; কিন্তু স্বামীর জীবন হইতে নিজেকে বিচ্যুত করিয়া লইয়া সেত' সরিয়া স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না ... তাহার পৃথিবী অতিশয় ক্ষুদ্র ... স্বামীর সত্তার বাহিরে যে জীবন্ত পৃথিবী রহিয়াছে, তাহার সঙ্গে সংযোগ তার স্বামীকেই বৃন্ত করিয়া, স্বামীকেই বৃন্ত রূপে পাইয়া সে চারিদিকের হাওয়ার মাঝে ফুটিয়া আছে ... তাহার পরিচয়ই ঐ।''[৫৩]

একান্ত স্বামী নির্ভর জীবনে মাখনের পৃথিবী বিকৃত একাকার হয়ে ছন্নছাড়া মৃতের শ্মশান হয়ে গেল। যে পথে মাখন আলো দেখত, যে পথে সে গান শুনত, যে পথে সুধা ঝরত, চোখের নিমেষে সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে জগতের সঙ্গে তার আর সম্পর্ক রইল না। মাখনের এই নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব বাড়ীর কেউই অনুভব করেনি। সাতকড়ি তো নয়ই। স্বামীর কথা ভাবতে গিয়ে চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলে মাখন। যার সঙ্গে জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন সেই স্বামীর অপরাধ গুরুতর। এতটাই গুরুতর যে সেই চিন্তা মাখনের সহ্য হয় না। মানুষ কোনদিন তা সহ্য করতে

পারেনি। সন্তানের জননী হয়ে, কূলের বধূ হয়ে, নারী তাকে ক্ষমা করেনি। ভগবানের নাম বুকে আছে, পশু হয়ে জন্মগ্রহণ করিনি এমন জ্ঞান যার আছে, সে তা ক্ষমা করেনি। তবু বাস্তবে দেখা যায় সাতকড়ি ঘরে ফিরে যেন বাড়ীর সকলের দ্বারা যুদ্ধজয়ী বীরের সম্মান ও ভালোবাসা পেয়েছে। কিন্তু মাখন এমন স্বামীর ছায়াটুকু দেখার কথা ভাবতেই মূৰ্চ্ছিতা হয়ে পড়েছে। তার সেই অন্তরস্থঃ অসহায়তা ব্যক্ত হয়েছে লেখকের অকৃত্রিম শিল্পী চেতনার অক্ষরে—

''মাখনের ভয় করিতে লাগিল—

কালের অতল গর্ভে অবতরণ করিয়া কাহারা যেন মন্থনে রত হইয়াছে—তাদের হারানো রত্ন খুঁজিতেছে। তাদের হাতের শব্দ নাই, পায়ের শব্দ নাই, মুখে শব্দ নাই। তাদের নির্ম্মমদণ্ড প্রহারে আবর্ত কেন্দ্র হইতে ঢেউ ছুটিতেছে ... আগে ধোঁয়া, তারপর ফেনমুখী হলাহল উদগারিত হইতেছে। সেই হলাহলের পাত্র হাতে লইয়া কে যেন অগ্রসর হইতে লাগিল।''[৫৪]

স্বামীর অপরাধ ক্ষমা করতে না পারার অপরাধে মাখনকে সংসার থেকে বিতাড়িত হতে হয়। পরে তার দ্বিতীয় জন্মলাভ হয় ত্রিলোকপতির হাতে। কিন্তু সেই অংশের সম্পর্ক সূত্র রচনায় কেমন যেন একটা আদর্শের গন্ধই থেকে গেছে শেষ পর্যন্ত। কারণ এই অংশে ত্রিলোকপতির ভাবনায় নারী-পুরুষের সম্পর্ক একটা পবিত্র তীর্থক্ষেত্রেই আটকে থেকেছে। রক্ত মাংসের বাস্তব জীবনের মাটিতে অবতরণ করেনি। এই ত্রিলোকপতির সঙ্গে 'চৌধুরাণী' উপন্যাসের সূর্যসেনের সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। সূর্যসেনের মতোই ত্রিলোকপতিও ভেবেছে—''পশু পক্ষিগণের কি নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় কে জানে। তাহাদের পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না; কেহ মন্ত্রপাঠ করায় না; কেবল মানুষই নিজেকে এ বিষয়ে নিতান্ত পরাধীন করিয়া রাখিয়াছে তার মানে আছে। মানুষকে আবদ্ধ করা হইয়াছে সত্য, অনেক দিক নিষিদ্ধ করাও হইয়াছে, কিন্তু তাহাকে সাধুজনের পরম ইপ্সিত একটা ক্ষেত্রে অশেষ অব্যাহতিও দেওয়া হইয়াছে—সেই ক্ষেত্রটি সনাতন, নিষ্কলুষ—অধ্যাত্ম জাগরণ দ্বারা গ্লানিনির্মুক্ত সেই ক্ষেত্রে দেহের মিলন হয়, এবং মিলন সার্থক হয়। ইহাই সেই অধীনতার মমার্থ, পশুর সঙ্গে তাঁর পার্থক্য ঐখানে; কেবল সন্তান-সৃষ্টিই তার উদ্দেশ্য নয়, হইতে পারে না।''[৫৫]

এইভাবে লেখক নারী পুরুষের সম্পর্ককে একটা আদর্শলোকে পৌঁছে দিয়েছেন ত্রিলোকপতি

আর সূর্যসেনের চোখ দিয়ে। ‘চৌধুরাণী’ উপন্যাসে সূর্যসেনের ডায়রিতে এরকম নানা ব্যাখা আমরা দেখি নারী পুরুষের সম্পর্ক বিবাহ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে। কয়েকটি ভাবনা সরাসরি ‘কলঙ্কিত তীর্থ’ উপন্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে—

■ ‘‘পুরুষ আসিয়া মেয়েটিকে বিবাহ করিয়া লইয়া যাইবে। ... মন্ত্রশক্তির দ্বারা জীবনে একটা অকাট্য গ্রন্থি দিবার অভিনয় করিয়া পুরুষটি মেয়েটিকে লইয়া যাইবে সন্তানার্থে এবং সুলভে এমন সব স্থুল কাজ করাইয়া লইবে যার নাম হইবে স্বামিসেবা এবং গৃহস্থালী।’’[৫৬]

■ ‘‘... বিবাহ আর কিছুই না, উভয় পক্ষেরই অর্থাৎ স্ত্রী এবং পুরুষের, জীবনযাপন-বিষয়ক একটা সুবিধাবিধায়ক চুক্তি মাত্র। পুরুষের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইয়া স্ত্রী থাকিবেন পোষ্য এবং উপযুক্ত ব্যবহার আর অন্নবস্ত্র না পাইলে স্ত্রী করিবেন গোঁসা। গোঁসা করিবার অনুমতি স্ত্রীকে দেওয়া আছে। আবার কি চাই?’’[৫৭]

■ ‘‘বিবাহে দেনা-পাওনা লইয়া মন গরম আর কষাকষি আমি মোটেই পছন্দ করিনা — মনে হয়, বিবাহের সম্ভ্রমহানি ঘটিতেছে, তার মাধুর্যের চমকারিত্ব নষ্ট হইল। যদি এমন হয়, একটি ছেলে আর একটি মেয়ের ভাব হইল; বিবাহে তারা সম্মত হইল; তখন তাহারা হাত ধরাধরি করিয়া গেল কোনো দেব মন্দিরে; পুরোহিত তাহাদের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেবতার আশীর্বাদ যাঞ্চা করিলেন; একাত্মকারী মন্ত্র পাঠ পূর্বক তাহাদের মস্তকে নির্মাল্য স্পর্শ করাইলেন—শ্বেত চন্দনে তাহাদের ললাট চর্চ্চিত করিয়া দিলেন; দেবতাকে জাগ্রত জানিয়া তাঁহারই গোচরে তাহারা বিবাহিত হইল।

যদি এমন হয়, তবে মন্দ হয় না—অনেক দাহ জন্মেই না।’’[৫৮]

■ ‘‘স্ত্রীকে সহধর্মিণী বলা হয়—মিথ্যা বলা হয় না; স্বামী পতি, ইহাও মিথ্যা নয়। বিবাহকে দৈহিক সুখের আর স্বপ্ন সুখের দ্বারোঘাটনের যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করার মনোবৃত্তিই বেশীরভাগ লোকের ইহাও সত্য; কিন্তু তা একেবারেই ভুল-মানুষ ভারি ভুল করে—মানুষ শোচনীয়ভাবে ঐখানটায় ভুল করিয়া বসিয়া আছে। বিবাহ ঐহিকও নয়, দৈহিকও নয়। বিবাহ পারত্রিক এবং আত্মিক।’’[৫৯]

■ ‘‘ভাবিতে সুন্দর লাগে, যে স্থানে ইহারা পরস্পরকে ভালবাসিবে, সে স্থান হইবে তীর্থতুল্য... সে স্থানটি ইহাদের হৃদয়ের রামমন্দির—এই স্থানের অনন্ত রূপান্তর কেবল তাহাদিগকেই কেন্দ্র করিয়া আসিবে যাইবে, নিয়ত আবর্তিত হইবে। ঐ স্থানটা চোখে পড়িবে

না, কিন্তু মনে জাগিবে, নির্নিমেষ অপলক হইয়া জাগিবে; মানুষের শ্রদ্ধার প্রাণপাতের স্পর্শে তাহাদের প্রেমের ঐতিহ্যের সৃষ্টি হইয়া সে স্থান হইবে অক্ষয় আর চিরবরণীয়; ধ্যানে মাত্র উপলব্ধি করার মতো একটা অশরীরী মন্দির সেখানে গড়িয়া উঠিবে জগদতীত মূল্য তার মানুষ বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না; কেবল স্মরণ করিয়া অপার্থিব রসসিঞ্চনে ধন্য হইয়া যাইবে; উচ্চারণ করিবে এখানে ভালবাসা জন্মিয়াছিল স্থিতিলাভ করিয়াছিল, কিন্তু বিলুপ্ত হয় নাই—সুন্দরের মর্মে, আর প্রকৃতির বক্ষ কূহরে তাহা সঞ্চিত হইয়া আছে ...
পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ ইহাই।”[৬০]

এইভাবে নারী পুরুষের সম্পর্কের কলঙ্কিত তীর্থের উত্তরণ ঘটেছে ত্রিলোকপতি তথা সূর্যসেনের মনোভাব ব্যক্ত করার মধ্যদিয়ে। এই মনোভাব আসলে লেখকেরই ব্যক্তিগত চিন্তার প্রতিফলন মাত্র। ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতা লেখককে এমন একটা অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছিল যে মধ্যবয়সে পৌঁছে তিনি হঠাৎই নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্লেদ-পঙ্কিলতা থেকে উর্দ্ধে উঠে সাময়িকভাবে এমন একটা স্নিগ্ধ পবিত্র ভাবনায় ক্ষণিকের জন্যে উপনীত হয়েছিলেন এমনটা কোনো মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। বরং এর উল্টোটাই তিনি আজীবন ভেবেছিলেন। একথার সমর্থন রয়েছে ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের অভিমতেও— “মধ্য বয়সে উপনীত হয়ে বাস্তব দৃষ্টি পরিত্যাগ করে তিনি আদর্শবাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন এ চিন্তাও অযৌক্তিক, কারণ এরপরেও তিনি কথাসাহিত্যে বাস্তবদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, কবিতায় মোহমুক্ত বাস্তবচিত্র উপস্থিত করেছেন। আসলে, এই দুটি উপন্যাসেই জগদীশ গুপ্তের মূল সমস্যা বিবাহ সম্পর্কিত। বর্তমান ব্যবস্থায় বিবাহ নারী-পুরুষের কেবল দৈহিক মিলনের পথ পরিস্কার করে মাত্র কিন্তু বিবাহের সঠিক তাৎপর্য অনুধাবণ করে অনুষ্ঠান কন্টকিত বিবাহ ব্যবস্থার পরিবর্তে তিনি যে বিশুদ্ধ সমপর্ণের কথা চিন্তা করেছেন তাকে দস্তয়ভস্কি কথিত 'Higher reality' হিসাবে মেনে নিতে কোন বাধা নেই।”[৬১]

তথ্যসূত্র :

১. 'নারী' : হুমায়ুন আজাদ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০১, পৃ. ৪৩।

২. বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, তুলিকলম, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৭২।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

৪. রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ. ৪১৮।

৫. রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ. ৩৮০।

৬. রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ. ৭৩।

৭. সুলভ শরৎ সমগ্র, ২য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ১৯২৯।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩৩।

৯. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী, প্রা.লি., কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ২৫৫।

১০. নারী, সাম্যবাদী, সঞ্চিতা, ডি.এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, পঞ্চাশৎ সংস্করণ, ১৯৯৮, পৃ. ৭৮।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

১২. জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৪, কলকাতা, পৃ. ২১।

১৩. পুতুলনাচের ইতিকথা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশভবন, কলকাতা, ৩৪তম মুদ্রণ, পৃ. ৯৪।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

১৫. প্রাগুকত, পৃ. ৯৪।

১৬. ফ্রয়েডের নারী চরিত্র, শ্রী নৃপেনকুমার বসু, বীণা লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১৪৩।

১৭. সাহিত্য ও সংস্কৃতি, পৃ. ২৭৫।

১৮. জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃ. ১১।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

৩১. বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, গ্রন্থনিলয়, ২০০৮, পৃ. ২৮৪।

৩২. জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃ. ২০৭।

৩৩. বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২১৫।

৩৪. জগদীশ গুপ্তর গল্প, সুবীর রায় চৌধুরী (সম্পাদিত), দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯১, পৃ. ১০৪।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪।

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

৩৯. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃ. ২৩৩।

৪০. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রা. লি., পৃ. ১৮০।

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২।

৪২. বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতা : জগদীশ গুপ্ত, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ১৩২।

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২।

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫।

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫।

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬।

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

৫৩. কলঙ্কিত সম্পর্ক, বিশু মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), পৃ. ৩।

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

৫৬. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রা. লি., ২০০৩, পৃ. ২৮৮।

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮।

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮।

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯।

৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০।

৬১. বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতা : জগদীশ গুপ্ত, বিশ্ববাণী, পৃ. ১৪০।

পঞ্চম অধ্যায়
অন্ধকার গলিপথের মানুষ : নিয়তির হাতের পুতুল

''এ যুগে কোথাও কোনো আলো—কোনো কান্তিময় আলো
চোখের সুমুখে নেই যাত্রিকের; নেইতো নিঃসৃত অন্ধকার
রাত্রির মায়ের মতো : মানুষের বিহ্বল দেহের
সবদোষ প্রক্ষালিত ক'রে দেয়—মানুষের বিহ্বল আত্মাকে
লোকসমাগমহীন একান্তের অন্ধকারে অন্তঃশীল ক'রে
তাকে আর শুধায় না অতীতের শুধানো প্রশ্নের
উত্তর চায় না আর—শুধু শব্দহীন মৃত্যুহীন
অন্ধকারে ঘিরে রাখে...''[১]

'অদ্ভুত আঁধারে' দাঁড়িয়ে কবি এভাবেই মহাকালের পথে ধাবমান যাত্রীকের অন্ধকারময় পথ দেখতে পেয়েছিলেন। প্রেক্ষিত ভিন্ন হ'লেও এই অন্ধকার গলিপথের জীবনকেই সমকালের ক্ষেত্র থেকে তুলে এনেছিলেন জগদীশ গুপ্ত। কুষ্ঠিয়ার 'অন্ধকারাছন্ন' গ্রামীণ জীবন পরিবেশ আর আদালতের কর্মসূত্রে এবং সেইসঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনে নানা টানাপোড়েনে বিধ্বস্ত লেখকের চারপাশের জগতে সেদিন ঢের কম আলো ছিল। উপরন্তু কলকাতার রাজপথের আলোকময় জীবন থেকে বহুদূরে বসে সমাজ মানুষের অন্ধকার-জীবনকে অবলোকন করেছেন পুরু চশমার কাচ দিয়ে। আর এই অন্ধকার জগৎ তাঁকে বারবার হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। এবিষয়ে তিনি তাঁর সুহৃদ নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে একবার একটি পোস্টকার্ডে কয়েক লাইনের কবিতায় লিখেওছিলেন—

''দুঃখ কষ্ট এ জীবনে চিরস্থায়ী নয়,
আজ হ'ক, কাল হ'ক, হবে তার ক্ষয়।
তবু সেই ভাগ্যবান, যার যথাকালে,
দুঃখ অন্তে সুখোদয় সম্ভবে কপালে।
আমি নয় সেই দলে তাতে নাই ক্ষতি
অশ্রুর কমলে পুজি দুঃখ-সরস্বতী।''[২]

এহেন মানুষটি অত্যন্ত নির্মোহ দৃষ্টি দিয়ে, অশ্রুর পদ্ম দিয়ে দুঃখ সরস্বতীর পূজার কথা লিখেছিলেন—তাতে যেন সচেতন ভাবেই নিজের বৈষয়িক ব্যর্থতা, দারিদ্র্য এবং সাহিত্য জগতে অপ্রতিষ্ঠার প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। ফলে 'অসাধু সিদ্ধার্থ' (১৯২৯) থেকে 'কলঙ্কিত তীর্থ' (১৯৬০)—উপন্যাসের ধারায় তিনি সচেতনভাবেই বারবার অন্ধকার গলিপথে হেঁটেছেন এবং নিয়তি লাঞ্ছিত মানুষগুলোকে তাঁর সাহিত্যে তুলে এনেছিলেন। সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতো যে সন্ধ্যা আসে সেই অন্ধকারে পথচলা মানুষগুলোর অন্তরেও আলো ফেলে তিনি তাদের অন্তরস্থ অন্ধকারকে ভাষারূপ দিয়েছেন। ফলে একদিকে তিমিরাচ্ছন্ন সমাজ মানুষ এবং অন্যদিকে নিয়তি তাড়িত অসহায় মানুষগুলো তাঁর উপন্যাসে ভিড় করেছে বারবার।

আধুনিক মানুষের নির্বেদ নিঃসঙ্গতার অন্তহীন যন্ত্রণার ছবি ধরা পড়েছে তাঁর সাহিত্যে। এই নিঃসঙ্গতাকে তিনি রোমান্টিক ভাবালুতায় আচ্ছন্ন করেননি। এদিক থেকে তাঁর সাহিত্য একান্তভাবেই দেশজ মৃত্তিকা থেকে উঠে এসেছে। 'আধুনিক সাহিত্যে দুঃখবাদ' নিবন্ধে অধ্যাপক অনিলবরণ রায় প্রথম দেখিয়েছেন জগদীশবাবুর সাহিত্যের অন্ধকারময় মানবসত্তার প্রকাশকে। তিনি লিখেছেন—

"তিনি (জগদীশ গুপ্ত) দেখিতেছেন, ভগবান, ধর্ম, নৈতিকতা এসবই মিথ্যা, শুধু তাহাই নহে, এ সংসারের যে বিধাতা সে এক নির্মম ক্রুর হৃদয় শয়তান। তিনি সবত্রই শুধু দেখিতেছেন শয়তানী এবং তাঁহার এই অনুভূতি তাঁহার মধ্যে যে রসের সৃষ্টি করিতেছে তাহারই ভিয়ান করিয়া তিনি তাঁহার ছোটগল্পগুলিকে রচনা করিতেছেন।"[৩]

এই ব্যাখ্যা তাঁর উপন্যাসগুলি সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য। অন্ধকার গলিপথ, কদর্য মানুষ, ক্রুর শয়তান ভগবান আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অসহায় মানুষগুলির নিয়ন্ত্রক তাদের অদৃষ্ট বা নিয়তি। এই নিয়তি তাড়িত মানুষগুলির স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি (Freedom of will) বলে কিছুই নেই। তারা সকলেই নিয়তির হাতের পুতুলমাত্র। এই নিয়তি নির্ভর পুতুলগুলো সম্পর্কে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসের নায়িকা কুসুমের বাবাকে দিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সারসত্যটুকু বলিয়েছিলেন। মানুষ আসলে নিয়তির হাতের পুতুলমাত্র। নিয়তি আড়ালে বসে থেকে যেভাবে আমাদের পুতুলনাচের পুতুলের মতো নাচান আমরা সেভাবেই নাচি, সেভাবেই কথা বলি। কারণ ব্যাখ্যা করে উপন্যাসটির শেষে মানিক লিখেছিলেন—

''নদীর মতো নিজের খুশিতে গড়া পথে কি মানুষের জীবনের স্রোত বহিতে পারে? মানুষের হাতে কাটা খালে তার গতি, এক অজানা শক্তির অনিবার্য ইঙ্গিতে। মাধ্যাকর্ষণের মতো যা চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়।''[৪] এখানে প্রশ্ন হলো, নিয়তি বা অদৃষ্ট তাহলে কী? এই নিয়তি বা অদৃষ্ট দুর্জ্ঞেয় অনিয়ন্ত্রণীয় এক শক্তি যা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে। গ্রীসসহ পৃথিবীর প্রায় সারাদেশেই এই নিয়তি একটি প্রাচীন ও অনিবার্য বিশ্বাস। এর সমার্থক শব্দ হিসেবে দৈব, ভাগ্য, কাল, বিধি, বিধিলিপি, বিধান, ললাট লিখন ইত্যাদির ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে সুনির্দিষ্ট করে এর সংজ্ঞা দেওয়া খুব মুশকিল। সারা পৃথিবীতে যুগ যুগ ধরে একটা পরিসরে এই নিয়তি নিয়ে মতৈক্য রয়েছে। মানুষ যখন সুখী থাকে, জীবন যখন সহজ আনন্দের তখন নিয়তির কথা বলা হয় না। কিংবা যখন মানুষের জীবনে খুব ভালো সময় আসে তখন বলা হয় তার সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু যখনি সৌভাগ্যের সোপান থেকে মানুষের অনিবার্য অবতরণ ঘটতে থাকে তখনই বলা হয় নিয়তির কথা। এই নিয়তির বিরুদ্ধাচারণ করে কখনোই জীবনে সফল হওয়া যায় না। কারণ নিয়তি অপরিবর্তনীয়, অবোধ্য আর যথেচ্ছাচারী। এর হাত থেকে কারও রেহাই নেই। এমন একটি ভাবনার উপরেই জগদীশবাবুর গল্প উপন্যাসগুলি দাঁড়িয়ে আছে। কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার এবিষয়ে লিখেছেন—''...আমি তাঁহার সেই গল্পগুলির কথাই বলিতেছি, যাহাতে মানুষের জীবনে একটা অতিশয় দয়াহীন, দুর্জ্ঞেয় দৈব নির্যাতনের রহস্য ঘনাইয়া উঠিয়াছে, মনে হয়, জীবনের আলোকোজ্জ্বল নাট্যশালার একপ্রান্তে একটা অন্ধকারময় কোণ আছে, সেখানে একটা নামহীন, আকারহীন হিংস্রতা সর্বক্ষণ ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে—মানুষ তাহারই যেন এক অসহায় শিকার; তাহার নিষ্ঠুরতাও তত ভয়ঙ্কর নয়—যত ভয়ংকর তাহারই সেই অতি-প্রাকৃতরূপ।''[৫]

নিয়তির এই কৃষ্ণপক্ষ বিস্তার এবং তারই কারণে মানুষের অসহায়তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় 'অসাধু সিদ্ধার্থ', 'লঘুগুরু', 'রতি ও বিরতি', 'যথাক্রমে', 'তাতল সৈকতে' প্রভৃতি উপন্যাসে। তবে গ্রীক নিয়তিবাদের সঙ্গে কিংবা এদেশের অদৃষ্টবাদী ভাবনার সঙ্গে জগদীশবাবুর নিয়তি ভাবনায় একটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর উপন্যাসগুলিতে আলোচনায় যাবার আগে লেখকের দুটি ছোটগল্পে এই নিয়তিবাদের প্রকাশ কীভাবে ঘটেছে তা উল্লেখ করা যায়। গল্প দুটি হল 'দিবসের শেষে' এবং 'হাড়'।

প্রথম গল্পটিতে আমরা দেখি কামদা নদীর তীরবর্তী গ্রামে রতি নাপিতের বাস, তার

একটি মাত্র ছেলে, পাঁচু—বয়েস পাঁচ বছর। সেই পুত্রটিকে নিয়তির ছোবল থেকে রক্ষা করা প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন—''রতির স্ত্রী নারাণী তিনটি পুত্রকে প্রসব গৃহ হইতে নদী গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া পাঁচুগোপালের মাদুলি ধারণ করে—তারপর পেটে আসে এই পাঁচু। তাই অসংখ্য মাদুলি-কবচ-তাবিজ প্রভৃতি আধিদৈবিক প্রকরণ পাঁচুর অঙ্গে নিয়ত উদ্যত থাকিয়া যাবতীয় অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রহরা দিতেছে।''[৬] এই বহু আরাধনার ধন পাঁচু একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই মাকে বলে, তাকে আজ নাকি কুমীরে নেবে। মা নারাণী চমকে ওঠে ছেলের কথা শুনে। এমন অলক্ষুণে কথা শুনে রতি ছেলেকে শাসন করে। এই মৃত্যুর পূর্বাভাসের কথা জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি সেদিন রতিকে ডেকে বলেছিল—''রতি রকম ভালো নয়, এটা মৃত্যুর লক্ষণ; এরকম মনের ভুল হয় পাগলের কিংবা যার মরণ ঘনিয়েছে।''[৭] কিন্তু এতোকালের পরিচিত কামদা নদীতে কুমীর থাকার কোনো সম্ভাবনাই নেই। গ্রামের কেউ কোনদিন দেখেনি কুমির, কিংবা কোনো জনশ্রুতিও ছিল না। মনের আনন্দে কাঠাল খেয়ে, শরীরে উঠোনে ধুলো লাগলে রতি তাকে নদীতে নিয়ে যায় স্নান করাতে। পাঁচু একটা ঘট নিয়ে বাবার সঙ্গে নদীতে যায় এবং বাবার তত্ত্বাবধানে নিরাপদে স্নান করে। ফেরার সময় সঙ্গে আনিত ঘট নিতে ভুলে যায় পাঁচু। ফিরে গিয়ে একা ঘট আনতে গেলে পাঁচুর সকালের পূর্বাভাসই সত্য হয়ে দাঁড়ায়—

''...এমন সময় তাহারই একান্ত সন্নিকটে দুটি সুবৃহৎ চক্ষু নিঃশব্দে জলের উপর ভাসিয়া উঠিলো; পরমুহূর্তেই সে স্থানের জল আলোড়িত হইয়া উঠিলো, লেজটা একবার চমক দিয়া বিদ্যুদ্বেগে ঘুরিয়া গেলো—এবং চক্ষের পলক না পড়িতেই পাঁচু জলে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেলো।''[৮]

দ্বিতীয় গল্পটির নাম 'হাড়'। এই গল্পে সনাতন একদিন সকালে নদীতে মাছ ধরতে যাবার সময় রসি ডাইনীর উপর চড়াও হয়ে তাকে মারতে গেছে। রসি কাঁপতে কাঁপতে সকলের সামনে সনাতনকে অভিশাপ দিয়ে বলেছে— ''অল্পেয়ে আমায় মারতে উঠেছিলি? ভগমান তা দেখেছেন। তুই মাছ মারতে চলেছিস্ ঐ মাছই যেন আজই তোকে মারে।''[৯] ছোট নদীতেই সেদিন কোঁচ নিক্ষেপ করে গাছের মতো প্রকাণ্ড এক চিতল মাছ ধরেছে। প্রবল পুচ্ছ তাড়নায় ডিঙি ভেঙ্গে ফেলার উপক্রম ক'রে সেই মাছ। কিন্তু সনাতনের সঙ্গে পেরে ওঠে না। পুত্র মথুরকে নিয়ে সনাতন সেই মাছ দিয়ে মহানন্দে খেতে বসেছিল। সহসা সেই

মাছের শিরদাঁড়ার হাড় গলায় বায়ুপ্রবেশের পথ রুদ্ধ করে মাঝপথে আটকে যায়। অ্যাসফিক্সিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে সনাতনের মৃত্যু হয়।

গল্প দুটিতে নিয়তির হাতে মানুষের অসহায়তার পূর্ণাঙ্গ চিত্র ধরা পড়েছে। নিয়তিবাদী গল্পগুলোর সঙ্গে জগদীশবাবুর গল্পের মৌলিক পার্থক্য হল, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ 'সতর্ক' থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর নিয়তির আক্রমণ নেমে আসে না। কিন্তু যে মুহূর্তেই মানুষ একটু অসতর্ক হয় তখনি নিয়তি ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষের ওপর। পাঁচুর মৃত্যু হয়েছে যখন সে একা নদীতে ঘট আনতে গেছে। একইভাবে বিরাটাকায় মাছের পুচ্ছ তাড়নার সময় সনাতন সতর্ক ছিল, ফলে বিপদ আসতে পারে নি। কিন্তু যখনি সে একটু অন্য মনস্ক হয়েছে তখনি নিয়তি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ এই নিয়তি অন্ধকারে ওৎ পেতে বসে থাকে। সুযোগ বুঝে শিকারের উপর অর্থাৎ মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করে না। কুমীর এখানে সেই নিয়তি। নিয়তি হয়েছে সনাতনের অন্য মনস্কতা প্রসূত মাছের হাড়।

অন্ধকার গলিপথের মানুষের জীবনে নিয়তির অতর্কিত আক্রমণের কথা ব্যক্ত হয়েছে লেখকের উপন্যাসগুলিতেও। 'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাসে জনৈক প্রতারক সিদ্ধার্থ যেটি তার প্রকৃত নাম নয়—তার প্রকৃত নাম নটবর। সিদ্ধার্থ পরিচয়ের আড়ালে যে নিজের ভবিষ্যৎকে সতর্কভাবে গড়ার দিকে এগিয়েছিল। এক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে তার বাহ্যিক সুদর্শন সৌম্যকান্তি চেহারা। এই নকল সিদ্ধার্থ অজয়ের মন জয় করেছে। নিজের ভেতরের অভিনয়টা একদিন বেফাঁস হয়ে বেরিয়ে পড়ে নটবরের। লেখক সেই জীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে জানিয়েছেন—

''একে একে মনে পড়ে জীবনের কথা—

সে চোর, জারজ; বেশ্যার দাসত্ব সে করিয়াছে। যে-রত্ন আহরণ করিতে সিঁদ কাঠি লইয়া বাহির হইয়াছে তাহার মত কুক্কুটের জন্য সে অপরূপ রত্নের সৃষ্টি হয় নাই। জীবনের আরম্ভ মুদিখানায়—আরো ভালো করিয়া মনে পড়ে, থিয়েটারের কথাটা— ... মেধা ছিল, আগ্রহও ছিল— ... অর্থ লোভে এক বৃদ্ধা বারাঙ্গনার ... দিক্‌ভ্রান্ত অবস্থায় ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে সাক্ষাৎ হইয়া গেল সেই আসল সিদ্ধার্থ বসুর সঙ্গে।''[১০]

ছদ্মবেশী নটবর খুব সপ্তুর্পণে এগিয়ে গেছে অজয়ার জন্যে। অজয়ার সঙ্গে সিদ্ধার্থের বিবাহের আয়োজন যখন শেষ পর্যায়ে তখন অজয়ার কাছে সিদ্ধার্থের প্রকৃত পরিচয় ফাঁস হয়ে যায়। কাশীনাথ কোনো কিছুই গোপন না করে অকপটে সিদ্ধার্থের সমস্ত অতীত বলে ফেলেন।

সবাই যাকে সিদ্ধার্থ ভাবছে, সে নটবর, বৈষ্ণবীর গর্ভে ব্রাহ্মণের জারজপুত্র। এই পরিচয় পেয়ে অজয়া আকাশ থেকে পড়ে। সে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে নিলে রজত তাকে ধরে ফেলে। কাশীনাথ নটবরের কাছে সক্রোধে জানতে চান—"তুই কেন এ কাজ করলি? তুই কেন মানুষের সর্বনাশ করে বেড়াচ্ছিস? বল্ সিদ্ধার্থ কোথায়? তার নাম আর পরিচয় তুই কোথায় পেলি?"[১১]

প্রবঞ্চক নটবর একথার কোনো জবাব দেয় না। নিজেকে নিরপরাধ দাবী করে। নিয়তির চক্রান্তেই সে ভালোবেসে ছিল বলে জানায়। আর ভালোবাসার তাড়নায় আর প্রতিদানের লোভে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার কথা সে স্বীকার করেছে। অজয়ার কথায় রজত নটবরকে বেরিয়ে যেতে দেয়। যাবার সময় জানিয়ে যায় প্রকৃত সিদ্ধার্থ এই পৃথিবীতে বেঁচে নেই। অমোঘ নিয়তির অনিবার্য ধারায় নটবরের জন্ম, তার বেড়ে ওঠা এবং ছদ্মবেশ খসে যাবার মধ্যদিয়ে আসলে তার আত্মিক মৃত্যুও হয়ে গেছে। এখানেও নিয়তি অসতর্ক মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কাশীনাথের মধ্যদিয়ে। নটবরের এই ছদ্মবেশ আর ব্যর্থতার ক্ষেত্রে নিয়তির ভূমিকা উল্লেখ করে অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"... নিজে যা নয় ছদ্ম আচরণে নিজেকে তাই প্রতিপন্ন করবার প্রাণান্ত প্রয়াস তো প্রত্যেকেরই জীবনের এক অংশ—এই জীবনগত চিরন্তন অদৃষ্ট লিখনের টানে আমাদের অনেক ব্যর্থতার জন্ম। সিদ্ধার্থের ছদ্মবেশের ব্যর্থতা প্রকৃতপক্ষে তার জীবনের ব্যর্থতা।"[১২]

'লঘুগুরু' উপন্যাসে উত্তম গণিকা জীবনের কদর্য পথ ছেড়ে সুস্থ গৃহী জীবনে প্রবেশ করতে চেয়েছিল। তার অন্ধকারময় অতীতের দিকে অবলোকন করলে দেখা যায় তার প্রথম পরিচয় ছিল যূথী রূপে, তারপর বনমালা এবং শেষে উত্তম। নিয়তির নির্মম পরিহাসে মানুষ হয়ে উঠেছিল একদিন যূথীর অন্যতম বড় শত্রু। সেই মানুষের কারণেই উত্তম গৃহী জীবনে সম্মান লাভ করে নি। প্রতিবেশী থেকে শুরু করে স্বামী বিশ্বম্ভর পর্যন্ত তাকে বারবার অপদস্থ করেছে। বহু পুরুষচারিণীর জীবন ছেড়ে উত্তম একক গৃহ-জীবনে এসে স্থিতু হয়েছিল। ততক্ষণ নিয়তি তার ওপর নতুন করে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেনি। কিন্তু যখনি বিশ্বম্ভরের গৃহে এসেছে এবং টুকীর মাতৃত্বের ভার নিয়েছে তখনি তার নিয়তি নির্দেশিত পথ স্থির হয়ে গেছে। এই সংসার যাপন ছিল অন্ধকার গলিপথে প্রত্যাশার সূর্যকে খুঁজে ফেরা। কিন্তু এই প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়নি।

■ প্রতিবেশীরা তাকে ‘বেশ্যে’ বলেছে।

■ বিশ্বম্ভর পূর্ববর্তী স্ত্রীর সঙ্গে তুলনায় উত্তমকে ‘বউ’ বলে স্বীকার করেনি।

■ বিশ্বম্ভরের বন্ধুরা তাকে ‘খাণ্ডারী’ বলেছে।

■ হিরণের মৃত্যুর কথা শুনে কাঁদলে বিশ্বম্ভর উত্তমকে বেড়াল শকুনের সঙ্গে তুলনা করেছে।

■ শুচি বায়ুগ্রস্ততায় সে গৃহস্থের ঘরের বউকেও হার মানিয়ে দিতে পারে বলে বিশ্বম্ভর ব্যঙ্গ করেছে—

■ টুকীকে নিয়ে সে পালিয়ে যাবে এবং দেহ ব্যবসায় নামাবে, প্রতিবেশীর এমন আশংকায় বিশ্বম্ভর সীলমোহর দিয়েছে।

■ গণিকার কাছে মানুষ বলেই টুকীর বারবার বিয়ে ভেঙ্গে গেছে। এর জন্যে উত্তমকে অভিযুক্ত করেছে বিশ্বম্ভর।

■ টুকীর বিয়ে হয়ে গেলে উত্তমের আর দুশ্চিন্তা করা ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকে নি। এইভাবে শেষ পর্যন্ত টুকীর পাপের পথে নেমে যাওয়ার মধ্যদিয়ে উত্তমের জীবনের ট্রাজেডি তথা নিয়তির কঠিন আঘাত বর্ষিত হয়েছে। নিয়তির এই নিষ্ঠুরতার প্রসঙ্গে সমালোচক ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—‘‘মানুষ তার আত্যন্তিক জীবনতৃষ্ণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকার জন্য আমরণ সংগ্রাম করে অথচ নিষ্ঠুর নিয়তি প্রচণ্ড এক দুর্জ্ঞেয় শক্তি নিয়ে মানুষের সেই প্রচেষ্টাকে ফুৎকারে উড়িয়ে নিয়ে যায়।’’[১৩]

উপন্যাসে টুকী জন্মের সময়ই মাকে হারায়। উদাসীন পিতা বিশ্বম্ভর তাকে প্রতিবেশীদের জিম্মায় ফেলে রেখেই বারবার বাইরে, ভগ্নিপতি লালমোহনের বাড়ী চলে যেত মাঝে মাঝে। টুকী পরের হাতে মানুষ, পরেই তার নাম দিয়েছে। এহেন নিয়তি লাঞ্ছিত শিশুটির জীবনে উত্তম মাতৃস্নেহ নিয়ে আবির্ভূত হলে টুকীর কষ্ট লাঘব হতে শুরু হয়। মায়ের স্নেহে আদরে ভালোবাসায় শাসনে সে বেড়ে উঠতে থাকে। শিক্ষা-দীক্ষা-সাংসারিক কাজকর্মে সে নিপুনা হয়ে ওঠে। এরপরই নিষ্ঠুর নিয়তির নিঃশব্দ পদসঞ্চার ঘটেছে। উত্তম নিজে পঙ্কিল জীবনে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল তার থেকে সম্পূর্ণ অন্য জগতে টুকীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু নিয়তি এবার সেই সব প্রয়াসকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। প্রথমেই ‘ভালো ঘরে’ টুকীর বিয়ের আয়োজন ব্যর্থ হয়েছে। নির্মম নিয়তির

মতো কুচক্রী প্রতিবেশী পাত্রপক্ষকে বেনামী চিঠি লিখে বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছে—

‘‘মহাশয়, আপনি যাহার কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিতেছেন, সে ব্যক্তি একটি রক্ষিতা লইয়া বাস করিতেছে। কন্যাটি তাহার গর্ভজাতা নহে; কিন্তু তাহাকে সেই স্ত্রীলোকটিই মানুষ করিয়াছে। অতএব সাবধান হউন।’’[১৪]

এই ‘সাবধান বাণী’র ফলস্বরূপ টুকীর বিয়ে ভেঙে গেছে। বারবার চেষ্টা করেও বিশ্বম্ভর মেয়েকে সৎপাত্রস্থ করতে পারেনি। এরজন্য সমস্ত দায় উত্তমের উপর চাপিয়েছে। অসহায় নিরপরাধ টুকীর বিয়ে হয়ে যায় পঞ্চাশোর্ধ রক্ষিতা পরিবৃত পরিতোষের সঙ্গে। নিয়তি এবার টুকীকে নিয়ে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দেয়। স্বামীর অবহেলা নির্যাতন আর সতীন স্বরূপা সুন্দরীর যৌথ ষড়যন্ত্রে টুকীর ভাগ্য চূড়ান্ত হয়েছে এক সন্ধ্যায়। স্বামী পরিতোষের পরিবর্তে বাড়ী আসে অচিন্ত্য—যে টুকীকে ভোগ করার জন্য সুন্দরীর হাতে টাকা গুঁজে দেয়। টুকীর কাছে সমস্তটাই জলের মতো সহজ হয়ে যায়। যৌবন ভিক্ষুর সামনে সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়—

‘‘... আসুন।

অচিন্ত্য চম্‌কিয়া বলিল, কোথায়?

— আমার সঙ্গে।

— সে কি?

টুকী বলিতে লাগিল, এ কাজ যদি করতে হয়, তবে আমি আপনাকে দেব দেহ, আপনি আমাকে দেবেন টাকা। মাঝখানে ওরা কে?’’[১৫]

জন্মমুহূর্তে যার জীবনে বিধাতা বিরূপ ছিল আজ আবার সমস্ত বিরূপতার কালো মেঘ নিয়ে টুকীর জীবনে তার নিষ্ঠুর আবির্ভাব লক্ষ্য করা গেল। অসহায় টুকী সুন্দরীর বাড়ীর চৌকাঠ পার হয়ে বাইরে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। যে যূথী একদিন পাপের পথে নেমে যেতে বাধ্য হয়েছিল, তারপর বনমালা-উত্তম রূপে সেখানে কদর্য জীবন কাটিয়ে চেষ্টা করেছিল সুস্থ গৃহী জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে—টুকীর অসহায় পরিণতির মধ্যদিয়ে সেই প্রতিষ্ঠার লড়াই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। টুকীর পিতা হিসেবে ‘স্বভাবসিদ্ধ ইতর’ বিশ্বম্ভর প্রথমদিকে উচ্ছৃঙ্খল জীবনে ডুবে ছিল, কিন্তু যখন তার মধ্যে পিতৃসত্তার জাগরণ ঘটেছে তখন তাকে কেবল একজন অসহায় পিতার ভূমিকাতেই দেখা যায়। পরিতোষ কিংবা সুন্দরীর কোনো উত্তরণ নেই। এরা অন্ধকার গলিপথের মানুষ।

মানব ভাগ্যকে জগদীশবাবু ধরতে চেয়েছেন তাঁর গল্পে যেমন তেমনি উপন্যাসেও। বিশেষ করে উপন্যাসে। তার সৃষ্ট মানুষগুলির অধিকাংশ নির্মম, নিষ্ঠুর নিয়তির দ্বারা লাঞ্ছিত পীড়িত। এ প্রসঙ্গে সমালোচক ড. বীরেন্দ্র দত্ত স্পষ্টতই জানিয়েছেন—''...কখনো আশা, কখনো নৈরাশ্য, কখনো মানুষের অক্লান্ত কর্মদক্ষতা, কখনো অসহায় কর্মহীনতা, কখনো জীবনপ্রাণের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা, কখনো অসহায় ইচ্ছাহীন কর্মশূন্যতা মানুষের জীবন-ভাগ্যে বিস্ময় রসের প্রকাশ ঘটায়। ঠিক ঈশ্বর নয়, এক অলৌকিক অস্তিত্বেই মানুষের ভাগ্য তাকে তাড়িত করে। তা তার জীবনের অধীন নয়, তাকে মানুষ জয় করতে পারে না। এ হলো মানুষের জীবনে নিশ্চিত স্থির অভিশাপের মতো।''[১৬]

মানুষের জীবনে এই অভিশাপের কাহিনী 'মহিষী' উপন্যাসটি। পুত্রের অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে পিতা অর্থের লোভে কালো মেয়ের সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দেয়। পুত্র ষড়যন্ত্রটি পরে জানতে পারে, ফলে নিজ দুর্বলতার প্রতি গ্লানি এবং স্ত্রীর প্রতি তীব্র ঘৃণা জন্মায়। পুরুষকারের অভাবে পিতার বিরুদ্ধে ক্রোধ ব্যক্ত করতে না পেরে পিতার নির্বাচিত পাত্রীর বিরুদ্ধেই তা উগ্‌ড়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যায়। এই বিচ্ছেদের পিছনে নিয়তি যেভাবে নীরবে কাজ করে গেছে, তা অশোক কিংবা জ্যোতিময়ীর সাধ্য ছিল না প্রতিরোধ করার। পিতা ব্রজকিশোরের অর্থলোলুপতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারেনি অশোক, এক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত অক্ষমতা ছিল এবং এরজন্য তার বিধাতা তাকে বিপথে চালিত করেছে। জ্যোতির্ময়ী ছিল কালো—এর জন্যে তার নিজের কোনো দোষ বা করণীয় কিছুই ছিল না। শেষপর্যন্ত তাকে নীরবেই স্বামীর গৃহত্যাগ করতে হয়েছে। নব বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে রোমান্স রসধারায় নিমজ্জিত স্বামীর কাছে শেষ মুহূর্তেও অপমানিতা হতে হয়েছে ভাগ্য বিধাতার বিমুখতার জন্যে। উপন্যাসের একেবারে শেষ দৃশ্যে নিয়তি নাটকের পরিচালকের মত নেপথ্যে থেকে সমস্তটা পরিচালনা করেছে। জগদীশবাবু সেই দৃশ্য অংকন করেছে এভাবে—

''দরজার দিকে মুখ করিয়াই অশোক বসিয়াছিল; নন্দ তার অদূরে; স্বামী স্ত্রীতে বোধহয় হাসাহাসি চলিতেছিল। জ্যোতি দরজার সম্মুখে দেখিয়া অশোক হাসিতে হাসিতেই বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিয়া উঠিল, —অই! তুমি আছো এখানেই?

এই নির্মম প্রশ্নে যত বেদনা ছিল, জ্যোতির প্রত্যেকটি রক্তবিন্দু তাহা নিঃশেষে গ্রহণ করিল। তার চোখের সম্মুখে একটি মুহূর্তের জন্য একটা কালো পর্দা দুলিয়া গেল; ... নন্দ

বলিল, —দিদি এসো আবার।

জ্যোতির জবাব ছিল না, কিংবা অশোকের সেই হাসিটা শেষ মুহূর্তে তার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল বলিয়া সে কথার জবাব দিতে পারিল না তাহা জানা নাই।"[১৭]

কালো মেয়ের ভাগ্য বিড়ম্বিত জীবনের এই কাহিনী একটা সময়কে চিহ্নিত করে যায়, যার ওপর মেয়েটির কোনো 'Freedom of will' বলে কিছু ছিল না।

মানব ভাগ্যের এক জটিল স্তর লেখক পরিস্ফুট করেছেন 'দুলালের দোলা' উপন্যাসে। উপন্যাসটিতে রয়েছে তিনটি পৃথক অংশ যার প্রথমটি পশ্চিম প্রবাসী নীরদবরণের তিক্ত অভিজ্ঞতা আর অন্য দুটি গ্রামস্থ বৃদ্ধ পিরুর মুখ দিয়ে বলা ঘটনার কোলাজ। নীরদবরণ মানুষের জীবনের অন্ধকার গলিপথে প্রবেশ করে যা প্রত্যক্ষ করেছে তাতে সে নিজে সহ মানব ভাগ্যের অসহায়তা কেমন হয়ে থাকে। সেই সূত্রেই এসেছে সতীশের কথা। ভরত গিরিবালার সংসারে কাজের মেয়ে স্বর্ণর গর্ভে জন্ম নেয় সতীশের বাবা। সেই সম্পর্কের ভাবনায় বিক্ষুব্ধ সতীশের মনের অন্ধকার গলিপথে বিচরণের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। তার সম্পর্কে নীরদ জানিয়েছে— "আমার করুণা জন্মিল; মনে হইল, কি নিদারুণ উত্তপ্ত অন্তর্দ্দাহে এই নিরপরাধ ব্যক্তির সমস্ত সূক্ষ্ম অনুভূতি বিনষ্ট হইয়া গেছে, আর সে বোধ হয় তা জানে। এই গুরুভার আত্মনির্য্যাতন বোধহয় সে সজ্ঞানেই বহন করিতেছে। কেবল অভিশপ্ত সেই ক্লেশই কন্যার প্রতি অশ্রাব্য অকাতর কটুক্তির আকারে উদ্গীরিত হইতেছে। পাপের ইচ্ছায় নহে, প্রলোভনে নহে, আত্মকৃত পাপের অনুশোচনায় নহে, একজনের স্খলিত জীবনের পাপের জ্ঞান তাহারই বুকে সঞ্জীবিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে নামাইবার স্থান নাই, তাহাকে হত্যা করিবার উপায় নাই—তার ছট্‌ফটানির অন্ত নাই।"[১৮] এইভাবে ভাগ্য বিড়ম্বিত সতীশ লোকের কথা যেখানেই ফোটে সেখানেই কান পেতে দাঁড়ায়, তার কথা কেউ বলছে কিনা। প্রচলিত সমাজ নীতির বাইরে গর্হিত যৌন সম্পর্কের ফলে তার বাবার জন্ম বলে সেই ভাবনায় তার মন পীড়িত হয়। বিবেকতাড়িত সতীশ অপরাধবোধে পিতামহীকেই দায়ী করে। এক সময়ে অপরাধের সূত্রে নিজের স্ত্রী ও তার অবর্তমানে কন্যাকেও দায়িত্ব দিয়ে দেয়। সতীশ দাসের এই মানসিক যন্ত্রণা এবং তা থেকে মুক্তির উপায়—সবই চরিত্রটির ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত। জটিল মনোবিকলনকে চিত্ররূপে জীবন্ত করতে গিয়ে লেখক মানব ভাগ্যের জটিলতাকেই সত্য করেছেন।

পল্লী বাংলার পটভূমিকায় রচিত 'যথাক্রমে' উপন্যাসে রয়েছে দুটি কাহিনী—একটি

দীনবন্ধু-সাবিত্রীর কাহিনী এবং অন্যটি নিত্যপদ নামক গ্রাম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ একজন যুবকের কাহিনী—যে নিঃস্বার্থভাবে গ্রামে ডাক্তারী করার সংকল্প নিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী হাতুড়ে ডাক্তার ফণীবাবুর পথকেই গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। চন্দনা নদীর ধারে ছোট্ট গ্রাম বেতডাঙ্গা। সেখানকার মুদি দোকানদার দীনবন্ধুর পিতা রামপ্রসাদ। তার মতো সাধারণ মানুষের ভাবনার মধ্যদিয়ে লেখক জীবন-মৃত্যু-ভাগ্য বিধাতার লেখাকে চমৎকার ভাবে পরিস্ফুট করেছেন—

''হেমন্তের পর শীত ঋতুটাকে বাদ দিয়া বসন্ত আসিবে ইহা যেমন কেহ আশা করিতে পারে না, তেমনি রামপ্রসাদেরও মনে হইত, আজিকার দুঃখের পর সুখ দেখা দিবে, সংসারের এই নিয়ম চক্রের আবর্ত্তনের হাত হইতে নিস্তার নাই; তবে তার দুঃখও যেমন মৃদু, সুখও তেমনি মৃদু; সুখ-দুঃখের এই মৃদুতাই চিরদিনের পরিচয়ে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু মৃত্যু সংসারে নিয়মের ভিতর হইলেও মৃদু নয়।''[১৯]

অদ্ভুদ এই জীবন পর্যবেক্ষণ, অদ্ভুত এই নিয়তি। বড় ধীর পায়ে কখন কার দুয়ারে এসে দাঁড়াবে কেউ বলতে পারে না। রামপ্রসাদের জীবনেও একদিন অতি ধীর-মন্থর গতিতে মৃত্যু এসে হানা দেয়। 'মৃদু স্রোতের মাঝে যমদণ্ড পড়িয়া স্রোত বাধা পাইয়া একদিন ফেনাইয়া উঠিল, স্ত্রীর মৃত্যু রামপ্রসাদের অন্তরে কঠিন ঘা দিল।'[২০] চিরদিনের অন্তঃপুর থেকে সহসা যাত্রা করে রামপ্রসাদের স্ত্রী চিরদিনের শ্মশানে চলে যেতেই রামপ্রসাদের গৃহ শূন্য হয়ে যায়। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে দীনবন্ধু ও সাবিত্রী ছেলেবেলাতেই মাকে হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়ে। রামপ্রসাদ তাদের সান্ত্বনা দেয়। মেয়ে সাবিত্রী যখন প্রতিবেশী বন্ধু হারু-কুতু-অনির মা বেঁচে আছে বলে আক্ষেপ করেছে তখন রামপ্রসাদ বুঝিয়েছে এদের মা বেঁচে থাকলেও খেঁদির মা বেঁচে নেই, ভোলার মা বেঁচে নেই, চাঁপার মা বেঁচে নেই। রামপ্রসাদ সংসার আর ব্যবসা—একা হাতে হাল ধরে। কিন্তু নিয়তি এরপরে আরও বিরূপ হলেন। নিয়তি এবার রামপ্রসাদকেও টেনে নিলেন এবং পাঠিয়ে দিলেন তার স্ত্রী সাবিত্রীর কাছে। বাবাকেও হারিয়ে দীনবন্ধু ও সাবিত্রীর কঠোর জীবন সংগ্রাম শুরু হয়। অন্ধকার গলিপথে এই লড়াই চলেছিল দীর্ঘকাল।

উপন্যাসের দ্বিতীয় কাহিনীতে নিত্যপদ ডাক্তারের বিড়ম্বিত ভাগ্যের সঙ্গে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসের শশীভূষণের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। গ্রামের মানুষ মেডিক্যাল

কলেজ থেকে পাশ করা ডাক্তারের চেয়ে গ্রাম্য কবিরাজ যাদবকেই বেশী ভরসা করে। ডাক্তার শশী বারবার গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যাবার স্বপ্ন দেখে। শহরে চাকরী সুন্দর বাংলো বাড়ি সুন্দরী স্ত্রী—এসব ভাবতে ভাবতেই তার জীবন গাঁওদিয়া গ্রামেই থেমে যায়। প্রতিবেশী হারুঘোষের বাড়ীর অদূরে তাল বনের ধারে টিলার উপর দাঁড়িয়ে যে সূর্যাস্ত দেখত। প্রতিবেশী বন্ধু পরাণের স্ত্রী কুসুমকে ঘিরে স্বপ্ন দেখত। কিন্তু একদিন সবপথ বন্ধ হয়ে যায়। কবিরাজ যাদব মারা যাবার আগে গ্রামে হাসপাতাল করার জন্যে অর্থ রেখে যায় শশীর তত্ত্বাবধানে। আর শশীর পিতা গোপাল শেষ বয়সের অবৈধ সন্তান নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যায় রাতের অন্ধকারে। কুসুম প্রেমে সাড়া না পেয়ে চিরদিনের জন্য গাঁওদিয়া ছেড়ে গেছে, শশীর জীবন থেকেও সরে গেছে শশীর শখের গোলাপের চারাটি মাড়িয়ে দিয়ে। নিয়তি তাড়িত শশীর জীবন গ্রামেই আটকে গেছে। লেখক শশীর এই পরিণতির বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন—

''জোরে আর আজকাল শশী হাঁটে না, মন্থর পদে হাঁটিতে হাঁটিতে গ্রামে প্রবেশ করে। গাছপালা বাড়িঘর ডোবাপুকুর জড়াইয়া গ্রামের সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ রূপের দিকে নয়, শশীর চোখ খুঁজিয়া বেড়ায় মানুষ। ... তালবনে শশী কখনও যায় না। মাটির টিলাটির উপরে উঠিয়া সূর্যাস্ত দেখিবার শখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না।''[২১]

ডাক্তার শশীর ব্যক্তিক পরিণতি যাইহোক না কেন, মানিক কিন্তু মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করা ডাক্তারকেই শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। যাদবের মৃত্যুর পর শশীর হাতেই হাসপাতাল করার দায়িত্ব রেখে যাওয়ার মধ্যে তারই ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু জগদীশবাবু তার ডাক্তার নিত্যপদকে এমন আলোকময় পরিণতির পথে নিয়ে যান নি।

কাহিনীতে আমরা দেখি অগ্রজ সত্যপদ'র মৃত্যুর পর নিত্যপদ তার ছেড়ে যাওয়া গ্রামেই ফিরে আসে। গ্রামের প্রকৃতিমুগ্ধ নিত্যপদ অল্পদিনেই গ্রামবাসীর প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারে। গ্রামের স্বার্থান্ধ মানুষের সঙ্গে তার সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। গ্রামের প্রধান মতিলাল নিত্যপদর উদারতাকে সুকৌশলে বযবহার করতে থাকে। হাতুড়ে ফণী ডাক্তার ও মতিলাল মিলে যৌথভাবে নিত্যপদর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। নিজে রং মেশানো ওষুধ দিয়ে মানুষকে ঠকায় ফণী, কিন্তু নিত্যপদ মানুষের কাছে বিনা পয়সায় ওষুধ পৌঁছে দেয়। কিন্তু যাদের ওষুধের দাম দেবার সামর্থ্য নেই, তারা পর্যন্ত মতিলাল আর ফণীর প্ররোচনায় পা দেয়। গ্রামের সকল স্তরের মানুষ সম্মিলিত ভাবে ষড়যন্ত্র করে নিত্যপদ'র জীবন দুর্বিষহ করে

তোলে। এই সব অন্ধকার গলিপথের মানুষই হয়ে ওঠে নিত্যপদর নিয়তি। সেই চক্রব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে ফণী ডাক্তারের কৌশলকেই সঠিক বলে মনে করেছে নিত্যপদ। সহকারী কান্তিভূষণকে সে নির্দেশ দিয়েছে—''আর ওষুধ বিতরণ করে' কাজ নাই। জল দিতে থাকো। ফণীবাবু দেশের লোকের নাড়ী ধরে আছেন—তাঁর ব্যবহারই ঠিক। আমরা ভুল পথে চলেছিলাম, ভাই।''[২২]

শশীর উত্তরণ যেভাবে ঘটেছে ফণীর মত হাতুড়ে ডাক্তারদের হারাতে না পেরে নিত্যপদ'র পরিণতি হয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে। লেখক দেখিয়েছেন নিয়তি নিয়ন্ত্রিত অন্ধকার পথে চলমান মানুষগুলির কোনো উত্তরণ নেই। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে তিনি কি এই উত্তরণ চান নি? তিনি কি তিমিরে আবদ্ধ থেকে তিমির হননের গান গাইতে পারেন নি কবির মত—

''তিমির হননে তবু অগ্রসর হ'য়ে
আমরা কি তিমির বিলাসী?
আমরা তো তিমির বিনাশী—
হ'তে চাই।
আমরা তো তিমির বিনাশী।''[২৩]

আসলে মনুষ্য ধর্মের স্তবে নিবুত্তর জগদীশবাবু নৈরাশ্য পীড়িত নিয়তি লাঞ্ছিত মানুষ এবং তাদের ট্রাজিক পরিণতিকেই উপন্যাসে তুলে এনেছিলেন।

'তাতল সৈকতে' উপন্যাসেও মানুষের মনের জটিলতায় অপরাধবোধে ভাগ্য-দোষের ভিন্ন মাত্রা পেয়ে যায়। উপন্যাসের নায়িকা শরৎ। তার জীবনের তিনটি স্তরকে লেখক চিত্রিত করেছেন। প্রথম স্তরে সে স্বচ্ছল পরিবারের গৃহবধূ। তার শ্বশুর এলাকায় সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে যেমন পরিচিত ছিলেন, তেমনি উপার্জনও করেছেন প্রচুর। দ্বিতীয় স্তরে তার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি হারাতে হয়েছে এবং দৈব দুর্ঘটনায় শেষ সম্বলটুকুও গেছে। তৃতীয় স্তরে শরৎ একা সহায় সম্বলহীন হয়ে নিজের দুটি ঘরের একটিতে ভাড়াটে বসিয়েছে। তার এই দুঃসময়ের একমাত্র সঙ্গী বালকপুত্র শান্ত—যাকে মানুষ করার ভাবনা শরৎকে অস্থির করে তোলে। একদিন সে ছেলের জন্যে অন্ধকারে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস তাকে নোংরা পঙ্কে নিমজ্জিত করে। তাকে স্বৈরিণী ভেবে মনোহর দত্ত তাকে সম্ভাষণ করলে শরৎ তার মাথায় আঘাত করেছিল—

''... ত্রাসে শরতের মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছিল। মনোহরের প্রশ্নে প্রেতলোক অন্তর্হিত হইয়া ছায়াময় ইহলোক সহস্রবাহু রাক্ষসের মতো তার দৃষ্টির সম্মুখে সহসা নাচিয়া উঠিল— কি উদ্দেশ্যে সে চারিদিকে চাহিল তাহা সে বোধহয় নিজেই জানে না... কিন্তু চোখে পড়িয়া গেল, একটা লোহার গরাদে ... অর্ধ-চেতনা অর্ধ-অচেতনার মাঝেই সে চক্ষের নিমেষে সেটা ভুলিয়া লইয়া মনোহর দত্তের গা বরাবর বসাইয়া দিলো এক ঘা—''[২৪]

আঘাত গুরুতর না হলেও ঘটনাটা নিয়ে হইচই পড়ে যায়। শরৎ যে ব্যভিচার করেনি তার জন্যে আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া স্বাভাবিক নয়। তবে পুত্র শান্ত'র কাছে নিজের কলঙ্কময় জীবনের কথা ব্যক্ত হয়ে পড়বে—এই আশংকায় সে পরিচিত আশ্রয় ছেড়ে সম্পূর্ণ অনিশ্চিৎ ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করেছে। উপন্যাসের শেষে এখানেও জনপবাদ হয়ে ওঠে শরতের নিয়তি। তার আদি গ্রামের রমা বৈষ্ণব ভিক্ষার জন্যে দরজায় এসে দাঁড়ায় এবং সে-ই মনোহরের সঙ্গে শরতের অবৈধ সম্পর্কের কথা ধনী গৃহিণী রাজনন্দিনীকে জানায়। সদলাবলে রাজনন্দিনী সেই আদিরস যুক্ত গল্প রণজিৎকে জানালে রণজিৎ সংশয়াগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এর পরিণামে আত্মহত্যা ছাড়া শরতের আর কোনো পথ খোলা থাকে না। উপন্যাসের একেবারে শেষে ভাগ্য বিড়ম্বিত সেই নারীটির করুণ পরিণতি লেখক বর্ণনা করেছেন—

''... প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে নিমু মোড়ল ... চেঁচাইতে লাগিল, কার সর্বনাশ হল রে..। কে আছো কোথায় শীগ্‌গির এসো ... কার সর্বনাশ হয়েছে দেখে যাও...

শুনিয়া লোকে ঘুম ভাঙিয়া কাপড় গামছা সাম্‌লাইতে সাম্‌লাইতে দৌড়াইয়া আসিতে লাগিল, এবং পুকুরঘাটে অকস্মাৎ এমন কলরব উঠিল যে পাখিদের আনন্দ কাকলি বন্ধ হইয়া গেল...

ব্যাপার সামান্যই একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ জলে ভাসিতে ছিল। প্রভাতের প্রথম আলোকে উজ্জ্বল জলাশয়ে অচঞ্চল ভাসমান দেহটির দিকে চাহিয়া মাধব রায় বলিলেন— জিতুর নতুন মা।''[২৫]

মানুষের এমন অন্ধকারময় মানসিকতাই শরতের মৃত্যুকে অনিবার্য করে কাহিনীকে করুণ পরিণতি দিয়েছে।

'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাসের নায়ক সিদ্ধার্থ ওরফে নটবরের আত্মজিজ্ঞাসা ছিল জীবন যুদ্ধে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা কীট পতঙ্গের আছে, উদ্ভিদেরও আছে; তাহলে সে

করবে না কেন। আর এইভাবে জীবন যুদ্ধে বেঁচে থাকাটা বিধিদও প্রেরণা। এই প্রেরণার বশেই আমরা দেখি 'সুতিনী' উপন্যাসের নায়িকা নিজেকে বাঁচানোর প্রাণপন লড়াই করছে। একটা সময় পর্যন্ত তাদের সংসারে শান্তি ছিল। কিন্তু রাজবালা পরপর চারটি মৃত পুত্র প্রসব করায় নিয়তি সহসা তাদের সংসারে কালো মেঘ ঘণীভূত করে দেয়। মৃত সন্তান প্রসবের দায় রাজবালা স্বামীর ওপর চাপায়। বিধি বাম বলে স্বামী ভগ্ন স্বাস্থ্য আর সেকারণেই সাতবছর 'গোঙানোর' পরেও রাজবালার ভাগ্য ফেরেনি। স্বামীকে ব্যঙ্গবাণে জর্জরিত করে নিজেকে সুস্থ ও নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে জেদের বশে নিজের বোন মধুবালার সঙ্গে স্বামীর বিয়ে দেয়। এই বিয়েও ছিল ভবিতব্য। উপন্যাসের অষ্টম পরিচ্ছেদের সূচনাতেই লেখক জানিয়েছেন—''মধুবালার বিবাহ ঐরূপই হইবে—ইহাই অখণ্ডনীয় ভবিতব্য; অদৃষ্টের লেখা, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ প্রভৃতি মণীমোহন আর কালীতারা উভয়েই তাহা মস্তক অবনত করিয়া সমস্বরে স্বীকার করিলেন।''[২৬]

কিন্তু ট্রাজেডির সূত্রপাত বিয়ের মাসখানেক পর থেকেই। মধুবালা আর তার স্বামীর সম্পর্ককে ঘিরে রাজবালার জীবনে যে চরম সংকট দেখা দেয় তা পূর্ণমাত্রা পায় মধুবালা পুত্রবতী হওয়ায়। নিজের জরায়ুকে সুস্থ প্রমাণ করার জন্যে তার নিরন্তর লড়াই চলে। আসলে দুর্গাপদ'র কাছে নিজেকে স্ত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে না পারাই তার জীবনে সবচেয়ে বড় বিপর্যয়। নিয়তি তাকে এই লড়াইতে পরাস্ত করেছে। নিয়তির এই ভূমিকা বিষয়ে ড. বীরেন্দ্র দত্ত যথার্থই লিখেছেন—

''সুতিনী' উপন্যাসে দুর্গাপদ'র স্ত্রী ইতিপূর্বে চারটি মৃত পুত্রের জন্মদাত্রী রাজবালার পঞ্চম সন্তান জন্ম দেওয়ার সময় মৃত্যুকে এক জাতীয় আত্মহননের বা ইচ্ছা মৃত্যুর ব্যঞ্জনা দিয়ে চরিত্রের অলিখিত ভাগ্যের অভিঘাতকে রূপ দিয়েছেন। তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের চরম অশান্তির পিছনেও আছে ভাগ্যের রহস্যময় ক্রিয়া।''[২৭] এই অভিমত অত্যন্ত যথার্থ।

জগদীশ গুপ্ত জীবনকে যেভাবে নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখেছেন, সেভাবেই সাজিয়েছেন তাঁর সাহিত্য সংসারের মানুষগুলিকে। এই মানুষগুলি কেবল সংসারের অন্ধকার গলিপথেরই নয়, জীবনের চঞ্চল ভাগ্যক্রিয়ার শিকার হয়েই তারা উপন্যাসের পাতায় পাতায় ঘুরে বেড়িয়েছে। মানুষগুলির যাবতীয় অসহায়তার পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল এক অলৌকিক অনড় শক্তি। সেই অলৌকিক শক্তির প্রভাবেই 'গতিহারা জাহ্নবী' উপন্যাসে যাবতীয় গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও

কিশোরী নিজেকে অকিঞ্চনের যোগ্য করে তুলতে পারেনি। এর জন্যে মূলতঃ দায়ী অকিঞ্চনের লাম্পট্য আর বহুনারীগামিতা। নিছক নিয়তি তাড়িত বলেই সে এমন লম্পট স্বামীর হাতে পড়েছিল, যে বিয়ের রাতেই স্ত্রীর সখিকেই লোলুপ দৃষ্টিতে দেখেছে এবং লাভ করার ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করেছে। প্রচলিত সামাজিক ভাবনায় বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন। সেই বন্ধনে অকিঞ্চন আর কিশোরীকে বেঁধে সম্প্রদানের পর কন্যাপক্ষীয় পুরোহিত জয়চক্র স্মৃতিতীর্থ কিশোরীকে আশীর্বাদের কথা বলেছিলেন। সেই পবিত্র মুহূর্তের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন—

‘‘... আপনারা মাকে আশীর্বাদ করুন’—বলিয়া অবগুণ্ঠন তুলিয়া ধরিতেই সভা থমকিয়া গিয়াছিল—এত কোলাহল চঞ্চলতা এক নিমেষে নিঃশব্দে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, এবং এত সজ্জা এত আলো এত বর্ণ এত স্পন্দন অনিন্দনীয়তা অতিক্রম করিয়া সভার সম্মুখে বিরাজ করিয়াছিল আনত আননা কন্যার সুখের সেই পেলব পুলকশ্রীটি—তাহা অনুপম। ক্ষণেকের জন্য সকলেরই মনে হইয়াছিল, এই কন্যা ভুবনমোহিনী কমলার অবিরামবাহী আশীর্বাদের যে বিত্ত মুখশ্রীতে বহন করিয়া আনিয়াছে তাহাই আমরা নতশিরে গ্রহণ করিলাম।’’[২৮]

কাহিনীর সূচনাতেই এতো আলোর ব্যঞ্জনার মধ্যেই যেন কিশোরীর বিড়ম্বিত ভাগ্যের ছায়া প্রচ্ছন্ন ছিল। অন্ধকার গলিপথে যেসব কদর্য মানুষের নিয়ত আনাগোনা, অকিঞ্চন ছিল তাদের যথার্থ প্রতিনিধি। জীবনের প্রধান বেড়ে ওঠার কালেই সে অন্ধকারের দেবতার হাত ধরেছিল। ফলে পাড়ার সমবয়সীদের তুলনায় তার নৈতিক-চারিত্রিক পতন হয়েছিল ঢের বেশী। ফলে অপদার্থ অকিঞ্চনের স্ত্রী প্রবোধ-সুধীর-গণেশ-এ্যম্বক-অরুণ প্রমুখদের স্ত্রীর তুলনায় নিখুঁত হলেও অকিঞ্চনের বিকৃত তৃষ্ণা মেটেনি। চাঁদের মতো সুন্দর যার লাবণ্য অঙ্গের প্রভা মুখের শ্রী ও সুষমা তাকে ছেড়ে অকিঞ্চন শ্বশুর বাড়ীতে গিয়েও প্রথমেই খোঁজ করেছে স্ত্রীর সখীকে। ‘তোমার সইকে দেখলাম না তো?’ একথা শুনে বজ্রাহত কিশোরী মাকে জানায় তার অপদার্থ স্বামী যেন আজই চলে যায়। আসলে স্ত্রী কিশোরীর রূপ লাবণ্য অকিঞ্চনের ছানিপড়া চোখে ধরা পড়েনি। বরং তার চেয়ে বাগ্দী পাড়ার ‘খারাপ’ মেয়েরা তার কাছে অনেক বেশী আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। বন্ধুদের কাছে সে অনায়াসেই স্ত্রীর স্থূল দেহ সর্বস্বতার কথা বানিয়ে বানিয়ে বলতে দ্বিধা করেনি। স্বামীর এই স্থূল মানসিকতাই হয়ে ওঠে কিশোরীর নিয়তি। স্বামীর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে সে বাপের বাড়ী চলে গেছে। আর ফিরে আসে নি শ্বশুর

বাড়ীতে। কিন্তু দৈব নির্ধারিত পথেই সে দু'মাস যেতে না যেতেই গভীর বেদনার সঙ্গে অনুভব করেছে যে সে মা হতে চলেছে—

''...বাহ্যত প্রশান্তভাবে দিন চলিতে চলিতে দ্বিতীয় মাসের একটি দিনে কিশোরী অনুভব করিল যে, গর্ভবতী। এ-দিক্‌টা কেউ ভাবে নাই, কিশোরীও না। তাহার এই অনুভূতিটা যে অচিন্তনীয় আর স্বতন্ত্র আকারে দেখা দিল তাহা চির স্মরণীয়, সংসারের আর কোনো নারী জঠরে সন্তান আগমনের সংবাদ ঠিক্ এমনি করিয়া গ্রহণ আর অনুভব করে নাই। সংসারে যে শুভ সংযম দেখা যায় এবং বিবাহের যে দার্শনিকতা আজ পর্য্যন্ত মানুষকে মুগ্ধ এবং পবিত্র করিয়া আসিয়াছে তার উৎপত্তি নাকি স্বামীর ঔরসে নারীর গর্ভধারণেই।''[২৯]

নিয়তি নির্যাতিত কিশোরীর ভেতরটা একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়। নিজের কাছেই সে জানতে চায়, এই সন্তান কি স্বামীর আত্মজ, স্বামী যা অকাতরে দান করে করে ইহকাল ও পরকালব্যাপী কলুষ মর্মে আত্মায় পুঞ্জীভূত করেছিল এই সন্তান সেই অশেষ কলুষ জাত। সাপের যেমন বিষদাঁত থাকে ঐ পুরুষটির অন্তরে তেমনি একটি জ্বালাময় প্রবৃত্তি আছে—এই সন্তান সেই প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির চিহ্ন মাত্র। দৈব অনুগ্রহে প্রাপ্ত ধন এই সন্তান নয়। এর সঙ্গে অনশ্বর অমৃতের কোনো সম্পর্ক নেই। ফলে তার ভেতরে মাতৃত্বের বীজ অঙ্কুরিত করে বিধাতা তাকে অমৃতের আস্বাদ এনে দেয়নি। কিশোরীর সমস্ত চাওয়া-পাওয়া নিঃশেষ হয়ে যায়। কোনো কান্তিময় আলো তার চোখের সামনে আর জ্বলে ওঠে না। সে মা হেমশশীর কাছে গিয়ে নিজেকে সমর্পণ করে—

''... আমি কি করব বল। আমার পেটে ছেলে এসেছে। তোমার পায়ের তলায় আমি পড়লাম, যা'খুশি করো তোমরা আমায় নিয়ে, আমি আর পারছি না।''[৩০] এই সমর্পণ আসলে অসহায় মানুষের নিষ্ঠুর নিয়তির কাছে অনিবার্য। কেননা যাবতীয় চিন্তার ক্ষেত্রগুলো রুদ্ধ হয়ে গিয়েই এই বিপর্যস্ত অবস্থা আসে। কিশোরীও সেই অবস্থার শিকার।

নারী গণিকা হয়ে জন্মায় না। সমাজ তার নিজের প্রয়োজনে নারীকে গণিকা করে তোলে। এই নারীকে নিয়ে পুরুষ নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। হয়ে ওঠে নারীর বিধাতা। রোমান্টিক পুরুষদের চোখে নারী মাত্রই দয়িতা বা মানস সুন্দরী, তাই তার চোখে পড়েছে শুধু নারীর চারপাশের বর্ণ, গন্ধ, ভূষণ, যাতে নারীকে সাজিয়েছে পুরুষ। পুরুষ প্রেম আর আলিঙ্গনেও ভুলতে পারে না, সে প্রভু সে বিধাতা, সে নারীর স্রষ্টা। আসলে পুরুষের অহমিকা এখানে

প্রকাশ পেয়েছে প্রকটভাবে, নারী সৃষ্টিতে সে বিধাতার সাথে নিজেদের অংশীদারত্ব দাবী করেছে। অস্বীকার করেছে নারীর বাস্তবতাকে, নারীকে বলেছে অর্ধেক মানবী, আর অর্ধেক কল্পনার। তাই পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতা নারী সৃষ্টি না করলেও নারী ধারণাটি পুরোপুরি পুরুষের সৃষ্টি। পুরুষ নারীকে নানা শব্দে শনাক্ত করেছে, নারীর সংজ্ঞা রচনা করেছে। নারীর জন্যে বিধি-নিয়ম চালু করে হয়ে উঠেছে বিধাতা। আর নারী-নিজেকে বারবার সেই পুরুষের চাওয়া-পাওয়ার কাছে নিজেদের সমর্থন করেছে। কখনো গৃহের চার দেওয়ালে, কখনো গৃহের গণ্ডীর বাইরে। ঘরের বৃত্তে নারীকে পেয়ে পুরুষ তৃপ্ত হয়নি। ফলে বহির্বিশ্বে নারী তার জীবন ও যৌবন সাজিয়ে রেখেছে পুরুষের জন্যে। এইভাবে নারী গৃহী জীবন থেকে ছিটকে গিয়ে হয়ে উঠেছে গণিকা; আবার বহু পুরুষের তৃষ্ণা মিটিয়ে গৃহ বুভুক্ষা নিয়ে ঘরে আসতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে। সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় হল, পুরুষতান্ত্রিক এই সমাজ কাঠামোর হাল বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ধরে রাখতে সহায়তা করেছে নারীরাই। তাইতো উত্তম গৃহ-জীবনে এলে মোক্ষর মা টুকীকে মনে করিয়ে দিয়েছে উত্তম ‘বেশ্যে’ ছিল। বিধাতা পুরুষের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এই পুরুষের প্রতিনিধি বিশ্বম্ভর ও পরিতোষ অনায়াসেই চূর্ণ বিচূর্ণ করেছে উত্তম ও টুকীর যাবতীয় সোনালী স্বপ্নকে। এরকমই স্বভাবসিদ্ধ ইতর আর কোমর বাঁধা শয়তান পুরুষের প্রতিনিধি ‘নন্দ আর কৃষ্ণা’ উপন্যাসের মণীন্দ্রবাবু। যার গৃহের গণ্ডীর ভেতরে কৃষ্ণা’র মতো গণিকা আবদ্ধ থেকে পুরুষকে নিয়ে আদিম খেলায় মেতে উঠেছে বারবার। এই কৃষ্ণা যেন নারীর বিষাক্ত রূপের প্রতিমূর্তি যার মধ্যে নির্মল স্নিগ্ধ নারী সত্তা নেই, নেই গৃহ বুভুক্ষা। পুরুষকে নিয়ে লীলা খেলাতেই যার আদিম আনন্দ। সে পুরুষ বিধাতার অযত্নের ফলে সৃষ্ট এক বিকৃত রূপ। ছেলের গৃহ শিক্ষক নন্দর কাছে কৃষ্ণার পরিচয় পরিস্ফুট করতে গিয়ে সেই বিকৃত কাম পুরুষ মণীন্দ্র জানিয়েছেন—

■ “তুমি হয়তো ভাব্‌ছো আমার সন্দেহটাই আছে, তাই টোকা মেরে একটু পরীক্ষে করছি; কিংবা সবই আমার মিথ্যে কথা আর আমি খুব নির্লজ্জ। তবে শোনো এক মজার কথা; প্রথমেই জানাই যে, উনি আমার স্ত্রী নন্‌।”[৩১]

■ “... আমার বয়স চল্লিশ, তোমার বয়স তেইশ, আর, তুমি পালিয়েছ বলে। আমি কিন্তু ধরে নিলাম, আমার স্ত্রীর উৎপাতেই পালিয়েছিলে। কাজেই তুমি আমার পরম বিশ্বাসভাজন, তোমার শুভ আমি একান্তভাবেই চাই। তারপর শোনো, উনি আমার স্ত্রী নন্‌।

তবে কে? নিশ্চয়ই তা জান্‌তে তোমার কৌতূহল হয়েছে। উনি আমার খুড়তুতো ভগিনী।"[৩২]

■ "... আমি সম্পর্কে সে-ই খুড়ীর বাড়ীতে যেতাম; এবং তারপর সেই মেয়েটি বড় হ'লে, আর আমার স্ত্রী বিয়োগ হ'লে, যাক্, অত খুঁটি নাটিতে কাজ নেই। আশ্চর্য্য সুন্দরী; আমি লোভ সংবরণ করিতে পারিনি, তুমি পেরেছ। ধন্যি ছেলে বটে তুমি। তোমার এখন যৌবনের পুরো জোয়ার আর রূপ আছে, আমি প্রৌঢ়।"[৩৩]

মণীন্দ্রর এই আত্ম-উদ্‌ঘাটন থেকেই পরিস্কার যে, সম্পর্কের তোয়াক্কা না করে সে কৃষ্ণার বড় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে এবং স্ত্রী বিয়োগের পরেই তাকে নিজের বাড়ীতে এনে রক্ষিতার মতোই রেখেছে। মণীন্দ্রর নোংরা হাতেই নির্ণীত হয়ে গেছে কৃষ্ণার ভাগ্য। কৃষ্ণার অন্তরে যে সুস্থ সুন্দর নারীসত্তা ছিল তাকে হয়তো অঙ্কুরেই বিনাশ করেছে মণীন্দ্র। ফলে পুরুষ বিধাতার বিকৃত মূর্তি কৃষ্ণা রূপ যৌবনের আগুনে পুরুষ পেলেই পুড়িয়েছে। তরতাজা তরুণ নন্দকেও সে তার পাতা ফাঁদে ফেলেছিল। সেই আগুনের শিখার বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন—"প্রভুপত্নী তরুণী রমণীমাত্র একখানি তোয়ালে কটিদেশ হইতে বিলম্বিত করিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন—দীর্ঘ কেশদামে পৃষ্ঠদেশ আবৃত ধৌত চুলে চিরুণী লাগাইয়া তিনি হাত তুলিয়া চিরুণী টানিয়া আনিতেছেন পিছনের চুলের ভিতর—দাঁড়াইয়া আছেন দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া, এবং সুবৃহৎ দর্পণের পটভূমিকায় তার সর্ব্বাঙ্গের ছায়া প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।"[৩৪]

এই রূপবহ্নি তেইশ বছরের তরুণ নন্দর বুকের ভেতরে উথাল পাতাল ঝড় তুলে দিয়েছিল। সে ভয়ে পালিয়ে গেছিল। পরে ফিরে এলে কৃষ্ণার কাছে মুক্তকণ্ঠে আহ্বান শুনতে পেয়েছে। সে যেন না পালায়। আয়নায় সে কৃষ্ণাকে যেমন দেখেছে ওরকম আবার দেখুক—এটাই কৃষ্ণার কাম্য। মণীন্দ্র যে বিকৃতকাম কৃষ্ণার জন্মদাতা, সেই নারী আবার নিজের পোড়া ভাগ্যের দহন জ্বালায় নন্দকে দগ্ধ হবার আহ্বান জানিয়েছে। অন্ধকার গলিপথের হাতছানি নন্দকে সম্পূর্ণ নষ্ট হতে দেয়নি তার স্ত্রী মমতার স্নিগ্ধ ভালোবাসা। তবু সেই ভালোবাসার মুক্ত শুদ্ধ বাতাস নিয়েও নন্দ-যখন কৃষ্ণার রূপ বহ্নিতে পিপিলিকার মতো দগ্ধ হতে গেছে তখনই কৃষ্ণার মায়ের সতর্কবার্তা তার অবচেতন মনের দরজাকে মুক্ত হতে দেয়নি—"তোমাকে বল্‌ব কি বাবা, মেয়েটা চিরকাল শয়তান। ... রূপ আছে, রূপের জোরে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলে মজা দেখা ওর মজ্জাগত অভ্যাস। ... তোমাকে মণির বাড়িতে দেখে আমার তৎক্ষণাৎ

মনে হল, আর, ভারি ভয় হল যে, এই ভালো ছেলেটাকে বজ্জাত মেয়ে আমার কষ্ট না দিয়ে কিছুতেই ছাড়বে না।"[৩৫]

কথাগুলো নন্দ'র জীবনে দৈব বাণীর মতোই বর্ষিত হয়েছে। মানুষ নিয়তির হাতের ক্রীড়নক, একথা সত্য। 'আবার সেই নিয়তিই' মানুষকে বিপথে চালিত হবার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে পড়ে। নন্দ তাই বিপথগামী হতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। কৃষ্ণার মায়ের কাছে সে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে। এবং নিজেকে শৃঙ্খলমুক্ত মনে করেছে। আর তার কাছে সত্য হয়ে উঠেছে স্ত্রী মমতার স্নিগ্ধ সুখখানি—"... তখন তার প্রাণে একমাত্র সত্য হইয়া উঠিয়াছে তাহারই মমতা; মমতার মুখচ্ছবি অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া আছে, তার কণ্ঠ জিহ্বা হৃদয় ব্যাপিয়া নিঃশব্দে ধ্বনিত হইতেছে মমতারই স্নিগ্ধ নামটি।"[৩৬]

মৃত্যু হল জীবনের অনিবার্য পরিণাম। জীবনানন্দ দাশ প্রসঙ্গত লিখেছিলেন—

"কখন মরণ আসে কে বা জানে—কালীদহে কখন যে ঝড়
কমলের নাল ভাঙে—ছিঁড়ে ফেলে—গাঙচিল শালিখের প্রাণ
জানি নাকো—"[৩৭]

এই নির্মম সত্য কি আর সহজে ইন্দ্রনাথের মতো বলতে পারা যায়—মরতে একদিন হবেই তো। বিশেষ করে প্রিয়তম সন্তানের অকাল প্রয়াণ কতটা মর্মান্তিক হয়ে জন্মদাতা-জন্মদাত্রীর বুকে আঘাত করে, সেকথা বর্ণনাতীত। জগদীশবাবু এরকমই এক মর্মান্তিক ভাগ্য বিপর্যয়ের চিত্র অংকন করেছেন তাঁর 'রতি ও বিরতি' উপন্যাসে। এখানে নায়ক রামের জীবন সংগ্রামের এক করুণ চিত্র অংকন করতে গিয়ে লেখক দেখিয়েছেন জীবনের অন্ধকার গলিপথটা কতখানি অনিশ্চিত হতে পারে আর সেই পথে চলতে গিয়ে কীভাবে মৃত্যু নিয়তির স্বরূপকে প্রকট করে দেয়। উপন্যাসের রাম ভিক্ষোপজীবী, হতদরিদ্র। 'রোমন্থন' উপন্যাসের হতদরিদ্র অভয়ের তবু জীবন-জীবিকার ভার বহনের জন্য একফালি জমি ছিল, যাতে সে পাট চাষ করেছিল। কিন্তু এই উপন্যাসের রামের সেই সম্বলটুকুও নেই। সে একক মানুষ। জীবনের শেষ পর্যায়ে নিয়তির নিষ্ঠুরতায় প্রথম কবে সে ভিক্ষাপাত্র হাতে তুলে নিয়েছিল, আজ আর তা মনে নেই। তার পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক উপন্যাসের একেবারে প্রথম পরিচ্ছেদেই লিখেছেন—

"রামের জীবনকথা অতি ক্ষুদ্র—তার নিজেরও সব কথা মনে নাই মনে রাখিবার সময়ও নাই, কিন্তু সকল দিনের চাইতে উজ্জ্বল একটি দিন উর্দ্ধের ঐ বিরাটায়তন সস্মিত আকাশের মতো

তাহার মনশ্চক্ষুর পুরোভাগে অক্ষয় চিরস্থির আর উদ্ভাসিত হইয়া আছে। সাগর মন্থন করিবার সময় যে দিনটাতে অমৃত পাওয়া গিয়াছিল আর লক্ষ্মী উঠিয়াছিলেন তেমন স্মরণীয় দিনটি।"[৩৮]

অতিসংক্ষিপ্ত, প্রায় তুচ্ছ রামের জীবনের সেই পুণ্যলগ্নে তার স্ত্রী ছিল, লব নামে একটি পুত্রও ছিল। পুরাণের রামচন্দ্রের মতো ঐশ্বর্যে না হলেও খেটে খাওয়া রামের জীবনে পুত্র লবের অবস্থান রামচন্দ্রের মতোই কোনো অংশে কম ছিল না। সেই আদরের ধন লবকে ঘরের মেঝেতেই গর্তে বসবাসকারী একটি সাপ দংশন করে এবং পিতা-মাতার বুক খালি হয়ে যায়। সন্তানকে হারিয়ে রাম সেই কালসর্পের গর্তটার দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। এই মৃত্যু যেন পরিকল্পিত। সেই বিধাতা নির্দেশিত ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন—

''একদিন গভীর রাত্রে ভগবান তাহাকে আদেশ করিলেন, 'সাপ তুমি রামের ছেলে লবকে দংশন করিয়া আইস, তাহার আয়ু শেষ হইয়াছে'।

এই আদেশে পাতালপুরীর অন্ধকারে নিদ্রিত সর্পের কুণ্ডলীকৃত অলস দেহের আদ্যোপান্তে চেতনা তরঙ্গিত হইল—কুণ্ডলী খুলিয়া খুলিয়া দেহ ধীরে ধীরে সচল হইয়া উঠিল তাহার বিষাক্ত নিঃশ্বাসে তাহার সম্মুখের মাটি ঝরিয়া ঝরিয়া অবাধ সরল একটি পথ প্রস্তুত হইল—সর্ব্বাগ্রে তার স-দন্ত মাথাটা বিবরের বাহিরে আসিল—যেখানে লবকে লইয়া তাহারা নিদ্রিত ছিল সেই দিকে তার মুখ ফিরিল—ধীরে ধীরে সমগ্র মসৃণ দেহটা অতি নিঃশব্দে নির্গত হইল।"[৩৯]

একেবারেই বিধাতার পূর্ব-পরিকল্পিত এই মৃত্যুর আয়োজন। অসহায় মানুষের এখানে কিছুই করণীয় নেই। যে গর্ত থেকে 'ভগবানের' দূত এসে লবকে নিয়ে চলে গেছে, সেই গর্তটি রাম বুজায় নি, বুজাতে দেয়নি। বরং অনেক আশা নিয়ে তারা স্বামী-স্ত্রী মিলে সেই গর্তের ধারে মাথা রেখে প্রতিদিন ঘুমায়। রাত্রির সুদীর্ঘ কালো অন্ধকার আর অনেক নিদ্রার সুযোগ শেষ হয়ে যায়, কিন্তু সেই কালসর্পকে আর ওই পথে তারা দেখতে পায় না। লখীন্দরের মৃতদেহ যেমন একদিন ভেলায় ভাসতে ভাসতে বেঁচে উঠেছিল দেবতার স্পর্শলাভে তেমনি করে তার পুত্রও বেঁচে উঠবে—এমন অলীক আশা নিয়ে একদিন জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে সন্তান হারা অসহায় গয়ামণি। শুরু হয় রামের একক পথচলা। নিয়তি যেন তাকে নিয়ে খেলা করতে থাকে। ভিক্ষাপোজীবী রামের শরীর ও মন ক্রমশ শুকিয়ে যেতে থাকে। এবং সে অদৃষ্টের ভূমিকায় পরিপূর্ণ ভিখারী হয়ে ওঠে। এই ভিক্ষুক জীবনে রামের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি

নীলকণ্ঠ মজুমদারের নাতির অন্নপ্রাশনে গিয়ে রায় বাহাদুরের কাছ থেকে একটি টাকা। প্রায় অনাহারে থেকে গাঙ্গুলীর হোটেলের উচ্ছিষ্ট খাবার খেয়ে রাম বেঁচে ছিল। রাজা বাহাদুরের কাছে টাকাটি পেয়ে রামের ভাবনার জগতে ঝড় ওঠে। টাকাটি সে খরচ করে না। সেই টাকা আর প্রাপ্ত কয়েকটি লুচি পুঁটলী বেঁধে ঘরে পেরেকের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখে। এতেই যেন তার ক্ষুধা মিটে যায়। টাকাটি নিয়ে সে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। লেখক প্রসঙ্গও জানিয়েছেন—

''টাকাটা বৃদ্ধাঙ্গুলি আর তর্জনীর মাঝে ধরিয়া রাম তাহাকে স্নেহ ও সম্ভ্রমের সহিত একবার কপালে ছুঁয়াইল; তারপর তাহাকে মুষ্টির ভেতর আবদ্ধ করিয়া মুষ্টি খুলিয়া দেখিল, টাকা একটিই আছে, দ্বিগুণ হয় নাই। ... কি মনে করিয়া সে পরম লালসার সঙ্গে জিহ্বা বাহির করিয়া টাকাটার এপিঠ ওপিঠ দু'বার চাটিল।''[৪০]

টাকাটি দিয়েই তার নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখার পথেও নিয়তি প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। পেরেকে টাঙানো ভিক্ষার ঝুলিটি মাটিতে পড়ে গেলে তাতে রাখা টাকাটি হারিয়ে যায়। রাম সারারাত ঘরের মেঝে খুঁড়ে চলে। সেই টাকাটি পেতেই হবে। কিন্তু সেটি আর পাওয়া গেল না। পরিবর্তে সুড়ঙ্গের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে লবের ঘাতক সেই কালসাপটি। প্রবল প্রতিহিংসায় অথবা আত্মহননের সুতীব্র ইচ্ছায় সে সাপটিকে আঘাত করে। সাপটিও প্রত্যাঘাত ফিরিয়ে দিলে রামের মস্তিষ্কে সর্বাঙ্গে দংশন জ্বালা অনুভূত হতে থাকে। নিয়তির হাতে অসহায়ভাবে পরাজিত হলেও বাইরে তার কোনো প্রকাশ ছিল না রামের। এইভাবে অন্ধকার গলিপথেই একটি অখ্যাত পরিবারের অধ্যায়টুকু নীরবেই শেষ হয়ে যায়। ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায় এই নিয়তির লাঞ্ছনার কাহিনী সম্পর্কে যথার্থ লিখেছেন—

''নিয়তির ভূমিকা এই গল্পে মুখ্য। নির্মম নিয়তি এই গল্পে রামকে নিয়ে যেন এক মর্মান্তিক খেলায় মেতেছে। লবের মৃত্যুর পর রাম সস্ত্রীক মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছে কিন্তু কালসর্প তখন অদৃশ্য। গয়ামণি অসহনীয় যন্ত্রণায় আত্মহত্যা করেছে, তখনও নিষ্ঠুর নিয়তির খেলা শেষ হয়নি, অবশেষে যখন রাম দারিদ্র্যের সর্ব্বোচ্চ বেদনায় পৌঁছে গেছে, তখনই নির্মম ভবিতব্য তার খেয়াল খুশীর খেলা সমাপ্ত করেছে।''[৪১]

কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক হলেও কল্লোলীয়দের পথে তিনি হাঁটেন নি। তাঁর গল্প উপন্যাসে এই যে নিয়তির লাঞ্ছনা তা কেবল নৈরাশ্যের চিত্রাঙ্গনেই শেষ হয়নি, বরং তিনি বিষয়টিকে বিপরীত অবস্থান থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন। 'অসাধু সিদ্ধার্থে'র নটবর থেকে শুরু করে,

লঘুগুরুর উত্তম-টুকী, হয়ে সুতিনী'র রাজবালা 'মহিষী'র কিশোরী কিংবা 'রতি ও বিরতি'র রাম এইসব অন্ধকার গলিপথের মানুষের জীবনকে একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ দ্বারা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন অত্যন্ত নিরাসক্ত ভঙ্গিতে। আসলে মানব ভাগ্য মানুষের কর্মফলকে দেখাতে চায়। ব্যক্তি, সমাজ ও পরিবেশের দায় হল সেই কর্মফলের যথার্থ প্রতিফলন। জীবনের সমস্ত শক্তির একটা সীমা আছে যাতে কর্মফল সবসময়ই আংশিকতা দোষে দুষ্ট। জগদীশবাবু সেই আংশিকতা থেকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে গেছেন তাঁর রচনার পাঠকদের। তাই আপাতদৃষ্টিতে বিভ্রান্তিটুকু কাটিয়ে উঠলে তাঁর শিল্পী প্রতিভার অখণ্ডতাকে অনুভব করা যায়। বিশেষ করে তাঁর এইসব অন্ধকার গলিপথের মানুষের জীবনে নিয়তি যে কিরূপ ভূমিকা পালন করেছে সেটা তিনি নির্মহ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষই শুধু করেননি, পাঠককেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। এখানেই তাঁর শিল্পী প্রতিভার অনন্যতা। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গীর মূল্যায়ন করে সমালোচক ড. সুকুমার সেন লিখেছেন—

''অসহায় মানুষের জীবন চক্র ঘুরিতেছে নির্মম নিষ্ঠুর হিংস্র অদৃষ্টের হাতে ইহাই জগদীশচন্দ্রের গল্পের অমোঘ নির্দেশ। মানুষের দৈন্য কুশ্রীতা-নোংরামির জন্য জগদীশচন্দ্র সমসাময়িক 'আধুনিক' লেখকদের মতো সমাজের বা ব্যক্তির ঔদাসীন্য, ঘৃণা বা লুব্ধতা দায়ী বলিয়া দেখান নাই। ... শক্তিশালী এবং অসাধারণ লেখক বলিয়াই জগদীশচন্দ্র আধুনিক সাহিত্যকদের মধ্যে শাখাপতিও হইতে পারেন নাই।''[৪২]

তথ্যসূত্র :

১. ১৯৪৬-৪৭, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ১৩৯।

২. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রা. লি., পৃ. ৬৩৩।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৪।

৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পুতুলনাচের ইতিকথা, প্রকাশভবন, কলকাতা, পৃ. ২১৪।

৫. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৩৫।

৬. জগদীশ গুপ্তর গল্প, সুবীর রায় চৌধুরী (সম্পাদিত), দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ,

১৯৯১, পৃ. ৫৩।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২।

১০. জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃ. ১৩৮।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

১২. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃ. ২৩১।

১৩. বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতা : জগদীশ গুপ্ত, বিশ্ববাণী, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ১৫৩।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

১৬. জগদীশ গুপ্ত : মানব ভাগ্যের এক নিঃসঙ্গ নিরাসক্ত কথাকার; জগদীশগুপ্ত : জীবন ও সাহিত্য, ড. সমরেশ মজুমদার (সম্পাদিত), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০১২, পৃ. ৫২।

১৭. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রা. লি., পৃ. ২০২।

১৮. জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃ. ২১৪।

১৯. জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৯৯।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

২১. পুতুলনাচের ইতিকথা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশভবন, কলকাতা, পৃ. ২১৪।

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

২৩. জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, পৃ. ১০৭।

২৪. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রা. লি., পৃ. ২৭৬।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

২৮. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রা. লি., পৃ. ৩৭।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

৩৭. জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ভারবি, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৩১৭।

৩৮. জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃ. ৫৫।

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।

৪২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃ. ৩৫১।

ষষ্ঠ অধ্যায়
চরিত্রদের মনোজগতের কুটিল বিসর্পিল গতি

"জগদীশ গুপ্ত স্পষ্টতই কথাশিল্পে মনোবিশ্লেষণের প্রাধান্য প্রভাবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। মানব প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির বিচিত্র রহস্যময় গতিবৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণই যে আধুনিক কথাসাহিত্যের চারিত্র্য লক্ষণ তার সংকেতও আছে এখানে। ... অদৃশ্য মহাশক্তির স্বেচ্ছাচার, অমঙ্গলবোধ, সংশয়চেতনা, বিশ্ববিধানে অনাস্থা, দুঃখবাদ নরনারীর বিচিত্র সম্পর্ক ও যৌনবৃত্তি সমাজবীক্ষণ—তাঁর শিল্প চেতনার, মূলভূমি অধিকার করে আছে। তবে এ-সমস্ত প্রবণতার ভেতরে মানব প্রবৃত্তির অন্বেষণ ও বিশ্লেষণ মধ্যবিন্দুতে ক্রিয়াশীল থেকেছে।"[১]

মানবদেহকে পোষ্টমর্টেম করলে দেহের বিভিন্ন অংশ ছাড়া 'মন' বলে কোনো স্বতন্ত্র জিনিসের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। দৈনন্দিন জীবনে যদিও 'মন', 'আত্মা' প্রভৃতি কথা ব্যবহার করা হয়, তবু এই অতি পরিচিত শব্দের সঠিক অর্থ আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট নয়। ভারতীয় দর্শনে মন ও আত্মার মধ্যে প্রভেদ করা হয়েছে। 'মন' হল ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়—যার সাহায্যে অন্তর্দর্শন হয় এবং আমাদের মানসিক অবস্থাগুলি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। আর 'আত্মা' হল জ্ঞাতা, কর্তা বা ভোক্তা—যিনি বিষয় জানেন, সক্রিয়ভাবে কর্মে লিপ্ত হন এবং দুঃখ-সুখ ভোগ করে থাকেন। কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনে 'mind', 'soul', self' প্রভৃতি শব্দগুলিকে সমার্থক শব্দ হিসেবে দেখা হয়ে থাকে। 'মন' বলতে ঠিক কী বোঝায় তা নিয়ে শুধু দার্শনিকরা নন, শরীরবিদ্‌দের মধ্যেও মত পার্থক্য রয়েছে। উইলিয়াম জেমস্ তার 'The Principles of Psychology' গ্রন্থে মানবদেহে মনের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর প্রদত্ত যুক্তি মতে, মানুষের প্রতিটি কাজের পেছনে উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সফল করার জন্য অনেকগুলি উপায় থেকে একটি উপায় বেছে নেওয়াকে বোঝায় মানসিক ক্রিয়ার লক্ষণ। সেদিক থেকে চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা, স্মৃতি ইত্যাদি হল মনের বিভিন্ন বৃত্তি। এইসব বৃত্তিগুলি আলাদা আলাদা হলেও তাদের মধ্যে একটি সুগভীর যোগসূত্র রয়েছে। এই মানসিক বৃত্তিগুলিকে একত্রে 'মন' বলা যায়। এই মনের স্বরূপ বা লক্ষণ হ'ল চেতনা যার দ্বারা মনকে জড় ও প্রাণ থেকে পৃথক করা যায়। বিভিন্ন মতবাদীরা মনকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। সেদিক থেকে মনের বিভিন্ন দিকগুলি হল—

■ 'মন' বলতে চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়াগুলির সমষ্টিকে বোঝায়। এদের বাদ দিয়ে কোনো স্থায়ী অপরিবর্তিত সত্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় না।

■ 'মন' বলতে বোঝায় চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা এই মানসিক প্রক্রিয়াগুলি থেকে স্বতন্ত্র দেহাতিরিক্ত এক স্থায়ী ও অপরিবর্তিত অধ্যাত্ম সত্তাকে।

■ 'মন' বলতে বোঝায় এক মূর্ত আধ্যাত্মিক ঐক্যের সম্বন্ধ—যা চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত কোন কিছু নয়, অথচ যা নিজের স্বাতন্ত্র্য না হারিয়ে ওই সব মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে।

বিভিন্ন মতবাদীরা 'মন' সম্পর্কে যত ব্যাখ্যাই দিয়েছেন, তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে 'মন' হল একটা মানসিক অবস্থার বিভিন্ন বৃত্তিগুলির যোগফল। এই মনের সঙ্গে চেতনার একটি অঙ্গাঙ্গীযোগ রয়েছে। অনেক সময় মন ও চেতনাকে সমার্থক বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ রয়েছে। তবে এককথায় চেতনারও সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। চেতনা হল মনের নিজের অবস্থা সম্পর্কে বোধ। এর অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদান হল চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া। অচেতনের সঙ্গে এর পার্থক্য নির্দেশ করে মনের ধর্ম বোঝানো হয়ে থাকে। এককথায় কেউ বলেছেন চেতনা হল জ্ঞাতা মন ও জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে এক সম্বন্ধ। মনোবিজ্ঞানী সিগমুণ্ড ফ্রয়েড-এর মতে চেতনা জীবনী শক্তির অচেতন উপাদান থেকেই উদ্ভুত। আবার মনের সঙ্গে দেহের একটা নিবিড় সংযোগ রয়েছে। দেহ যদি আধার হয়, তাহলে মন হল আধেয়। একটি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব সম্ভব নয়। তাই যদি শরীর সুস্থ ও নীরোগ থাকে, তাহলে মনও সতেজ আর খুব ভালো থাকে। শরীর যদি কোনো কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে মনেরও জোর কমে যায়। আবার মন যদি প্রফুল্ল থাকে তাহলে শরীরের কর্ম ক্ষমতা বেড়ে যায়। অধ্যাপক প্রমোদ বন্ধু সেনগুপ্ত দেহ ও মনের এই সম্পর্ক বিষয়ে লিখেছেন—"... মস্তিষ্কে যদি কোন গুরুতর আঘাত লাগে, তবে চেতনা শক্তি লোপ পায়। মস্তিষ্কের বৈকল্য অনেক প্রকার মানসিক রোগের কারণ হয়। মানসিক-অনুভূতির দৈহিক প্রকাশ খুব স্বাভাবিক ঘটনা। মানুষ ক্রুদ্ধ হলে তার চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে, হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়, দুঃখে মানুষের চোখ দিয়ে জল ঝরে। মনে আনন্দ হলে মুখভঙ্গির মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটে।"[২] শারীরবিদ্যা বলে, মস্তিষ্কের আকার, ওজন এবং জটিলতার সঙ্গে বুদ্ধির তারতম্যের নিবিড় যোগ আছে। মস্তিষ্কের কোন অংশ কেটে বাদ দিলে তার সঙ্গে যুক্ত চেতনার কাজটি বিকল

হয়ে যায়।

সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড (১৮৫৮-১৯৩৯) হলেন মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের প্রবর্তক। তিনি তাঁর কয়েকজন শিষ্য মিলে মানুষের অবচেতন ও অচেতন মনের আবিস্কার, বাল্যকালের অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব আরোপ, স্বপ্ন ব্যাখ্যা অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি ইত্যাদির উপর আলোকপাত করে মনোবিজ্ঞানে এক নতুন দুয়ার খুলে দেন। মানুষ সম্পর্কে ধারণার ক্ষেত্রটি প্রশস্ত হয়, ফলে সেটা সাহিত্য শিল্প-ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব-নন্দনতত্ত্ব-শিক্ষা-ধর্ম ইত্যাদি জীবনের নানাক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। ফ্রয়েডের তত্ত্ব সমগ্র মানবজাতিকেই একটা নতুন ভাষ্যে ও আলোকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মানুষের মন, মনন, নিদ্রা, স্বপ্ন, চেতনা-অবচেতনা-মানসিক বৈকল্য ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই একটা নতুন দুয়ার উন্মোচিত হয়েছে। যদিও বর্তমানে ফ্রয়েডীয় চিন্তাও নানাভাবে সমালোচিত হচ্ছে। এবং এটাই স্বাভাবিক। মানুষের মন ও চিন্তনকে প্রথম প্রচলিত ধারণা থেকে আলোয় এনেছিলেন ফ্রয়েড। দীর্ঘকাল তাঁর প্রদর্শিত পথেই মনোবিজ্ঞান এগিয়েছে। তিনি আমাদের মনের যাবতীয় চিন্তা, অনুভূতি ইত্যাদিকে দেখেছিলেন যৌনতার নিরীখে, কিন্তু বর্তমানে আমাদের এইসব বৃত্তিগুলি বাইরের বস্তু দ্বারাও প্রভাবিত হয়—এই দিকটির প্রতি ফ্রয়েড আলোকপাত করেননি। এটা তাঁর সীমাবদ্ধতা, কিন্তু তাঁর মতবাদ আজও প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। বিশেষ করে বিংশ শতকের সাহিত্য সমাজ-ধর্মের ক্ষেত্রটি পর্যালোচনা করতে হয় ফ্রয়েডীয় চিন্তার নিরীখেই। ফ্রয়েড আমাদের মনের উদ্দেশ্যগুলোর উৎসকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছিলেন—

- অদস্ (Id)
- অহং (Ego) এবং
- অধিশাস্তা (Super-ego)

অদস্ (Id) স্তরে ভালোমন্দ বা মূল্যবোধ বলে কোনো কিছু নেই, নীতি নেই আছে কেবল সুখ ভোগ যার কেন্দ্রস্থল হল দেহ। এর আরেকটি নীতি হল মিতব্যয়িতা। কমশক্তি খরচ করে বেশী সুখ পাওয়াই হল অদসের নীতি। আবার মনের চেতনার নিরীখে যে তিনটি স্তর—চেতন (Concious), অচেতন (un-concious) এবং অবচেতন (sub-concious)—সেখানে অবচেতন মন স্বপ্নপূরণ কালেও এই অদস্ কাজ করে থাকে। অহং (Ego)-এর উৎপত্তি অদস্ থেকেই। অদস্ যেমন সুখ-ভোগ নীতির পরিপোষক, অহং (Ego) তেমনি বাস্তবতা

মেনে চলে। ফ্রয়েড অদসের শক্তিকে বলেছেন কাম-প্রেরণা (Libido)। এই অদস্ একেবারেই অন্ধ, যে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুলাভ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। কিন্তু অহং-এর কাজ হল প্রকৃতিগত তাগিদ ও বিষয়াকর্ষণকে বাস্তবতার নিরীখে বিচার করা। বহির্জগতের সংস্পর্শে এলেই কেবল অদস্ তার ইচ্ছা চরিতার্থ করতে পারে। কিন্তু নিরপেক্ষ বাস্তবতা তার ইচ্ছার সবটুকু সব সময় চরিতার্থ করতে দেয় না। অধ্যাপক সুনীল কুমার সরকার প্রসঙ্গত লিখেছেন—"...বহির্জগত বাস্তবতার দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হলেই অদস্ থেকে অহং বেরিয়ে আসে। তখন অদস্ বেশ বুঝতে পারে যে তার যা ইচ্ছা তা-ই করা চলবে না, তার অনেক ইচ্ছাকে অবদমিত করতে হবে। আর তা না হ'লে বাস্তবতা তাকে শাস্তি দেবে, ভয় জাগাবে।"[৩] যেমন জন্মের পর শিশুর মধ্যে কেবল অদস্ কাজ করে। সেজন্য সে তার চাহিদা মত মা কিংবা ধাত্রীমাতার স্তন এবং তাদের নিজেদের হাতের মধ্যে কোন পার্থক্য বুঝতে পারে। একটু বড় হলেই তার মধ্যে তার চারপাশের অন্যান্য জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে এবং সেই সঙ্গে বুঝে যায় যে ক্ষুধার জন্যে কাঁদলে সঙ্গে সঙ্গে মায়ের দুধ পাওয়া যায় না। এভাবেই তখন থেকে সে নিজের আর বাইরের জগতের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করতে পারে। এইভাবে অদস্ এবং অহং-এর পার্থক্য শিশুর মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এরপর বাইরের জগতের সঙ্গে অহং আরেকটি পৃথক অবস্থা বা স্তর গঠন করে। ফ্রয়েড একেই বলেছেন অধিশাস্তা (Super-ego)। এরই প্রয়োগগত রূপ হল নৈতিকতা। অহং যখন অদসের কাঙ্ক্ষিত ইচ্ছাকে (যা সামাজিক বা নৈতিকভাবে নিষিদ্ধ) চরিতার্থ করতে যায়, তখনই অধিশাস্তা তার মধ্যে সতর্কবাতা পৌঁছে দিয়ে তাকে নিরস্ত করে। সেদিক থেকে অধিশাস্তাকে বলা যায় বিবেক। এই বিবেকবোধ শিশু লাভ করে তার পরিবার এবং পরিপার্শ্ব থেকেই। এই লাভ করার ক্ষেত্রটি যদি যথেষ্ট বিস্তৃত না হয় তাহলে শিশুর মধ্যে অনৈতিক বা সমাজ নিষিদ্ধ কাজের প্রতি প্রবণতা তৈরী হয়ে যায়। মনের এই তিনটি স্তরের মধ্যে তাই অহং-এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই অহংকেই বাস্তবতা, অদস্ আর অধিশাস্তা—এই তিনটি অবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়। এক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলেই সমাজ নৈতিকতার নিরীখে নানা সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়।

ফ্রয়েডের পূর্বে মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় শুধুমাত্র চেতন (concious) মন এবং তার অস্তিত্ব আর কার্যাবলী স্থান পেত। সেই সংকীর্ণ আলোচনার পরিসরকে ফ্রয়েড প্রথম

প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিস্তার দান করেন। চেতন মনের সঙ্গে যুক্ত হয় অচেতন (un-concious) এবং আচেতন মন (sub-concious) এবং তাদের কার্যক্ষেত্র। চেতন মনের অস্তিত্ব মনের ক্ষুদ্রতম অংশ জুড়ে। এই ক্ষুদ্রতম অংশই বাস্তবের সঙ্গে ব্যক্তির সংযোগ ঘটায়। দ্বিতীয় স্তর হল অবচেতন মন; এটি আগে চেতন ছিল আর এখন সুপ্ত অবস্থায় আছে। একটু চেষ্টা করলেই অনেক সময় অবচেতন মনকে চেতন স্তরে তুলে আনা যায়। যেমন—স্মৃতিচারণার মাধ্যমে অতীতের কোনো বিষয়কে চেতন স্তরে তুলে ধরা যেতে পারে অনায়াসেই। তৃতীয় স্তরটি অচেতন মন—এটি মনের বৃহত্তম অংশ। একটি রেখা চিত্রের সাহায্যে মনের বিমূর্ত ধারণাটিকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন ফ্রয়েড। এতে অদস্-অহং-অধিশাস্তা আর চেতন-অচেতন-অবচেতন—দুটি কৌণিকতা থেকেই মনকে বোঝানোর প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়—

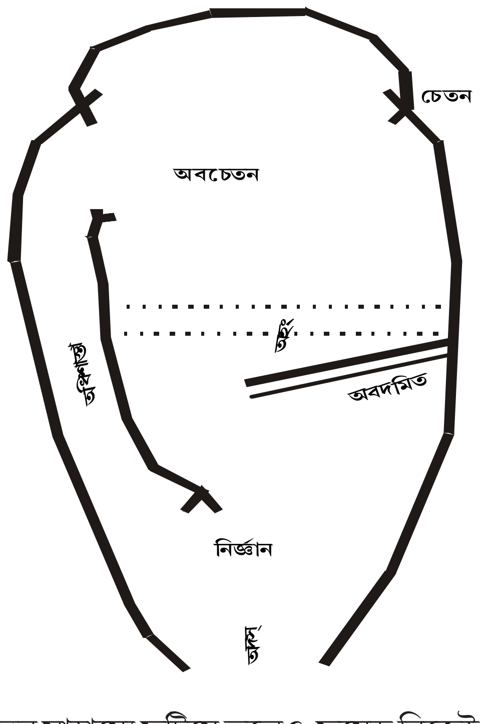

মনকে এইভাবে রেখাচিত্রের সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেও ফ্রয়েড নিজেই সন্দিগ্ধ ছিলেন যে এভাবে একটি বায়বীয় সত্তাকে ফুটিয়ে তোলা কতটা যুক্তিযুক্ত। তবুও এই রেখাচিত্র একটি বিমূর্ত ভাবনাকে প্রত্যক্ষীভূত রূপ দিয়েছে। অদসের পুরোটাই নির্জ্ঞান। যা কিছুই অবদমিত সবই এই নির্জ্ঞানে চলে যায়। অহং-এর কিছুটা নির্জ্ঞানে আর বাকীটা অবচেতনে। শিশুর অবদমিত আকাঙ্ক্ষা যখন নৈতিকতার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখনি সেটা অধিশাস্তা। এই অধিশাস্তাও নির্জ্ঞান পর্যন্ত তলিয়ে আছে। উত্তরকালে মানবমনের এই চেতন-অবচেতন আর অচেতন

স্তরকে শতাংশের নিরীখেও প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। চেতনস্তর ১০ শতাংশ, অবচেতন স্তর ৫০-৬০ শতাংশ আর অচেতন স্তর ৩০-৪০ শতাংশ। এই স্তর পরস্পরার একটি বিশেষ মননগত দিক হল স্বপ্ন। ফ্রয়েডীয় ভাবনায় এই স্বপ্ন আমাদের অবচেতন মনজাত। চেতন মনের যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা বাস্তবতা আর নৈতিকতার কারণে পূরণ হয় না। সেইসব অপূরণীয় আকাঙ্ক্ষা অবচেতন স্তরে সঞ্চিত থাকে। চেতন ও অচেতনের মধ্যবর্তী তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় অবচেতন মনের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পেলে সেই অপূরণীয় আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নময় রূপ লাভ করে একটা কাল্পনিক বাস্তবতা পায়। ফ্রয়েড বলেছেন, স্বপ্ন হল মূলত অবচেতন আকাঙ্ক্ষাগুলির প্রতীকী পরিতৃপ্তি। ফ্রয়েডের এই ভাবনাকে ভাষ্যরূপ দিয়ে ড. তপোধীর ভট্টাচার্য লিখেছেন—"... স্বপ্নের বস্তুভিত্তি যদি সরাসরি প্রকাশিত হত, তাহলে তা হয়তো আমাদের প্রবল অস্বস্তি এবং আশংকার কারণ হত। কেননা জাগ্রত অবস্থায় সচেতন মনে সেইসব আমরা হয়তো ভাবতেও পারি না। আক্ষরিক অর্থেই ঘুমোতে পারতাম না তখন। যাতে আমরা অশান্ত না হই, বিশ্রামের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত না হই—অবচেতন আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে নানা ছদ্মবেশের আড়ালে গোপন করে রাখে, বদলে দেয়, কোমল ও সহনীয় করে তোলে। ঐসব আকাঙ্ক্ষার বস্তুভিত্তির ওপর পর্দা নেমে আসে, তাদের প্রকৃত নিষ্কর্ষ রূপান্তরিত বা বিকৃত হয়ে যায়। অবচেতনের এইসব ক্রিয়াই স্বপ্নের মধ্যে ব্যক্ত হয়। সেই স্বপ্ন রাজ্যে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নানা ধরণের প্রতীকে রূপান্তরিত হয় বলে এদের ভাষ্য করতে না পারলে তাৎপর্য অধরা রয়ে যায়।"[৪] বস্তুত অহং প্রহরীর ভূমিকায় স্বপ্নেও থাকে। কখনো এলোমেলো বার্তা পৌঁছে দেয় আবার কখনো বা রূপকল্পদের পরিশোধন করে। এইসব আলোচনার নিরীখে আপাতদৃষ্টিতে ফ্রয়েডকে যুক্তিবাদী মনে হয় না, কিন্তু তাঁর পরিণত বয়সের চিন্তা অনুধাবন করলে বোঝা যায় তিনি শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে যুক্তি ও অভিজ্ঞতা অপ্রতিরোধ্য। এরই প্রেক্ষিতে ড. ভট্টাচার্য আরও জানিয়েছেন—"...মানুষের ক্ষমতার ওপর তাঁর (ফ্রয়েড) আস্থা ছিল, যদিও সাধারণভাবে তাঁর চিন্তাধারা রক্ষণশীল ও নৈরাশ্যবাদী, কেননা অন্তিম পর্যায়ের রচনায় তিনি এই বোধে পৌঁছেছিলেন যে, সমগ্র মানবজাতি এক ভয়ংকর মৃত্যু এষণায় বন্দী। জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল মৃত্যু; তা এমন আনন্দময় প্রাণাতীত অবস্থা যেখানে অহং আহত হয় না।"[৫] আসলে ফ্রয়েড মানুষের সহজাত আদিম প্রবৃত্তিকে দু-ভাগে ভাগ করেছেন—প্রাণশক্তি বা জীবনবৃত্তি এবং বিনাশশক্তি বা মরণবৃত্তি। প্রাণী মাত্রেরই

যেমন বাঁচার প্রবল ইচ্ছা আছে, তেমনি জীবনের বিশেষ পরিস্থিতি তাকে মৃত্যুর কাছে নিয়ে যায়। জীবনবৃত্তি প্রকাশ পায় আত্ম ও জাতি সংরক্ষণ আর আত্ম প্রচারের মধ্যে। সবাই বলে শুধু আমাকেই দেখো আর 'নিজে বাঁচলে বাপের নাম'। তেমনি বিনাশবৃত্তি মানুষকে আত্ম নির্যাতন, আত্মহনন আর নিষ্ঠুরতায় উদ্বুদ্ধ করে। জীবনের এই স্ববিরোধিতা অনিবার্য। বিশেষ করে সংবেদনশীল মানুষের এর হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই।

ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের সীমাবদ্ধতা যাই থাক না কেন, এই চিন্তা চেতনার প্রভাব শিল্প-সাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই মনঃসমীক্ষণের একটি বিশেষ দিক যে যৌনতা, সাহিত্যিক এ বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হয়েছেন। আদি রসাত্মক সাহিত্যের প্রাচীন যে ধারা ছিল তার সঙ্গে এই সাহিত্য ধারার অনিবার্য পার্থক্য তৈরী হয়ে গেছে। যৌনতা ও সাহিত্যের এই দিকটি ব্যাখা করে ড. প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন—"...মনঃসমীক্ষণের তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে যৌন আকাঙ্ক্ষা মানব মনের মূলপ্রেরণা হিসেবে চিহ্নিত হল। সাহিত্যে যৌন আকর্ষণ একটি স্বতন্ত্র সাময়িক উত্তেজনার ঘটনা হিসেবে বিশ্লেষিত না হয়ে মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিকোণ দিয়ে মানব মনের মূল প্রেরণার সঙ্গে এর সম্পর্কটি বিচার করায় বিষয়টি ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিত লাভ করল।"[৬] কেবল যৌনতা নয় সাহিত্যে মৃত্যুচিন্তা, হত্যা, আত্মহত্যার ঘটনা, পাগলামী বা মানসিক বিকৃতি ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণ এক নূতন দরজা খুলে দিয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে এই মনঃসমীক্ষণের আলো প্রথম বিচ্ছুরিত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে, বিশেষ করে সামাজিক উপন্যাসে। 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭২) উপন্যাসে নগেন্দ্র-সূর্যমুখী-কুন্দনন্দিনী-দেবেন্দ্র-হীরা প্রভৃতি চরিত্রগুলি এই মনঃসমীক্ষণের যথার্থ ফসল। চরিত্রগুলি কখনো তাদের কথনে আবার কখনো তাদের লিখিত চিঠিপত্রে তাদের মনের গোপন চাওয়া-পাওয়াগুলি ব্যক্ত করেছে। সেইসঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে লেখকের মানসিকতা এবং উপন্যাসের পরিণতিতে পৌঁছে আমরা বুঝতে পারি লেখক তাঁর শিল্পী মানসিকতাকে কণ্ঠরোধ করে কীভাবে নীতিবাগিশ মানসিকতাকেই বড় করে দেখিয়েছেন। একই পরিণতি ঘটেছে তাঁর 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসেও। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যে নবত্ব', 'আধুনিক কাব্য' ইত্যাদি রচনার মধ্যদিয়ে ইউরোপীয় সাহিত্যের 'সস্তা কারি পাউডার' কীভাবে কল্লোলীয়রা সাহিত্যে এনেছেন বলে সমালোচনা করলেও তিনিও স্পষ্টতই ঘোষণা করেছিলেন, আধুনিক সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ ঘটনা পরম্পরা নয়, চরিত্রদের 'আঁতের কথা' বের করে দেওয়ার

মধ্যদিয়েই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এখানেই ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ অনায়াসেই স্থান করে নিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাসের 'সূচনা' অংশে যথার্থই লিখেছেন—''এবারকার গল্প বানাতে হবে এ যুগের কারখানা ঘরে। ... সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরায় বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।''[৭] এরই পরিপ্রেক্ষিতে কল্লোলীয়দের চেয়ে কিছুটা বয়ঃজ্যেষ্ঠ জগদীশগুপ্ত সাহিত্য ক্ষেত্রে এসেছিলেন এই ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণকে আত্মস্থ করে। তাঁর সাহিত্য প্রতিভার বলয়কে চিহ্নিত করে সমালোচক ড. প্রবীর কুমার চট্টোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন—''বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মতো বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর কেন্দ্রে জগদীশ গুপ্ত কখনও স্থান গ্রহণ করেননি। শরৎচন্দ্রের গার্হস্থ্যধর্মী গল্পের ঐতিহ্য মনের কোন কোন স্তরে কিঞ্চিৎ বজায় থাকাটাই হয়ত এর কারণ। ফ্রয়েড এবং কন্টিনেন্টাল সাহিত্য পাঠ করেও তিনি নিজস্ব রচনা ধারা গড়ে তোলেননি।''[৮] বঙ্কিমচন্দ্রের রক্ষণশীল ভাবনা, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের রোমান্টিক সাহিত্যাদর্শ ত্যাগ করে ভিন্ন পথ অবলম্বন করতে হবে—এই উপলব্ধিটাই জগদীশ গুপ্তকে তাড়িত করেছে। এক্ষেত্রে তাঁর কুষ্ঠিয়ার গ্রামীণ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর আদালতে টাইপিস্টের কর্মসূত্রে যে মানুষগুলোকে তিনি প্রতিদিন চুলচেরা লাভালাভের পঙ্কিলতায় ডুবে থাকতে দেখতেন সেই মানুষের জীবনই তাঁর রচনায় উঠে এসেছে। ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের আলোকে তিনি বিচিত্র স্বভাবের মানুষগুলোর মনোলোকের গভীরে প্রবেশ করেছিলেন এবং তুলে এনেছেন তাদের চরিত্রের নানা কৌণিকতাকে। বস্তুতঃ জগদীশবাবু তাঁর অভিজ্ঞতা লব্ধ জগৎ থেকে অদস্-অহং-অধিশাস্তার মধ্যে মূলত অদস্ এর অধীন মানুষগুলোকে খুব বেশী করে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ফলে অসৎ লোভী, ঠক, আত্মকেন্দ্রিক, পরশ্রীকাতর, নিতান্ত দেহসর্বস্ব মানুষগুলো তাঁর গল্প-উপন্যাসে বেশী ভিড় করেছে। মানুষের মধ্যে শুভবোধের অভাব, হিংসা জর্জরিত কুটিল বিসর্পিল স্বভাবের মানুষগুলির জীবন তিনি তুলে এনে যেন অন্ধকারকেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র পরবর্তী সাহিত্যরুচির, নির্মল স্নিগ্ধ আবহাওয়ার বিরুদ্ধে প্রথম সার্থক শিল্পী প্রতিবাদ করেছিলেন। প্রসঙ্গত সমালোচক ড. অশ্রুকুমার সিকদার যথার্থই লিখেছেন—''...রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের সাহিত্য যেখানে মানুষের উপর অপরিসীম বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, সেখানে জগদীশচন্দ্রের সাহিত্যের মূল কথাই হলো মানুষের মনুষ্যত্বে অবিশ্বাস।''[৯]

এই সূত্রেই উপন্যাসের চরিত্রগুলির মনোজগতের কুটিল ও বিসর্পিলতাকে তিনি পরিস্ফুট করেছেন।

মানুষের ভেতরে শঠতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা যে কোন পর্যায়ে উপনীত হতে পারে সেটা লেখক তুলে ধরেছেন তাঁর 'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাসে। উপন্যাসের নায়ক নটবর ওরফে সিদ্ধার্থ ভেতরে ও বাইরে সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তার বাহ্যিক সৌম্যকান্তি চেহারার অন্তরালে একটা কুৎসিত মানুষ যে বসবাস করত তাকে লেখক অত্যন্ত সুকৌশলে পরিস্ফুট করেছেন। চরিত্রটির বাইরের স্বরূপের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন—''সিদ্ধার্থের ঋজু বলিষ্ঠ দেহ; বর্ণ গৌর; মুখে বুদ্ধির দীপ্তি; এমনি করিয়া সে মাটিতে পা ফেলিয়া চলে যেন পৃথিবীর যাবতীয় প্রতিকূলতা আর বিমুখতা সে অতীব অবজ্ঞার সহিত দু'পা দিয়া মাড়াইয়া চলিয়াছে; মানুষের সঙ্গ দিয়া তার কোনো প্রয়োজন নাই; সহানুভূতির ধার সে ধারে না।''[১০] এই তার বাহ্য মূর্তি কিন্তু ভেতরটা তার অন্যরকম। কিছুদিন ধরে সেখানে অগ্নিগিরির অগ্নিবমন শুরু হয়ে গেছে। বাইরে সপ্রতিভ হলেও ভেতরে সে শ্রান্ত, পরামুখাপেক্ষী চরিত্র। এই পরামুখাপেক্ষিতার সাথে লেখক দীপের চঞ্চল শিখা আর তার সমগ্র মানসিক সত্তার সঙ্গে অন্ধকারের তুলনা করেছেন। বন্ধু দেবরাজের ডান হাতখানা বুকের ওপর টেনে সে অন্ধকার দেখিয়েছে। বন্ধুকে বুকে কান পেতে থাকতে বলেছে। সেখানে ভগবানের অভিশাপ চেপে বসে আছে আর ভেতর থেকে প্রতিনিয়ত উঠছে 'ক্ষুধার গোঙানি'। ব্যক্তিগত জীবনে সিদ্ধার্থ ছদ্মনামের আড়ালে নটবর একজন বৈষ্ণবীর গর্ভে কোনো এক ব্রাহ্মণের জারজ সন্তান সে। জীবনের প্রথম লগ্নে সে ছিল দোকানের বিনা মাইনের চাকর। তারপর সখের থিয়েটারের ছোকরা অভিনেতা এখন অর্থের বিনিময়ে এক বৃদ্ধার শয্যাসঙ্গী। এই বেড়ে ওঠার কলুষ জর্জর পরিবেশ নটবরের অন্তরটাকে মুক্ত হতে দেয়নি। তার মনের যাবতীয় টানাপোড়েনের কারণে যখন সে অবচেতনের অবদমিত আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় অস্থির, তখনই প্রস্তাব আসে জাল করে অর্থ সংগ্রহ করার। প্রস্তাব শুনে তার বাহ্য আচরণকে দেবরাজের মনে হয়েছে নিপুণ অভিনয়। শেষপর্যন্ত দেনার দায়ে জর্জরিত নটবর তমলুক জাল করার প্রস্তাবে রাজী হয় কিন্তু তার অন্তরে গভীর মনস্তাপের সৃষ্টি হয়। জীবনের সূচনা লগ্নেই যার শুভভাবনার সবরকম সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটেছিল এবং তার জীবন একটা ফলহীন বন্ধ্যাত্বের সঙ্গে জড়িয়ে উত্তরণের পথ হারিয়ে ফেলে ছিল। অথচ এই সিদ্ধার্থ গৃহী নয়, কেননা তার কোনো গৃহ নেই,

সে বৈরাগী নয়, কারণ তার কোনো বৈরাগ্য জমে নি। এই দুইয়ের মাঝখানে সে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দুলেছে। তার এই ব্যর্থতা, বিরহ আর শূন্যতা কেবল সমব্যথীরাই অনুভব করতে পারবে। এহেন চরিত্রটিই সম্পর্কে সমালোচক ড. সরকার আবদুল মান্নান লিখেছেন—''জগদীশ গুপ্ত সিদ্ধার্থের মানস-জগৎ বিশ্লেষণ দুর্বলতার ফাঁক আবিস্কারে সুনিপুণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। চরিত্রের এই দুর্বলতার জন্য বাস্তব পৃথিবীতে চলবার স্বাভাবিক মাত্রাজ্ঞান সে রক্ষা করতে পারেনি। ফলে সহজেই প্রবঞ্চক ইতরে পরিণত হয়েছে।''[১১] আসলে সচেতন অংশে চরিত্রটির অহংসত্তা অগ্রসর হয়ে বাস্তব পরিস্থিতিতে যেতে চাইছে কিন্তু অচেতন বা নির্জ্ঞান অংশের পিছুটানের জন্যে সে যেতে পারেনি বলেই তার অন্তর বেদনায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে।

সিদ্ধার্থর অপরাধবোধ থেকে যে মানসিক যন্ত্রণার সূত্রপাত তার থেকে মুক্তির জন্য সে একসময় আত্মহত্যার জন্যে প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে সফল হয় না। মৃত্যুর কাছাকাছি এসেও সে জীবনের এমন এক আশ্বর্য রূপের সন্ধান পায় যার জন্যে তার মনে হয় 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে'। তার এই মানসিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন—''যাহাকে দর্শন মাত্রেই সিদ্ধার্থ ডিগবাজি খাইয়া মরণের তট হইতে জীবনের জ্যোতির্মঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, বলা বাহুল্য সে একটি নারী। প্রপাতের অদূরে যে রাস্তা দিয়া যাইতেছিল—সহসা তাহাকে দেখিয়াই সিদ্ধার্থর মরিবার সংকল্প উল্টাইয়া সরাসরি একটা সহজ বুদ্ধির উদয় হইল।''[১২] অস্থির জলের নীচে ক্ষুধা তৃষ্ণা আর বিবেক দংশনের পরম শান্তি যেন মিলনাকুলা প্রেয়সীর মতো সিদ্ধার্থকে গ্রহণ করতে বাহু মেলে বুক পেতে প্রবল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই মৃত্যু প্রেয়সীর স্থানে এল অজয়া। এই অজয়াকে ঘিরে সিদ্ধার্থের বাঁচবার আকাঙ্ক্ষাটি একান্তভাবে সৎ। এই অজয়ার মধ্যে সে একটি পরিপূর্ণ নারীর সন্ধান পেয়েছে। এবং এই নারীর চোখের সামনে নিজেকে স্পষ্টভাবে দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত সে নিয়েছে। কারণ তার বিশ্বাস অজয়ার প্রেমেই তার জীবনের যাবতীয় গ্লানি ও বেদনা দূর হয়ে যাবে। এই ভাবনার মধ্যে হয়তো কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। যেভাবে গণিকা উত্তম একদিন গৃহী নারী হতে চেয়েছে। সিদ্ধার্থর মধ্যে যে ভণ্ডামি এবং শঠতার অভিযোগ তা আসলে তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য উপায়হীন সংগ্রাম। যে অপরাধপ্রবণ মানসিকতার ফলে নীচ বিষয়ে মানুষ আনন্দ লাভ করে সেই প্রকৃতি সিদ্ধার্থর মধ্যে নেই। তার অহং শক্তি দুর্বল হওয়ায় সে এমন ঘটনা

ঘটিয়েছে। স্বভাবতই তার মনে হয়েছে, জীবনের অন্তহীন ধারা একটিমাত্র স্তবকে সীমাবদ্ধ হয়ে একটি রেখার সামনে গতিহীন হয়ে পড়েছে। এই রেখাটি উত্তীর্ণ হতে সিদ্ধার্থর মন কিছুতেই চাইল না। তবে তার এই মানসিক পরিবর্তনকে স্বাভাবিক বলে মানতে চাননি সমালোচক ড. প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত তিনি লিখেছেন—"... একদিকে জীবনের তীব্র ব্যর্থতার মধ্যে বাঁচবার সান্ত্বনায় উল্লাস, আর একদিকে সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তির নারীসঙ্গ লিপ্সায় চাতুর্যের উদয়। এই পরিবর্তন উপন্যাসটির ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নয়। সিদ্ধার্থের এ পরিবর্তনের পূর্বসূত্র হিসেবে এমন কোন প্রস্তুতি লেখক সৃষ্টি করেন নি যা অনুসরণ করে আমরা পরিবর্তিত সিদ্ধার্থের কার্যকলাপে সায় দিতে পারি।"[১৩] এই সীমাবদ্ধতার দিকটি বাদ দিলে লেখকের আন্তরিকতার কোনো অভাব ছিল এমন বোধহয় বলা যাবে না। আসলে আগের সিদ্ধার্থ এবং পরের সিদ্ধার্থ—এই পৃথক সত্তা দুটির মাঝের সেতুটি ঠিক বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে নি। তবে অজয়ার মানসিক দিকটির উদ্‌ঘাটনে লেখকের আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সিদ্ধার্থের মানসিক পরিবর্তনের দিকটি মেনে নিলে দেখা যায় অজয়ার কাছে নিজেকে স্পষ্টভাবে দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত সে এই কারণে নিয়েছে যে, তার বিশ্বাস অজয়ার প্রেমেই তার জীবনের যাবতীয় গ্লানি দূর হয়ে যাবে। আসলে অতিশয় হীন সংশ্রবে জীবনের দীর্ঘদিন সে কাটিয়েছে, 'তাই তার আহৃত শিক্ষার ফলটিকে আবৃত করিয়া মাঝে মাঝে পাঁকের বুদ্‌বুদ্ উঠিতে থাকে।' কিন্তু নিজেকে আড়াল করতে গিয়ে নিজের কাছেই সে বারবার ধরা পড়ে গেছে। সেই সঙ্গে তার পিসিমা ও ভাই রজতের কথাতেও সন্দেহের কালো মেঘ জমে ওঠে। এরই সঙ্গে মানুষের মনের অচেতন অংশের সহজাত প্রবৃতি ক্ষমতা তার বাস্তবতাবোধ থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী; কাজেই অনেক সময় নৈতিকবোধকে অস্বীকার করে সহজাত প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। জগদীশবাবু সিদ্ধার্থ চরিত্রের এই সহজাত প্রবৃত্তির দিকটি তুলে ধরলেও সেটাকে মানুষের বিগত অভ্যাস বলেই ছেদ টেনেছেন। আসলে সিদ্ধার্থের অতীত জীবন অভিজ্ঞতা আর তার হীন মানসিকতা —এই দুটো মিলে তার পরিণতি চূড়ান্ত হয়ে গেছে। কাহিনীর চূড়ান্ত পর্বে এসে প্রকৃত সিদ্ধার্থের মাতামহ কাশীনাথ ছদ্মবেশী সিদ্ধার্থকে দেখে অজয়াকে প্রশ্ন করে নিজের বক্তব্য জানিয়েছে। এই কেন্দ্রবিন্দুতে এসে লেখক ছদ্মবেশী সিদ্ধার্থ আর অজয়ার অন্তর্গত মননকে তুলে ধরেছেন—

"কাশীনাথ বলিলেন, 'সিদ্ধার্থকে তুমি খুব ভালবাস?

বলো, লজ্জা কি? আমি যে তোমার দাদা মশাই'।

বৃদ্ধের যেন কিছুরই দিশা নাই। অজয়া নিরুত্তরে মাথা নত করিয়া রহিল।

বৃদ্ধ হাত চাপড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, কিন্তু সিদ্ধার্থর যে আর একদণ্ড পরমায়ু, সে যে বাঁচবে না।

অজয়া চমকিয়া উঠিল, সেকি? কি বলছেন আপনি?

হঠাৎ অজয়া বৃদ্ধকে পাগল ঠাওরাইয়া বসিল।"[১৪]

ইতিপূর্বেই সিদ্ধার্থের অন্তর্দাহ শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রকৃত সিদ্ধার্থের ছায়া তাকে তাড়িত করেছে। সে স্বপ্নে দেখতে পেয়েছে শ্মশানে চিতা জ্বলছে। চিতার আগুনে ধোঁয়া নেই। চিতায় শায়িত শবদেহটা দেখা যাচ্ছে। নকল সিদ্ধার্থের সামনে আসল সিদ্ধার্থ এসে দাঁড়িয়েছে। নকল সগর্বে ঘোষণা করেছে অজয়ার সঙ্গে তার বিবাহের কথা। অজয়াকে ছায়া হাত তুলে নিষেধ করেছে, নকল সিদ্ধার্থকে ভালো না বাসার কথা বলেছে। কেননা সে আসল সিদ্ধার্থের গল্পটা চুরি করে বেঁচে আছে। সে আসলে জারজ সন্তান অর্থলোভে কুরূপা বৃদ্ধা বারাঙ্গনার সেবা করত। এই বার্তাই পৌঁছে দিয়েছেন কাশীনাথ। এই পরিচয় পেয়ে অজয়ার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। সে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যেতে নিলে রজত তাকে ধরে ফেলে। কাশীনাথ নকল সিদ্ধার্থকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছেন—"তুই কেন এ কাজ করলি? কেন তুই মানুষের সর্ব্বনাশ করে বেড়াচ্ছিস্? বল সিদ্ধার্থ কোথায়? তার নাম আর পরিচয় তুই কোথায় পেলি?"[১৫] মুখোশ খুলে গেলে মানুষের ভেতরের কংকালটা বেরিয়ে পড়ে। তখন তার আর বাঁচার কোনো পথ থাকে না। ফলে প্রবঞ্চক নটবর স্ব-রূপে আত্মপ্রকাশ করে গেলে আর কোনো উত্তর দেয়নি। নিজের পক্ষে সে যুক্তি সাজিয়ে রজতকে অসংকোচে জানিয়ে যায়—"... ভগবান জানেন আমি নিরপরাধ। নিয়তির চক্রান্তে ভালোবেসে ছিলাম। ভালোবাসার তাড়নায় আর প্রতিদানের লোভে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি। কিন্তু আমি ত' সেই মানুষ।"[১৬] তার কাছ থেকেই জানা যায় প্রকৃত সিদ্ধার্থ আর বেঁচে নেই। সিদ্ধার্থ এইভাবে নটবরের বেশ থেকে বেরিয়ে এসে যা কিছু করেছে তার মূলে ছিল তার অদস্ -এর প্রভাব। তার পুরো অতীত জীবনটাই একটা গ্লানি ও পঙ্কের মজা পুকুর—যার ভেতরে নামলে কুটিলতা আর বিসর্পিনতাই ধরা পড়ে। তবে লেখক সিদ্ধার্থের ভালো মানুষী সত্তাটির সঙ্গে তার শঠ সত্তাটির সবক্ষেত্রে সমন্বয় ঘটাতে পারেননি বলে কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন। আসলে মানুষ নিজে

যা নয় ছদ্ম আচরণে নিজেকে তাই প্রতিপন্ন করার প্রাণান্তকর প্রয়াস প্রত্যেকটি মানুষের জীবনেই থাকে—এই ভাবনার কেন্দ্রে এসে সিদ্ধার্থ নামক মানুষটির মানস কুটিলতা জটিলতাকে সমর্থন করা যায়। এই দ্বৈত সত্তার মূল্যায়ন করে সমালোচক ড. সরকার আবদুল মান্নান যথার্থই লিখেছেন—"...সিদ্ধার্থর হতাশা ও বিরক্তি এবং সীমাহীন ক্লান্তিকে একদিক থেকে যেমন বিশ্বব্যাপী কুশ্রিতা অবিচ্ছিন্নভাবে পেঁচিয়ে আছে, তেমনি সংগোপনে খনির গর্ভে লুক্কায়িত হীরকের মতো সমস্ত তিক্ত প্রত্যাখ্যান ও অসহায় আত্মসমর্পণ সত্ত্বেও ভালোবাসা নামক স্পন্দিত সজীব হৃৎপিণ্ডকে আমাদের আবিস্কার করে নিতে কষ্ট হয় না।"[১৭]

জগদীশবাবু তাঁর 'পয়োমুখম্' গল্পে দেখিয়েছেন কেমন করে পিতার অর্থ লোলুপতার কারণে একের পর এক পুত্রবধূর মৃত্যু হয়। পণের মোটা টাকার লোভে ভূতনাথের পিতা কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণকান্ত সেনশর্মা পুত্রবধূদের ওষুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে মেরে ফেলত এবং পুনরায় পুত্রের বিবাহ দিত। শেষ বউটির বেলায় ভূতনাথের কাছে পিতার অর্থলোলুপতা ও অমানবিক স্বরূপটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পিতাকে সে ব্যঙ্গের হাসি হেসে জানিয়ে দেয়—"এ বৌটার পরমায়ু আছে, তাই কলেরায় মরলো না বাবা। পারেন তো নিজেই খেয়ে ফেলুন।"[১৮] পিতার এই অর্থ লোলুপতারই এক নগ্নরূপ প্রকাশিত হয়েছে 'মহিষী' উপন্যাসে। পুত্রের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা না থাকায় পিতা ব্রজকিশোর মোটা টাকা পণ নিয়ে কালো মেয়ের সঙ্গে পুত্র অশোকের বিয়ে দেন। আলালের ঘরের দুলাল আর রূপবান বলে বন্ধুদের কাছে অশোকের পরিচয় ছিল 'যুবরাজ' রূপে। বন্ধু মারফত অশোক পিতার কাছে পাত্রী দেখার প্রস্তাব পাঠিয়ে ব্যর্থ হয়। এনিয়ে পুত্রকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে অশোক আর পিতার সঙ্গে বিরোধে যায় নি। কালো মেয়েকেই সে স্ত্রী হিসেবে মেনে নেয়। কিন্তু পিতার গোপন অভিসন্ধি প্রকাশ হয়ে পড়লে অশোকের সমস্ত রাগ-বিদ্বেষ পিতার দিকে ধাবিত না হতে পেরে স্ত্রী জ্যোতির্ময়ীর উদ্দেশ্যেই বর্ষিত হয়। এই দূরত্ব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তৃতীয় নারীর অনুপ্রবেশ ঘটায় এবং তাদের চির-বিচ্ছেদ ঘটে।

অশোকের পিতার মধ্যে পুনস্নেহের লেশমাত্র নেই। তিনি মূলত অদস্ তাড়িত। সুখ ভোগাকাঙ্ক্ষাই তার কাছে শেষ কথা। এবং সেই উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে তিনি পুত্র অশোককে সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ব্রজকিশোরের মধ্যে কোনো শুভবোধ ছিল না। তারই উত্তরসূরী হিসেবে অশোকের মধ্যে লেখক দুটি পৃথক সত্তাকে প্রকটিত করেছেন। তার

বাহ্য সুন্দর রূপের বিপরীতে অন্তরে একেবারে কুৎসিত রূপ। এদিক থেকে তাকে অনায়াসেই মাকাল ফলের সঙ্গে তুলনা করা যায়। তার বাহ্য রূপের বর্ণনায় লেখক জানিয়েছেন—

''...আমাদের যুবরাজ ঐ ব্রজ কিশোরের পুত্র—

অশোক সুপুরুষ বর্ণ গৌর, দেহ সুগঠিত সবল; মোটের উপর এমন একটা অভিজাতশ্রী আর গাম্ভীর্য তার আছে যা সুলভ নয়। অশোকের যুবরাজ নাম পাইবার ঐ একটা কারণ।''[১৯]

আপাত এই বাহ্য চেহারার অন্তরালে অশোক আসলে গাঢ় বুদ্ধি সম্পন্ন নয় এবং তার আত্ম নির্ভরশীলতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ফলে পিতার বিরুদ্ধে গিয়ে বলার সাহস পায়নি যে, 'আমি ক'রব বিয়ে, যাকে বিয়ে ক'রব তাকে আমি স্বচক্ষে দেখে নেব'। এই ঘটনায় তার অহং আর অন্তর্নিহিত দুর্বলতার দ্বন্দ্ব সে বুঝতে পারেনি। কিন্তু যখন প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যে পিতা তাকে বিষ্ণুপুরের সুন্দরী মেয়ের পরিবর্তে বাতাসপুর নিবাসী মন্মথ রায়ের কালো কন্যার সঙ্গেই গাঁটছড়া বাঁধিয়েছে। পিতার এহেন কপটতায় অশোকের প্রাণের রং মুছে গেল। বিয়ে এবং স্ত্রী লাভ—এই দুটো ব্যাপারকে সে একটা দুর্লভ, লাভের সমাদর এবং মূল্য দিয়েছিল। কিন্তু তার সেই মূল্যে 'জুয়াচুরি' আছে শুনেই সেই মূল্যটির অঙ্ক গোলাকার একটি শূন্যে পরিণত হয়ে তার চোখের সামনে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল। পিতার চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু বলতে না পেরে নিজের দুর্বলতার জন্য তার ভেতরে একটা অপরাধবোধ কাজ করেছে এবং এর শাস্তি হিসেবে সে নিজেই নিজেকে ধিক্কার জানিয়েছে। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে তুলে দেবার ক্ষেত্রে অশোক এক কুটিল চরিত্রের মানুষ হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে। কালো স্ত্রীর প্রতি অবিচার করার যুক্তি সে অনায়াসেই খুঁজে পেয়েছে—এ এক অদ্ভুত মানসিক ব্যাধি। প্রসঙ্গত লেখক জানিয়েছেন—''অশোক তার মানসিক ব্যাধির এই ব্যবস্থা করিল যে, লজ্জা ঢাকিতে নয়, আত্মসম্মান বজায় রাখিতে বাহিরের লোকের কাছে এই ভাবটাই দেখাইতে হইবে, সম্পত্তির লোভে বাবা কালো মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছেন বটে, কিন্তু ঐ সম্পত্তিকে নস্যাৎ করিতে যদি স্ত্রীকে অসমাদার করিতে হয় তবে তাহাতেও সে পশ্চাদপদ হইবে না।...''[২০]

এখানে তার অন্তর্গত অদস্ সত্তাটিরই জয় ঘোষিত হয়েছে। অহংকে দূরে সরিয়ে রেখে সে এমনটাও ভাবতে কুণ্ঠিত হয়নি যে 'তার এই লাঞ্ছনার জন্য কেহ দায়ী নহে, বাবা নন, গগন নয়, মধু খুড়ো নন, মা নন দায়ী ঐ স্ত্রীটি'। এইভাবে পঙ্কিলতার অবগাহন করার শেষধাপ সে নেমে গেছে স্ত্রীর বিরুদ্ধে বন্ধুদের কাছে অশালীন অভিযোগ করে—''কালো বউ আরো

আছে। কিন্তু এ একেবারে।... প্রবৃত্তি বড় জঘন্য, আর ঘেন্না বলে কোনো আবরণ তার নেই। হস্তিনী নারীর সব লক্ষণ তাতে বিদ্যামান।”[২১] স্ত্রীর অবর্তমানে স্ত্রীর বিরুদ্ধে এমন অপবাদ দিলেও জ্যোতির্ময়ী কিন্তু তার প্রবল অহং দ্বারা চালিত হয়েছে। পিতার কাছে স্বামীর বিষয়ে এমন কথা শুনে সে অনুমান করেছে, কোথাও একটু ভুল হচ্ছে হয়তো। এবং প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে সে বাপের বাড়ী ছেড়ে শ্বশুরবাড়ী ফিরে আসে। কিন্তু স্বামী তাকে আর কোনোভাবেই গ্রহণ করেনি। একদিকে অদস্-এ আচ্ছন্ন অশোক আর প্রবল আত্মাভিমানী জ্যোতির্ময়ীর বিছানা নিশ্চিত ভাবেই আলাদা হয়ে গেছে। ‘যোগাযোগে’র কুমুদিনী যেভাবে স্বামীর সঙ্গে সহাবস্থানে যেতে পারে নি। জ্যোতি বুঝতে পেরেছে, সে কালো বলেই স্বামী তাকে গ্রহণ করেনি। এবিষয়ে তার নিজেরও আগে থেকেই একটা হীনমন্যতাবোধ ছিল। তবে স্বামী তাকে প্রথম পর্বে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করার তার এই দুর্বলতা কেটে গিয়েছিল। তবে দ্বিতীয়বার যখন সে আঘাতটা পেল, ততদিনে তার মধ্যে জীবন সম্পর্কে যে ইতিবাচক ভাবনা ছিল সেটা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। জ্যোতির ভেতরে যে সুস্থ জীবনবোধ ছিল সেকথা লেখক তার মনের অতলস্তরের চিত্র তুলে ধরে স্পষ্ট করেছেন। সর্বান্তকরণ দিয়ে ধ্যান ক’রে সে ভবিষ্যতের একটি সুরঞ্জিত মনোরম ছায়াচিত্র গড়ে তুলেছে, যা হাসিতে উজ্জ্বল, অর্চনায় পবিত্র, প্রেমে মধুর; যাতে কপটতা নেই, তিক্ততা নেই, ব্যসন নহে। লেখকের ভাষায়—‘‘মন তার আরো দূরে ভ্রমণ করে—যেখানে সে সন্তানের জননী—পুত্র-কন্যার ভেদ জ্ঞান নাই... কেবল প্রাণ মুকুলটি কোলে ন্যস্ত—শৈশবের সেই অভিনয়টুকু যেন নিত্য জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে—পুতুলটি প্রাণ পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে—বুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াও সে জানে না সে-ই তার মা।”...[২২]

বস্তুতঃ জ্যোতির্ময়ী বুঝেছিল স্বামী অশোক তাকে মোটেই ভালোবাসে না। তখন তার কালো রংয়ের জন্য হীনমণ্যতা বোধের পরিবর্তে দেখা দিয়েছে একটা প্রবল জেদ। এবং স্বামীর কবল থেকে সে যেকোন মূল্যে মুক্ত হতে চায়। অশোক তাকে শারীরিকভাবে লাভ করতে চাইলে জ্যোতি স্পষ্ট করে দিয়েছে, ভালোবাসাহীন দৈহিক সম্পর্ক সে চায় না। এই দেহজ সুখ যাতে অশোক পায় সেজন্য মূলতঃ তারই অনুরোধে ব্রজকিশোর ও রত্নময়ী পুনরায় অশোকের বিবাহে উদ্যোগী হন। স্বামীকে সে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে—‘‘শয্যাংশ দিয়ে যদি আমায় কৃতার্থ করবার ইচ্ছা হ’য়ে থাকে, তবে সে তোমার বৃথা আশা। ... তুমি যে ত্যাগ

করেছিলে, সেইটেই সত্যি। মাকে বলেছি—ক'নে দেখতে।"[২৩] অহংবোধ জ্যোতির্ময়ীকে এভাবে শরীর সর্বস্ব অশোকের কাছ থেকে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। চিরতরে বাপের বাড়ী চলে যাবার আগে জ্যোতি দেখেছিল, অশোকের মন রূপ সাগরে ডুবে গেছে। নতুন শরীর পেয়ে স্বামীর চেহারাই বদলে গেছে চোখে-মুখে আনন্দ ধারা উছ্‌লে উঠেছে। বিধাতা তাকে ছুটি দিয়েছেন। শরীরের ব্যাকরণ শরীর গ্রহণের মধ্যদিয়েই তৃপ্তি খুঁজেছে আর জ্যোতির্ময়ী হয়ে উঠেছে মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গ।

জগদীশ গুপ্ত তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জগৎ থেকে অদস্-অহং আর অধিশাস্তা সমন্বিত যে মানুষ তাদের মনোজগতে অদস্এেরই বাড়বাড়ন্ত লক্ষ্য করেছিলেন। তবে অহং আর অধিশাস্তা সমন্বিত মানুষও তাঁর রচনায় এসেছে। আদালতের কর্মসূত্রে তিনি স্বার্থপর নগ্ন-লোভী মুখোশহীন মানুষদের সঙ্গেই বেশী পরিচিত ছিলেন। স্বভাবই তাঁর গল্প উপন্যাসে মানুষের মনোজগতের কুটিল বিসর্পিল রূপই অধিক প্রত্যক্ষ করা যায়। এই ভাবনার বিশিষ্ট উপন্যাস 'লঘুগুরু'। আধুনিক জীবন জটিলতার কারণে মানুষের ভেতর আর বাইরের মধ্যে একটা দুস্তর ব্যবধান তৈরী হয়ে গেছে। সেই দ্বৈতসত্তার মানুষদের মধ্যেকার অন্ধকার দিকটি তাঁকে অধিক আকর্ষণ করেছে। ফলে এই উপন্যাসে আমরা দেখি সেইসব ভোগসর্বস্ব মানুষের কদর্য জীবন যাপন। যাদের বেশীরভাগেরই কোনো উত্তরণ নেই। একসময়ের যূথী থেকে বনমালা হয়ে গণিকা উত্তম বহু পুরুষচারিণী থেকে গৃহী জীবনে প্রবেশের ইচ্ছা পোষণ করে। বিপত্নীক বিশ্বম্ভরের হাত ধরে সে সংসারে আসে এবং টুকীর মা হয়ে ওঠে। কিন্তু স্বয়ং বিশ্বম্ভর ও প্রতিবেশীরা সেইসঙ্গে বিশ্বম্ভরের বন্ধুরা—সকলে মিলে উত্তমের জীবন থেকে তার পূর্ব পরিচয় মুছে ফেলতে দিতে নারাজ। ফলে উত্তমের হাতে মানুষ হয়েও টুকীর স্বাভাবিক বিয়ে হয় না। বিপত্নীক ও গণিকা পরিবৃত সংসারে টুকী যায় এবং অল্পকালের মধ্যে পুনরায় দেহব্যবসার পথে নেমে যেতে বাধ্য হয়। ফলে একদা পাপের পথে নেমে যেতে হয়েছিল সে উত্তমকে তার আর সংসারে ফেরা হয় না। আপাতদৃষ্টিতে উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে অদস্ স্তরের মানুষ বলেই মনে হয় কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে, তাদের ভেতরেও অনেকের মধ্যেই নৈতিকতা ও বিবেকবোধ ছিল।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র উত্তম সামাজিক পরিস্থিতির চাপে পড়ে গণিকা জীবন বেছে নেয়। তার পঙ্কিল ভোগ সর্বস্বতার কোনো পৃঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় লেখক তুলে ধরেননি।

ফলে উত্তমের ভেতরের ভোগাকাঙ্ক্ষা লুপ্ত হয়ে কীভাবে সুস্থ যাপনাকাঙ্ক্ষা প্রকট হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। যেখানে এই অস্পষ্টতা সেটাকে রবীন্দ্রনাথ মানতে পারেননি। সমাজ বাস্তবতার পাশাপাশি উত্তমের মানসিকতার পরিবর্তনকে তার স্বাভাবিক মনে হয়নি। এবিষয়ে তিনি সমালোচনা করে লিখেছিলেন—''পতনের ইতিহাসটাকে একেবারে চাপা দিয়ে রাখলে মনে হয় যে পতিতা নারীর মধ্যেও সতীত্বের উপাদান অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে এই তত্ত্বটাকে একটা চমক লাগানো অলঙ্কারের মতোই ব্যবহার করা হয়েছে। সাধুতাকে ভাবরসের বর্ণ বাহুল্যে অতিমাত্রায় রাঙ্গিয়ে তোলার যত বড় অবাস্তবতা, লোকে সেটাকে অসাধু বলে তাকে সেন্টিমেন্টের রসপ্রলেপে অত্যন্ত নিষ্কলঙ্ক উজ্জ্বল করে তুললে অবাস্তবতা বেশি বই কম হয় না।''[২৪] উত্তমের এই মানসিক পরিবর্তন নিয়ে প্রশ্ন তুললেও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নিজেই তাঁর 'পতিতা' কবিতায় বারাঙ্গনা নারীর মধ্যে প্রেম চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। অঙ্গরাজ্যের সংকটের সময় অপাপবিদ্ধ কুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজপ্রাসাদে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে। কিন্তু সেই বারাঙ্গনার মধ্যে প্রেমচেতনা জাগ্রহ হয়েছে ঋষ্যশৃঙ্গের সংস্পর্শে এসে। তখন সেই বারাঙ্গনা রাজমন্ত্রীর কাছে যাবতীয় স্বর্ণমুদ্রার পুরস্কার ফিরিয়ে দিতে এসেছে—

''ধন্য তোমারে হে রাজমন্ত্রী, চরণপদ্মে নমস্কার।
লও ফিরে তব স্বর্ণমুদ্রা, লও ফিরে তব পুরস্কার।
ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিরে ভুলাতে পাঠাইলে বনে যে কয়জনা।
সাজায়ে যতনে ভূষণে রতনে আমি আমি এক বারাঙ্গনা।''[২৫]

আর জগদীশবাবুর জীবনেও এমন নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছিল তাঁর শৈশবে। আসলে উত্তমের ভেতরের গৃহী ও মাতৃসত্তা তাকে পুরোপুরি 'অদস্' স্তরে আবদ্ধ রাখতে পারেনি। তার ভেতরে অহং-এর প্রকাশ ঘটেছিল অচিরেই। তবে উত্তমের মনোলোক উদ্‌ঘাটনে তার পূর্ব জীবনের পরিচয় বিস্তারিত দিলে ভালো হত—এমনটা অনেকেই মনে করেছেন।

গার্হস্থ্য জীবনে এসে উত্তম প্রতিবেশীদের কাছে, বিশ্বম্ভরের কাছে তার অতীত জীবন নিয়ে কিন্তু কোনো ধোঁয়াশা রাখেনি। শুধু টুকীর কাছে নিজের প্রকৃত পরিচয়টুকু সযত্নে গোপন রাখতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে। মোক্ষর মা টুকীকে জানিয়ে দিয়েছে 'উত্তম বেশ্যে' ছিল—যেকথা উত্তমকে সবচেয়ে বেশী দগ্ধ করেছে। আর যে নারী সত্তার কারণে উত্তম গৃহী নারী হয়ে উঠতে চেয়েছিল, তারও প্রকাশ রয়েছে তার দৃঢ়চেতা মনোভাবের মধ্যে। যে উত্তম হিরণের

মৃত্যু সংবাদে কেঁদেছিল অকৃত্রিমভাবে, সে বিশ্বম্ভরের দ্বারা বিড়াল-শকুনের তুলনা দ্বারা অপমানিতা হয়েও নীরব থেকেছে। কিন্তু বিশ্বম্ভরের ইয়ার-বন্ধুদের দ্বারা 'খাণ্ডারী' বলে অভিযুক্ত হলেও গৃহে টুকীর সামনে মদ্যপানের আসরের অনুমতি দেয়নি। বিশ্বম্ভরের কাছে প্রতিবাদ করে সে জানিয়েছে—"...স্ত্রীকে বেড়ালের মতো রাস্তায় পুরে বিদেয় করা কি দুধ মাছ দিয়ে তাকে পোষা তোমাদের ইচ্ছে; কিন্তু তাকে নিয়ে তোমাদের একি খেলা।"[২৬] শুধু এইভাবে স্পষ্ট উচ্চারণে নয় বিশ্বম্ভরের হাত ধরে সংসারে এসে বিশ্বম্ভরের কাছে নানাভাবে অপমানিতা হয়েও আত্মবিশ্লেষণ করেছে এই বিশ্বম্ভর লোকটিকে কেন সে আশ্রয় করেছে, সেটা তার নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়। বিষয়টিকে তার নিজের কাছেই জটিল সমস্যার মতো মনে হয়। তখন নিজের অন্তরের দিকে তাকিয়ে উত্তম দেখতে পায় সেখানে বিশ্বম্ভরের জন্যে খুব একটা স্থান নেই। অথচ তার গৃহ বুভুক্ষা এই লোকটিকে ঘিরে বাস্তবরূপ পাবে বলে তার মনে হয়েছিল প্রথমাবধি। শত লাঞ্ছিতা হয়েও তার গৃহ বুভুক্ষা মরে নি। বরং তা আরও প্রকট হয়ে উঠেছিল টুকীকে আশ্রয় করে। টুকীকে সে পড়াশুনা থেকে শুরু করে ঘর-গৃহস্থালির যাবতীয় কাজ শিখিয়েছে। টুকীর দিকে তাকিয়ে তার মাতৃসত্তা স্পষ্টতই অনুভব করেছে—"এ মেয়েটি তার পেটের মেয়ে নয়—একেবারে পর—কিন্তু ইহার দিকে চাহিয়া ইহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তার দেহমন শীতল হইতে থাকে। চিরন্তনী কন্যা এ। বধূ, স্ত্রী, জননী। শরতের আকাশ যেমন অনাবিল, ইহার জীবনও আদি প্রান্ত হইতে কল্পনায় যতদূর দেখা যায় সেই শেষতম প্রান্ত পর্য্যন্ত তেমনি ছায়াহীন অনাবিল। পৃথিবীর কাহারো দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে তাহার সংকোচের হেতু নাই।"[২৭] এই টুকীর বিয়ের প্রসঙ্গ এলেই উত্তমকে আমরা আর ব্যক্তিত্বময়ী রূপে পাই না। মূলত তারই কারণে বারবার টুকীর বিয়ে ভেঙ্গে গেলে বিশ্বম্ভর উত্তমকেই দোষী সাব্যস্ত করেছে তার স্থূল ভাবনার দ্বারা। উত্তমের মন ভেঙে গেছে। নিজেকেই তার অপরাধী মনে হয়েছে। টুকীর কাছে সে ক্ষমাও চেয়েছে। টুকীকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে বলেছে—"টুকী, আমায় তুই ক্ষমা কর—আমি তোকে সুখ দেব ব'লে আসি নাই, কিন্তু তোর সুখ ইচ্ছে করেছি ভগবান তা জানেন। কিন্তু অন্তরায় দাঁড়ালাম আমিই।"[২৮] এইভাবে এক সময়ের গণিকা উত্তমের অন্তর্গত যে আবেগ ও প্রকাশের আন্তরিকতা তা কোনভাবেই মিথ্যে নয়। ফলে গণিকার ভেতরে অনায়াসেই একজন স্ত্রী এবং জননীকে আমরা খুঁজে পাই। এখানেই লেখকের অনন্যতা।

উত্তমেরই ভিন্ন পীঠ টুকী। জন্ম মুহূর্তেই মাকে হারিয়ে প্রতিবেশীদের আদরে অবহেলায়,

পিতার উদাসীনতায় তার জীবন শুরু হয়েছিল। চরম বিপর্যয় কাটিয়ে তার জীবনে পরম আশ্রয় হয়ে ওঠে উত্তম। মাকে পেয়ে অসহায় মেয়েটির জীবনের গতি বদলে যায়। তার চেতনায় বাস্তবতা আর নৈতিকতার বোধ গড়ে উঠতে থাকে। উত্তমের শিক্ষা টুকীকে একটা পরিপূর্ণ নারী করে তুলেছে। যে উত্তমকে সম্মান যেমন করতে শিখেছে তেমনি বাবা বিশ্বম্ভরকে ক্ষমা করেছে। যাবতীয় পরিপূর্ণতা সত্ত্বেও শুধু উত্তমের কারণেই তার বিয়ে হয়ে যায় পঞ্চাশোর্ধ বিপত্নীক, রক্ষিতা পরিবৃত পরিতোষের সঙ্গে। এই বিয়েতে উত্তমের সায় ছিল না। কিন্তু টুকী মাকে নিরস্ত করে বলেছে—"মা, তুমি বাবাকে ক্ষমা করো; বাবা কিছু বোঝে না।"[২৯] বাস্তবতা আর ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে অনায়াসেই সমন্বয় করতে পেরেছিল টুকী। তাইতো তার অহং দ্বারা সে বাস্তবের কঠোর কঠিন জীবনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিল। প্রথমাবধি খটকা থাকলেও স্বামীর রক্ষিতা সুন্দরীকেও সে স্বাভাবিক বলেই গ্রহণ করার চেষ্টা করেছে। বিয়ে হয়ে এসে নিরানন্দময় অন্ধকার পরিবেশে পৌঁছে টুকীর মানসিক অবস্থা ঝড়ে বিধ্বস্ত পাখির মতো হয়েছে। কিন্তু সে তবু ভেঙ্গে পড়েনি। সাধ্যমত সংগ্রাম ও সমন্বয় করার চেষ্টা করেছে। পরিতোষের কাছে সুন্দরীর পরিচয় জানতে চেয়ে উত্তর পেয়েছে, 'তোমার মা, তোমার বাবার যা হয়'। খুব দ্রুত সে সুন্দরী-পরিতোষের দ্বারা সৃষ্ট পিঞ্জরে যে বন্দিনী সেটা বুঝতে পেরেছে। তবু মায়ের শিক্ষার কারণে সে স্বামীর প্রতি শেষ পর্যন্ত ভক্তি রাখার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বাস্তবতার সঙ্গে সমন্বয় ঘটাতে ঘটাতে, নৈতিকতা আর মূল্যবোধের বৃত্তে আবদ্ধ থেকে পরিতোষ ও সুন্দরীর দ্বারা নিষ্পেষিত হতে হতে তার ভেতরের পর্যুদস্ত নারীসত্তা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে অচিন্ত্যর আগমনের পর। বিয়ের পর থেকে সে পরিতোষ আর সুন্দরীর যাবতীয় লোভাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। বাবার কাছে চিঠি লিখে টাকা আনিয়েছে। মা ও বাবার যাবতীয় অপমান সহ্য করেছে প্রায় নীরবে। তার ভেতরের শুভ ও সুন্দরবোধ সুন্দরীর কুশ্রিতাকে মৃদু আঘাতও হেনেছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত তার ভেতরের অহং বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তাকে ভোগ করতে আসা অচিন্ত্যকে সে সরাসরি আহ্বান জানিয়ে বলেছে—"এ কাজ যদি করতে হয়, আমি আমি আপনাকে দেব দেহ, আপনি আমাকে দেবেন টাকা। মাঝখানে ওরা কে?"[৩০] ভারতীয় সনাতন নারীর গণ্ডীটুকু মেনে নিয়েও সে যাবতীয় পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে সুন্দরীর বাড়ীর চৌকাঠ পার হয়ে বাইরে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। উত্তম থেকে টুকী একটা বৃত্তে নারীর মনোগহনের রক্তচ্ছবি চিহ্নিত

হয়ে গেছে সব রং নিভে যাওয়া অন্ধকার পাণ্ডুলিপিতে জোনাকীর আলোর অক্ষরমালায়।

'স্বভাবসিদ্ধ ইতর' বিশ্বম্ভর আপাদমস্তক অদস্ -এর সত্তাজাত সুখভোগের পঙ্কিলতায় আবদ্ধ ছিল। তার মধ্যে ছিল না কোন শুভবোধ ও নৈতিকতা। কেবল পরবর্তী সময়ে টুকীর বিয়ে এবং বিবাহ পরবর্তী অধ্যায়টুকুতে বিশ্বম্ভরের পিতৃসত্তা ইতিবাচক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। ভোগাকাঙ্ক্ষায় জর্জরিত বিশ্বম্ভর ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে বাড়ীতেই মদের আসর বসিয়েছিল এক শ্রাবণ সন্ধ্যায়। গর্ভবতী স্ত্রী হিরণ তার চাহিদামত চাটের উপকরণ সরবরাহ না করার ফলে তার দ্বারা প্রহৃত হওয়া থেকে রক্ষা পেতে গিয়ে পিচ্ছিল উঠানে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছে। এ নিয়ে খুনি বিশ্বম্ভরের মনে কোন তাপ-উত্তাপ ছিল না। ছিল না নবজাতিকা টুকী সম্পর্কেও কোন মানসিক উদ্বেগ। বরং সে টুকীকে ফেলেই বারবার বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। পরে উত্তমকে সংসারে এনেছে, সেটা টুকীর কথা ভেবে নয়। নিজেরই লাভালাভের হিসেব কষে। স্ত্রী উত্তমকেও সে সম্মান দেয়নি। বরং অসম্মান করেছে প্রতিপদক্ষেপে। উত্তমকে সে 'গৃহী নারী' হয়ে ওঠার জন্য সবচেয়ে বেশী ব্যঙ্গ করেছে। এসবের মধ্যদিয়ে তার মনের কুৎসিত রূপটিও প্রকট হয়েছে। তবে উত্তমকে হারাবার ভয় তার মধ্যে ছিল। শেষপর্যন্ত পিতৃসত্তার জাগরণে বিশ্বম্ভরের মনের একটা শুভ দিক ফুটে উঠেছে ক্ষণপ্রভার মত। লালমোহনের আনীত পাত্রের সন্ধান ও পাত্রপক্ষ কন্যা দেখে যাবার পরেও বিয়ে ভেঙে যায় বেনামী চিঠিকে কেন্দ্র করে। এরজন্য উদ্বিগ্ন বিশ্বম্ভর উত্তমকেই দায়ী করেছে। অথচ অকৃতজ্ঞের মতো ভুলে গেছে যে উত্তমের অর্থেই তার অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। টুকীর বিয়ের পর পরিতোষের গৃহে গিয়ে বিশ্বম্ভরের পিতৃসত্তার অসহায়ত্বই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। আপাদমস্তক স্বার্থান্ধ এই চরিত্রটির নির্মল পিতৃসত্তাটুকু তার মনোলোকের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এটুকু বাদ দিলে বাকী অংশে চরিত্রটির মনোলোক উদ্‌ঘাটিত করে লেখক উত্তমের ভাবনায় জানিয়েছেন—"বিশ্বম্ভরের মনের প্রবণতায় একটা হদিস্ পাওয়া গেল—মোহ তার জন্মে, কিন্তু অপছন্দ হইলে, গায়ে হাত তুলিতেও তার বাধে না—নৈতিক মর্য্যাদার বোধ নাই-সূক্ষ্ম সুখ-দুঃখের ধার সে ধারে না—গা ছাড়িয়া দিয়া ধরা দিলে সে ফেলিয়া দিতে চায়—বিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিলে ঘুরিয়া আসে—পনর' আনা মেরুদণ্ডহীন মানুষের এই চরিত্র—"[৩১]

সমাজ সংসারের প্রতিটি মানুষের মধ্যেই অদস্, অহং আর অধিশাস্তার কমবেশী ক্রিয়াশীলতা থাকে। অর্থাৎ সবচেয়ে ভালো মানুষটির মধ্যেও যেমন কিছু না কিছু খারাপ গুণ

থাকে আবার সবচেয়ে খারাপ মানুষের মধ্যেও কিছু না কিছু আলোর বিন্দুর বিচ্ছুরণ থাকে তা সে প্রচ্ছন্ন বা প্রকট যেভাবেই হোক না কেন। কিন্তু জগদীশবাবু বোধহয় বাংলা সাহিত্যের প্রথম লেখক যিনি মানুষের মধ্যে এই দ্বৈতসত্তার কথা উল্লেখ করেন নি। তাঁর সৃষ্ট এমন মানুষের মধ্যে অন্যতম হল পরিতোষ চরিত্রটি। আজীবন 'কোমর বাঁধা শয়তান' এই চরিত্রটি মানুষকে নানাভাবে ঠকিয়েছে। অল্প কয়েকদিনের জন্যে বিয়েও করেছিল। কিন্তু তার কোনো স্মৃতি এর নেই। সুন্দরীকে নিয়ে দীর্ঘ তিন দশক কদর্য জীবন কাটিয়ে শেষে কীর্তনের আসর খুলে বসেছে। বঙ্কুর মতো সরল শিষ্যের কাছে খোলের মাহাত্ম্য কথা শুনিয়েছে। আবার সংসারের অনটন মেটাতে নিছক অর্থের লোভে বঙ্কুর আনিত প্রস্তাবে টুকীকে বিয়েও করেছে। কিন্তু টুকীকে কোনদিন স্ত্রীর মর্যাদা দেয়নি। টুকীর ভাবনায় এর স্বরূপ উন্মোচিত করেছেন লেখক—''এই ব্যক্তি তাহার পিতার দুর্ব্বলতার সুযোগে তাহার মায়ের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছে। সঙ্গে সে আসিয়াছে আনুসঙ্গিকভাবে। সে পত্নী নয়, দায় মুক্তির দক্ষিণা।''[৩২] পরিতোষের যৌবন বয়সের ছবিতে মালা দিয়ে টুকী স্বামীকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু পরিতোষের অন্তর্গত কুৎসিত মনটি সেই বেদীকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করেছে এবং সংসারের উদরপূর্তি ঘটাতে টুকীকে পাপের পথে ঠেলে দিয়েছে। চরিত্রটির মনোজগতের কুটিলতা খল চরিত্রের শীর্ষদেশ স্পর্শ করেছে। ড. সরকার আবদুল মান্নান প্রসঙ্গত লিখেছেন—''ভালো ও মন্দের, শুভ ও অশুভের এবং ন্যায় ও অন্যায়ের এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক আবর্তে মানুষ সর্বদাই ঘুরপাক খায়। কিন্তু পরিতোষ চরিত্র আমাদের এই সনাতন ভাবনার মূলে কুঠারাঘাত করে। তার জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সে নিরন্তর অন্যায় ও অপরাধের মধ্যে নিমজ্জিত। শুভ, সুন্দর ও কল্যাণের সঙ্গে তার কোনো পরিচয় নেই।''[৩৩]

উত্তম থেকে টুকী—গণিকা জীবনের পরম্পরার যে ইতিহাস সুন্দরী হল তাদের মধ্যবর্তী একটি কদর্য সত্তা। অদস্ তার চেতনা জুড়ে। উত্তম সম্পর্কে মাত্র একবার মাথানত করা ছাড়া এই নারীর অন্তর্জগৎ জুড়েও পঙ্কিলতার ধারা বহমান। অর্থ লালসা আর লিবিডো চরিত্রটিকে তাড়িত করেছে। পরিতোষের রক্ষিতা হিসেবে তার যৌনজীবনের পরিচয় উপন্যাসে না থাকলেও টুকীর সঙ্গে তার যাবতীয় কথোপকথনের মধ্যদিয়ে তার মধ্যে একটা ভোগী নারীকে খুঁজে পাওয়া যায়। আপাদমস্তক স্বার্থপর এই চরিত্রটি যখন চূড়ান্ত আর্থিক কষ্টের মধ্যে পড়েছে তখনই পরিতোষকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে—''...আমার ওজর নেই, করো তুমি বিয়ে।

আর পারিনে দিনরাত নেই নেই করতে—ইঁদুরে খুঁটে খাবে এমন দানাটিও নেই ঘরে। আমার মায়ের মা মরেছে পালঙ্কে শুয়ে—মা মরেছে পালঙ্কে শুয়ে; আমি ডোমপাড়ার ঘাটে মরব না—তুমি বিয়ে করো।”[৩৪] সমাজ সমর্থিত নীতিবোধ, মূল্যবোধ—এসবের কোনো বালাই তার মধ্যে নেই। সে যেন একটা বিগত যৌবনা ‘হস্তিনী’ নারী—যার সমগ্র সত্তা জুড়ে কামনার সরীসৃপ কিলকিল করে। এই কামনাময়তা থেকেই সে টুকীকে জানিয়েছে ‘পাপপুণ্য’ বলতে কিছু নেই, শরীরের সুখই সুখ, মনের সুখও শরীরের সুখ দিয়েই আসে। এই সুখের স্বর্গ সে রচনা করেছে টুকীর অভুক্ত যৌবনের দিকে তাকিয়ে থেকে—“... সুন্দরী মুগ্ধ হইয়া তাহার নিটোল যৌবনের দিকে চাহিয়া রহিল। কেমন একটা লালসা সুন্দরীর মনে দুর্দমনীয় হইয়া উঠিল, যেন ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া সহস্র লম্পটের রিরংসাদাহ তৃপ্ত করিতে দু’হাতে বিলাইয়া দেয়। সুন্দরীর যৌবনোল্লাসের সুপ্ত প্রেতমূর্তি একবার দাঁড়াইয়া উঠিল—যেন অতৃপ্তির ঢেউ এখনো বহিতেছে—প্লাবনের আকাঙ্ক্ষা বুকে বহিতেছে।”[৩৫] এই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার জন্যই পরিতোষের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে টুকীর ঘরে অচিন্ত্যকে পাঠিয়েছে। টুকীকে দেহ ব্যবসার কাজে লাগিয়ে সে তার ভোগ বাসনার পূর্ণ নিবৃত্তি করতে চেয়েছে। ইতিপূর্বে বিশ্বম্ভরের সামনে দাঁড়াতে সে মুহূর্তকালের জন্য সংকোচবোধ করেছিল, বিশ্বম্ভর যখন টুকীকে দেখতে এসেছিল। আর উত্তম সম্পর্কে তার শ্রদ্ধাও ঝ’রে পড়েছিল—“উত্তমকে সে দেখে নাই—টুকী এবং বঙ্কু কেবল দু’একবার তাহার নামোচ্চারণ করিয়াছে মাত্র—সুন্দরীর সম্মুখে সে ছায়া নিক্ষেপ করে নাই; কিন্তু এখন তার মনে হইয়াছে, উত্তম স্বাভাবিক নয়, অনুকূল নয়, অপরিচিত নয়, সুদূর নয়। সুন্দরী আরো অনুভব করিল, এই লোকটি (বিশ্বম্ভর) প্রণয়িণীয় মর্ম্মবাণী কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই।”[৩৬] এই ক্ষণিকবোধের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে সুন্দরীর মনোলোক এবং তার কদর্য নারীসত্তা গণিকা জীবনের যেন চরম সার্থকতা লাভ ঘটে গেছে।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলো ছাড়াও অপ্রধান চরিত্র বিশ্বম্ভরের ভগ্নিপতি লালমোহনের মধ্যে কমবেশী নৈতিকতা বোধের প্রকাশ আমরা দেখি। তবে বিশ্বম্ভরের বন্ধুরা যারা হিরণের মৃত্যুর জন্যে পরোক্ষভাবে দায়ী, যারা বিশ্বম্ভরের গৃহে মদ্যপানের আসর বসানোর অনুমতি না পেয়ে উত্তমকে ‘খাণ্ডারী’ বলেছে তাদের ভেতরেও অদস্ সম্পূর্ণ মাত্রায় ক্রিয়াশীল ছিল। কিংবা স্বভাবতঃ ঈর্ষার কারণে মোক্ষর মা, মোহিনীর মতো চরিত্রেরা গরল ঢেলে দিয়ে উত্তমের জীবনকে দুর্বিষহ করে পরিতৃপ্তি খুঁজেছে। ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্বের প্রয়োগ নিয়ে

সাম্প্রতিককালে যতই নতুন করে বির্তক হোক না কেন, সেসবের দিকে না গিয়েও আমাদের মনে হয় সমাজ মানুষের কুটিল বিসর্পিল মনোজগতের চিত্রাঙ্গণ করে জগদীশ গুপ্ত স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি করেছেন।

লেখকের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের যথার্থ প্রয়োগ দেখি 'রোমন্থন' উপন্যাসেও। পল্লীজীবন সম্পর্কে দীর্ঘকালের গতানুগতিক ধারণার পাশে নতুনভাবে দেখার চেষ্টা করেছেন লেখক আর সেটা করতে গিয়ে চরিত্রদের মনোলোকে স্বচ্ছন্দে ঢুকে পড়েছেন তিনি। তিন শহরবাসী মানুষ তাঁদের অগ্রজের আদেশক্রমে সাময়িকভাবে গ্রামের বাড়ীতে এসেছেন যেখানে তাদের পিতামহ ও তার পত্নী ভূমিষ্ঠ হলেও চিতায় উঠেছিলেন শহর কলকাতায়। আর গ্রামে বসবাসকারী অভয় ও কালোশশী নামক চরিত্রদ্বয়ের চোখ দিয়ে গ্রামদেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে শহরবাসী বাবুদের। শহরের বাবুরা গ্রাম সম্পর্কে একটা পূর্ব ধারণা নিয়ে গ্রামে এসেছিলেন সাময়িকভাবে, কিন্তু তারা গ্রামের মানুষদের চিনতেন না। এখানে এসেই গ্রামীণ মানুষের নীচতা-হীনতা ও দৈন্যতার সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র—অভয়। সহায় সম্বলহীন অভয়কে ঠকায় কালোশশী। সে নিজেকে শহুরে বাবুদের স্তাবক করে তোলে। শহুরে বাবু-কালোশশী আর অভয়—এরা অদস্ তাড়িত তিনটি ধারার প্রতিনিধি চরিত্র। তাদের চোখে গ্রাম জীবনের তিনটি পৃথক চিত্র ধরা পড়েছে তাদের মানসিকতার কারণে।

গ্রাম সম্পর্কে শহুরে মানসিকতা ব্যক্ত হয়েছে তিন ভাইয়ের গ্রামে আসার পূর্বে বৈঠকখানার আড্ডায়। সেখানে সমবেত মনোজবাবু বলেছেন—''...'জমি' লোকের বিছানাতেই বজ্‌বজ্‌ করছে—বিছানা তো কাচে না, রোদে দেয় না কোন কালে! আত্মীয়তা করে' হঠাৎ তাদের বাড়ীতে গিয়ে উঠো না যেন।''[৩৭]

■ ''ক্ষিতিনাথ বলিলেন, শুনেছি পাড়াগাঁয়ে এমন ইঁদুর আছে যার ন্যাজের রোঁয়ায় রোঁয়ায় বিছুটির বিষ—ন্যাজটা যদি একটিবার মানুষের গায়ে ছোঁয়াতে পেরেছে তবে গা চুল্‌কেই মানুষ বেচারা মারা যাবে।''[৩৮]

■ ''ক্ষেত্র মোহন বলিলেন, জলের কথায় আর একটা কথা মনে পড়ে' গেল, পাড়াগাঁয়ে আর একটি উৎপাত আছে।... জলে নেম' না খবরদার! এক চাষী কোথায় যেন পাট ধুয়ে জল থেকে উঠে' দেখে একটা জোঁক তার নাইয়ে এক মুখ লাগিয়ে কোমর বেড়ে' ও মুখটা নাইয়ে লাগিয়েছে, আর এত রক্ত খেয়েছে যে, লোকটা অল্পক্ষণ পরেই অজ্ঞান হয়ে

গেল।"[৩৯]

শহুরে মানসিকতায় এইসব বর্ণনায় একটা কাল্পনিক গ্রাম আছে ঠিকই, কিন্তু সেখানে গ্রামীণ মানুষ নেই, নেই তাদের দুঃখ-কষ্ট যন্ত্রণার ভালোবাসার কোনো স্পর্শানুভব। অভয়ের মতো অভাবী মানুষ এইসব চোখের তারায় ধরা পড়ে নি। পশু যেমন বেঁচে থাকার জন্যে নিরন্তর ব্যস্ত, অভয়ও তেমনি সবকিছু হারিয়ে বেঁচে থাকার প্রাণান্তকর চেষ্টায় মুমূর্ষু। কালো শশীর মতো ঠকবাজ লোক তাকে পাটের দামে ঠকায়। এই কালো শশী আবার শহুরে বাবুদের জন্য উপযাচক হয়ে অভ্যর্থনার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। ফলে অভয় আর কালো শশীর মধ্যে একটা দুস্তর ব্যবধান তৈরী হয়ে গেছে। আবার অভয়ের পারিবারিক জটিলতা ব্যক্তিগত জীবনের সীমাহীন ক্ষোভ বাবুদের কাছে অজ্ঞাতই থেকে গেছে। জীবন যুদ্ধে বিপর্যস্ত অভয় সংসারে প্রবেশ কখনো করেনি, 'দ্বারের নিকট হইতেই বিতাড়িত হইয়াছে'। আসলে অভয়কে সংসার থেকে বিতাড়িত করেছে বাইরের কোন শক্তি নয় তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা। দুর্বল অহং তাকে জীবনে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছে। আর গ্রাম যেন অনেকটা শহরের উপনিবেশের মতো। ফলে ওদের স্তাবকতা করতে পারলেই কালোশশী নিজেকে ধন্য মনে করেছে। এইভাবে গ্রামীণ মানুষের দারিদ্র বর্ণনা নয়, লেখক মানুষগুলোর অন্তরের অন্ধকার জগতে প্রবেশ করে তুলে এনেছেন একের পর এক অবাক করা চিত্র। বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী সময়ে কেবল অর্থনৈতিক সংকট বাড়ে নি, সেইসঙ্গে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কালবেলায় দাঁড়িয়ে শহুরে বাবুরা কেবল গ্রামীণ মানুষকে আশ্বাসবাণী শুনিয়ে গেছে স্তাবক কালোশশীকে—"... কিন্তু মুস্কিল কি জান! সব পল্লীরই এক সমস্যা নয়, কারো জলাভাব, কারো রোগ, কারো দারিদ্র্য, কারো আবার গো-সঙ্কট; ... কারও আবার তিন মাইল লম্বা এক খাল কেটে দিতে পারলে সুবিধা হয় বর্ষার জল বেরিয়ে গিয়ে আবাদ্ চলতে পারে। দেখ' কি দুরূহ ব্যাপার। তবে আমরা সাধারণভাবে শ্রেণীবিভাগ করে নিয়েছি, ম্যালেরিয়া আর গোচারণ ভূমিই আমাদের প্রথম লক্ষ্য হবে। একটিকে তাড়াব, আর একটাকে তৈরী করব।"[৪০]

'রোমন্থনে'র মতো 'দুলালের দোলা' উপন্যাসেও শহরবাসী নীরদবরণের চোখে গ্রামজীবন আর গ্রামীণ বৃদ্ধ পিরুর মুখ দিয়ে গ্রামীণ মানুষের কদর্য জীবনের ছবি বর্ণিত হয়েছে। গ্রামীণ মানুষ জাত-পাত ধর্ম-বর্ণের নিরীখে নানাস্তরে বিন্যস্ত এবং এ নিয়ে তাদের মনে কোনো ক্ষোভ-বিক্ষোভ নেই। ব্রাহ্মণ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেয়ে নিজের পাত নিজেদেরই ফেলতে

এবং ধুতে হয় দেখে নীরদবরণ গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ দ্বারিক ঠাকুরের প্রসাদ পাবার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে। তার সংস্কারমুক্ত মনের যুক্তি ছিল—"...আগে মানুষ, তারপরে ভদ্র-অভদ্র, সকলের শেষে ব্রাহ্মণ-শূদ্র। সংস্কার আগে নয়, গুণ আগে, আপনাদের এই কথাটা মনে করবার সময় এসেছে। আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি আমাকে দিয়ে এঁটো বাসন মাজাতেন কিনা জানি নে, আপনি তা' করাবেন না প্রতিশ্রুতি দিলেও আমি ব্রাহ্মণ বাড়ী খেতে যাব না।"[৪১] দুশো সিঁদেল চোরের সর্দার দ্বারিক ঠাকুর এতে নীরদবরণের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে জানিয়েছেন, সে ব্রাহ্মণকে চেনে না; অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজের পাল্লায় সে পড়েনি। সত্যি নীরদবরণ এইসব মানুষের ভেতরটা দেখতে পায়নি। পরদিন পরিধেয় বস্ত্রাদি ছাড়া নীরদের সমস্ত কিছু চুরি হয়ে যায়। তবে উপন্যাসের প্রধান অংশ পিরুর বর্ণিত ঘটনার কোলাজ। পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থাদিতে যেসব যৌনতার গল্প আছে, এই অংশে পিরু সেই যৌন-জীবনকেন্দ্রিক কাহিনী বর্ণনা করেছে। গ্রামের 'লক্ষ্মীদিয়া' থেকে 'পোড়া বৌ' নামকরণের ইতিহাসের মধ্যদিয়ে। সেই কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে পিরু নারী-পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তিটি তার মতো করে নীরদবরণের কাছে তুলে ধরেছে যাতে শুধু পিরু না, গোটা গ্রামীণ মানুষের অন্তরের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে—

■ "... এই যে বাছুরটা চর্‌ছে দেখ্‌ছেন, পেট ভরানো ছাড়া এর আর কোনো কাজ কি আছে? নাই; পেট ভরলেই এ নিশ্চিন্দি। কিন্তু, বাবু, মানুষের খাই খাই আর মেটে না; ভরা পেটেও যেমন তার খাই খাই, খালি পেটেও তেম্‌নি; একদণ্ড সে নিশ্চিন্দি না; কত যে খাবে, তার কত যে ক্ষিদে তা' সে নিজেই জানে না; সে জ্ঞাতির সর্ব্বস্ব খায়, নিজের মাথা খায়, পরের পরকাল খায়, তবু তার খাওয়ার আশ্‌ মেটে না।"[৪২]

■ "আমি ভেবে দেখেছি, বাবু, ধর্ম্মপত্নী, স'ধর্ম্মিণী, আরো অনেক কথার এমনি মানে নাই। মন্তর মেয়েকে বাঁধার কৌশল, তার দেহটাই আসল।"[৪৩]

এমনই এক দেহ-সর্বস্বতার ফসল সতীশ চরিত্রটি। তার পিতামহ ভারতের অবৈধ নারী আসক্তির কারণে অন্য নারীর গর্ভজাত সন্তান সে। এই পাপকর্ম দেখেও ভারতের স্ত্রী বাইরে কোনো প্রতিবাদ করেনি, কিন্তু একদিন গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। সেই থেকেই গ্রামের নাম 'পোড়া বৌ' হয়েছে। জন্মের এই কালো ইতিহাস সতীশের মনে একটি সহজাত অপরাধবোধের জন্ম দিয়েছিল। ফলে সে সর্বদা একটা মানসিক যন্ত্রণায় ভুগত। তার

এই মানসিক যন্ত্রণার কারণ বর্ণনা করে সমালোচক ড. প্রবীর কুমার চট্টোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন—“বিবাহের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ছাড়াও নরনারীর ভালোবাসার সম্পর্ককে সমাজ ও সংস্কৃতি উচ্চমূল্য দিয়ে এসেছে। ভালোবাসার সম্পর্ক অনুসরণ করে যদি এ দৈহিক সম্পর্ক স্থাপিত হত তবে সতীশ দাস সান্ত্বনা পেত। পিতা এবং নিজের জন্মের সার্থকতা খুঁজে পেত। ভালবাসাহীন যৌন সম্পর্কের ফলে পিতার জন্ম হওয়ায় এবং সে পিতার সন্তান বলে নিজেকে চূড়ান্ত অপরাধী মনে করে।”[৪৪] মানসিক বিকারগ্রস্ততার কারণেই তার বিচারবোধ লোপ পেয়েছে। সে পিতামহীর সঙ্গে নিজের স্ত্রীর এবং স্ত্রীর অবর্তমানে কন্যাকে দেখে অভিন্ন ক'রে, সন্দেহ করে। স্ত্রী ও কন্যাকে আক্রমণ করে সে আকাঙ্ক্ষিত শাস্তির প্রয়োজনকে তৃপ্ত করে। নীরদবরণ সেই মানুষটির মনের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে—

■ “...আপন কন্যার প্রতি এ ব্যক্তি যে মিথ্যা এবং কুৎসিত কটূক্তি করে তাহাতে তাহার দ্বিধা নাই; যাহার অধিক কলঙ্ক স্ত্রী লোকের হইতে পারে না, সেই কলঙ্ক আপন স্ত্রীর চরিত্রে কেবল আরোপ নয়, সর্ব্বত্র প্রচার করিতে ইহার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ নাই।”[৪৫]

■ “পাপের ইচ্ছায় নহে, প্রলোভনে নহে, আত্মকৃত পাপের অনুশোচনায় নহে, একজনের স্খলিত জীবনের পাপের জ্ঞান তাহারই বুকে সঞ্জীবিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে নামাইবার স্থান নাই, তাহাকে হত্যা করিবার উপায় নাই—তার ছট্‌ফটানির অন্ত নাই।”[৪৬]

এইভাবে নীরদের কথনের মধ্যদিয়ে লেখক মানুষের মনের কুটিল বিসর্পিল গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাবনা ব্যক্ত করেছেন। এইসব মানুষগুলোর অন্তরে অদস্‌ যত প্রকট অহং কিংবা অধিশাস্তার প্রকাশ নেই বললেই চলে। পিরুকে কেবল পল্লীজীবনের ‘বিবেক’ বলা যায়।

জগদীশগুপ্তের গ্রামকেন্দ্রিক ‘ত্রয়ী’ উপন্যাসের তৃতীয় উপন্যাস ‘যথাক্রমে’। ছোট্ট নদী চন্ননার তীরে অবস্থিত ছোট্ট গ্রাম বেতডাঙ্গার মানুষগুলির অন্তরমহলে লেখক অনায়াসেই পৌঁছে তুলে এনেছেন বিচিত্র অভিজ্ঞতার পাঠ। উপন্যাসের কাহিনীর দুটি অংশ—একটি রামপ্রসাদ ও তার ছেলেমেয়ের দুঃখ-কন্টকিত জীবন আর দ্বিতীয়টি নিত্যপদ নামক ডাক্তারের স্বপ্নভঙ্গ। গ্রামস্থ মানুষগুলির লোভ-লালসা-পরশ্রীকাতরতা, হিংসা-বিদ্বেষ-জাতপাত ইত্যাদি ছোট ছোট ঘটনার মাধ্যমে বর্ণনা করে লেখক তাদের ‘আঁতের কথা’ তুলে এনেছেন। স্ত্রীর মৃত্যু রামপ্রসাদের অন্তরকে যতটা আঘাত করেছিল, মাকে হারিয়ে দীনবন্ধু ও সাবিত্রীর জীবন

ততোধিক সংকটে পড়েছিল। এই মানসিক সংকট আরও ভয়াবহ হয়েছে পিতা রামপ্রসাদও চলে গেলে। পিতার মৃত্যুর পর অসহায় নাবালক দুটিকে গ্রামের মানুষ যা দিয়েছিল তার নিখুঁত বর্ণনা করেছেন লেখক—"...দীনুদের এই দুর্দ্দিনে তাহাদের শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া সবাই সৎ পরামর্শ দিল যত, তাহাদের আগ্‌লাইবার কেহ নাই দেখিয়া ফাঁকি দিল তার ঢের বেশী। তাহাদের প্রাপ্য পয়সা আগ বাড়াইয়া কেহ দিতে আসিল না। খাতায় হিসাব উঠিত না; অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, সজ্ঞান অপরাধের সাজা কঠিনতর জানিয়াও রামপ্রসাদের এই কাঁচা কাজের সুযোগ ত্যাগ করিলেন না।"[৪৭]

ছদ্মবেশী এইসব ঠক প্রতারক ছাড়াও দীনবন্ধু-সাবিত্রীর সমস্যা কন্টকিত জীবনে ক্ষণপ্রভার মত এসেছিল গোবিন্দ ঠাকুর—যার কারণেই এরা সংসার সমুদ্রে শেষপর্যন্ত ভেসে যায়নি। দীনবন্ধু ব্যবসা সামলে বোনের বিয়ে দিয়েছে ভিন্ গাঁয়ে। কিন্তু সেখানে শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা ভয়ানক হিংস্র প্রাণীর মত দাঁত-নখ বের করে বোনকে প্রতিনিয়ত শাস্তি দিলে দীনবন্ধু সেই সংবাদে ভেঙ্গে পড়েছে। আসলে তার অন্তরে গোবিন্দ ঠাকুর বাস্তব জগত সম্পর্কে ধারণা ঢুকিয়ে দিলেও তাব ব্যক্তিক অহং-এর দুর্বলতা হেতু সে বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে স্থির থাকতে পারেনি। কিন্তু গোবিন্দ ঠাকুরের অহং অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় তার সংস্পর্শে দীনবন্ধু ধীরে ধীরে মাথা তুলতে পেরেছে। আর সাবিত্রীও আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে শেষে প্রত্যাঘাতের জন্য মরীয়া হয়েছে সহজাত প্রবৃত্তি বশে—

"... এখন শাশুড়ী যদি বলে এক কথা সাবিত্রী শোনায় তাকে দশ কথা, শাশুড়ী যদি তোলে কঞ্চি, সাবিত্রী তোলে বাঁশ, পারুল ডাঙায় সবাই বল্‌ছে, বেটি জব্দ।

— শিবু?

— সে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখে। আমার মাসী বলে, 'কালী-মা এবার রণে চেপেছেন।"[৪৮]

উপন্যাসের কাহিনীর দ্বিতীয় অংশে অন্তরস্থ নৈতিকবোধ আর মূল্যবোধের তাগিদ থেকে দাদার মৃত্যুর পর ডাক্তার নিত্যপদ গ্রাম সমাজকে সুস্থ-সুন্দর করে তোলবার স্বপ্ন নিয়ে স্থায়ীভাবে গ্রামেই চলে আসে। কিন্তু গ্রামীণ মানুষের অন্তরস্থ কদর্যরূপ আর ষড়যন্ত্রের কারণে তার মোহভঙ্গ হতে দেরী হয়নি। গ্রাম সম্পর্কে তার যে গর্ব ও উচ্ছ্বাস ছিল তা গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার ফণী, প্রধান মতিলালদের ষড়যন্ত্রে ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়েছে। এ যেন 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসের নায়ক শশীভূষণের স্বপ্নভঙ্গ। আসলে যাবতীয় সদ্‌গুণ থাকলেও

নিত্যপদ'র ভেতরে অহং সবল ছিল না। ফলে সে বাস্তবতার সঙ্গে তার আদর্শের সমন্বয় ঘটাতে পারেনি। যদিও ক্ষণপ্রভার মতো তাঁর অন্তরে দু'একবার মহৎ ভাবনা জেগেছিল। একসময় সে ভেবেছে—"...ইহাদের বুদ্ধিই অল্প; তাহার প্রতি বিদ্বেষ ইহাদের কাহারো নাই, বিষ প্রয়োগের গুজবটা ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তির মিথ্যা কলঙ্ক রটনা হইতে পারে কি না সেইটা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার উৎসাহটা বাদে ইহাদের অপর সকল দিকেই প্রেরণা আছে; ইহাদের কথায় রাগ করিলে নিজেকে ছাঁটিয়া ইহাদেরই সমান করিয়া খাট করা হয়।"[৪৯]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিত্যপদ আপন সংকল্পে অটল থাকতে পারেনি। সেও যেন 'দশচক্রে ভগবান ভূত' হয়ে গেছে। সমস্তরকম সেবার মানসিকতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে তার সহকারীকে জানিয়েছে, হাতুড়ে ডাক্তার ফণীর রাস্তাই সঠিক। গ্রামীর মানুষগুলিকে সেবা করা মূর্খামি। তাই সে কান্তিভূষণকে অনায়াসেই আদেশ দিয়েছে—"... আর ওষুধ বিতরণ করে' কাজ নাই। জল দিতে থাকো। ফণীবাবু দেশের লোকের নাড়ী ধরে আছেন—তার ব্যবহারই ঠিক। আমরা ভুল পথে চলেছিলাম, ভাই।"[৫০]

'তাতল সৈকতে' উপন্যাসে লেখক শরৎ নাম্নী নারীর জীবনের অন্তর্দাহ ও করুণ পরিণতিকে ভাষারূপ দিয়েছেন। মোহিতের পুত্রবধূ শরৎ কঠিন দুঃখ-লাঞ্ছনা ভোগ করে সামাজিক অপবাদ মাথায় নিয়ে; পুত্রের কাছে নিজের সম্ভ্রম রক্ষায় শেষে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল। শরতের স্বামী বিদুরের ভাবনায় লেখক জীবন সংগ্রামে পরাস্ত একজন মানুষের মানসিক যন্ত্রণার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন—"... মিথ্যে নয়; মনটাকে ক্ষয় ক'রে এনেছি... যে ইচ্ছার জোরে মানুষ বেঁচে থাকে সে জোর আমার নেই, আমি তা বোধ করছি। এখন খুবই ইচ্ছে হচ্ছে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকি... কিন্তু সে ইচ্ছাটা আমি এতদিন নিজের অজ্ঞাতেই প্রতিমুহূর্তে লঙ্ঘন ক'রে গেছি।... এখন দেরী হ'য়ে গেছে।"[৫১] এরপর চরম দারিদ্র্যকে সম্বল করে শরৎ পুত্রকে নিয়ে নিজের দুটি ঘরের একটিতে ভাড়াটে বসিয়ে বাঁচার পথ খুঁজেছে। একদিন ছেলের জন্যে অন্ধকারে অপেক্ষা করতে গিয়ে কামুক মনোহর দত্তের দ্বারা আহূত হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর পর শরৎ হয়ে উঠেছিল সন্তানের অভিভাবিকা, শুধু মা নয়। কারণ মৃত্যু-শয্যায় স্বামী তাকে ছেলের ভার দিয়ে গেছে—অথচ মনোহর প্রদত্ত অপবাদ তার জীবনে চরম সংকট ঘনিয়ে তোলে। মনোহরের রক্ষিতা সুখী শরতের কাছে এসেছে নিজের গচ্ছিত ধন মনোহর হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে ভেবে। এই সুখী 'লঘুগুরু'র সুন্দরীর মতোই। তার কোনো মানসিক

উত্তরণ নেই। কোনো শুভবোধ নৈতিকতা তার নেই। একেবারেই অদস্-এর বশীভূত সুখী অনায়াসেই শরৎকে কুৎসিত আহ্বান জানিয়ে বলেছে—"... আয়, আমার সঙ্গে আয়; আমার ঘরে থাকবি। নিত্যি নতুন নাগর এনে দেবো, কাব্লি, মেড়ো, খোট্টা।... ভিজে বেড়ালটি আমার, নেকী, মুখে রা শব্দটি নেই।... ঘরে থেকে ডুবে ডুবে পরের জলে নোলা ভেজাবি-কতদিন? ... আয় বেরিয়ে।"[৫২] অন্তরস্থ অহং-এর দুর্বলতার কারণে শরৎ এরপর আর নিজেকে কঠিন বাস্তবের মাটিতে দাঁড় করাতে পারেনি। ভুলে গেছে মৃত্যু শয্যায় স্বামীর বলে যাওয়া ছেলেকে মানুষ করার কথা। নিজের কাছে পরাজিত শরৎ শেষ পর্যন্ত আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে।

মনস্তত্ত্বের নিরীখে দেখলে দেখা যায় জগদীশবাবুর সৃষ্ট পুরুষেরাই মেয়েদের চেয়ে দুর্বল চিত্তের। এরকমই এক দুর্বল মানসিকতার মানুষ 'সুতিনী' উপন্যাসের দুর্গাপদ। উপন্যাসটি সম্পর্কে সমালোচক ড. ক্ষেত্র গুপ্ত লিখেছেন—"...বাঙালির সংসার-সমাজে নারীর (এবং পুরুষেরও) যৌনতা ভিত্তিক মনোকুটের অর্থাৎ সেক্স-অবসেশনের এই উৎসটি সুপরিচিত। জগদীশবাবুর উপন্যাসে মনোবিকারের যে বিচিত্র চরিত্র-মূর্তি অংকনের চেষ্টা তার মধ্যে সুতিনীর সমস্যাটি বিশেষভাবে বাঙালি জীবনের অঙ্গ।"[৫৩] উপন্যাসের নায়িকা রাজবালা পরপর চারটি মৃত পুত্র প্রসব করায় তাদের শান্তিপূর্ণ সংসারে সমস্যার করাল ছায়া ঘনিয়ে উঠেছে। মৃত সন্তান প্রসব করার দায় রাজবালা চাপিয়েছে স্বামীর ভগ্নস্বাস্থ্যের উপর। এক্ষেত্রে তার শৈশব থেকে জাত সহজাত আক্রমনাত্মক প্রকৃতি কাজ করেছে। নিজেকে এবং নিজের জরায়ুকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে স্বামীর সঙ্গে জোরপূর্বক নিজের বোন মধুবালার বিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এরপরই তার আক্রমনাত্মক প্রবৃত্তি আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে। বিয়ের অল্পকালের মধ্যে মধুবালা পুত্রবতী হওয়ায় রাজবালার অন্তরের সুপ্ত ঈর্ষা এখন আগ্নেয়গিরির মতো প্রবল অগ্ন্যুৎপাত শুরু করে। কেবল ঈর্ষা নয়, নিজের পরাজয়ের গ্লানি ও আত্মধিক্কার তাকে জর্জরিত করে তোলে। এরপর সে পঞ্চমবার সন্তান ধারণ করে নিজের জরায়ুর অপবাদ ঘুচিয়েছে। রাজবালার মধ্যে অহং-এর নেতিবাচক দিকগুলি যত প্রকট সেই তুলনায় দুর্গাপদ অনেক বেশী ইতিবাচক। শেষপর্যন্ত পুত্রের জন্ম দিয়ে রাজবালা চিরশয্যায় শায়িত হয়েছে—

"কালীতারা ছট্‌ফট্ করিতেছেন—ছেলে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, কিন্তু ফুল পড়ে নাই।

—'দাই, পেটে চাপ দে, পোয়াতির মুখে চুল দে'—

দিতে দিতেই রাজবালার চোখ উল্টাইয়া গেল—গলায় উদ্‌গারের মতো একটা শব্দ হইল—রক্তহীন দেহ কাঁপিতে লাগিল—এবং ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া নয়, নিঃশ্বাস সহজভাবে চলিতে চলিতেই এক নিমেষে একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।"[৫৪] রাজবালার মনের অচেতন অংশে যে অপরাধবোধ দৃঢ়তর হয়েছিল—তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে তার মৃত্যু—যা ছিল তার কাছে অবধারিত শাস্তির মতো।

'সুতিনী' উপন্যাসে রাজবালার মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বই 'রতি ও বিরতি' উপন্যাসে রাম চরিত্রটির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র তিনটি—রাম, তার স্ত্রী গয়ামণি এবং পুত্র লব। সর্প দংশনে পুত্র লবের মৃত্যু হলে স্বামী-স্ত্রী দিশেহারা হয়ে পড়ে। তাদের অন্তরস্থ অহং সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি অন্ধ বিশ্বাস থেকে পুত্রহারা গয়ামণির মনে হয়েছে লখীন্দরের মত তার ছেলের মৃতদেহ ভাসিয়ে দিলে কোনো মহৎ গুণীনের হাতে পড়ে পুনর্জীবন লাভ করবে। গয়ামণির এই বিশ্বাসের মধ্যে সংস্কারের পনের আনা মানুষের মনের অন্ধ বিশ্বাস আর মায়ের পুত্র বাৎসল্য ধরা পড়েছে। পুত্রহারা অপ্রকৃতিস্থ গয়ামণি নদীর ধারে গিয়ে একদৃষ্টে দূরের দিকে চেয়ে থাকে। কল্পনা করে ছেলের সর্পদংশনাহত দেহটি সকলের সেরা গুণীর কাছে পৌঁছে গেছে এবং গুণী তার প্রাণ বাঁচিয়ে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে। স্বপ্নভঙ্গ হয়। পুত্র শোকাতুরা গয়ামণির মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে স্ত্রী-পুত্র হারিয়ে রাম গৃহের মেঝেতে গর্তের ভেতরে লুকিয়ে থাকা সাপটিকে দিয়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেছে শেষ পর্যন্ত। এই মৃত্যুর মনস্তত্ত্বসম্মত ব্যাখ্যা করে ড. প্রবীর কুমার চট্টোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন—"সর্পের দংশনকে স্বেচ্ছায় বরণ করায় রামের বিশেষ একটি মানসিকতা ধরা পড়েছে। প্রতিশোধ গ্রহণের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত ছিল সর্পকে হত্যা করা তা না হয়ে সে নিজেই সর্প দংশনে নিহত হল। সর্পকে দেখে তার উল্লাস, আকাঙ্ক্ষা পূরণের আগ্রহ অবিকৃতরূপে সর্প দংশনের যন্ত্রণা বরণ করা, এর মধ্যদিয়ে আকাঙ্ক্ষিত শাস্তি লাভ করার তৃপ্তি প্রকাশ পেয়েছে।"[৫৫]

আদর্শ দাম্পত্য সম্পর্কে কেবল দেহ সর্বস্বতা নয়, থাকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। সেই যৌথ সত্তার সহাবস্থান না হলে সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত যাবতীয় কদর্যতা ঠেলে এক ট্রাজিক পরিণতি পায়। 'গতিহারা জাহ্নবী'তে অকিঞ্চন ও কিশোরীর দাম্পত্য জীবন শেষপর্যন্ত তেমনি এক পরিণতি লাভ করেছে। অবশ্য সম্পর্ক যখন চূড়ান্ত ভাবে ভাঙনের মুখে তখন কিশোরীর

সন্তান সম্ভাবনার সংবাদ একটা সেতু হয়ে উঠেছে। প্রবৃত্তি তাড়িত অকিঞ্চন এতটাই অদস্-এর বশীভূত যে তার ভেতরের অহং আর অধিশাস্তা প্রচ্ছন্নই থেকে গেছে। একান্তভাবেই দেহসর্বস্ব অকিঞ্চন নিজের স্ত্রীকে কোনো সম্মানতো দেয়ই নি উপরন্তু স্ত্রীর সখিকে লাভ করার কদর্য বাসনা প্রকাশ করতে একটুও লজ্জিত হয়নি। লেখক জানিয়েছেন—''অকিঞ্চন তখন সেই মেয়েটির কথা বলে—যে তার স্ত্রীর সই আর যার চোখের কথা ভোলা যাইতেছে না—অকিঞ্চন তার মনের কথা এমন করিয়া লালসা দিয়া ফলাইয়া গাল ভরিয়া বলে যেন কিশোরীর সঙ্গে বিবাহ না হইয়া সেই মেয়েটির সঙ্গে বিবাহ হইলেই আক্ষেপের কিছু থাকিত না।...''[৫৬]

অদস্-এর বশীভূত অকিঞ্চনের মধ্যে নীতিবোধের ছিঁটেফোঁটা না থাকায় সে স্ত্রীকে শুধু অপমানই করেনি, বাগ্‌দী পাড়ায় 'খারাপ' মেয়েদের সঙ্গে তার যৌন-সম্পর্কের বিষয়েও সবাই জেনে কী ভাবল সেটা নিয়েও কোন হেলদোল ছিল না। এক অসম মানসিকতার দাম্পত্য জীবনে কিশোরীর অহং দুর্বল হওয়ায় সে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারেনি। সমস্ত মানসিক যন্ত্রণা নীরবেই সহ্য করেছে। স্বামীর জৈব বীজের ফসল দেহে ধারণ করে তার জীবনের মুক্তির পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কুমুদিনীর মতোই। সন্তানের মা হতে পারার যে ঈশ্বরিক আনন্দ নারী মাত্রেই লাভ করে সেই আনন্দধাম থেকে নির্বাসিত কিশোরীর মনে হয়েছে এই মাতৃত্ব নিরর্থক অযাচিত ব্যাপার, হাস্যকর এবং হৃদয় বিদারক। প্রসঙ্গতঃ তার মনের অবস্থা বর্ণনায় লেখক জানিয়েছেন—''... এই সন্তান কি স্বামীর আত্মজ? স্বামী যাহা অকাতরে দান করিয়া ইহকাল ও পরকালব্যাপী কলুষ মর্ম্মে আত্মায় পুঞ্জীভূত করিয়াছিল এই সন্তান সেই অশেষ কলুষজাত, ইহা শুভ নহে, সার্থক নহে, ঈপ্সিত নহে, ইহা অবাঞ্ছিত এবং বর্জনীয় কলুষ।''[৫৭]

এই মাতৃত্ব লাভ না করার এক ভিন্নধর্মী মানসিকতা ব্যক্ত হয়েছে 'দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা' উপন্যাসে মল্লিকার ভাবনার মধ্যদিয়ে। তার শাশুড়ি কামিনী বংশ রক্ষার জন্য নাতি চেয়েছে, বৌকে চায়নি। আর মল্লিকা অসুস্থ শরীরে গর্ভধারণ করে মৃত সন্তান প্রসব করেছে। এবং নিজের জীবনের কথা ভেবে পুনরায় আর সন্তান ধারণ করতে চায়নি। এটা নিয়ে সে আদালত পর্যন্ত যেতে পিছুপা হয়নি। নারীর জীবনে মাতৃত্বই একমাত্র লক্ষ্য—এই শাশ্বত ধারণার বিরুদ্ধে গিয়ে মল্লিকা স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে। হাকিমের আদেশে শ্বশুরবাড়ী ফিরে যাবার কথা নাকচ করে দিয়ে মল্লিকা বলেছে—''না, হাকিম; আমি সেখানে এখন যাব না। ... অসুখের সময়

ছেলে পেটে এসেছিল; মরতে বসেছিলাম। এ শরীরে আমি আর ছেলে চাইনে—ছেলে আমি পেটে ধরতে পারব না। রক্ষে করো আমাকে তোমরা।"[৫৮]

পুরুষের রূপজ মোহ ও তার সমস্যা নিয়ে 'নন্দ আর কৃষ্ণা' উপন্যাসটি রচিত। উপন্যাসের নায়ক নন্দ শহরে গৃহশিক্ষকতা করতে এসে মণীন্দ্রবাবুর স্ত্রী বলে জানত যে কৃষ্ণাকে তার অর্ধনগ্ন দেহ দেখে ফেলে তীব্র অপরাধবোধ পোষণ করেছে এবং শাস্তির ভয়ে পালিয়ে গেছে। ভোগ সর্বস্ব অহং শূন্য নারী কৃষ্ণার কামজ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি নন্দ। পরবর্তী সময়ে অবশ্য স্ত্রী মমতার স্নিগ্ধ ভালোবাসার বৃত্তে সে ফিরে গেছে। নন্দর অন্তর্গত সুপ্ত অদস্তাকে কৃষ্ণার প্রতি প্রলুব্ধ করেছিল। কৃষ্ণাও আহ্বান জানিয়ে তাকে বলেছিল—"পালাবেন না; আমাকে আয়নায় যেমন দেখেছেন, তেমনি দেখা আমার ভালো লাগে, আপনাকে আরো—আপনি নির্ব্বোধ, তাই দিশে পান না, পালান্।"[৫৯]

কৃষ্ণার আহ্বান প্রথমাবধি উপেক্ষা করেই নন্দ পালিয়ে এসেছিল, কিন্তু তার অন্তরের কামনা বাসনাকাঙ্ক্ষী পুরুষ সত্তাটি নারীর রূপ পিপাসা পূরণ করার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। এই অন্তর্গত পুরুষসত্তাটি কৃষ্ণাকে ঘিরে স্বপ্নও দেখে। অর্থাৎ সচেতন সত্তায় যেটা পূরণ হয়নি, অবচেতন মন স্বপ্নের ভেতর দিয়ে তা পূরণ করতে চেয়েছে। লেখক সেই অবচেতনের স্বরূপ বর্ণনা করে লিখেছেন—

"... যা মানুষকে উদাস আর আন্‌মনা করে, নন্দ কিশোরের বেলায় আজ তা-ই ঘটিল রাত্রে, নন্দর নিদ্রিতাবস্থায়।

নারীর রূপ আর আকর্ষণ, বিভ্রান্তিকর সেই মোহন ইন্দ্রজাল, পুরুষ অত সহজে আর অত সত্বর ভুলিতে পারিলে পৃথিবীর বুক হালকা, কাব্য ক্ষুন্ন, এমন কি মরণশীল, পুরাণ অপাঠ্য, আর পাগলের সংখ্যা চৌদ্দ আনা হ্রাসপ্রাপ্ত হইত। তা যা'তে না হয় সেই জন্যই বোধ হয় নন্দ কিশোর সেই রাত্রেই এক অভাবনীয় স্বপ্ন দেখিল।"[৬০]

মণীন্দ্রবাবু নন্দর এই অন্তর্গত কামনাকে জাগিয়ে দিয়েছেন তার কামুক সত্তার প্রকাশের মধ্যদিয়ে। সেই সঙ্গে তিনি অকপটে জানাতে ভোলেন নি, কৃষ্ণা তার স্ত্রী নয়; বলতে গেলে রক্ষিতা। তার খুড়তুতো বোন। স্ত্রী বিয়োগের পর সেই বোনের রূপে মুগ্ধ মণীন্দ্র কৃষ্ণাকে ঘরে তুলেছিলেন। প্রৌঢ় মণীন্দ্রের অন্তর্গত কদর্যতার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে নন্দকে বাড়ীতে যাবার অনুমতি দিয়ে এবং তার সাময়িক গৃহে অবস্থান কালে স্ত্রী মমতাকে কতবার শারীরিকভাবে

লাভ করার সুযোগ পাবে সেটাও অঙ্ক করে বলে দিয়েছেন। তার মনের অন্তরালে অতৃপ্ত কামনা ছাড়া কোনো মূল্যবোধ-নৈতিকতাবোধ নেই। তার অবর্তমানে নন্দ বাড়ী থেকে ফিরে এসে কৃষ্ণার রূপবহ্নিতে পতঙ্গ রূপে দরা দিয়ে দগ্ধ হবার প্রাক্-মুহূর্তে কৃষ্ণার মা নন্দকে সেই দগ্ধ হওয়া থেকে বাঁচিয়ে দেয়। তিনি নন্দকে সতর্ক করে দিয়ে জানান—''তোমাকে বলব কি বাবা মেয়েটা চিরকাল শয়তান।... রূপ আছে, রূপের জোরে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলে মজা দেখা ওর মজ্জাগত অভ্যাস। কতজনকে যে মিছি-মিছি পাগল করেছে তার ইয়ত্তা নাই। মনে হয়—কাউকে ভালোবাসে না, বাস্তে পারেই না, ঈশ্বর ওকে সে ক্ষমতা দেন নাই।''[৬১]

'লঘুগুরু' উপন্যাসের উত্তমের সঙ্গে এখানেই কৃষ্ণার চরিত্রের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। বহু পুরুষচারিণী উত্তমের ভেতরে সুস্থ-সুন্দর গৃহী নারী বাস করত। কিন্তু অদস্ তাড়িত কৃষ্ণা কেবল কামনার আগুনে একের পর এক পুরুষকে পুড়িয়ে মেরেছে। তার হৃদয়ের কোন কোষেই 'ভালোবাসা' নামক কোনো বস্তু ছিল না। কৃষ্ণার দেহজ চক্রব্যুহ থেকে মুক্ত হয়ে নন্দ যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। এবং অহং-এর পুনর্জাগরণের ফলে তার চোখের সামনে স্ত্রী মমতার স্নিগ্ধ মুখটা ভেসে উঠেছে।

দাম্পত্য প্রেমের যে স্নিগ্ধতা 'নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ' উপন্যাসে শশধরের স্ত্রীর মধ্যে ছিল, যার জন্যে সে স্বামীর প্রথমদিকের বীরত্ব আর পরোপকারের কারণে নিজেকে সে 'ভীমের স্ত্রী' বলে গর্ব অনুভব করেছিল এবং শেষে প্রতিবেশীর গৃহে ডাকাতির ঘটনায় শশধর কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমের 'ভান' করে পড়ে থাকলে তার স্ত্রীর কাছে সে কাপুরুষ প্রতিপন্ন হয়েছে—এমন রূপ 'নিষেধের পটভূমিকায়' উপন্যাসের অভয়ার মধ্যে ছিল না। নিছকই জৈবিক তাড়নায় একদিন সে কন্যা শান্তিকে নিয়ে অতুলের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছিল। পরে মেয়ে যতই বড় হয়েছে অতুলের প্রতি অবিশ্বাস তার বেড়েছে এবং শঙ্কিতা। মাতৃসত্তা আতঙ্কিত হয়েছে। বিশেষ করে অতুলের সঙ্গে শান্তির সমস্ত বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা এমন কী নারী পুরুষের সম্পর্ক নিয়েও মুক্ত আলোচনাকে শঙ্কিতা অভয়া ভালোভাবে নিতে পারে নি। ফলে একদিন রাত্রে সিনেমা দেখে ফেরার পর অভয়ার আকুল প্রশ্নে ব্যক্ত হয়ে পড়েছে তার পূর্ব পরিচয়। শান্তির উদ্দেশ্যে ব্যাকুল অভয়া জানিয়েছে—''আমি পাগল হ'য়ে গেছি; আমার বুক পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে। বল্ সত্যি করে', শান্তি, ও তোকে নষ্ট করেনি ত'? ... ও তোর বাবা নয়, কেউ না; তোকে তিন মাসের কোলে নিয়ে ও'র সঙ্গে আমি কুলত্যাগ করেছিলাম।''[৬৩] শান্তির

অন্তর্গত অহং তাকে ছিটকে দিয়েছে এতোকালের পিতৃ মাতৃ আশ্রয় থেকে। মাকে অভিভুক্ত করে সে তার জন্মদাতার কাছে গেছে। কিন্তু মেরুদণ্ডীহীন জন্মদাতা তাকে আশ্রয় দেয়নি, দিতে সাহস পায়নি। ফিরে এলে অতুলের ভেতরেও কোনও পিতৃসত্তার জাগরণ দেখি না। শেষ পর্যন্ত শান্তির আশ্রয় হয়েছে নিস্তারণ মজুমদারের কাছে। অভয়া-অতুল কিংবা শান্তির পিতা বসন্ত—একই সরলরেখায় অঙ্কিত নষ্ট চরিত্র। কেবল অভয়ার মাতৃসত্তাটি অকৃত্রিম। যদিও লেখক শেষে শান্তির অহং-এর উত্তরণ দেখিয়েছেন—অবশ্য সেটা পুরোপুরি মনস্তত্ত্বের শর্ত পূরণ করেনি বলেই আমাদের মনে হয়।

নারীত্বের যে অভিমান 'গতিহারা জাহ্নবী'র কিশোরীকে অপদার্থ অকিঞ্চনের জীবন থেকে সরিয়ে দিয়েছিল, ঠিক একই কারণে শরীর সর্বস্ব সাতকড়ির কবল থেকে চিরমুক্তি চেয়েছিল অহং-এর অধিকারী স্ত্রী মাখন। সাতকড়ি যেন অকিঞ্চন নামক মুদ্রার ভিন্ন পিঠ। গৃহে মাখনের মতো স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সে ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে মধুডাঙ্গার মেলায় একাকিনী বিধবা যুবতীকে নিয়ে পৈশাচিক কৃতকর্মের অপরাধে দেড় বছরের জন্য জেলে গিয়েছিল। জেল থেকে ফিরে এলে বাড়ীর সকলেই তাকে সসম্মানে গ্রহণ করে। কিন্তু স্ত্রী মাখন নোংরা আবর্জনার পঙ্কে নিমজ্জিত স্বামীর কাছে যেতে পারেনি। প্রবল ঘৃণা তাকে দূরে সরিয়ে এনেছে। এর জন্য শাশুড়ি তাকে বাড়ী থেকে চিরতরে বের করে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কলঙ্কিত তীর্থ মুক্ত হয়ে ত্রিলোকপতির সাথে মাখন এক শান্তির স্বর্গ রচনা করে পুনর্জীবনে ফিরে গেছে। সেই মিলন মুহূর্তটি রচনা করেছেন লেখক মন্দিরে দু'জনের কথোপকথনের মধ্যদিয়ে—

''ত্রিলোক বলিল,—বলো, দেবতা সত্য।

মাখন বলিল,—দেবতা সত্য।

— ধর্মের বিগ্রহ ইনি।

— ধর্মের বিগ্রহ ইনি।

— সমুদয় সৃষ্টি ইঁহার।

— সমুদয় সৃষ্টি ইঁহার।

— আমাদের অন্তর এই দেবতা নিরন্তর নিরীক্ষণ করিতেছেন।

— আমাদের অন্তর এই দেবতা নিরন্তর নিরীক্ষণ করিতেছেন।

— ইঁহার গোচরে আমরা বিবাহিত হইলাম।

— ইঁহার গোচরে আমরা বিবাহিত হইলাম।

— চিরকাল প্রেমদান করিব।

— চিরকাল প্রেমদান করিব।"[৬৩]

আদর্শায়িত ভঙ্গিতে হলেও নরনারীর চিরন্তন সম্পর্কের সেতুবন্ধন যে বিবাহ তা এখানে লেখক তুলে ধরেছেন। অদস্ মুক্ত এক সুন্দর জীবনের মননের বার্তা ধ্বনিত হয়েছে দুজনের মন্ত্রোচারণের মধ্য দিয়ে। এইভাবে জগদীশবাবু তাঁর উপন্যাসের চরিত্রদের মনোলোকে অবগাহণ করে একজন সুনিপুণ মনস্তত্ত্ববিদের মতো মনের আনাচে কানাচে বিচরণ করেছেন। এখানেই তাঁর অনন্যতা। তাঁর সম্পর্কে হাসান আজিজুল হক লিখেছেন—

"...জগদীশ গুপ্ত দেখাতে চান একান্ত জান্তব তাড়না সম্পূর্ণত অন্ধ ও সংকীর্ণ এবং এইটের উপর ভর করেই মানুষ ও জীব এক সোপানে দাঁড়িয়ে আছে। এরকম একটা অবস্থার মধ্যে মানুষকে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করার ফলে জগদীশ গুপ্তের লেখায় যৌনতা, প্রতিহিংসা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি এত প্রাধান্য পেয়েছে।"[৬৪]

তথ্যসূত্র :

১. জগদীশ গুপ্ত : আবুল আহসান চৌধুরী, বাংলা একাডেমী ঢাকা, পৃ. ৬১।

২. পাশ্চাত্ত্য দর্শন, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, ষোড়শ সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃ. ২৯৮।

৩. ফ্রয়েড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৯০, পৃ. ২৮।

৪. প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, অমৃত লোক সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৬, পৃ. ২০৬।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭।

৬. জগদীশ গুপ্তের কথাসাহিত্য : ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের আলোকে, বেস্ট বুক্স্, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ১৩।

৭. রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ. ৩৭৩।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

৯. আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৭২।

১০. জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, বসুবতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, পৃ. ৯৩।

১১. উপন্যাসে তমসাবৃত জীবন : নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৪৩।
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬।
১৮. জগদীশ গুপ্তর গল্প, সুবীর রায় চৌধুরী সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৭৭।
১৯. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রা. লি., পৃ. ১৫৫।
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯।
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০।
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২।
২৪. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, তথ্যপঞ্জী ও গ্রন্থ পরিচয় অংশ, গ্রন্থালয় প্রা. লি., পৃ. ৬৩৮।
২৫. রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ. ৯৭।
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।
২৭. প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৫।
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।
৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২।

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২।

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫।

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪।

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪।

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪।

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫।

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

৫১. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রা. লি., পৃ. ২৭০।

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭।

৫৩. বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০৮, পৃ. ২৮৪।

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯।

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯।

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮।

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

৬২. দুষ্প্রাপ্য জগদীশ গুপ্ত, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা : রাজীব চৌধুরী, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১১৫।

৬৩. কলঙ্কিত তীর্থ, শ্রী বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ. ৬১।

৬৪. কথাসাহিত্যের কথকতা, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ৮৮।

সপ্তম অধ্যায়

উপন্যাসের আঙ্গিক ও ভাষা : একটি স্বতন্ত্র নিরীক্ষা

"সচেতন পাঠক হিসেবে যখন পড়ি, আসলে আমরা তখন লিখি, বা বলা ভালো, পুনর্লিখন করি। লেখকের পরিসরকে সর্বগ্রাসী বলে মানি না কিছুতেই, পড়ুয়ার পরিসরকে নিরন্তর প্রসারিত করে চলি। কেননা তাৎপর্যে পৌঁছাতে হবে আমাদের; একক পাঠে এই প্রক্রিয়া শেষ হয় না বলে পুনঃপাঠের পরম্পরা চলতে থাকে। পর্ব থেকে পর্বান্তরে কাল থেকে কালান্তরে, এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে।"[১]

বস্তুত সাহিত্য পাঠ একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া। এক প্রজন্মের পাঠকের সঙ্গে অন্য প্রজন্মের পাঠকের মধ্যে একই রচনা ভিন্ন আবেদন নিয়ে দেখা দেয়। সেই আবেদনে পূর্বসূরীকে পুরোপুরি অস্বীকার করে নতুন কোন বার্তা পাঠক দিয়ে থাকেন, অথবা পূর্বসূরীর মতকে স্বীকৃতি দিয়ে অতিক্রমণের একটা শিল্পীত প্রয়াস থাকে। হুবহু পূর্বসূরীর বিবৃতির ফটোগ্রাফী নির্মাণ করা সচেতন সাহিত্য পাঠকের ধর্ম নয়। সাহিত্য বিস্তৃত শাখা-প্রশাখার মধ্যে এই পাঠক প্রতিক্রিয়া উপন্যাস পাঠের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। শুধু পাঠক পরম্পরা নয় লেখকের সঙ্গেও পাঠকের ভাবনার একটা দুস্তর ব্যবধান রচিত হয়ে যায়। সেজন্য সমকালে পাঠকের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে শিল্পোচিত আলোচনার পরিসর পেতে পারে অনায়াসেই। তাই লেখক থেকে পাঠক, পাঠক থেকে উত্তরকালের পাঠকের মধ্যে একটি সচেতন দৃষ্টিভঙ্গিগত দূরত্ব অনিবার্যভাবে তৈরী হয়ে যায়। যেহেতু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের দেখার চোখ বদলে যায়। স্বভাবতই কোনো রচনা পড়তে পড়তেই মনের মধ্যে একটা কথন-বিশ্ব তৈরী হয়ে যায়। ধরা যাক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজসিংহ' উপন্যাসটির কথা। ১৮৭৮ সালে উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ছয় মাস ধরে প্রকাশের পর তা বন্ধ হয়ে যায়। গল্প অসম্পূর্ণ থাকে। তিন বছর পরে ১৮৮২ সালে পুস্তকাকারে এটি প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এটিকে উপন্যাস না বলে 'ক্ষুদ্রকথা' বলেছিলেন। প্রথম সংস্করণে পৃষ্ঠা ছিল ৮৩। পরে ১৮৯৩ সালে চতুর্থ সংস্করণে এর কলেবর বৃদ্ধি করে করা হয় ৪৩৪ পৃষ্ঠা। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই চতুর্থ সংস্করণেই

এটি উপন্যাসের আকার পায়। পরবর্তীকালে ১৯৯৮ খ্রীঃ শতবর্ষ অতিক্রম করে একজন সমালোচক—পাঠক উপন্যাসটি নিয়ে তাঁর মত করে আলোচনা করলেন। সেই আলোচনা থেকে সরে এসে ২০১৭ সালে যদি আরেকজন সচেতন পাঠক উপন্যাসটির পুনঃপাঠ ও আলোচনা করেন তাহলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র হতে বাধ্য। এইভাবে সাহিত্যের সমালোচনা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় এবং সেই বদলে যাওয়া সময়ের নিরীখে রচয়িতার এবং তাঁর রচনার পুনর্মূল্যায়ন হয়ে যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের উত্তরসূরী এবং কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের চাইতে কিছুটা বয়ঃজ্যেষ্ঠ জগদীশগুপ্ত যখন সাহিত্য ক্ষেত্রে এলেন তখন স্বভাবতই তিনি তাঁর মত করে একটি ক্ষেত্র রচনা করেছেন। সমকালের পাঠকের কাছে তিনি নিন্দিত ও নন্দিত উভয়ই হয়েছেন। তাঁর রচনার মূল্যায়ন হয়েছে অথবা অংশত হয়েছে। সচেতন পাঠক হিসেবে তাই উত্তরকালে জগদীশগুপ্তের উপন্যাসগুলি পড়তে পড়তে পড়ুয়া হিসেবে আমাদের পরিসর নিরন্তর বেড়েছে। পুনঃপাঠে কোন রচনা সম্পর্কে পুরনো দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে। আবার সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বীকৃতি দিয়েও নতুন কিছু বলার তাগিদ অন্তরে অনুভূত হচ্ছে। তিনি তাঁর জীবিতকালে (১৮৮৬-১৯৫৭) মাত্র কয়েকটি উপন্যাস লিখে গেছেন। প্রথম উপন্যাস 'অসাধু সিদ্ধার্থ' (১৯২৯) এবং শেষ উপন্যাস 'কলঙ্কিত তীর্থ' (১৯৬০) তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময়কালের মধ্যে তার রচিত উপন্যাস মাত্র ১৭টি। এই স্বল্প সংখ্যক রচনার মধ্যেই ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি তাঁর স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় রেখে গেছেন।

জগদীশগুপ্তের নিজের রচনা সম্পর্কে তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গির বিক্ষিপ্ত কিছু পরিচয় প্রথমেই আলোচনা করা যেতে পারে—

■ কুষ্ঠিয়া থেকে ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে 'কালিকলম' পত্রিকার সম্পাদক মুরলীধর বসুকে একটি চিঠিতে জগদীশ গুপ্ত লিখেছিলেন—

"যে বইখানা আপনাকে পড়িতে দিয়াছি ওখানা ঠিক নাটক নয়, কি যে তাহা পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন। ঐ স্বপ্নের গল্পটা ছাড়া আরও একটি গল্প লিখিয়াছি। আপনার কাজের ভার একটু হাল্কা হইয়াছে যখন মনে হইবে, তখন পাঠাইব। গল্পটি ভালই হইয়াছে বলিয়া মনে

হয়।...

উপন্যাস লেখা আমার পক্ষে দুরূহ—অসম্ভবই।"[২]

■ খিদিরপুর, কলকাতা থেকে ৭ই জানুয়ারী ১৯২৭ খ্রীঃ মুরলীধর বসুকে একটি চিঠিতে লিখেছেন—

"... এইবার আপনার সঙ্গে আমার যথার্থ মতানৈক্য ঘটিল। গল্পটি আদৌ Stale হয় নাই।—প্রেম নয়, ত্যাগ নয়; শুধু, সুবর্ণের লোভের ভিতর দিয়া, সামান্য ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া, ব্যক্তি যতটা সম্ভব ফুটিতে পারে, তাহা ফুটিয়াছে। ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া ঘটনা এবং তাহার পরিণতিকেই যদি প্রাধান্য দেওয়া যায়, তবে গল্প হিসাবে খুব দোষের বলিয়া আমার মনে হয় না। আপনারা যাহাকে 'বিস্বাদ' বলিতেছেন, সেটা গল্পের বিস্তৃতি।"[৩]

■ 'রোমন্থন' উপন্যাসের 'ভূমিকা' অংশে জগদীশবাবু লিখেছেন—

"ইহাতে 'প্লট্' নাই আমার বক্তব্য ব্যক্ত করিয়াছি মাত্র; গল্প তৈরী আমার উদ্দেশ্য নয়।

উপন্যাস সুলভ গল্পের বস্তুসংস্থান বা পরিপুষ্টি ইহাতে নাই।..। ঘটনাগুলিও পরস্পর বিচ্ছিন্ন, কিন্তু একস্থানে যাইয়া ফল প্রসব করিতেছে। ঘটনার কল্পনায় গভীরতা থাক্ আর নাই থাক্, পল্লীর সঙ্গে মনের নিবিড় আত্মীয়তা জন্মিবার পক্ষে তাহা সুদূরাগত বা প্রত্যক্ষ অন্তরায় হইতে পারে কিনা তাহাই বিবেচ্য।

উপন্যাস বা গল্পের সংজ্ঞার অধীনে আনিয়া হইাদের বিচার না করিয়া প্রবন্ধ হিসাবেই যদি কেহ ইহাদের বিচার করেন তবে আমি বিস্মিত হইব না।"[৪]

■ জগদীশ গুপ্তের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় তাঁর শেষ উপন্যাস 'কলঙ্কিত তীর্থ' (১৯৬০)। উপন্যাসটির ভূমিকা লিখেছিলেন শ্রী বিশু মুখোপাধ্যায়। 'ভূমিকা' অংশে তিনি জানিয়েছেন, উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি বহুকাল পূর্বে লেখক দিয়েছিলেন কোনো একজন প্রকাশককে। সেজন্য তিনি কিছু অগ্রিম টাকাও নিয়েছিলেন। ঐ প্রকাশক উপন্যাসটির কলেবর বৃদ্ধির জন্য এবং অংশ বিশেষ অপেক্ষাকৃত রসঘন করে তোলার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু লেখক সরাসরি সেই আবেদন অগ্রাহ্য করে দিয়ে মুখের উপর বলেছিলেন—

''উপন্যাস যেখানে যখন সমাপ্ত হওয়া প্রয়োজন এবং যে ঘটনা বিস্তারের যতটুকু ক্ষেত্র আছে, তার বেশী কোন ফরমাশী লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।''[৫]

লেখকের নিজের রচনা প্রসঙ্গে মন্তব্যগুলিকে পরপর সাজালে দাঁড়ায়—

প্রথমত : তিনি ছোটগল্প রচনা বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু উপন্যাস রচনা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় : গল্পের প্রকৃতি নিয়ে এতোটাই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে তা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে বিতর্কে যোগ দিয়েছেন।

তৃতীয় : উপন্যাস রচনার একটি ধারা রয়েছে। সেটিকে ছুঁতে পারেনি তাঁর উপন্যাস। এটিকে উপন্যাস হিসেবে ব্যাখ্যা না করে 'প্রবন্ধ' হিসেবে দেখার কথা লেখকক জানিয়েছেন।

চতুর্থত : নিজের উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর প্রবল আত্মবিশ্বাস ছিল। তিনি প্রকাশক সম্পাদক বা অন্য কারও পরামর্শে তাঁর রচনার আকারও প্রকৃতি পরিবর্তন করতে বাধ্য নন।

অভিমতগুলোর বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি, যেকোন সকল উপন্যাস রচয়িতা (ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে) প্রথমে ছোটগল্প লিখে তাঁর শিল্প কুশলতা বৃদ্ধি করেছেন। রবীন্দ্রনাথও এই ধারার ঔপন্যাসিক। তিনি তাঁর 'চোখের বালি' উপন্যাসের 'সূচনা' অংশে এবিষয়ে লিখেছিলেন—

''...সেদিনের আসর ভেঙ্গে গেছে, নতুন সম্পাদককে রাস্তার মোড় ফেরাতেই হবে। সহ-সম্পাদক শৈলেশের বিশ্বাস ছিল, আমি এই মাসিকের বর্ষব্যাপী ভোজে গল্পের পুরো পরিমাণ জোগান দিতে পারি। অতএব কোমর বাঁধতে হবে আমাকে। এ যেন মাসিকের দেওয়ানি আইন অনুসারে সম্পাদকের কাছ থেকে উপযুক্ত খোর-পোশের দাবি করা। বস্তুত ফরমাশ এসেছিল বাইরে থেকে। এর পূর্বে মহাকায় গল্প সৃষ্টিতে হাত দিই নি। ছোটো গল্পের উল্কা বৃষ্টি করেছি।''[৬]

জগদীশবাবুও কোমর বেঁধে নেমেছিলেন। এবং চিঠিটি লেখার মাত্র তিন বছরের মধ্যেই তাঁর

প্রথম উপন্যাস 'অসাধু সিদ্ধার্থ' (১৯২৯) প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটি পাঠ করেই রসজ্ঞ পাঠক বুঝতে পারেন লেখক ছোটোগল্পের উল্কাবৃষ্টি করার পাশাপাশি প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন উপন্যাস রচনার। এবং উপন্যাস হিসেবে এটির সাফল্য প্রশ্নাতীত। প্রসঙ্গত কয়েকজন প্রথিতযথা সমালোচকের অভিমত গ্রহণ করা যেতে পারে—

■ ''... ব্যক্তি, কাহিনীর বুনট, জীবনকে সামগ্রিকভাবে দেখার ক্ষমতা এবং চরিত্রকে পূর্ণাঙ্গ পরিস্ফুট করার প্রবণতায় এটিকে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের সম্মান দেওয়াও আমার মতে অযৌক্তিক নয়।''[৭]

■ ''অসাধু সিদ্ধার্থ জগদীশ গুপ্তের সবচেয়ে পরিচিত ও বহু পঠিত উপন্যাস; আর এই উপন্যাসটি দিয়েই শুরু হয়েছে বাংলা কথাসাহিত্যে নতুন যুগের।''[৮]

■ ''প্রথাসিদ্ধ উপন্যাস শৈলীর বিচারে তাঁর উপন্যাসগুলির বিচ্যুতি রয়েছে। কিন্তু যে স্বতন্ত্র জীবনবোধের দ্বারা তিনি এই প্রবহমান জীবনযাত্রাকে বুঝবার এবং ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন, সে উপলব্ধির মাধ্যম হিসাবে এরকম উপন্যাস শৈলীর ব্যবহার সার্থক। ... লঘুগুরু, রতি ও বিরতি, অসাধু সিদ্ধার্থ, গতিহারা জাহ্নবী, নন্দ আর কৃষ্ণা, সুতিনী, মহিষী, তাতল সৈকতে প্রভৃতি উপন্যাস এই শ্রেণীতে পড়ে।''[৯]

অভিমতগুলি থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, জগদীশবাবু একেবারে প্রথম উপন্যাসেই নিজেকে সার্থক ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। লেখক যে নিজেকে ধীরে ধীরে তৈরী করেছেন, তাঁর আত্মপ্রত্যয়ের গ্রাফ প্রতিদিন একটু একটু করে বেড়েছে, এটা সম্পাদকের সঙ্গে নিজের গল্পের প্রকৃতি নির্ণয় নিয়ে যে ঠাণ্ডা লড়াই তা থেকেই অনায়াসেই আমরা বুঝতে পারি। এবং এই আত্মপ্রত্যয় তাঁকে গতানুগতিক উপন্যাসের Form ভেঙ্গে নতুনভাবে গল্প বলার ক্ষেত্রে প্রেরণা জুগিয়েছে। আসলে ততদিনে পুরনো ছক ভেঙে নতুন ভাবে গল্প বলার প্রবণতা লেখককে ঘিরে ধরেছে। এবং একজন সৃষ্টিশীল লেখকের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। পুরনো পথ ছেড়ে 'নতুন সম্পাদককে রাস্তার মোড় ফেরাতেই হবে।' সেজন্যে গল্প বলার আগেই এর 'প্লট' সম্পর্কে স্পষ্ট বার্তা দিয়ে দিলেন লেখক। ইদানিং কালে যে 'অ্যান্টি নভেলের' কথা বলা হয় জগদীশবাবুর উপন্যাসকে 'প্রবন্ধ' হিসেবে বিচার করার

বার্তায় তারই আভাস পাওয়া যায়। পরিণত বয়সে পৌঁছে তিনি ফরমাশী লেখার গণ্ডী যে ভাঙবেন এটাই তো স্বাভাবিক। যদিও কোনও কোনও সমালোচক এই দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেছেন। ড. ক্ষেত্র গুপ্ত এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

''জগদীশবাবু গল্প গড়তে জানতেন না। পুরনো রীতির অনুসরণ করলেও তার আকর্ষণী শক্তিকে কাজে লাগাতে পারেননি হয়ত চানও নি। না চাইলে সাহিত্যের অভিপ্রায় বিষয়ে তাঁর ভাবনায় গলদ ছিল। তবে পারেননি, এটাও ভুল নয়। 'মোর অধিকার সুন্দরের নাহি নাহি... কোথা পাব পুষ্পাসব ধুতুরা গেলাস ভরিয়া করেছি পান নয়ন নির্যাস।' এই যাঁর বোধ এবং তার সঙ্গে এক ধরণের একগুঁয়ে আন্তরিকতা যা কোনোরূপ আপোসে রাজি ছিল না। এতে তাঁর উপন্যাসের শিল্প মানের ক্ষতি হয়েছে।''[১০]

ড. গুপ্তের এই সমালোচনায় নিন্দা এবং প্রশংসা দুই-ই আছে। তবে একথা সত্যি জগদীশবাবু লিখে গেছেন আপন খেয়ালে। যশ-খ্যাতি-প্রতিষ্ঠার কথা তিনি কখনো ভেবেছেন বলে মনে হয় না। তাঁর জীবন অভিজ্ঞতাই তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে। ইচ্ছা পুরণের গল্প তিনি লিখতে পারেননি। এটাই তাঁর সবচয়ে বড় দুর্বলতা। উপন্যাস তথা কথাসাহিত্যের আঙ্গিকগত বিচারের আরেকটি দিক হল এতে প্লট না চরিত্র—কোন্‌টির গুরুত্ব থাকবে। কেউ বলেছেন প্লটের কথা, আবার কেউ চরিত্রের কথা। জগদীশবাবুর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বলেছিলেন তাঁকে কোনদিন প্লট নিয়ে ভাবতে হয়নি; তিনি একটি চরিত্রকে নিয়ে কাহিনী বলতে শুরু করতেন এবং পরে প্লট একাকী দাঁড়িয়ে যেত। অ্যারিস্টটল তাঁর ' পোয়েটিক্‌স্' গ্রন্থে ট্রাজেডির আলোচনায় আবার প্লটকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। জগদীশবাবু তাঁর 'রোমন্থন' উপন্যাসের ভূমিকায় স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন সেখানে প্লট নেই। কতগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা একস্থানে গিয়ে ফলপ্রসব করছে। অর্থাৎ সেখানে ঘটনাগুলির কোলাজই কাহিনীতে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। আবার একটি চিঠিতে তিনি 'কালিকলম' পত্রিকার সম্পাদক মুরলীধর বসুকে লিখেছেন—

''কথাসাহিত্যে কথাকে প্রাধান্য না দিয়া, শুধু তাহাকে চরিত্র ফুটাইবার অবলম্বন রূপে ব্যবহার করিলে সে ক্ষুন্ন হয়, অর্থাৎ কথা আর কথা থাকে না, বক্তৃতায় দাঁড়াইয়া যায়।''[১১]

এই চিঠির বক্তব্য থেকে পরিস্কার যে, তিনি চরিত্র পরিস্ফুটনকেই কথার সাহিত্যের প্রধান

লক্ষণ বলে বিবেচনা করতেন না। আবার 'বক্তৃতা' যে 'কথা' নয় সেটাও তিনি বলেছেন। তবে 'কথা' শব্দটির দ্বারা তিনি কী বুঝিয়েছিলেন। এবিষয়ে উত্তর সন্ধানের প্রয়াস করেছেন সমালোচক ড. সুমিতা চক্রবর্তী। তিনি প্রসঙ্গত লিখেছেন—

" 'কথা' বলতে কী বুঝিয়েছিলেন তিনি? নিশ্চিতভাবেই 'শব্দ' বা 'words' কিংবা 'বাক্য' বা 'sentence' বোঝান নি। 'কথাসরিৎসাগর'-এর দেশ ভারতবর্ষের লেখক হলেও জগদীশ গুপ্ত সম্ভবত 'গল্প' বা 'story' অর্থে 'কথা' শব্দটির প্রয়োগ করেন নি। যদিও আজও হিন্দী ভাষায় 'কথা' শব্দটির অর্থ গল্পই। পূর্ব বাংলার 'পরণ-কথা', এই বাংলার 'রূপকথা', 'উপকথা' ইত্যাদি শব্দ বন্ধেও লেগে আছে পুরনো অর্থটির রেশ। আধুনিক বাংলার 'কথাসাহিত্য' শব্দটিতেও সেই অর্থেরই প্রচ্ছা। ... তাঁর পত্রোল্লিখিত 'কথা' শব্দটির নিহিত অর্থ ব্যঞ্জনা হল মানব প্রকৃতি সম্পর্কে শিল্পীর স্বকীয় উপলব্ধিজাত জীবন ভাষ্য।"[১২]

এখানেই লেখকের বক্তব্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। তবে উপন্যাসের সঙ্গে 'story'-র সম্পর্ক উপন্যাস রচনার একেবারে সূচনা লগ্ন থেকেই। সে প্রাচ্য বা পাশচাত্য সাহিত্য যাই হোক না কেন। যেমন পাশচাত্য তাত্ত্বিক ই. এম. ফর্স্টার খুব স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়েছেন—

"We shall al agree that the fundamental aspect of the novel is its story telling aspect, but we shall voice our assent in different tones, and it is on the precise tone of voice we employ now that our subsequent conclusions will depend."[১৩]

এই অভিমত থেকে স্পষ্ট যে উপন্যাসে 'story-telling' থাকতেই হবে। এদেশে বঙ্কিমচন্দ্রও উপন্যাস কথাটির অর্থ করতে গিয়ে 'রচা কথা'র উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর পরে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের উপন্যাস সাহিত্যেও 'গল্প নির্ভর' কাহিনী বর্ণনার ধারা লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের সমাজ ভাবনা থেকে শুরু করে মানবচরিত্র বিশ্লেষণ—সবক্ষেত্রেই তাঁরা উপন্যাসে এই 'গল্প' বলার চেষ্টা করেছেন। এমনকি উপন্যাসের আধারে তত্ত্বকথা বলতে গিয়েও তাঁরা তাঁদের এই অবস্থান থেকে সরে আসেননি। প্রসঙ্গত বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বের আলোকে লেখা 'আনন্দমঠ-দেবী চৌধুরাণী-সীতারাম'-উপন্যাস ত্রয়ী, রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' এবং শরৎচন্দ্রের 'শেষ-প্রশ্নের' মতো উপন্যাসের কথা উল্লেখ করা যায়। তাঁদেরই উত্তরসূরী জগদীশ

গুপ্তও উপন্যাসে মানব জীবনের বিচিত্র দিক, বিশেষ করে আচরণের আড়ালের যে কুটিল মানুষ, তাদের অন্তর্গত খলতা-ক্রুরতা-নিষ্ঠুরতা-কামুকতা-পাপাচার ইত্যাদিকে তুলে আনতে গিয়ে নিজের মতো করে একটা শিল্পীত জীবন ভাষ্য রচনা করেছেন। তবে তিনি নিছক কাহিনীর জন্যে কাহিনী নির্ভর 'প্লট' রচনা করেন নি। এক্ষেত্রেও তাঁর স্বকিয়তা লক্ষ্য করেছেন ড. সুমিতা চক্রবর্তী। তিনি লিখেছেন—

''একান্ত কাহিনি-নির্ভর কোনো প্লট নির্মাণের ইচ্ছে তাঁর যেমন ছিল না তেমনি বিশেষভাবে কাহিনি আধার যে তিনি ভাঙতেই চেয়েছিলেন- তাও নয়। এজন্যই কখনো তাঁর হাতে গড়ে উঠেছে কার্যকারণ শৃঙ্খলা পরম্পরা অস্বীকার করা আপাত শিথিল জীবন চিত্র—যেমন দেখেছি লঘুগুরু উপন্যাসে।''[১৪]

ড. চক্রবর্তী 'লঘুগুরু'র প্লটকে শিথিল বলেছেন। তবে গণিকার জীবন বৃত্তের নিরীখে যদি উপন্যাসটিকে বিচার করা যায় তাহলে কিন্তু একটা পরম্পরা আমরা লক্ষ্য করি। গণিকা নারী উত্তম বহু পুরুষ চারিণী হলেও তার অন্তরে একটি সুপ্ত গৃহী নারী সত্তা ছিল। যদিও কেউ কেউ উত্তমের পূর্ব জীবনের ইতিহাসকে উল্লেখ না করার জন্য সমালোচনা করেছিলেন। এই দলে ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। 'পরিচয়' পত্রিকায় 'পুস্তক পরিচয়'-এ এবিষয়ে তিনি স্পষ্টতই অভিযোগের ভঙ্গীতে লিখেছিলেন—

''...এককালে উত্তমের সমাজ বিশ্বম্ভরের সমাজের চেয়ে শিক্ষায়, আচরণে উপরের স্তরের ছিল। সেটাও লেখকের জবানবন্দীর উপর বিশ্বাস করে ধরে নিতে হয়। উত্তমের এই দিককার ছবিটা একেবারে বাদ দিয়েই শুরু করা হয়েছে। উত্তম যদি সাধারণ বেশ্যার মতোই হত, তাহলে পাঠকের কল্পনার উপরে বরাৎ দিয়ে ইতিহাস অসম্পূর্ণ রাখলে কোনো অসুবিধা ঘটত না।''[১৫] রবীন্দ্রনাথ কথিত এই সমালোচনায় 'সাধারণ বেশ্যার মতো হত' —এই কথাটিতে অসঙ্গতি রয়েছে। বেশ্যার সাধারণ বা অসাধারণ বলতে তিনি ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছিলেন? সেইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই গল্পটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখকের সমাজজীবন অভিজ্ঞতার উপরেও ব্যঙ্গবাণ মেরেছিলেন। তাঁর পরিচিত জগতে এমন ঘটনা সম্ভব নয় বলে তিনি মনে করেছিলেন। লেখক নিশ্চয়ই 'অনতি পরিচিতের সন্ধানে রাস্তা ছেড়ে কাঁটাবন পেরিয়ে ও

জায়গায় উঁকি মেরে এসেছেন’ বলে মন্তব্য করেছিলেন। এইভাবে রচনাকে ছেড়ে লেখককে আক্রমণ করাটা আসামীকে ছেড়ে তার জনককে আক্রমণ বলে মন্তব্য করেছিলেন জগদীশবাবু। সেইসঙ্গে তিনি স্পষ্ট করেই বলেছিলেন—

“লোকালয়ের যে চৌহদ্দির মধ্যে এতকাল আমাকে কাটাইতে হইয়াছে যেখানে ‘স্বভাব সিদ্ধ ইতর’ এবং ‘কোমর বাঁধা শয়তান’ নিশ্চয়ই আছে; এবং বোলপুরের টাউন প্ল্যানিং-এর দোষে যাতায়াতের সময় উঁকি মারিতে হয় নাই, ‘ও জায়গা’ আপনি চোখে পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি আমার আপত্তি এই যে, পুস্তকের পরিচয় দিতে বসিয়া লেখকের জীবনকথা না তুলিলেই ভাল হইত, কারণ উহা সমালোচকের ‘অবশ্য দায়িত্বের বাইরে’ এবং তাহার ‘সুস্পষ্ট প্রমাণ’ ছিল না।”[১৬]

এরকম ‘ঠাণ্ডা লড়াই’য়ের ইতিবাচক পরিণতি অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কথাতেই ব্যক্ত হয়েছে। তিনি এই সমালোচনার শুরুতেই মেনে নিয়েছিলেন, লেখকের অর্থাৎ জগদীশবাবুর লেখার ক্ষমতা আছে। এর পরিচয় রবীন্দ্রনাথ আগেও পেয়েছেন এবং এই উপন্যাসের ক্ষেত্রেও দেখতে পাচ্ছেন।

ড. সুমিতা চক্রবর্তীর বক্তব্যে ফিরে যাই। তিনি ‘লঘুগুরু’র কাহিনীকে ‘আপাত শিথিল জীবন চিত্র’ বলেছেন। যদি গণিকা নারীর পরম্পরার দিক থেকে দেখা যায় তাহলে বলব, উত্তম থেকে টুকী মাঝে সুন্দরী—গণিকা নারীর এক ধারাবাহিক এবং পূর্ণবৃত্ত জীবনচিত্র অংকন করেছেন লেখক। এবং এই বৃত্তাঙ্কনে লেখকের মানব প্রকৃতি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট উপলব্ধি জাত জীবনভাষ্য প্রকাশ পেয়েছে। তা হল ‘স্বভাব সিদ্ধ ইতর’ বিশ্বম্ভর আর ‘কোমর বাঁধা’ শয়তান পরিতোষের মত পুরুষরা নারীদের কখনোই ভোগ্যবস্তুর উর্ধ্বে স্থান দেয়নি। সমাজ তার নিজের প্রয়োজনেই গৃহী নারীকে গণিকা বানায়। তাদের পরিচয় সমাজের অন্ধকার দিকটিতেই হারিয়ে যায় বারবার। তাই যূথী থেকে বনমালা আর বনমালা থেকে উত্তম হয়েছে এবং উত্তমেরই করুণ পরিণতি টুকীর পাপের পথে নেমে যাওয়া। ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে উত্তমের গৃহী নারীসত্তার বিসর্জন হয়ে গেছে বিশ্বম্ভর পরিতোষ আর অচিন্ত্যদের মতো পুরুষের জৈবিক ক্ষুধা মেটাবার প্রয়োজনে। এভাবে দেখলে কিন্তু একটা পরম্পরাগত যোগসূত্র

খুঁজে পাওয়া যায়। তবে ‘লঘুগুরু’ সম্পর্কে ড. চক্রবর্তী শৈথিল্যের প্রশ্ন তুললেও ‘অসাধু সিদ্ধার্থ’ উপন্যাসটি সম্পর্কে বলেছেন—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অনিবার্য ঘটনামালার গাঢ় বিন্যাসে জমাট প্রায় গোয়েন্দা গল্পের প্লট রয়েছে। অথচ দুটি উপন্যাসই লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে বলে ড. চক্রবর্তী অভিমত প্রকাশ করেছেন। এইভাবে লেখকের স্বতন্ত্র সন্ধান ও আঙ্গিকের মূল্যায়ন করে ড. চক্রবর্তী লিখেছেন—

“বাস্তব মানুষের অনুরূপ ‘জীবন্ত’ চরিত্র নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা থেকে তাঁর চরিত্রায়ণ নয়, আবার চরিত্রটিকে বিশেষভাবে অদ্ভুত বা রহস্যময় করে তুলতেও চান নি তিনি। উপন্যাসের চরিত্রগুলির মনোবিশ্লেষণে তিনি অত্যন্ত সফল কিন্তু তাঁর সৃষ্ট চরিত্রেরা অন্তর্মুখ ধরণের নয়।”[১৭]

জগদীশবাবুর উপন্যাসের চরিত্রেরা আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক যাদের অন্তর্গত দারিদ্রজনিত যাবতীয় লক্ষণগুলো লেখক সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন, এমন স্বীকৃতি দিয়ে ড. চক্রবর্তী তাঁর আলোচনার অন্য একটি অংশে জানিয়েছেন—

“ ‘অভাবে স্বভাব নষ্ট’ হয় একথা মানুষ চিরকালই জানে। বঙ্কিমচন্দ্র মন্বন্তর-নির্জিত গ্রামবাসীর লুঠেরায় পরিণত হওয়া অনেকবার দেখিয়েছেন। ‘আনন্দমঠ’ এর সেই অংশটি ভোলা শক্ত যেখানে দীর্ঘ অনাহারী মানুষগুলি শিশু শরীর আগুনে ঝলসে খাবার কল্পনায় লোলুপ হয়ে ওঠে। কিন্তু বঙ্কিম এই বিষয়টিকে সবিস্তার বিশ্লেষণের গুরুত্ব দিয়ে উপন্যাস রচনা করেন নি। একাজটা বোধহয় বাংলা সাহিত্যে প্রথম করেছেন জগদীশ গুপ্তই। যদিও সব রচনায় নয়।”[১৮]

এভাবেই একজন মননশীল পাঠক ও সমালোচকের পুনঃপ জগদীশ গুপ্তের মৌলিকত্বের প্রমাণ হয়ে গেছে। যদিও সমালোচক ‘বোধহয়’ শব্দটি দ্বারা সংশয় যেমন প্রকাশ করেছেন, তেমনি লেখকের সব রচনাকে এর অন্তর্ভুক্ত করেননি।

ড. ক্ষেত্র গুপ্ত তাঁর মননশীল আলোচনায় বাংলা উপন্যাসকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—

- ঘটনামূলক, নাট্যরীতি-ভিত্তিক কাহিনী বিন্যাস ও চরিত্র রচনা।
- প্রাত্যহিক বিবরণধর্মী নিস্তরঙ্গ কাহিনী—জীবন ও মন। মনের সবটাই উপরতলার

প্রত্যক্ষতা।

■ অন্তশ্চেতনায় ডুব দিয়ে মনের লুকনো জটের খোঁজ ও বিশ্লেষণ।

এই শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে জগদীশগুপ্তের উপন্যাসগুলোর অবস্থান নির্ণয় করে লিখেছেন—

"... জগদীশবাবু এই তৃতীয় মডেলের লেখক। যে কোনো মডেলেই উঁচু মানের লেখক আসতে পারেন। তবে এই তৃতীয় রীতিটি মিশ্র আকারে প্রকাশ পেলেও বাংলা উপন্যাসে একান্ত হয়ে ওঠেনি আগে, নরেশবাবুর কিছু লেখা বাদ দিয়ে। সেদিক থেকে জগদীশবাবুর বিশেষ স্থান আছে বাংলা নভেলের ইতিহাসে।"[১৯]

এখানেও জগদীশবাবুর মৌলিকত্বের স্বীকৃতি রয়েছে। যদিও ড. গুপ্ত লেখকের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে সমালোচনা করেছেন। এরূপ সমালোচনা করেও অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু সেই অন্ধকারের ভিতরেও ক্ষণপ্রভার আভাস পেয়েছিলেন। এবং তার নিরীখে জগদীশবাবুর শিল্প সৃষ্টির প্রশংসাই করেছেন—

"জীবনের অন্তর্নিহিত শুদ্ধিভবনের শক্তিকে দুঃখবাদী জগদীশবাবু সর্বত্রই পরাভূত দেখেছেন। একটা শিল্পী জীবনের আদি অন্তে জীবনবোধের অপরিবর্তনীয়তা শিল্প এবং জীবন দুয়ের ন্যায়েই অসত্য। জগদীশ গুপ্তের দৃষ্টির এই অপরিবর্তনীয়তা অবশ্যই আমাদের পীড়া দেয়। কিন্তু তিনি কখনো জীবনের প্রচেষ্টাকে ছোট করে দেখেননি। শুদ্ধিভবনের জন্য জীবনের অমেয় প্রয়াসকে তিনি যদি ছোট করে দেখতেন তাহলে তাঁর পক্ষে শিল্প সৃষ্টিই সম্ভব হত না।"[২০]

আবার উপন্যাসের কাহিনীতে নাট্যকারের নির্লিপ্তি ছিল জগদীশবাবুর আদর্শ। সেজন্য তিনি উপন্যাসে যারপরনাই স্বল্পভাষী। ব্যক্তিগত জীবনেও এই স্বল্পভাষিতা তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। মাতৃবিয়োগ সম্পর্কে মুরলীধর বসুকে নানা কাজের কথার ফাঁকে লিখেছিলেন—

"মা স্বর্গারোহন করিয়াছেন।"[২১]

কোনোরকম দীর্ঘ ভূমিকা উপসংহার ছাড়া মায়ের মৃত্যু সংবাদ দিয়েছেন। এই বৈশিষ্ট্য তাঁর বিভিন্ন রচনাতেও আমরা লক্ষ্য করি। দু-একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়—

■ ‘‘অক্ষয় মরবে এবং রতি মঞ্জরী বিধবা হবে।’’[২২]

■ ‘দিবসের শেষে’ গল্পে পাঁচুর মৃত্যুদৃশ্য বর্ণনায় লিখেছেন—

‘‘সূর্যকে ভক্ষ্য নিবেদন করিয়া লইয়া কুম্ভীর পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গেল।’’[২৩]

■ ‘অসাধু সিদ্ধার্থ’ উপন্যাসের শেষে যখন ছদ্মবেশী নটবরের আসল রূপ বেরিয়ে পড়ে নকল সিদ্ধার্থকে ভালোবেসে অজয়া যেভাবে প্রতারিত হয়েছিল সেই যন্ত্রণা প্রকাশ করে অজয়া শুধু একটি বাক্যব্যয় করেছে। রজতকে সে বলেছে—

‘‘দাদা, ওঁকে যেতে বলো।’’[২৪]

■ ‘যথাক্রমে’ উপন্যাসের বামপ্রসাদের স্ত্রীর মৃত্যুর ঘটনা বর্ণনাতেও লেখক একটি বাক্যব্যয় করেছেন—

‘‘মৃদু স্রোতের মাঝে যমদণ্ড পড়িয়া স্রোত বাধা পাইয়া একদিন ফেনাইয়া উঠিল, স্ত্রীর মৃত্যু রামপ্রসাদের অন্তরে কঠিন ঘা দিল।’’[২৫]

■ ‘তাতল সৈকতে’ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শরৎ-এর স্বামীর মৃত্যু সংবাদ দিতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন—

‘‘শরৎ বিধবা হইল।’’[২৬]

■ ‘কলঙ্কিত তীর্থ’ উপন্যাসে নারীঘটিত অপরাধের ফলে জেল প্রত্যাগত সাতকড়িকে বাড়ীর সকলেই সাদরে গ্রহণ করেছে। কিন্তু স্ত্রী মাখন লম্পট স্বামীকে গ্রহণ করতে না পারলে শাশুড়ি সমাজপতির ভূমিকা নিয়ে মাখনকে বাড়ী থেকে বের করে দেয়। সেই শাস্তিদৃশ্য বর্ণনা করে লেখক জানিয়েছেন—

‘‘... ঘাড়ে ধাক্কা দিতে দিতেই তাহাকে বারান্দায় আনিলেন উঠানে নামাইলেন, উঠান পার করিলেন... বধূর ঘাড় হইতে হাত নামাইয়া সদর দরজার খিল খুলিলেন...’’[২৭]

এরকম অজস্র স্পল্পবাক্ বর্ণনা বিভিন্ন রচনায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এই স্বল্পভাষিতা বহুক্ষেত্রেই শিল্প রসোত্তীর্ণ হয়েছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখক আরেকটু অমিতব্যয়ী হলে পাঠকের পক্ষে ভালো হত। অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত ‘লঘুগুরু’ উপন্যাসটির ক্ষেত্রে মিতভাষিতার সমালোচনাকে অতিক্রম করেছেন। তিনি

স্পষ্টতই জানিয়েছেন, লেখকের এই স্বল্পভাষিতা কখনো কখনো তাঁকে ত্রুটির সীমায় উপনীত করেছে। কিন্তু যেসমস্ত ক্ষেত্রে লেখক সফল হয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম 'লঘুগুরু'র উত্তম চরিত্র। প্রসঙ্গত অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাটির প্রশংসা করে লিখিছেন—

"...টুকীর অন্ধকারে অন্তনের ভেতরে যেন প্রতিফলিত হল উত্তমের সাধনার অন্ধকারে বিলুপ্তি—যে সাধনা একমাত্র টুকি ছাড়া লালমোহন, বিশ্বম্ভর, পাড়া প্রতিবেশী, বিশ্বম্ভরের বন্ধুবান্ধব সকলের কাজ থেকে আঘাত পেয়েছে। কাম্য বিষয়ের স্পষ্টতায় এবং স্পষ্ট কামনার সঙ্গে প্রাক্তনের কর্মফলের সংঘাতে ব্যক্তির চূর্ণীকৃত রূপ রচনায় 'লঘুগুরু' অনুপম। 'লঘুগুরু' তাঁর প্রথম দিকের উপন্যাস হলেও সার্থকতায় বোধ করি জগদীশগুপ্তের সর্বোত্তম রচনা।"[২৮]

বস্তুত জগদীশবাবু যে অত্যন্ত সচেতনভাবেই তাঁর উপন্যাসের প্লট বিষয়ে নিজস্ব ভাবনা প্রকাশ করেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিভিন্ন সমালোচকের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা সেকথারই সমর্থন দেয়। যাঁরা মনে করেন জগদীশবাবু উপন্যাসের প্লট রচনার ব্যাপারে অমনোযোগী ছিলেন তাঁরা ঠিক বলেন না। বরং এবিষয়ে তিনি অতিরিক্ত সচেতন ছিলেন। 'রোমন্থন' উপন্যাসের ভূমিকা ছাড়াও 'দুলালের দোলা' এবং 'তাতল সৈকতে' উপন্যাসের নিবেদন অংশে নিজের অভিমত স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন।

■ 'দুলালের দোলা' উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন— "ইহাতে 'প্লট্' নাই আমার বক্তব্য ব্যক্ত করিয়াছি মাত্র; গল্প তৈরী আমার উদ্দেশ্য নয়। উপন্যাস সুলভ গল্পের বস্তু সংস্থান বা পরিপুষ্টি ইহাতে নাই।"[২৯]

■ 'রোমন্থন' উপন্যাসের ভূমিকায় বলা কথারই পুনরাবৃত্তিমাত্র এটি। আসলে নিজের রচনা সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন বলেই তিনি এই পুনরুক্তি করেছেন। প্রায় সমান্তরাল বক্তব্য আমরা পাই তাঁর 'তাতল সৈকতে' উপন্যাসের নিবেদন অংশেও। সেখানে তিনি তাঁর বক্তব্যকে আরও অকপটে ব্যক্ত করেছেন—

"এই গল্পটির রচনাপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। গল্পটিকে ঘটনাবহুল এবং দ্রুত গতিশীল করিয়াছি। পাত্র হইতে পাত্রান্তর অবলম্বন করিয়া কথা অগ্রসর হইয়াছে গতি পুনঃ পুনঃ পথচ্যুত হওয়ায় গল্পের অখণ্ডতা ভগ্ন হইয়াছে মনে হইতে পারে; সমাপ্তির

পূর্বে একটা সমগ্র মূর্তির আভাস পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না; তথাপি যে পাঠক রসতৃষ্ণা লইয়া যাত্রা করিবেন তাহাকে পথিমধ্যে বা প্রান্তে পৌঁছাইয়া নিরাশ হইতে হইবে না।

'বক্তব্য সংক্ষেপে বলো'—কথকের প্রতি মানুষের এই হুকুম চিরকাল আছে। রূপকে বিকল এবং রসপুঞ্জকে পঞ্চতিক্তে পরিণত না করিয়া সেদিক হইতে পাঠককে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছি।"[৩০]

যথেষ্ট সচেতন একজন শিল্পীর পক্ষে এভাবে নিজের রচনার প্রকৃতি সম্পর্কে পাঠককে পূর্ব থেকে অবহিত করা সম্ভব ছিল। এবং তিনি এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ সফল একজন শিল্পী ছিলেন। তাঁর এই দিকটির স্বতন্ত্রতা স্বীকার করে সমালোচক ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

"সাহিত্যে জীবনের কোনো নিটোল কাহিনী জগদীশগুপ্ত দেখান নি, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন জীবনের কোনো পরিপাটি ছক নেই। মানুষ অনেক পরিকল্পনা করে জীবনটাকে একটা কিছু বানিয়ে তুলতে চায়, কিন্তু মানুষের সমস্ত ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে ধুলিসাৎ করবার জন্য এক নির্মম অ-দৃষ্ট শক্তি উন্মুখ হয়ে আছে, যার ফলে মানুষের কোনো উদ্যোগই শেষপর্যন্ত সফল হয় না। সুতরাং সাহিত্যে কৃত্রিমভাবে একটি নিটোল জীবনবৃত্ত আঁকা অর্থহীন বলে তাঁর কাছে মনে হয়।"[৩১]

এখানেই জগদীশবাবু সকলের চেয়ে আলাদা। এটাই তাঁর স্বাতন্ত্র্য।

উপন্যাসের চরিত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে ড. উজ্জ্বল কুমার মজুমদার লিখেছেন—

"উপন্যাসের চরিত্র মাত্রেরই দুটি মাত্রা আছে। একদিকে সে বাইরের জীবনের প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত, অন্যদিকে সে অন্তর্জীবনের আলোড়নে আলোড়িত। এই দ্বিমাত্রিক গতিবিধি নিয়েই তার তথাকথিত 'চরিত্র' নামটি সার্থক। এই সূত্রেই 'সাহিত্যিক চরিত্র' 'বাস্তব চরিত্র' থেকে আলাদা হয়ে গেছে।"[৩২]

জগদীশগুপ্তের উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্রই লেখকের জীবনক্ষেত্র থেকে তুলে আনা। মূলত গ্রামীণ পরিবেশ আর আদালতে কর্মসূত্রে চোখে দেখা ইতর বিশেষ মানুষগুলিকে তিনি নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। অর্থনৈতিক বৈষম্য, জাত-পাত-বর্ণ-বিদ্বেষ, কামতাড়িত স্থূল রুচির মানুষগুলোকে তিনি একেবারে নগ্নভাবে তুলে ধরেছেন। সাধারণতঃ যাদের প্রতিদিন

দেখা যায় পথে ঘাটে, গ্রামে, সমাজে-সংসারে। অসুস্থ বিকারগ্রস্ত, দারিদ্র্যের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যাওয়া মানুষগুলো তাদের নিজ নিজ স্বরূপ নিয়ে উঠে এসেছে। ড. সুমিতা চক্রবর্তী এইসব চরিত্রের সম্পর্কে বলেছেন—

''...তাঁর আকর্ষণ সেই জাতীয় চরিত্রের প্রতিই যারা আমাদের মধ্যেই নিতান্ত স্বাভাবিকতার এক পরিচয় নিয়ে বাস করে কিন্তু যাদের মনের গঠনে অসদ্‌বৃত্তি সমূহের প্রাধান্য। সহজ বাংলায় আমরা যাদের বলি 'পাজি'। 'লঘুগুরু'র বিশ্বম্ভর ও পরিতোষ 'অসাধু সিদ্ধার্থ'র সিদ্ধার্থ বা নটবর, 'দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা' উপন্যাসের দয়ানন্দ 'গতিহারা জাহ্নবীর'র অকিঞ্চন—এরকম সহজ অসৎ ব্যক্তিরাই তাঁর অবলম্বন।''[৩৩]

সভ্যতার স্বাভাবিক নিয়মে অর্থনৈতিক বৈষম্যের পথ ধরে যেমন সবল-দুর্বল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে মেরুরেখা গড়ে উঠেছে তেমনি প্রকৃত শিক্ষার অভাবে কদর্য অশ্লীল রুচির মানুষেরাও সমাজের চারপাশে ভিড় করে শিক্ষিত রুচিশীল মানুষের সমান্তরালভাবে। জগদীশগুপ্ত প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ অন্যায়-অত্যাচার-বৈনাশিকতায় যুক্ত মানুষদেরই বেশী করে তুলে এনেছেন তাঁর রচনায়। বিশেষতঃ গ্রাম জীবন নির্ভর উপন্যাসগুলিতে এদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এইসব মানুষদের চিহ্নিত করছে 'দুলালের দোলা' উপন্যাসের পিরু চরিত্রটি) —যার কথার মধ্যদিয়ে আসলে লেখকেরই অন্তরস্থ ভাবনাগুলি প্রকাশ পেয়েছে। নীরদবরণকে উদ্দেশ্য করে পিরু উপন্যাসের একজায়গায় বলেছে—

''দু'রকমের লোক দেখবেন এ গাঁয়ে আর তারা হদ্দ বেহায়া আর কারুর উপর তাদের দরদ নাই।... একদল তারা আছে—জন্মে ইস্তক খেতে পায় না, তারা বেহায়া হয়ে উঠেছে—লজ্জা তাদের নাই। আর একদল আছে তারা সুদখোর, টাকার ময়লা চেটে চেটে খায় এদেরও চক্ষু লজ্জা নাই, কাণ্ডজ্ঞান নাই।''[৩৪]

এই উভয় শ্রেণীর মানুষেরাই জগদীশবাবুর গল্প উপন্যাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। বিশেষ করে ইতর শ্রেণীর মানুষেরা। যাদের সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশ ভিন্ন একটি পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন—

''...জীবনের ইতর শ্রেণীর
মানুষ তো এরা সব; ছেঁড়া জুতো পায়ে

বাজারের পোকাকাটা জিনিসের কেনাকাটা করে;
সৃষ্টির অপরিক্লান্ত চারণার বেগে
এইসব প্রাণকণা জেগেছিলো—বিকেলের সূর্যের রশ্মিতে
সহসা সুন্দর ব'লে মনে হয়েছিলো কোনো উজ্জ্বল চোখের
মনীষী লোকের কাছে এইসব অণুর মতন
উদ্ভাসিত পৃথিবীর উপেক্ষিত জীবনগুলোকে।"৩৫

পুরু পাওয়ারের চশমার ফাঁক দিয়ে 'উজ্জ্বল মনীষী' জগদীশ গুপ্ত এইসব অণুর মত জীবনগুলোকে দেখেছিলেন। হোক না তারা ইতর, হোক অশিক্ষায়-দারিদ্র্যে-পরশ্রীকাতরতায় হিংসায়-কামুকতায় জর্জরিত মানুষ। তবু এরাই তো বাংলাদেশের গ্রামজীবনের প্রতিনিধি। অত্যন্ত নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে লেখক এদের তুলে এনেছেন। 'মহিষী' উপন্যাসের ব্রজকিশোর অশোক-জ্যোর্তিময়ী, 'লঘুগুরু'র 'স্বভাবসিদ্ধ ইতর' বিশ্বম্ভর আর 'কোমর বাঁধা শয়তান' পরিতোষ ছাড়াও উত্তম-টুকী-সুন্দরী-বঙ্কু-অচিন্ত্য, 'রোমন্থনে'র অভয় ও কালোশশী, 'দুলালের দোলা'র পিরু-সতীশ-পিসিমা 'যথাক্রমে' উপন্যাসের রামপ্রসাদ-দীনবন্ধু-সাবিত্রী কিংবা ফণীডাক্তার মতিলাল-নিত্যপদ, 'তাতল সৈকতে' উপন্যাসের শরৎ-মনোহর দত্ত-সুখী 'সুতিনী'র দুর্গাপদ রাজবালা-মধুবালা; 'রতি ও বিরতি'র রাম-লব-গয়ামণি 'গতিহারা' 'জাহ্নবী'র অকিঞ্চন-কিশোরী, 'দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা' উপন্যাসের দয়ানন্দ ও মল্লিকা; নন্দ আর কৃষ্ণা উপন্যাসের নন্দ-মণীন্দ্র-মমতা-কৃষ্ণা; 'নিষেধের পটভূমিকায়' উপন্যাসের অভয়া-অতুল-শান্তি-বসন্ত; কিংবা 'কলঙ্কিত তীর্থ -এর মাখন-সাতকড়ি প্রভৃতি চরিত্র একেবারে লেখকের চোখে দেখা জীবন থেকে তুলে আনা রক্তমাংসের মানুষ। এদের তুলে আনবার জন্যে লেখককে 'অনতিপরিচিতের গণ্ডী ছাড়িয়ে কাঁটাবন পেরিয়ে' যেতে হয়নি। তাঁর চেনাবৃত্তের মধ্যেই এরা তাদের জান্তব চাওয়া-পাওয়া নিয়ে ঘুরে বেরিয়েছে। আবার তাঁর উপন্যাসে দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে পুরুষ চরিত্রদের তুলনায় নারী চরিত্ররাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সবচেয়ে বেশী। এপ্রসঙ্গে ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায় যথার্থই অভিমত প্রকাশ করে লিখেছেন—

“হয়তো পুরুষ চরিত্র অঙ্কনে অধিকতর দক্ষতাই জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসে বেশি প্রত্যাশিত ছিল, কারণ তিনি লেখেন প্রধানত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে নির্ভর করে এবং সেই অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যে পুরুষের প্রবেশ সহজতর অথচ যেমন তাঁর ছোটগল্পে, এখানেও (উপন্যাসে) আমরা দেখি পুরুষ চরিত্রের তুলনায় মহিলা চরিত্রগুলি অনেক বিচিত্র এবং তীব্র। অন্তত জগদীশ গুপ্তের একজন ভক্ত পাঠক তাঁর উপন্যাস জগতের নারীগুলিকে যেভাবে মনে রাখবেন, পুরুষগুলিতে সেভাবে নয়।”[৩৬]

ড. চট্টোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যের সঙ্গে আমরা সহমত পোষণ করি। ‘অসাধু সিদ্ধার্থে’র নটবর ওরফে সিদ্ধার্থকে বাদ দিলে প্রায় সব উপন্যাসেই পুরুষ চরিত্রের তুলনায় নারীরাই সংবেদনশীল পাঠকের অন্তরকে নাড়া দিয়ে গেছে। ‘লঘুগুরু’ উপন্যাসের উত্তম ও টুকী এমন কী সুন্দরী ‘মহিষী’ উপন্যাসের জোতির্ময়ী, ‘সুতিনী’ উপন্যাসের রাজবালা ‘তাতল সৈকতে’ উপন্যাসের শরৎ ‘গতিহারা জাহ্নবী’র কিশোরী, ‘দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা’র মল্লিকা, ‘নন্দ আর কৃষ্ণা’ উপন্যাসের কৃষ্ণা, ‘নিষেধের পটভূমিকা’য় উপন্যাসের অভয়া ও শান্তি, ‘কলঙ্কিত তীর্থ’র মাখন প্রমুখ নারী চরিত্রেরা পাঠকের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এইসব নারীদের মধ্যে আবার কয়েকজনকে গণিকা বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছে। এইসব গণিকা নারীর জীবন চিত্রণে শরৎচন্দ্রীয় ‘সতীনারী’ ভাবনাকে লেখক অস্বীকার করেছেন। এবিষয়ে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল, মূলত সমাজ মানসিকতার কারণেই তাদের এই পাপের পথে নামতে হয়েছে। এই মতের সমর্থন আছে ড. সমরেশ মজুমদারের বক্তব্যে—

“সাধারণভাবে তাঁর সাহিত্যের নারীদের মধ্যকার একজন বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে, তার জন্য ব্যক্তির নিজের মানসিক প্রবণতা দায়ী নয়, দায়ী সমাজ ব্যবস্থা, বলা ভালো কিছু মানুষের আচরণ তাঁকে এই পথে নিয়ে যেতে বাধ্য করেছে, সেই দয়া, মমতা, স্নেহ—তথাকথিত কোমল ব্যাপারগুলি নিয়েই তার সমগ্রতা। মূলত সতী, অবস্থা বিপাকে তাকে ঘৃণ্য বৃত্তিটির অন্তর্ভুক্ত হতে হয়েছে। এই যে একটি মিথ্যের আবরণ, তাকে সরিয়ে বস্তুর বাস্তবিক চেহারাটি দেখিয়েছেন বলেই জগদীশ গুপ্ত অনেকাংশে দলছুট এবং স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত।”[৩৭]

একটি সার্থক উপন্যাসের কাহিনী বা প্লট নির্মাণ, চরিত্রের যথাযথ রূপায়ণ, কিংবা

রচয়িতার জীবন দর্শনের প্রকাশ—সবক্ষেত্রেই বিশিষ্ট ভূমিকা থাকে ভাষার। কারণ ভাষাই হল প্রকাশ মাধ্যম। এই ভাষার মধ্যেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে লেখকের জীবনদৃষ্টিও। এসবের সার্বিক প্রতিফলনে গদ্যভাষা বিশেষ কার্যকরী। তবে পদ্যাকারেও উপন্যাস লেখা যেতে পারে। সবটাই নির্ভর করে রচয়িতার ভাষাগত দক্ষতার উপরেই। ভাষার এই প্রায়োগিক দিকটি সম্পর্কে সমালোচক ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার লিখেছেন—

"উপন্যাসের ভাষায় কাব্যরস অনেক সময়ই কৃত্রিম হয়ে পড়ে এবং অযথা বিশ্লেষণে লেখক যে কৃত্রিমতা সৃষ্টি করেন, তাতে মনে হয়, বিষয়কে তিনি উপযুক্ত ভাবে ধরতে পারছেন না; বিশ্লেষণ দিয়ে সেই ক্ষতিটুকু পূরণ করবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু বিষয় সম্পর্কে লেখকের ধারণা যদি আন্তরিক হয়, তাহলে উপন্যাসের ভাষা, উপমা, চিত্রকল্প সমস্তই বিষয়ের তাৎপর্যকে ব্যক্ত করতে এগিয়ে আসে।"[৩৮]

জগদীশ গুপ্ত তাঁর নির্মোহ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা জীবনকে দেখেছিলেন ব'লে তাঁর উপন্যাসের ভাষাও হয়ে উঠেছে সেই জীবনানুসারী। এই জীবনদর্শন অনেক ক্ষেত্রেই বাঁকা বলে লেখকের গদ্যশৈলীতেও সাহিত্য সৃষ্টির প্রথাগত ভঙ্গি বর্জিত হয়েছে। একটি বস্তুবাদী মানুষ জগৎ ও জীবনকে যেভাবে দেখেন, সেভাবেই জগদীশ গুপ্ত দেখেছেন। ফলে তাঁর উপন্যাসের ভাষা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রতিফলিত করেছে। সেই ভাষায় যেমন সাংবাদিক সুলভ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, তেমনি রয়েছে ভাবাবেগ বর্জিত বর্ণনা, গাণিতিক যুক্তির প্রয়োগ; সেইসঙ্গে আঙ্গিকগত দিক থেকেও নতুনত্ব লক্ষ্য করা যায়। লেখকের উপন্যাসগুলির ভাষাগত প্রায়োগিক ক্ষেত্রটির মধ্যে আমরা যে পৃথক পৃথক রূপ প্রত্যক্ষ করি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

- লেখকের কাহিনী বর্ণনার ভাষা
- চরিত্রের মনোলোক আর বাহ্যসত্তার ভাষা;
- উপমা-চিত্রকল্প ইত্যাদির ব্যবহার এবং
- বাক্য গঠনের স্বাতন্ত্র্য।

■ **লেখকের কাহিনী বর্ণনার ভাষা :**

'দুলালের দোলা' এবং 'আলুনী আলু' বাদ দিলে জগদীশবাবুর বাকী উপন্যাসগুলি প্রথম পুরুষে অর্থাৎ লেখক নিজেই বর্ণনা করেছেন। 'দুলালের দোলা'য় শহরবাসী একজন মানুষের চোখে গ্রামীণ জীবনচিত্র তারই ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। আর 'আলুনী আলু'তে একটি দেড় বছরের মেয়ের জবানীতে কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এতো ছোট একটি মেয়েকে দিয়ে কাহিনী বর্ণনার কোন পূর্ব এমনকি পরেও কোনো উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে নেই। এই বিষয়টিকে বিশ্বাসযোগ্যতা দেবার জন্যে লেখককে অলৌকিকতার সাহায্য নিতে হয়েছে। বাকী উপন্যাসগুলিতে লেখক নিজেই কাহিনীর ন্যারেটর। উপন্যাসগুলির অন্দরমহলে পৌঁছলে আমরা দেখতে পাই এগুলিতে মূলত গ্রামীণ জীবনই বর্ণিত হয়েছে। কুষ্ঠিয়ার গ্রামীর পরিবেশে লেখকের যে ছেলেবেলা কেটেছিল তারই প্রতিফলন ঘটেছে এইসব বর্ণনায়। আর আদালতে টাইপিস্টের চাকরী সূত্রে যে বিচিত্র মানুষগুলোকে দেখেছেন তাদের যাপন চিত্রই তুলে ধরেছেন অত্যন্ত নির্মোহ ও নিরাসক্ত ভঙ্গীতে। 'যথাক্রমে' উপন্যাসের সূচনাতেই তিনি গ্রামীণ একটি অখ্যাত নদীর তীরে অবস্থিত একটি গ্রামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরেছেন—

"ছোট্ট নদীর ধারে হাট। গ্রামের নাম বেতডাঙ্গা, নদীর নাম চন্ননা, হাটের নাম চন্ননার হাট। নদীর বুক বৃদ্ধার স্তনের মত শুকাইয়া আসিতেছে, তবু স্তন্যের মায়ামধু কৃতজ্ঞ স্তন্যপায়ী সন্তানেরা ভুলিতে পারে না, চন্ননাকে ভালবাসিয়া হাটের নাম দিয়াছে চন্ননার হাট।"[৩৯]

বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ মহকুমার অন্তর্গত খোর্দ মেঘচামী গ্রাম ছিল জগদীশ গুপ্তের পৈত্রিক নিবাস। চন্দনা নদীর তীরবর্তী গ্রামটির প্রকৃত নাম ছিল মেঘচুম্বী যা লোকমুখে ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে 'মেঘচামী' নামে পরিচিতি পেয়েছিল। বাস্তবের 'চন্দনা' নদীই হয়তো হয়ছে চন্ননা আর 'মেঘচামী' হয়েছে 'বেতডাঙ্গা'। লেখকের পিতামহ আনন্দমোহন ছিলেন সেকালের ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ মহকুমার ডাকসাইটে আইন ব্যবসায়ী। সেইসঙ্গে তাঁদের ছিল জোতদারী। মেঘচামী গ্রামে তাঁদের ছিল দিগন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র যার ফসল উঠলে উৎসব ক্রিয়া উপলক্ষে গৃহের প্রায় সকলেই গ্রামের বাড়ীতে যেতেন। সকলের মিলনের আনন্দে পরিবেশটাই সম্পূর্ণ বদলে যেত। 'রোমন্থন' উপন্যাসে তিন শহরবাসী ভাইয়ের

গ্রামজীবন দর্শনের অভিজ্ঞতা কিংবা 'দুলালের দোলা'য় নীরদবরণের গ্রামে গিয়ে শিকড় অনুসন্ধানের মধ্যে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের ছাপ খুঁছে পাওয়া যায়। কিংবা আদালতের টাইপিস্টের চাকরী সূত্রে লেখক রাঁচীতে ছিলেন সপরিবারে। সেখানকার মহানদীর যে রূপ তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল সেকথাও তিনি হয়তো তুলে ধরেছেন।

জগদীশবাবুর মা সৌদামিনী দেবী ছিলেন একেবারে ছেলে অন্ত প্রাণ। ছয় পুত্র কন্যার মধ্যে চারজনই অল্প বয়সে মারা যাওয়ায় মায়ের স্নেহের অবলম্বন ছিল কনিষ্ঠ জগদীশ। সেজন্য তিনি ছেলেকে ছেড়ে একা থাকতেই পারতেন না। মায়ের সঙ্গে এই বন্ধনের কথাই উত্তরকালে 'রোমন্থন' উপন্যাসে ছোটবাবুর সঙ্গে তার মায়ের কথোপকথনে ধরা পড়েছে—

"... তোদের খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হবে। ছোট'র ত' বিছানার চাদর শোবার আগে ঝেড়ে না দিলে সে রাত্রে আর ঘুম হয় না। তুই কেন যাচ্ছিস্ তুই থাক। বলিয়া গৃহিনী ছোটছেলের দিকে আকুল নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

ছোটবাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন— ঐ করেই তো তোমরা মায়েরা বাঙালী ছেলের মাথা খাও।"...[৪০]

লেখকদের কুষ্ঠিয়ার বাড়ীর খুব কাছেই একটা পতিতা পল্লী ছিল। সেখানে অনেক ঘর পতিতার বাস ছিল। গিরিবালা নাম্মী এক পতিতার সঙ্গে তাঁদের বাড়ীর যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল যে বালক জগদীশকে খুব ভালোবাসত। এই গিরিবালাই হয়তো উত্তরকালে 'লঘুগুরু'র উত্তম কিংবা সুদরী হয়েছে। এইভাবে ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতার টুকরো টুকরো কোলাজ দিয়েই উপন্যাসগুলির কাহিনী গড়ে উঠেছে। সেই কাহিনী বর্ণনার ভাষা লেখকের কষ্ট কল্পনা প্রসূত নয়। সেইসঙ্গে আদালত চত্বরে দেখা মানুষগুলির নগ্ন চেহারাই ফুটে উঠেছে 'দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা' উপন্যাসের আদালতের দৃশ্যে। লেখক তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে শব্দ চয়ন করে করেই এইসব কাহিনী ও চরিত্র নির্মাণ করেছিলেন। স্বভাবতই তাঁর বর্ণনার ভাষা একেবারে 'গৃহস্থপাড়ার ভাষা' হয়ে উঠেছে।

■ **চরিত্রদের মনোলোক আর বাহ্যসত্তার ভাষা :**

সমাজ সংসারের মানুষের দুটি স্বতন্ত্র রূপ রয়েছে। আচরণের মানুষ আর আচরণের আড়ালের মানুষ। লেখক অত্যন্ত খোলা চোখে মানুষের এই দ্বৈত সত্তার ভাষাকে প্রাঞ্জল করে তুলেছেন। আদালতে প্রতিদিন যে মানুষেরা আসত তাদের ভাষা ছাড়াও, কুষ্ঠিয়ার গ্রামীণ পরিবেশে আর যাদবপুরের কাছে রামগড় কলোনীর জীবন লেখককে ভাষা সঞ্চয়ে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে। শুধু তাই নয় পথচারীদের কথোপকথন তিনি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে শুনতেন। এবিষয়ে চারুবালা দেবী জানিয়েছেন—

‘‘তখন তো পর্দা প্রথা ছিল। কখনো হয়তো এক গলা ঘোমটা দিয়ে ওঁর সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়েছি। দু’জন নিম্নশ্রেণীর পুরুষ বা মেয়ে মানুষ রাস্তায় ঝগড়া করছে, উনি দাঁড়িয়ে পড়ে যতক্ষণ সম্ভব ঐ ঝগড়া শুনতেন।’’[৪১]

এইসব অভিজ্ঞতার ফসল তাঁর উপন্যাসের চরিত্রেরা এবং তাদের ভাষা। এই ভাষা নিয়ে বিরূপ সমালোচনা করেছেন ড. ক্ষেত্র গুপ্ত। তিনি স্পষ্টতই জানিয়েছেন—

‘‘...তাঁর লেখা যে একটু দুরূপ তাতে সন্দেহ নেই, ভাষায় কৌতুক না থাক ব্যঙ্গের ছটা আছে, কিন্তু লঘু তরলতা নেই। কোথাও মজা নেই। আনন্দ উল্লাস নেই। মানুষের অবচেতন অন্ধকারের কারবারী লেখক কোথাও আলোর কণামাত্র অবশিষ্ট রাখেন নি।’’[৪২]

ড. গুপ্তের এই সমালোচনার মধ্যে জগদীশবাবুর উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যসহ ভাষাগত দিকটিও প্রকট হয়েছে। তাঁর ভাষায় কৌতুক নেই, ব্যঙ্গ আছে এবং লঘু তরলতা নেই। আসলে লেখকের চরিত্রেরা কেউই তাঁর রোমান্টিক কল্পনা বিলাসিতার ফসল নয়। কিংবা তিনি এইসব চরিত্রদের নিয়ে কোনো ইচ্ছা পূরণের গল্প লেখেননি। ফলে ‘সিরিয়াস’ কাহিনীতে মজা বা আনন্দ উল্লাস না থাকাই স্বাভাবিক। বরং যেটা আছে তা হল উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্রের অন্তর্সত্তা আর বহির্সত্তার অনুসারী ভাষার সুনিপুণ প্রয়োগ। ‘অসাধু সিদ্ধার্থ’ উপন্যাসে সিদ্ধার্থর ছদ্মবেশে নটবরের দুটি পৃথক সত্তা লেখক উপন্যাসের সূচনাতেই উল্লেখ করেছেন। বাইরে ঋজু বলিষ্ঠ গৌর বর্ণ, মুখে বুদ্ধির দীপ্তি প্রকাশ পেয়েছে যে নটবরের; তার ভেতরটা অন্যরকম—

‘‘... কিছুদিন হইতে সেখানে অগ্নিগিরির অগ্নিবমন শুরু হইয়া গেছে। ভিতরে সে

শ্রান্ত, অতিশয় পরামুখাপেক্ষী।”[৪৩]

এই দ্বিমুখী লড়াইয়ে ক্ষত-বিক্ষত সিদ্ধার্থ তার বন্ধু দেবরাজকে বলেছে, ‘বড় অন্ধকার, বন্ধু’। কিন্তু দেবরাজ তা মানতে চায়নি। বরং সে সিদ্ধার্থের মধ্যে দিব্যি দিনের আলোর মত জোছ্না দেখতে পেয়েছে। ছদ্মবেশী সিদ্ধার্থ জীবনের একটা পর্বে এসে আত্মহত্যার কথা পর্যন্ত ভেবেছে। কিন্তু অজয়ার সংস্পর্শেই আবার সে নতুনভাবে বাঁচতে চেয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন কাশীনাথের উপস্থিতিতে অজয়াকে বিয়ের শেষ মুহূর্তে সিদ্ধার্থের মুখোশ খসে পড়েছে তখন সে শামুকের মতো গুটিয়ে গিয়ে বলেছে—

“...আমি নিরপরাধ। নিয়তির চক্রান্তে ভালোবেসেছিলাম। ভালোবাসার তাড়নায় আর প্রতিদানের লোভে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি। কিন্তু আমি ত’সেই মানুষ।”[৪৪]

এই দ্বৈতসত্তাই সিদ্ধার্থকে পুরোপুরি ‘ভিলেন’ করেনি। লেখক সিদ্ধার্থের এই পৃথক সত্তার ভাষা নির্মাণে পুরোপুরি সফল।

‘লঘুগুরু’ উপন্যাসে বারাঙ্গনা উত্তমের উত্থান-পতনময় জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি, পরিস্থিতি অনুযায়ী উত্তমের ভাষা বদলে বদলে গেছে। বহু পুরুষচারিণী উত্তমের মধ্যে গৃহ বুভুক্ষা ছিল বলেই প্রথমাবধি তার মধ্যে গৃহী নারীর ভাষা শুনতে পাই। বিশ্বম্ভরের সঙ্গে চলে আসার আগে উত্তম টুকরো টুকরো সংলাপে নিজেকে ক্রম উন্মোচিত করেছে। বিশ্বম্ভর টুকীর প্রসঙ্গ তুলতেই উত্তম বলেছিল, ‘তা থাক্, আমি ত পুতনা নই’। গৃহস্থালী পাতানোর স্বপ্ন নিয়ে বিশ্বম্ভরের গৃহে এলে টুকীর সঙ্গে তার পরিচয় পর্বে তাকে একজন সত্যিকারের গৃহী জননী বলেই মনে হয়েছে। আবার বিশ্বম্ভরের প্রতিবেশিনীদের কাছে উত্তম নিজেকে দৃঢ়ভাবেই ব্যক্ত করেছে। মোহিনীর জিজ্ঞাসার উত্তরে উত্তমের খুব কাটাকাটা জবাব ছিল—

“ঘরের আমার ঠিকানা ছিল না; যেখানে থাকতাম সেই ঘর।”[৪৫]

কিংবা “ধরণ দেখে বা না দেখেই যা ভেবেছ তাই ঠিক।”[৪৬]

এই উত্তমই আবার হিরণের মৃত্যু সংবাদে কান্নায় ভেঙে পড়েছে। মোক্ষর মা টুকীকে ডেকে কানে কানে ‘তোর মা বেশ্যে ছিল’ — বলার পরেই মেয়ের কাছে সেকথা শোনার পর উত্তমের

আর নিজের ইচ্ছা শক্তিজাত কোনো সংলাপ ছিল না। কেবল বিশ্বম্ভরের বন্ধুদের নিয়ে মদের আসর বসানোর ক্ষেত্রে তার দৃঢ় মনোভাবজাত কথা আমরা শুনতে পাই। টুকীর বিয়ে ভেঙে যাওয়া থেকে শুরু করে পরিতোষের সঙ্গে বিবাহ আর তার জীবনের বিপর্যয় পর্বে আমরা উত্তমকে শুধু বঙ্গ জননীর মতোই চোখের জল ফেলতে আর মেয়েকে সৎ উপদেশজাত কথা বলতেই দেখি। লেখক উত্তমের পতিতা জীবনের বিস্তারিত পরিচয় দেননি। কেবল বারবার চরিত্র বদল করা উত্তমের জীবনকে একটা পূর্ণাঙ্গ নারী হিসেবে অনায়াসেই খুঁজে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে উত্তমের ভাষা তার চরিত্র বৈশিষ্ট্য সূচক।

বিশ্বম্ভর চরিত্রকে আলাদা করে চেনা যায় তার নিজস্ব ভাষা-ভঙ্গিমার জন্য। প্রথমদিকে উচ্ছৃঙ্খল স্বামী, উদাসীন পিতা, পরে উত্তমের শাসনে গৃহী হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত অসহায় কন্যার পিতা হিসেবে লেখক কাহিনীতে তার ভূমিকা শেষ করেছেন। প্রথমা পত্নী হিরণ তারই দোষে সন্তান-সম্ভবা অবস্থায় মারা গেছে। সেই ঘটনা সে নির্বিকার চিত্তে উত্তমকে জানিয়েছে তাই নয় সেজন্যে উত্তমের কান্নাকে সে ব্যঙ্গ করতেও ভোলেনি। উত্তমের কান্নার প্রতিক্রিয়ায় 'হো হো' করে হেসে উঠেছে। এবং বলেছে—

''কার শোকে কে কাঁদেরে বাবা, তার দিশে পাওয়া ভার—মাছ মরলে বিড়াল কাঁদে, গরু মরলে শকুন; আর পদির পিসি কাঁদে পদি মারলে বলে উকুন।''[৪৭]

এরপর মোক্ষর মা উত্তমকে 'বেশ্যা' বললে কিংবা বন্ধুরা মদের আসর বসানোর অনুমতি না পেয়ে উত্তমকে 'খাণ্ডারী' বললে সেসব নিয়েও বিশ্বম্ভর প্রতিবাদ করেনি, বরং উপভোগ করেছে বদনামটা। কিন্তু অন্তরের অন্তস্থলে উত্তমের প্রতি তার গোপন ভালোবাসার কথাও উচ্চারণ করেছে। লেখক জানিয়েছেন—

''আমি তাহাকে ভালবাসি, সেও ভালবাসে—এককালে সে দশজনের পক্ষে সুলভ ছিল বলিয়াই, কেবল সেই কারণেই, এখনও তাহাকে হাটের মধ্যে নিজে ডাকিয়া আনিয়া সুলভ প্রাপ্যের দলে ছাড়িয়া দিতে হইবে, ইহাই বা কেমন কথা! তাহাতে কোন লাভ নাই, বরং লোকসানের ভয় আছে—তাহাকে চিরদিনের মতো হারাইবার ভয় আছে।''[৪৮]

কিন্তু এই ক্ষণিক ঢেউ মিলিয়ে যেতে সময় লাগে নি। তারপর উত্তমের গৃহী হয়ে ওঠার চেষ্টা

থেকে শুরু করে টুকীর বিয়ে ভেঙে যাওয়া সবক্ষেত্রেই উত্তমকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ দোষারোপ করেছে বিশ্বম্ভর। শেষ পর্যন্ত 'স্বভাবসিদ্ধ ইতর' বিশ্বম্ভরের মধ্যে একজন অসহায় পিতাকেই আমরা দেখি। মায়ের জন্য উদ্বিগ্না কন্যাকে আশ্বস্ত করে বলেছে—

''সে মরবে না। কিন্তু তোর কি হয়েছে বল্ দেখি? কাহিল হয়ে গেছিস।''[৪৯]

কিংবা টুকী সংসারে ঠিকঠাক মানিয়ে নিতে পেরেছে কিনা সেটাও জানতে চেয়েছে। বিশ্বম্ভরের এই ভাষায় কোনো কৃত্রিমতা নেই।

'কোমর বাঁধা শয়তান' পরিতোষের ভাষা তাকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। ঠক-প্রবঞ্চক এই চরিত্রটির অন্তঃপ্রকৃতির বিপরীতে বহিঃপ্রকৃতিটি যথার্থই 'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণের মতো'। বিপত্নীক পরিতোষ রক্ষিতা সুন্দরীকে নিয়ে কদর্য জীবন কাটানোর পাশাপাশি মূলতঃ অর্থের লোভেই টুকীকে বিয়ে করেছে। অথচ এহেন মুখোশধারীর বাহ্যরূপ ছিল এরকম—

''পরিতোষ বাজনা থামাইয়া, খোলের পেটির উপর দু'হাত তুলিয়া দিয়া বলিল,—এমন আশু ফলপ্রদ জিনিষ আর নেই ভাই, এই খোল যেমন চাটি মেরেছ কি মন সাদা; শ্রী গৌরাঙ্গদেবের নিজের আবিস্কার—তিনি পূর্ণতার অবতার কিনা।''[৫০]

টুকীর সঙ্গে তার আচরণের ভাষা কিংবা বিশ্বম্ভরের সঙ্গে শ্বশুর-জামাতার সম্পর্ককে কদর্য রূপে ব্যক্ত করার যে প্রকাশ-রূপ ভাষা সে প্রয়োগ করেছে, তাতে লেখকের মৌলিকত্বের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে।

পরিতোষের রক্ষিতা সুন্দরীর কদর্য ও ভোগমুখী জীবনযাপনের যে অকপট প্রকাশ, তাতে তাকে অনায়াসেই লেখকের অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ ফসল বলা যায়। বিশেষ করে তার ভাষা সে পরিতোষের সঙ্গেই হোক, কিংবা টুকীর সঙ্গে তার মধ্যে একটা রূপরেখা তৈরী হয়ে গেছে। কীর্তনে ডুবে থাকা পরিতোষের অভাবের সংসারে সুন্দরীর আক্ষেপ—

''... তোমায় নিয়ে আমার চিরকালই দুঃখ গেল। দুঃখে ভাজা হয়ে গেছি।''[৫১]

আবার টুকীর বিয়েতে পাওয়া নগদ সমস্ত টাকা চুরি হয়ে গেলে সুন্দরীর বিলাপের যে পরিচয় লেখক দিয়েছেন তাতে মনে হয় না এই চরিত্রের ভাষা আরোপিত। অথবা উপন্যাসের শেষে টুকীর খদ্দের অচিন্ত্যর সামনে টুকীকে আক্রমণ করে সুন্দরী বলেছে—

"ওরে আমার সোয়ামী উলি, বেরো বল্ছিস কাকে তুই? কার ঘরে তুই আছিস্ জানিস?"[৫২]

এই ভাষা একজন প্রকৃত বারাঙ্গনাকে চিনিয়ে দেয়।

উত্তম থেকে টুকী—নারীর পরম্পরার যে ইতিহাস তা আসলে একটা পূর্ণবৃত্ত। মাতৃহীনা টুকীর প্রথম ভাষা ছিল সংক্ষিপ্ত প্রায় অর্থশূন্য। সকলের ডাকেই সে শুধু বলতো 'উঁ'। তারপর নতুন মা উত্তমের কাছেই তার জীবনচর্যার পাশাপাশি ভাষা শিক্ষা। বেশ্যার অন্তর্গত নির্মল ও পবিত্র মাতৃসত্তার কাছে সঠিক শিক্ষা পেয়েছিল বলেই টুকী মোক্ষর মায়ের বিষযুক্ত কথন 'তোর মা বেশ্যে ছিল'; এর কোনো জবাব দিতে পারে নি। বরং মায়ের কাছেই জানতে চেয়েছে 'বেশ্যে কী?' এরপর তার বেড়ে ওঠা, দুর্বিসহ দাম্পত্য জীবন নীরবে মেনে নেওয়া এবং স্বামীর যাবতীয় অবহেলা সত্ত্বেও সনাতন ভারতীয় নারীর আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হওয়া কিংবা কোনোরূপ কদর্য ভাষায় কথা বলার কোনো দৃষ্টান্ত কাহিনীতে নেই। সংক্ষিপ্ত ও সংযত ভঙ্গীতে সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তার পরিণতি বুঝতে পেরে প্রথম খদ্দের অচিন্ত্যকে বলেছিল—

"এ কাজ যদি করতে হয়, তবে আমি আপনাকে দেব দেহ, আপনি আমাকে দেবেন টাকা। মাঝখানে ওরা কে?"[৫৩]

এরপর স্বামীর ভিটে ছেড়ে 'ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী অন্ধকারের' মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায় টুকী। এই নীরব ভাষাও টুকীর প্রতিবাদী সত্তাকে চিনিয়ে দেয়। এইভাবে লেখক অপ্রধান চরিত্র লালমোহন বঙ্কু প্রমুখেরও একটা স্বতন্ত্র কথন বিশ্ব রচনা করেছেন অত্যন্ত সফলভাবে।

'নন্দ আর কৃষ্ণা' উপন্যাসে নন্দ এবং কৃষ্ণা ছাড়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র মণীন্দ্রবাবু। তারই পুত্রের গৃহ শিক্ষক হিসেবে নন্দর আগমনে কাহিনীর সূত্রপাত। মণীন্দ্রবাবুর রক্ষিতা কৃষ্ণার অর্ধনগ্ন শরীর আয়নায় দেখে ফেলে নন্দ। সেইসূত্রেই তার মধ্যে সু এবং কু'র দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। প্রথমে সে পালিয়ে যায়, পরে আবার ফিরে আসে। স্ত্রী মমতার কথা ভেবে তেইশ বছরের যুবক নন্দর প্রথমে অপরাধবোধ কাজ করে। স্ত্রীকে ভালোবেসে আদর করেও সে কৃষ্ণার রূপ ভুলতে চেয়ে পারেনি। স্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনে তার বাহ্যিক সত্তার প্রকাশ অন্তরস্থ সত্তা থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। বরং কৃষ্ণাকে নিয়ে তার অবৈধ আসক্তি প্রকট হতে থাকে। দুটি

ক্ষেত্রেই নন্দর সংলাপ তাকে চিহ্নিত করে দেয়। উত্তম যেখানে গণিকা জীবন ছেড়ে গৃহীনারী হয়ে উঠতে চেয়েছিল, কৃষ্ণা সেখানে গৃহান্তরালে থেকে গণিকার জীবন কাটিয়েছে। প্রৌঢ় মণীন্দ্রর সঙ্গে তার যৌন সম্পর্কের অতৃপ্তি সে নন্দর মতো পুরুষের সঙ্গে মেটাতে চেয়েছে বারবার। নন্দকে অকপটে বলেছে—

"পালাবেন না; আমাকে আয়নায় যেমন দেখেছেন, তেম্‌নি দেখা আমার ভালো লাগে, আপনাকে আরো—আপনি নির্ব্বোধ, তাই দিশে পান না, পালান্।"[৫৪]

অন্যদিকে মণীন্দ্রবাবু বাহ্যত সন্তানের পিতা, কিন্তু তার অন্তরে একজন কামুক, শরীর সর্বস্ব মানুষ বাস করে। পুত্রের গৃহ শিক্ষক, বয়সে প্রায় সন্তানতুল্য নন্দর সঙ্গে তার কথোপকথন তাকে নগ্ন করে তোলে। বাড়ীতে গিয়ে কতবার স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিক মিলনের সুযোগ পাবে তার হিসেব করে, দু'রাত্রির অতিরিক্ত ফেরার গাড়ির প্রসঙ্গ তুলে সে বলেছে—

"... দিনে গাড়ি কখন?

— তিনটেয়।

- তাহলে দুপুরটাও পাচ্ছ। বলিয়া মণীন্দ্র সম্পর্ক বিগর্হিত এবং বয়সের তারতম্য হিসাবেও অত্যন্ত অনুচিত একটা ইঙ্গিতের হাসিতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া তুলিলেন।"[৫৫]

শুধু তাই নয়, কৃষ্ণা যে তার স্ত্রী নয়, সম্পর্কীয় বোন অথচ কৃষ্ণার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকেই লুট করেছিল একদিন এমন কথাও নন্দর কাছে নির্দ্বিধায় বলেছে। তার এইসব সংলাপ একজন 'নষ্ট' পুরুষকে চিনিয়ে দেয়।

'রোমন্থন', 'দুলালের দোলা' এবং 'যথাক্রমে'—গ্রাম জীবন কেন্দ্রিক এই ত্রয়ী উপন্যাসে শহর ও গ্রামীণ মানুষের পৃথক সত্তা চিহ্নিত কথোপকথন, গ্রামীর মানুষের অন্তর্গত নীচতা কদর্যতা ফুটে উঠেছে তাদের আচরণ ও সংলাপে। 'দুলালের দোলা'য় গ্রামীণ জীবনে জাতপাতের নোংরামো দেখে নীরদবরণের শিক্ষিত সংস্কারমুক্ত সত্তা প্রতিবাদ করে বলেছিল—

"... আগে মানুষ, তারপরে ভদ্র-অভদ্র, সকলের শেষে ব্রাহ্মণ-শূদ্র। সংস্কার আগে নয়, গুণ আগে, আপনাদের এই কথাটা মনে করবার সময় এসেছ। আমাকে ক্ষমা করুন।

আপনি আমাকে দিয়ে এঁটো বাসন মাজাতেন কিনা জানিনে, আপনি তা' করাবেন না প্রতিশ্রুতি দিলেও আমি ব্রাহ্মণ বাড়ী খেতে যাব না।"[৫৬]

এর জবাবে ব্রাহ্মণের ভেতরের অশুভ সত্তাটি চিৎকার করে উঠেছে—'বালক, তুমি ব্রাহ্মণকে চেন' না।' এরপরেই নীরদবরণের সমস্ত কিছু চুরি হয়ে গেছে দুশো সিঁদেল চোরের সর্দার ব্রাহ্মণের হুকুমে। এমন অসুস্থ সমাজে পিরু চরিত্রটি বিবেকের মতো, সে যেন গোবরে পদ্মফুল, তার কণ্ঠে লেখক সমস্ত সমাজের এবং সমাজ মানুষের মানসিকতার প্রতিবেদন তুলে ধরেছেন। বিয়ে সম্পর্কে তার অকপট সত্য কথন—

"আমি ভেবে দেখেছি, বাবু, ধর্ম্মপত্নী, স'ধর্ম্মিণী আরো অনেক কথার এমনি মানে নাই। মন্তর মেয়েকে বাঁধার কৌশল, তার দেহটাই আসল।"[৫৭]

'রোমন্থনে' তিন ভাইয়ের গ্রামদেশে আসার আগে বৈঠকখানার আড্ডায় গ্রামসমাজ ও গ্রামীণ মানুষ সম্পর্কে শহুরে মানসিকতা স্পষ্ট হয়েছে তাদের কথোপকথনে। অভয়ের মতো গ্রামীণ মানুষের জন্যে এদের আল্‌গা দরদ ঝ'রে পড়েছে। কালোশশীকে এক বাবু বলেছে—

"পল্লী ছাড়া কি আমাদের গত্যন্তর আছে? ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে আমরা খুব ভাবছি; আর চাষের কথাও আমাদের সভায় মাঝে মাঝে আলোচিত হয়—বিশেষজ্ঞ আছেন। খবরের কাগজে দেখে থাক্‌বে।"[৫৮]

অন্যদিকে 'যথাক্রমে' উপন্যাসে গ্রাম সমাজকে সুস্থ সুন্দর করে তোলার ব্যর্থতা শেষ পর্যন্ত ঝ'রে পড়েছে ডাক্তার নিত্যপদর জলমিশ্রিত ওষুধ তৈরী করার আদেশের মধ্যে। লেখক এইসব মানুষের ভাষা একেবারে মাটি ঘেঁষা জীবন থেকে তুলে এনেছেন। তাঁকে কোনরকম কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়নি।

লেখকের 'মহিষী' উপন্যাসের জ্যোর্তিময়ী 'তাতল সৈকতে' উপন্যাসের শরৎ, 'সুতিনী' উপন্যাসের রাজবালা, 'গতিহারা জাহ্নবী' উপন্যাসের কিশোরী—এইসব নারীরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পেষণে কীভাবে নিষ্পেষিত হয়েছে সেটা তাদের কখনো নীরব যন্ত্রণার ভাষা আবার কখনো প্রতিবাদের ভাষার মধ্যদিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। এইসব নারীদের বাহ্যসত্তা আর অন্তরের প্রদাহপূর্ণ অন্তমুখী সত্তা নিয়ে উপন্যাসে তাদের ভাবনাকে প্রকাশ করেছে। এই প্রকাশের

ভাষা নিঃসন্দেহে তাদের চরিত্রের বাস্তবতাকেই তুলে ধরেছে। ‘মহিষী’র জ্যোর্তিয়ী কালো ছিল বলে তাকে মোটা অংকের পণের বিনিময়ে তার পিতা বিয়ে দেন অর্থলোলুপ ব্রজকিশোরের একমাত্র সন্তান অশোকের সঙ্গে। প্রথমে আপত্তি করলেও পিতার চাপে অশোক কালো বউকেই গ্রহণ করে, কিন্তু যখনি পিতার অভিসন্ধি প্রকাশ হয়ে পড়ে তখনি জ্যোর্তিময়ীর প্রতি তার বিদ্বেষ ঝ’রে পড়ে। সম্পর্কের বাঁধন আলগা হ’তে থাকে। নিছক দৈহিক চাহিদা মেটাতে জ্যোতির্ময়ীকে আছে টানতে চায় অশোক। প্রচণ্ড আত্মসম্মানে ক্ষত-বিক্ষত জ্যোতির্ময়ী স্বামীকে অস্বীকার করে বলে—

‘‘... দিতে না এসে নিতে আসা তোমাদের পক্ষেই সম্ভব; কিন্তু সম্পর্ক তাতে জন্মে না। আমরা তা পারিনে। ... শয্যাংশ দিয়ে যদি আমায় কৃতার্থ করবার ইচ্ছা হ’য়ে থাকে তবে সে তোমার বৃথা আশা। ... তুমি যে ত্যাগ করেছিল, সেইটেই সত্য। মাকে বলেছি ক’নে দেখতে।’’[৫৯]

দাম্পত্য সম্পর্ক কোন্ স্তরে নেমে গেলে নারী এরূপ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় জ্যোতির্ময়ীর সংলাপেই তার প্রকাশ ঘটেছে। ছেলের জন্য অন্ধকারে অপেক্ষারতা ‘তাতল সৈকতে’র শরৎ যেভাবে কামুক মনোহর দত্তের দ্বারা ‘বেশ্যা’ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায় সেটা জ্যোতির যন্ত্রণার ভাষাতেই ফুটে উঠেছে। ‘সুতিনী’র রাজবালা স্বামীকে সন্তান দিতে না পাবার যন্ত্রণাকে স্বামীর পৌরুষের দোষ বলে চিৎকার করে চাপিয়ে দিয়েছে—

‘‘সাত বছর গোঙালে আমায় নিয়ে তুমি—রোজ এমন চমকালে এতদিন পাঁজরার হাড় ফেটে প্রাণ বেরিয়ে যেত তোমার। ... শনির মতো তুমি মানুষের কাঁচা মাথা সত্যিই চিবিয়ে খাও না; কিন্তু আমার অদৃষ্ট তুমি পুড়িয়ে দিয়েছ।’’[৬০]

‘গতিহারা জাহ্নবী’র কিশোরী স্বামীর লাম্পট্য থেকে মুক্ত হতে চেয়ে শেষ পর্যন্ত আবিস্কার করেছে সে মা হতে চলেছে। এই অসহায় মাতৃত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হতে চেয়ে ব্যর্থ হয়ে মায়ের কাছে নিজেকে সমর্থন করেছে—

‘‘তোমরা আমায় কেটে ফেল্‌তে পারো মা?... আমি কি করব বল। আমার পেটে ছেলে এসেছে। তোমার পায়ের তলায় আমি পড়লাম, যা খুশি করো তোমরা আমায় নিয়ে,

আমি আর পারছি নে।"[৬১]

কিংবা 'দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা' উপন্যাসে মল্লিকা নিজের জীবনের কথা ভেবে আর সন্তান গর্ভে ধারণ করতে চায়নি। প্রতিটি নারীর আর্ত-যন্ত্রণার ভাষা তাদের অন্তর্গত নারীসত্তাকে জীবন্ত করে তুলেছে। এই ভাষা প্রয়োগে কোথাও লেখকের আন্তরিকতার এতটুকু অভাব নেই। এছাড়া 'রতি ও বিরতি' উপন্যাসে পুত্রহারা পিতা রাম ও মা গয়ামণির হাহাকারের ভাষা, 'নিদ্রিত কুম্ভকর্ণে' কাপুরুষ শশধরের স্ত্রীর আত্মাভিমানের ভাষা কিংবা 'নিষেধের পটভূমিকায়' শঙ্কিতা জননী অভয়া, কন্যা শান্তি কিংবা অতুলের ভাষা বাস্তবের মৃত্তিকা থেকে উঠে এসেছে। 'কলঙ্কিত তীর্থ' উপন্যাসে লম্পট স্বামীকে গ্রহণ করতে না পারার নীরব যন্ত্রণার ভাষা যত জীবন্ত, শ্বশুর বাড়ী থেকে বিতাড়িতা মাখনের ত্রিলোকপতির সঙ্গে আদর্শায়িত দাম্পত্য তীর্থে মিলনের ভাষা ততটাই কাল্পনিক হয়েছে। এর থেকে স্পষ্ট যে লেখক যখনি তাঁর অভিজ্ঞতার গণ্ডী ছাড়িয়ে কল্পলোকে তাদের চরিত্রদের নিয়ে গেছেন, সেইসব ক্ষেত্রে আদর্শ আরোপিত ভাষা জীবন্ত হয়ে ওঠে নি।

■ **উপমা-চিত্রকল্প ইত্যাদির ব্যবহার :**

'উপমা' কথাটির অর্থ তুলনা করা। দুটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে তাদের কোনো অন্তর্ধর্মের তুলনা বোঝাতে উপমার প্রয়োগ হয়। জগদীশবাবু তাঁর অভিজ্ঞতার জগৎ থেকেই উপন্যাসের বর্ণনার ভাষায় যেমন উপমা ব্যবহার করেছেন, তেমনি চরিত্রদের বিমূর্ত মানসলোককে পরিস্ফুট করতেও দক্ষ ডুবুরির মতো জীবন সমুদ্রে অবগাহন করে বিচিত্র সব উপমাদি তুলে এনে তাঁর শৈল্পিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছেন।

■ 'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাসে হতাশ নকল সিদ্ধার্থ যখন আত্মহত্যার স্তর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে, তখন তার জীবনে সহসা আসে অজয়া। অজয়ার সেই আগমনকে লেখক রূপক অলংকারের চমৎকারিত্বে তুলে এনেছেন—

"যাহাকে দর্শন মাত্রেই সিদ্ধার্থ ডিগবাজি খাইয়া মরণের তট হইতে জীবনের জ্যোতির্ম্মঞ্চে আসিয়া দাড়াইয়াছে, বলাবাহুল্য সে একটি নারী।"[৬২]

■ ''জলের চেয়ে রক্ত গাঢ় ইহা যেমন সত্য, তেমনি সত্য এই কথাটি যে, রোগের বীজের মতো অভ্যাসও যেন রক্তের আশ্রয়েই চিরজীবী হইয়া থাকিতে চায়।''[৬৩]

■ ''অজয়া পেন্সিলে ছবি আঁকিতেছিল—

পাহাড়ের ঠিক নীচেই একটি পল্লী; তার পশ্চিম প্রান্তে রৌপ্য প্রবাহের মতো নদীটি;[৬৪]

■ 'মহিষী' উপন্যাসে জ্যোতির্ময়ীর স্মৃতিচারণায় স্বামীর সঙ্গে কাটানো সোনালী মুহূর্তের ছবি ভেসে উঠেছে—

''... স্বামীর আদরগুলি একটা স্বচ্ছ নিরবচ্ছিন্ন স্রোতের মত কোথা হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতে থাকে—কাঙালীর মত কাতর চক্ষে চাহিয়া ক্ষণিকের তরে যেন তাহাই দুয়ার ধরিয়া দাঁড়ায়।''[৬৫]

■ ''... ঐ পর্যন্ত বলার পরই যেন সূত্র ছিঁড়িয়া অবশিষ্ট কথাগুলি মধুসূদনের বুকের ভিতর জড় একটা স্তূপের মত পড়িয়া রহিল।''[৬৬]

''পুত্রের জননীর আহত অন্তরের সত্যটি যেন সর্বপ্রকার বাহুল্য বর্জিত জ্বলন্ত একটা বিগ্রহের মত তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।''[৬৭]

■ 'লঘুগুরু' উপন্যাসে খেয়া নৌকায় উত্তমকে দেখে আসার পর বিশ্বম্ভরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লালমোহনের ভাবনায় লেখক জানিয়েছেন—

''স্ত্রীর মৃত্যুর পরেও বিশ্বম্ভর কয়েকবার আসিয়া দু'দশ দিন থাকিয়া গেছে; কিন্তু মুগ্ধ কবিবরের ছবির চক্ষের মত এমন উড়ুউড়ু বিমনাভাব তার কোনদিনই দেখা যায় নাই।''[৬৮]

■ ''পরিতোষের গাম্ভীর্য্য পর্ব্বতের গাম্ভীর্য্যের মত।''[৬৯]

■ ''টুকী যেন কেবল সে-ই নিরালম্ব প্রেতের মত আকাশ পাতাল হাতড়াইয়া তৃণাঙ্কুরের মতো ক্ষুদ্রতম একটা আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরিতেছে।''[৭০]

■ 'দুলালের দোলা' উপন্যাসে শহরবাসী নীরদবরণের চোখে গ্রামীণ প্রকৃতির রূপ ধরা পড়েছে—

''চঞ্চল আলোকখচিত স্থির ছায়া মণিদীপ্ত অন্ধকারের মত প্রসারিত হইয়া আছে এবং

এই অপরূপ ভজনালয়ে পাখির দিবা বন্দনা তখনও শেষ হয় নাই।"[৭১]

■ "... বর্ষার ঐ ভরা নদী! আমরা যেন বুঝতে পারলাম, বাবু, নদীতে যেমন জল ধর্‌ছে না, বিধ্‌বে এই মেয়েটির বুকের চারপাশ তেমনি ভরা জলের ধাক্কায় ভাঙ্‌ছে।"[৭২]

■ "পল্লীর অপবিত্রতা নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিতেই যেন পবনদেব ঝাঁটাইতে শুরু করিয়া দিলেন।"[৭৩]

■ 'যথাক্রমে' উপন্যাসের একেবারে সূচনাতেই চন্ননা নদীর বর্ণনা করে লেখক জানিয়েছেন—

"নদীর বুক বৃদ্ধার স্তনের মত শুকাইয়া আসিতেছে, তবু স্তন্যের মায়ামধু কৃতজ্ঞ স্তন্যপায়ী সন্তানেরা ভুলিতে পারে না।"[৭৪]

■ "আমের আঁটির বাঁশী তৈরীর তখনই সময়, ছাইগাদায় দু'টি মাত্র পাতা লইয়া ডাঁটাটা বাহির হয়, সাপের কচি বাচ্চার মত লিক্‌লিকে আর মসৃণ।"[৭৫]

■ "বলিতে বলিতে মধুরতার সজীব মূর্তির মত মতিলাল অতি ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন।"[৭৮]

'তাতল সৈকতে' উপন্যাসে ঠাকুর চরিত্রের বর্ণনা এরকম—

"গোঁফ-দাড়ি কবে কামান হইয়াছিল, কিন্তু এখন তাহাদের উদ্গম-প্রাচুর্যে ঠাকুরের মুখখানা সশস্ত্র দুর্গের মত দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে।"[৭৭]

■ "...যাঁর হাত দিয়া সৌভাগ্য সুখ মানিক বৃষ্টির মত অজস্র ধারায় মাতা পুত্রের মাথার উপর ছড়াইয়া পড়িবার কথা তিনি তখন কি মনে করিলেন তাহা তিনিই জানেন।"[৭৮]

■ "... মনোহরের প্রশ্নে প্রেতলোক অন্তর্হিত হইয়া ছায়াময় ইহলোক সহস্র বাহু রাক্ষসের মত তার দৃষ্টির সম্মুখে সহসা নাচিয়া উঠিল।"[৭৯]

■ 'সুতিনী' উপন্যাসের রাজবালার বিগত প্রায় সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে লেখক জানিয়েছেন—

"যৌবনের পরিপূর্ণতা তার দেহতটের বহু নিম্নে অবতরণ করিয়া শীতের নদীর মতো ক্ষীণ ধারায় বহিতেছে— তার উল্লাস নাই, তাহাতে শিহরণ নাই।"[৮০]

■ ''রাজবালা দাঁড়াইয়া আছে—নির্ব্বাত আকাশে দগ্ধীভূত মেদগন্ধের মতো তা' দুস্তর আর অবিচল।''[৮১]

■ ''সিঁথির দুই পার্শ্বে দুইটি করিয়া কেশগুচ্ছ কবরীর ভিতর ধরা পড়ে না—দুইটি অর্দ্ধবিকশিত পুষ্পকোরকের মতো ললাট স্পর্শ করিয়া ভাসিতে থাকে।''[৮২]

■ 'রতি ও বিরতি' উপন্যাসের সূচনায় রামের জীবনের একটি সোনালী দিনের স্মৃতিচারণা করানোর মধ্যদিয়ে লেখক বর্ণনা করেছেন—

''অসংখ্য দিন-প্রবাহের মাঝে সে দিনটি জ্বলন্ত একটি বুদ্বুদের মতো উত্থিত হইয়াছিল—এখনও যেন তাহা চোখের সম্মুখে দিবারাত্র হীরকের মত জ্বল জ্বল করিতেছে।''[৮৩]

■ ''নদী শান্ত—মাতৃক্রোড়ে নিদ্রিতা কিশোরী কন্যার মত আনত সৌম্য নীলিমার স্নেহস্নিগ্ধ দৃষ্টির নীচে সে যেন সুপ্তিমগ্ন আনন্দোজ্জ্বল পিতৃরূপী সূর্য্য তার শিয়রে দাঁড়াইয়া মনোহর লাবণ্য-ধারা কন্যার সর্ব্বদেহে মাখাইয়া দিয়াছে—দূর বনানীর নিস্পন্দ শ্যাম লেখাবিন্যাস যেন কিশোরীর অচঞ্চল বেণীর মত, অলস হইয়া উপাধানে পড়িয়া আছে—''[৮৪]

■ ''বুকের কোটের উপর সোনার মোটা চেন ঝুলিতেছে খানিকটা ধনুকের মত বাঁকা, খানিকটা তীরের মত সোজা হইয়া ঝুলিতেছে। ... পায়ের জুতো দর্পণের মত মসৃণ।''[৮৫]

■ 'নিষেধের পটভূমিকায়' উপন্যাসের সূচনাতেই মানুষের পরিচয় প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন—

''প্রত্যেকটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, আর প্রত্যেকটি সামগ্রীর বিদ্যমানতা চিরনবীন আর ধৌত কাণ্ড প্রকৃতির মতো সুশোভন।''[৮৬]

■ ''আমাদের পত্নীদের পতিভক্তি কেমন জানো? গেরস্ত'র ভিক্ষুককে মুষ্টি ভিক্ষা দেওয়ার মত।''[৮৭]

■ ''অভয়ার আঙুলগুলির সুকোমল মাধুর্য্য দেখিয়া চাঁপার কলির মতো আঙুলগুলি যেন একটা অনায়াস স্রোতের মতো একটানা বহিয়া চলিয়াছে।''[৮৮]

■ 'কলঙ্কিত তীর্থ' উপন্যাসে ত্রিলোকপতির চোখে নারী মূর্তির বর্ণনা—

''... একটুখানি লম্বাটে' গড়ন—পরিপূর্ণতায় আর পরিমাণ পারিপাট্যে তার দেহের

অনিন্দ্য আনন্দ সুষমা যেন উৎসের মতো ঝরিতেছে; গতিতে একটি মৃদু লীলা আছে।"[৮৯]

■ "... এইরকম সব কারণেই মানুষের মনের মূল শুকাইয়া যায়—সে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে; মৃতের মতো অসাড় এবং অসাড় অবস্থায় দেহ বহন আর ভগবানে অবিশ্বাস করিতে থাকে।"[৯০]

■ "... উজ্জ্বলতার আবির্ভাব সে অনুভবই করে নাই—অন্তরের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছে, দিক সীমানা পর্যন্ত মরুর মতো রিক্ত, অগ্নি নিঃশ্বাসে জর্জরিত, অভাবে বিধুর।"[৯১]

এইভাবে একের পর এক উপন্যাসে লেখক অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে, জীবনের পরিচিত বৃত্ত থেকেই নানারকম উপমাদি চয়ন করে কাহিনী-চরিত্র চরিত্রের অন্তর্লোককে পরিস্ফুট করেছেন। এইসব উপমাদিতে কোনরকম কৃত্রিমতা নেই, একেবারে দেশজ উপাদানে এগুলি পরিপূর্ণ। এইসব অলংকারের পাশাপাশি চিত্রকল্প সৃষ্টিতেও তাঁর স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় রেখেছেন। ইংরেজী 'Image' শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবেই চিত্রকল্প, রূপকল্প, কল্পচিত্র, বাক্ প্রতিমা ইত্যাদি ব্যবহৃত হলেও 'চিত্রকল্প' কথাটিই অধিক প্রচলিত। এই চিত্রকল্প যেন আবেগ সংরক্ত শব্দ চিত্র। এক্ষেত্রেও জগদীশবাবু তাঁর চারপাশের জীবন থেকে এইসব আবেগ সংরক্ত শব্দচিত্র নির্মাণ করেছেন অনায়াসে। তাঁর নির্মিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চিত্রকল্প এরকম—

"... অন্ধকার এইখানে। কান পেতে থাকো, একটা শব্দ শুনতে পাবে। ভগবানের অভিসম্পাত বুকের গহ্বর জুড়ে চেপে বসে আছে; তার ভেতর থেকে অবিশ্রান্ত উঠছে পৃথিবীর গোঙানি।"[৯২] — 'অসাধু সিদ্ধার্থ'।

এই চিত্রকল্প সিদ্ধার্থ'র মানসিকতাকে প্রকাশ করেছে। এর কোনো বিকল্প ভাষা হয় না, কারণ নির্জ্ঞান মনের প্রকাশের এটাই একমাত্র পথ। ড. ক্ষেত্র গুপ্ত প্রসঙ্গতঃ লিখেছেন—"... এ জাতীয় চিত্রকল্প অনেক। রঙ সেখানে চড়া, ধ্বনি কর্ণবিদারী কখনো অনাহত—সব কটা ইন্দ্রিয় আবেদন উত্তেজক। এইভাবে একটা কল্প জগৎ তৈরী হয়ে ওঠে যা রুগ্ন মানসিকতার স্বভূমি।"[৯৩]

■ "নদীর জল তখন 'ধীরে পবনে ঢেউ তুলিয়া' নৌকার গায়ে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ করিতেছে—পূর্বাহ্নের অনুতপ্ত রৌদ্র তখন সুন্দর—দিগ্বলয়লগ্ন সবুজের গায়ে সুন্দর নদীর

নির্মল জলে সুন্দর আকাশের নীল অঙ্গে সুন্দর।"[৯৪] — 'লঘু গুরু'

এখানে খেয়া পারাপারের সময় উত্তমকে দেখে বিশ্বম্ভরের কামজ ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে।

■ অদূরে অন্ধকার-মগ্ন সেই ফলবান বৃক্ষটিতে তখন নিশাচর পক্ষীর আগমন সশব্দ হইয়া উঠিয়াছে। তীক্ষ্ণকণ্ঠ একটি কীট কর্কশ সুর অবিশ্রান্ত টানিয়া চলিয়াছে—ছায়াপথ স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে, দুটি সুবৃহৎ তেঁতুল গাছের পাতায় পাতায় ডালে ডালে মেশামেশি হইয়া গেছে।"[৯৫] — 'লঘুগুরু'

দীর্ঘ এই সংরক্ত শব্দ চিত্রে টুকীর জীবনের আগামী দিনগুলির ভয়াবহতার পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে।

■ 'তাতল সৈকতে' উপন্যাসে রাত্রি নেমে এলেও একমাত্র পুত্র ঘরে না ফেরায় মা শরতের অন্তরের অবস্থাকে লেখক একটি সুন্দর চিত্রকল্পের সাহায্যে তুলে ধরেছেন—

"... বাহিরের ঘন অন্ধকার ঘনতর হইয়া দূরের আকাশ দূরের দৃশ্য যেন চিরদিনের মত গলাধঃকরণ করিয়া অজগরের মত অগ্রসর হইতে লাগিল।... কলের চিম্‌নিটা, শ্বেত একটা অট্টালিকার খানিকটা, ফলশোভিত খর্জুর বৃক্ষটি, গৃহচূড়াগুলি...
চির পরিচিত যারা তারা চোখের সম্মুখে যেন অন্ধকারের জঠরে নিরবশিষ্ট হইয়া একে একে নিঃশব্দে জীর্ণ হইয়া যাইতেছে।"[৯৬]

■ "... একটি শীর্ণদেহা কুক্কুরী ছুটিয়া আসিল পশ্চাতে তার পাঁচটি স্তন্য পিপাসু সন্তান, কুক্কুরী অদূরে পা মেলিয়া দিয়া মাথা খাড়া করিয়া শুইল; বাচ্চাগুলি স্তনে মুখ লাগাইবার শশব্যস্ত ব্যাকুলতায় কাহার ঘাড়ে কে চাপিল তাহার ঠিক রইল না।"[৯৭] — 'রোমন্থন'
গ্রামদেশকে যে পরিকল্পনাহীন ভাবে যে যার মতো দখল করে শ্রেণী বৈষম্য তৈরী করছে তার ব্যঞ্জনা এখানে ধরা পড়েছে।

■ "এতবড় আকাশের যেখানে যে জ্যোতির্বিন্দুটি ছিল মেঘের গাঢ় প্রলেপে তাহা একেবারে চিহ্নহীন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে। থইথই অন্তহীন কালোর পাথারে পৃথিবী ডুবিয়া গিয়াছে।"[৯৮] — 'কলঙ্কিত তীর্থ'

নারী ঘটিত অপরাধ করে জেল প্রত্যাগত স্বামী সাতকড়িকে গ্রহণ করতে না পারার

প্রসঙ্গে স্ত্রী মাখনের মানসিক অবস্থা ব্যক্ত হয়েছে। এইভাবে প্রায় সব উপন্যাসেই জগদীশ গুপ্ত নানা অনুষঙ্গে চিত্রকল্পের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন অত্যন্ত যথাযথভাবে। এইসব চিত্রকল্পের প্রয়োগ সম্পর্কে সমালোচক ড. তরুণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

''জগদীশ গুপ্তের গল্প, উপন্যাসে চিত্রকল্প প্রয়োগ তখনই সার্থক হয়েছে, যখন তিনি তার দ্বারা মানুষ ও প্রকৃতির অন্তঃসারকে ব্যঞ্জিত ও মূর্ত করে তুলতে পেরেছেন। জগৎ ও জীবনের প্রতি তাঁর যে বক্র দৃষ্টি ছিল, তাও প্রতিফলিত হয়েছে চিত্রকল্পে।''[৯৯]

■ **বাক্য গঠনের স্বাতন্ত্র্য :**

জগদীশ গুপ্ত তাঁর উপন্যাসগুলির কাহিনী বর্ণনায় বাক্য প্রয়োগ যেভাবে করেছেন, তার মধ্যে দিয়েও লেখকের নিজস্বতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কাহিনী বর্ণনায় বহুক্ষেত্রেই সংযত বাক্ আবার কোথাও কোথাও তিনি অনেক জটিল ও দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করেছেন।

'গতিহারা জাহ্নবী' উপন্যাসে স্বামী অকিঞ্চনের লোলুপ নজরে পড়েছিল কিশোরীর সখি অপরা। তার না আসার কথা এবং কিশোরীর উদ্বেগহীনতা বোঝাতে লিখেছেন—

''অপরা আসিল না।

কিশোরী বাঁচিয়া গেল।''[১০০]

আবার অকিঞ্চনের এই পরনারী লোলুপতা নিয়ে মায়ের কাছে তার বকুনি খাওয়া এবং কিশোরীর কাছে ক্ষমা চাওয়া প্রসঙ্গে কিশোরীর মনের অবস্থা বর্ণনায় দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করেছেন লেখক—

''... পরস্ত্রীর প্রতি স্বামীর এমন নির্লজ্জ ক্ষুব্ধতা আর লোভের এমন বর্ব্বর প্রকাশ কোনো নারীর সহ্য হইবার কথা নয়; কিন্তু যে সজীব বাক্যগুলি কেবল মানুষের বারম্বার আবৃত্তিতে ফুসফুসের হাওয়া খাইয়া জীবন দৈর্ঘ্যে অনন্ত এবং স্ফীতিতে অনতিক্রম্য হইয়া আছে তাহাকে লঙ্ঘন করিতে পা তুলিলেই ভ্রষ্ট হইতে হইবে, সে অপরাধের মার্জনা ইহকালেও নাই, পরকালেও নাই, ইহাই সনাতন নিয়ম; কারণ তলায় ক্ষুদ্রতম ছিদ্র থাকিলেই জলের কলসী যেমন অকেজো হইয়া যায়, তেম্‌নি তুচ্ছতম স্থানেও নিয়মকে লঙ্ঘন করিলেই লঙ্ঘনের প্রবৃত্তি সহজ হইয়া নিয়মকে ব্যর্থ করিতে পারে।''[১০১]

'তাতল সৈকতে' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শরতের স্বামী মারা গেলে লেখক শুধু লিখেছেন—

"শরৎ বিধবা হইল।"[১০২]

আবার 'রোমন্থন' উপন্যাসের এক জায়গায় অভয়ের মনের গহনলোকের ছবি অংকন করেছেন এভাবে—

"সে জানে না যে, মানুষের মন দিগ্বলয়ের দিকে চাহিয়া মহাকালের হস্তান্দোলন দেখিতে দেখিতে একবার তার ছেদের অবসরে সূর্য্যাস্তের আলোক প্লাবন দেখিয়া মোহের আবেশে মৃত্যুকে বিস্মৃত হইতে পারে, সলিলাবর্তের মাঝে ঘুরিতে ঘুরিতে তলাইয়া যাইবার সময় মন চাঁদের দিকে চাহিয়া সে পথের কথা মুহূর্তের জন্য ভুলিয়া যাইতে পারে, যে-পথে মৃত্যু তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, রাক্ষসের মুষ্ঠির ভিতর হইতেও মানুষ প্রিয়জনের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিতে পারে, সব অভিমান আর অনুভূতি নিষ্ক্রান্ত হইয়া মানুষ যখন কেবল পশুর ধর্ম্ম পালন করিয়া চলে, তখন লুপ্ত চৈতন্য যদি একবার ফিরিয়া আসিতে পায় তবে দানবীয় অন্ধ উল্লাসে একটি তরঙ্গে আসে।"[১০৩]

উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনায় অজস্র dots বা ফুট্‌কি চিহ্নের প্রয়োগ করেছেন অনেকটা মুদ্রা দোষের মতো। এই চিহ্ন ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অবশ্য তিনি বিভিন্ন অর্থের ব্যঞ্জনা এনেছেন। কখনো সময়ান্তর বা প্রসঙ্গান্তর বোঝাতে, কখনো ব্যাপ্তি বোঝাতে তিনি ব্যঞ্জনাগর্ভ এইসব ফুট্‌কি চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। যেমন 'তাতল সৈকতে' উপন্যাসের একটি অংশে এরকম ফুট্‌কি চিহ্ন যুক্ত বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন—

"... অভাবের কথা উঠিতেই তাঁহার মুখে যে ছায়া পড়িত... শরৎ জানিত, তাহা বড় গুরুতর। ... স্বামীর মুখের প্রত্যেকটি রেখা তার পরিচিত... রেখার ইঙ্গিত সে কখনো ভুল বোঝে নাই—সেই পাঁচ বছর বয়স হইতে বিদুর তার খেলার সাথী... এক পলকে ভাব, এক পলকে আড়ি ... মারামারি, কাড়াকাড়ি—মাছের মাথা খাবো ব'লে দু'জনার সেই জিদ..."[১০৪]

'কলঙ্কিত তীর্থ' উপন্যাসের একটি অংশ—

"... অসংখ্য যাতায়াত, অজস্র অর্থ ব্যয় ... কত কি বিশৃঙ্খলতা; কিন্তু প্রত্যেকটি ঘটনা

স্বতন্ত্র এবং স্পষ্ট ... তারপর সুদীর্ঘ সশ্রম কারাবাস ... দেহের শক্তি যেন নিঙ্‌ড়াইয়া বাহির করিয়া লইয়া তাহারা কাজে লাগাইয়াছে ... নিদারুণ দাসত্ব—”[১০৫]

‘মহিষী’ উপন্যাসের একটি বর্ণনা—

“... সরে যা ... সামনে থেকে ..। বেহায়া!

চক্ষের নিমেষে একটা বিপ্লব কাণ্ড ঘটিয়া গেল।’ ... সংসারের কর্তা স্বরূপে ছেলেকে ও বৌমাকে শাসন করিয়া এবং স্ত্রীকে উপদেশ দিয়া ব্রজকিশোর চলিয়া গেলেন।... এবং অশোকের মনে দুঃসহ একটা অগ্ন্যুৎপাত শুরু হইয়া গেল ...”[১০৬]

ব্যাকরণ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতনতার জন্য জগদীশবাবু বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। যেমন সংযোজক অব্যয় হিসেবে ‘এবং’ এর পরিবর্তে প্রায়ই ‘আর’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ‘যথাক্রমে’ উপন্যাসের একটি বর্ণনা এরকম—

“হাট তাঁর অর্থাৎ তাঁর মাটিতেই বসে, আর পরিণাম শঙ্কায় বিশেষ ব্যাকুল হইয়াই তিনি চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছেন... সেখানে একটা বাঁশের খুটির সঙ্গে লম্বা শিকল দিয়া সুগ্রীব বাঁধা থাকিত আর ঝিমাইত।... তারপর অনেকেই ... দাঁড়াইয়া সুগ্রীবের গ্রীবাভঙ্গী, ভোজনকৌশল আর চর্বণ পটুতা দেখে, আর তারিফ করে।... দীনবন্ধু আর সাবিত্রী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শোনে, হাসির কথায় সকলের সঙ্গে হাসে, আর মানুষের আর রামপ্রসাদের ফাইফরমাশ খাটে।”[১০৭]

দীর্ঘ এই বর্ণনায় সংযোজক হিসেবে কোথাও ‘এবং’ ব্যবহৃত হয়নি। এমন অজস্র বর্ণনা উপন্যাসগুলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

শব্দ প্রয়োগের সময় তিনি খুব নিখুঁতভাবে 'Apostrophe' বা উর্ধ্ব কমা (’) চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। তা’র, তা’, তা’কে ইত্যাদি সর্বনাম ছাড়াও উচ্চারণে সাধারণত শব্দের শেষে যেখানে ‘ও’ এর উচ্চারণ হয় সেখানেও উর্ধ্বকমা ব্যবহার করেছেন। আবার শব্দের যত্রতত্র হস্‌ চিহ্ন (্) প্রয়োগ করেছেন উচ্চারণে বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে। কয়েকটি বাক্যাংশ উল্লেখ করা যায়—

- ঘর ছাড়তেই হ’ত।

- বেশী দূর ত' নয়।
- আপ্‌নি গেছে বেঁচেছি।
- ছেলে পিলেও হ'তে পারে দু'জনারই।
- ঢেঁকির ললাটে সিঁদুর মাখান'।
- বল্‌ব সার্‌, ভূতের চাইতেও গেছো, এখন দেখ্‌ মজা।
- ছেলেটা নিতান্ত বদ্‌মায়েস স্টুপিড্‌ ছেলে।
- পাট্‌ তুল্‌ছিনে শীগ্‌গির।
- পয়সার লেন্‌দেন্‌ ছিল।

এমন বর্ণনা উপন্যাসের পাতায় পাতায় পাওয়া যায়। শব্দ সচেতন শিল্পী হিসেবে লেখক চরিত্রানুযায়ী যেমন বাস্তবোচিত শব্দ ব্যবহার করেছেন, তেমনি তৎসম শব্দের পাশাপাশি অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব, বিদেশী ইত্যাদি শব্দ অনায়াস ভঙ্গীতে প্রয়োগ করেছেন তাঁর বর্ণনার প্রয়োজনে। ব্যবহার করেছেন যত্রতত্র 'ড্যাস চিহ্ন' ('—')। যেমন—

- মন্তর মেয়েকে বাঁধার কৌশল।
- চক্কোত্তির পরিবার তার শোবার ঘরে।
- তারও নিব্বংশ হবার ভয় থাকে।
- ওদের মনে ঘেন্না নাই।
- চক্কোত্তির ঘরে অতিথ্‌ হয়।
- কেরোসিন ল্যাম্পের উপর আমাদের লণ্ঠনের আলো পড়িল।
- সান্‌লাইট সোপ্‌ নিয়েছিস?
- লুক বিফোর ইউ লিপ।
- 'জার্ম' লোকের বিছানায় বজ্‌বজ্‌ করছে।
- ওষুধ দিয়ে কুইনিনের কয়েকটা পিল করে দেবখন্‌। ইত্যাদি।

এমন শব্দ-মিছিল লক্ষ্য করা যায় উপন্যাসে।

'ড্যাস' ('—') চিহ্নের ব্যবহারও রয়েছে বহু ক্ষেত্রে—

- বলিল—বড়ই অভিমান যে। —ডাকছি তা' আসা হ'চ্ছে না... ঢং দেখলাম বিস্তর। ... নেও হয়েছে, এখন এস। —না আমায় উঠতে হবে—"
- এখন সে কোথায়—কেমন তার দশাটা—কে জানে—
- মাখন বলিল,—উঠে কি ক'রবো?—

ইত্যাদি বর্ণনাকে প্রাঞ্জল ও বাস্তব জীবনঘেঁষা করবার স্বতঃস্ফূর্ততায় অজস্র প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করেছেন লেখক। যেমন—

- 'শ্বশুর ঘরই মেয়ে মানুষের তীথ্য।' — 'রোমন্থন'।
- 'চোরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া মাটিতে ভাত খাওয়া' —'দুলালের দোলা'।
- 'নরম কাঠে ছুতোরের বল' — 'দুলালের দোলা'।
- 'থাল ভরে' বেড়' ভাত আমি যুবতী,
  কাজে কর্ম্মে' বল' নাক আমি পোয়াতী।' —'যথাক্রমে'।
- 'সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।' —'কলঙ্কিত তীর্থ'। ইত্যাদি।

শুধুমাত্র বিষয়ের স্বাতন্ত্র্যে নয়, এইভাবে আঙ্গিকগত ও ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেও জগদীশগুপ্ত ছিলেন তাঁর কালের একেবারে স্বতন্ত্র ঔপন্যাসিক ব্যক্তিত্ব। ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায় তাঁর এই ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে স্পষ্টতই লিখেছেন—

"... জীবনকে বাঁকা চোখে দেখেছেন বলেই জগদীশগুপ্তের গদ্যশৈলীতেও সাহিত্য সৃষ্টির প্রথাগত ভঙ্গি বর্জিত হয়েছে। একটি বস্তুবাদী মানুষ জগৎ ও জীবনকে যেভাবে দেখে সেইভাবেই তিনি দেখেছেন এবং নির্মোহ গদ্যভঙ্গিতে দেখিয়েছেন।"[১০৮]

তথ্যসূত্র :

১. পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদ, প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, ড. তপোধীর ভট্টাচার্য, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পৃ. ৮৩।

২. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পত্রগুচ্ছ অংশ, গ্রন্থালয় প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৬০৮।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১১।

৪. জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, বসুবতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, পৃ. ১৫৭।

৫. রচনাপ্রসঙ্গ ও রচনার প্রতিলিপি অংশ, দুষ্প্রাপ্য জগদীশ গুপ্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনা : রাজীব চৌধুরী, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৩০৭।

৬. সূচনা, চোখের বালি, রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ. ৩৭৩।

৭. জগদীশ গুপ্ত, ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, ২০০০, পৃ. ৬৬।

৮. উপন্যাসে তমসাবৃত জীবন : নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ড. সরকার আবদুল মান্নান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৪০।

৯. জগদীশ গুপ্তর কথাসাহিত্য : ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের আলোকে, ড. প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, বেস্ট বুক্‌স্‌, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৮৫।

১০. বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০৮, পৃ. ২৭৮।

১১. পত্র, জগদীশ গুপ্ত, আবুল আহসান চৌধুরী, বাংলা একাডেমী ঢাকা, পৃ. ৫৮।

১২. ভিন্ন সন্ধান, ভিন্ন আঙ্গিক : উপন্যাসে জগদীশ গুপ্ত , জগদীশ গুপ্ত : জীবন ও সাহিত্য, ড. সমরেশ মজুমদার সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১৭৩।

১৩. Asects of the Novel, Doaba Publications, First Indian Edition, 2014, p. 28.

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫।

১৫. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রা. লি., পৃ. ৬৩৮।

১৬. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৪১।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬।

১৯. বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০৮, পৃ. ২৭৬।

২০. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃ. ২৩৫।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৩।

২২. বিধবা রতিমঞ্জরী, জগদীশ গুপ্তর গল্প, সম্পাদনা : সুবীর রায় চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯১, পৃ. ১।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

২৪. জগদীশ গুপ্ত গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃ. ১৫৪।

২৫. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃ. ১০০।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬।

২৭. দুষ্প্রাপ্য জগদীশ গুপ্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনা : রাজীব চৌধুরী, সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১০, পৃ. ১৪৮।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪।

৩১. জগদীশ গুপ্ত, সাহিত্য-অকাদেমী, নতুন দিল্লী, ২০০০, পৃ. ৯৮।

৩২. উপন্যাসে জীবন ও শিল্পী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮, পৃ। ৪৯।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩।

৩৫. ১৯৪৬-৪৭, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৩৮।

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

৩৭. জগদীশ গুপ্ত : নারী ও সমাজচেতনা; জগদীশ গুপ্ত : জীবন ও সাহিত্য সম্পা: ড. সমরেশ মজুমদার, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১২, পৃ. ১৯৮।

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০।

৪১. স্ত্রীর চোখে লেখক জগদীশ গুপ্ত, বারোয়ারী শারদীয়া ৮, অশোক সেন সম্পাদিত, পৃ. ৪৫।

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭।

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২।

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪।

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২।

৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭।

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯।

৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪।

৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯।

৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮।

৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭।

৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০।

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৯৫।

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২।

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪।

৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬।

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪।

৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮।

৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪।

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

৮৬. দুষ্প্রাপ্য জগদীশ গুপ্ত, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা : রাজীব চৌধুরী, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৯৭।

৮৭. প্রাগুক্ত, ১২৯।

৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

৮৯. দুষ্প্রাপ্য জগদীশ গুপ্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনা : রাজীব চৌধুরী, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৫৫।

৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।

৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮।

৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪।

৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২।

৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।

৯৯. (গদ্যে চিত্রকল্প : প্রসঙ্গ জগদীশ গুপ্ত) জগদীশ গুপ্ত : জীবন ও সাহিত্য, সম্পাদনা : সমরেশ মজুমদার, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ২২০।

১০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

১০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

১০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬।

১০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫।

১০৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭।

১০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬।

১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।

১০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

১০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

অষ্টম অধ্যায়
ঔপন্যাসিক হিসেবে মূল্যায়ন

"জগদীশ গুপ্ত কোনোদিন কল্লোল-অপিসে আসেননি। মফস্বল শহরে থাকতেন, সেখানেই থেকেছেন স্বনিষ্ঠায়। লোককোলাহলের মধ্যে এসেই তিনি সাফল্যের সার্টিফিকেট খোঁজেন নি। সাহিত্যকে ভালোবেসেছেন প্রাণ দিয়ে। প্রাণ দিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। স্বস্থান সংস্থিত একনিষ্ঠ শিল্পকার।

অনেকের কাছেই তিনি অদেখা, হয়তো বা অনুপস্থিত। নদী বেগ দ্বারাই বৃদ্ধি পায়। আধুনিক সাহিত্যের নদীতে তিনি একটা বড় রকমের বেগ।"[১]

বাস্তবিক অর্থেই 'স্বস্থান সংস্থিত একনিষ্ঠ শিল্পকার' ছিলেন জগদীশ গুপ্ত। একেবারেই অন্য ধারার শিল্পী ব্যক্তিত্ব। আসলে সত্যিকারের প্রতিভারা এমনই হয়। তাঁরা সমসময় যুগের অনেক আগে জন্মান। যুগ যদি হয় একটি ছোটো সাইজের জুতো, তাহলে প্রতিভা হল বড় আকারের পা। যদি ওই পায়ে ছোটো জুতোজোড়া পড়তে হয়, তাহলে সেই পা'কে ক্ষত-বিক্ষত হতেই হয়। অনেক কাল পরে সেই প্রতিভার মূল্যায়ন হয়; হয়তো তখন আর সেই প্রতিভা ইহজগতে থাকেন না। বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ধারার শেষ সক্ষম কবি হিসেবে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের আবির্ভাব হয়েছিল। সেই সমসময়ে ভারতচন্দ্র অনায়াসেই বলেছিলেন—

"পড়িয়াছি সেইমত, লিখিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি।।
না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।।"[২]

কতটা আত্মপ্রত্যয় থাকলে এমন অকপট সত্য উচ্চারণ করা যায়। তবুও সেই ১৭৫২ খ্রীঃ বাংলাদেশের সমাজ প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে। কিংবা সেই দৈব নিয়ন্ত্রিত সমাজের মাটিতে দাঁড়িয়ে যিনি উচ্চারণ করতে পেরেছেন, 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।' এহেন প্রতিভার প্রকৃত

মূল্যায়ন হয়েছে অনেক পরে। রবীন্দ্রনাথের মতো আরেক প্রতিভা বুঝেছিলেন; ভারতচন্দ্রের কাব্য রাজকণ্ঠের মণিমালার মত, যেমন তার উজ্জ্বলতা, তেমনি তার কারুকার্য। কিন্তু প্রকৃত প্রতিভারা এরকম মূল্যায়িত হবার কোনো প্রত্যাশা রাখেন না। তাঁরা নিজের খেয়ালেই সৃষ্টি করে যান। এই সৃষ্টির আনন্দই তাঁদের কাছে বড় প্রাপ্তি। তাঁরা 'বর্তমানের কবি' হয়েই জন্মান, ভবিষ্যতের 'নবী' হবার কোনরকম স্বপ্ন তাঁরা দেখেন না। বরং তাঁরা সমকালের অন্যদের জন্য জায়গা ছেড়ে দেন অনায়াসেই। কাজী নজরুল ইসলাম যেভাবে তাই লিখেছিলেন—

''বড়কথা বড় ভাব আসে নাক' মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে!
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু যাহারা আছ সুখে!
পরোয়া করি না, বাঁচি বা না-বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে
মাথার ওপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।''[৩]

এটাই প্রকৃত প্রতিভার ধর্ম। তাঁরা যথার্থ বিনয়ী। সৃষ্টির সুধারস তাঁর বিলিয়ে দেন জীবনের হলাহল পান ক'রে। ভাবীকালের পাঠক তাঁদের খুঁজে নেয় ফেলে আসা পথের ধার থেকেও। যুগে যুগে এটাই হয়ে এসেছে। হয়ে আসছে। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের উত্তরসূরী কল্লোলীয়দের তুলনায় খানিকটা বয়ঃজ্যেষ্ঠ জগদীশবাবুও ছিলেন এমন একটি 'অনুপস্থিত', 'অদেখা' প্রতিভা—যিনি সমকালের কোনোরকম স্বীকৃতি বা সম্মানের কথা না ভেবে কোনোরকম প্রচারের আলোয় না এসে নীরবে নিঃভৃতে বসে সাহিত্য-সাধনা করেছেন। কলকাতা কেন্দ্রীক পাদপ্রদীপের আলো থেকে দূরে বসে, মফঃস্বল শহরের কলোনীর ঘরে বসে সৃষ্টি করে গেছেন একের পর এক উপন্যাস ও ছোটোগল্প। দীর্ঘ তিন দশক ধরে চলেছে এই নিঃভৃত সাধনা। কাজী নজরুল ইসলামের মতোই তিনি অন্যদের জন্য চিরন্তন সাহিত্য রচনার জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়েছিলেন। 'কালিকলম' পত্রিকায় সম্পাদক মুরলীধর বসুকে কুষ্ঠিয়া থেকে একটি চিঠিতে নিজের লেখার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা সম্পর্কে খুব স্পষ্ট করেই জানিয়েছিলেন—

''লোকের মুখে আমার লেখার প্রশংসা শুনিয়া আপনার বিদেশ ভ্রমণের আনন্দ বাড়িতেছে শুনিয়া যথার্থই তৃপ্ত হইয়াছি। আনন্দ দেওয়া আর আনন্দ পাওয়া ছাড়া লেখার

আর কোনো সার্থকতা আমি প্রত্যাশা করি না। যাঁহারা অসাধারণ প্রতিভা লইয়া লিখিতে বসেন, তাঁহারা ইতিহাস উজ্জ্বল করিয়া তোলেন, কিন্তু আমাদের সাময়িক একটু আনন্দই হয় লাভ।"[৪]

এমন অকপট সত্য-ভাষণ জগদীশবাবুর মতো প্রতিভাই উচ্চারণ করেছেন নির্দ্বিধায়। তবে তিনি কেবলই সাময়িক আনন্দটুকু লাভ ছাড়াও যে ভাবীকালের সাহিত্য পাঠকদের জন্য আরও অতিরিক্ত কিছু রেখে গেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এরই পাশাপাশি সমকালের বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর ভাবনার প্রসঙ্গ টেনে নিজের অভিমতকে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ব্যক্ত করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু বাঙালী গল্পকারদের বিষয়বস্তুর অভাবজনিত সমস্যার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন যে, কবিতার চর্চা যত অনায়াস ভঙ্গীতে স্বতঃস্ফূর্ততা লাভ করতে পারছে, সেই তুলনায় ছোটগল্পের সম্ভাবনা খুবই কম। এবিষয়ে জগদীশবাবু তাঁর আপত্তির কথা জানিয়ে মুরলীধর বসুকে আরেকটি চিঠিতে লিখেছিলেন—

"... আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয়, শুধুমাত্র সামাজিক বা সাংসারিক ঘটনা লইয়া গল্প লিখিবার রেওয়াজ যখন ছিল, তখন একথা বলা চলিত। কিন্তু, এখন সে কায়দা ত' নাই... উন্মুখ প্রবৃত্তি লইয়াই এবং মনোভাবের বিশ্লেষণ করিয়াই এখন গল্প লেখা চলিত হইয়াছে। কাজেই মানুষের বিভিন্ন প্রবৃত্তির সঙ্গে যার যত পরিচয়, বা সে বিষয়ে যার যত অন্তর্দৃষ্টি, তার গল্প তত বিচিত্র হইবে।"[৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই সময় জগদীশবাবু বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে ছোটোগল্পের 'উল্কাবৃষ্টি' করছেন এবং 'তাঁর পক্ষে উপন্যাস লেখা প্রায় অসম্ভব-দুরূহ' বলে স্বীকারোক্তিও করেছেন। কিন্তু এটাও ছিল তাঁর নিতান্ত অহংবোধ শূন্যতার অমায়িক পরিচয়। কারণ এই ধরণের বিনম্র ভাষায় অক্ষমতা প্রকাশ করার মাত্র দু'বছরের মধ্যে 'অসাধু সিদ্ধার্থে'র মতো উপন্যাস লিখে ফেলেছেন। এবং এই উপন্যাসটি যে শিল্প হিসেবে যথেষ্ট উৎকৃষ্ট মানের তা সমালোচকদের দ্বারা সমর্থিতও হয়েছে পরবর্তী সময়কালে।

■ বাংলাদেশের বিশিষ্ট সমালোচক ড. সরকার আবদুল মান্নান উপন্যাসটি সম্পর্কে জানিয়েছেন—

‘‘... অসাধু সিদ্ধার্থ জগদীশ গুপ্তের সবচেয়ে পরিচিত উপন্যাস। আর এই উপন্যাসটি দিয়েই শুরু হয়েছে বাংলা কথা সাহিত্যের নতুন যুগের।’’[৬]

কিংবা, আরেক জায়গায় তিনি লিখেছেন—

‘‘... স্বাভাবিকতা নামক একটি আশ্চর্য বিষয় আছে লেখকের দখলে, যার পরাকাষ্ঠা আমাদের স্বাভাবিকতাকে অতিক্রম করতে শিখিয়ে দেয়—যার বিকল্প স্বাভাবিকতা পাঠক ভাবতেও পারে না। অসাধু সিদ্ধার্থ এই ধরণের স্বাভাবিকতার উজ্জ্বল নিদর্শন। বাংলা সাহিত্যে পরবর্তীকালে এই স্বাভাবিকতাকেই ব্যবহার করেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দিবারাত্রির কাব্য, পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসে।’’...[৭]

■ অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘বাংলা উপন্যাসের কালান্তর’ গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন—

‘‘... জগদীশ গুপ্তের কাছে এই গল্পের অর্থ অন্যতম। ‘নিজে যা নয় ছদ্ম আচরণে নিজেকে তাই প্রতিপন্ন করবার প্রাণান্ত প্রয়াস তো প্রত্যেকেরই জীবনের এক অংশ’—এই জীবনগত চিরন্তন অদৃষ্ট লিখনের টানে আমাদের ব্যর্থতার জন্ম। সিদ্ধার্থের ছদ্মবেশের ব্যর্থতা প্রকৃতপক্ষে তার জীবনের ব্যর্থতা।’’[৮]

ড. সুমিতা চক্রবর্তী উপন্যাসটির খানিকটা সমালোচনা করেও লিখেছেন—

‘‘অপরূপ কবিত্বময়, গভীর ও সূক্ষ্মতম মনস্তত্ত্বের কারুকার্যে সাজানো—প্রেমের, সততার, শুদ্ধতার স্বপ্ন জড়ানো—বাস্তবে প্রতীকে মেলানো ‘অসাধু সিদ্ধার্থ’ উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ হয়ে থাকে।’’[৯]

এইসব আলোচনায় উপন্যাসের, বিশেষ করে আধুনিক কালের বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই উপন্যাসটির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আমাদের কোনরকম সংশয় থাকে না।

প্রথম উপন্যাস ‘অসাধু সিদ্ধার্থ’ (১৯২৯) এর স্বীকৃতি থেকে মৃত্যুর তিন বছর পর প্রকাশিত ‘কলঙ্কিত তীর্থ (১৯৬০) পর্যন্ত তিন দশক কাল ধরে জগদীশ গুপ্ত ঔপন্যাসিক হিসেবে বাংলা উপন্যাসের ধারায় একটি নিজস্ব ঘরানা গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। সেদিক থেকে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ-প্রভাত কুমার-শরৎচন্দ্র এবং অন্যদিকে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক

শৈলজানন্দ-প্রেমেন্দ্র মিত্র-অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মধ্যবর্তী সেতু স্বরূপ। তাঁর এই ঔপন্যাসিক প্রতিভার স্বীকৃতি জানিয়ে অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপ্যায় লিখেছেন—

"রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্রের যৌথ প্রয়াসে যে সাহিত্য রুচি গড়ে উঠেছিল, সেই আবহাওয়ার বিরুদ্ধে প্রথম সার্থক শিল্পী প্রতিবাদ জগদীশ গুপ্তের। জগদীশ গুপ্তের বিভিন্ন সৃষ্টি একটা গোটা সাহিত্যিক যুগের প্রতিক্রিয়া সঞ্জাত। সেই গভীর তাৎপর্যেই এই লেখক বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয়। অন্যদের ক্ষেত্রে যেখানে প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটা ছিল বুদ্ধি সম্ভব উপলব্ধি, জগদীশ বাবুর ক্ষেত্রে সেখানে উপলব্ধিটা জীবনবোধের ফল। জীবনের গূঢ় সমস্যা হিসেবেই তিনি বিষয়গুলিকে শিল্পী হিসাবে ধারণ করেছিলেন।"[১০]

স্বভাবতই জগদীশগুপ্তের কালের সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর একটা মেরুকরণ হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মেরুকরণগুলি হল—

■ **রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশ গুপ্ত :**

আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে কীসে আর কীসে। কিন্তু সুগভীর বিশ্লেষণের নিরীখে দেখা যাবে, জীবন-সমুদ্র মন্থন করে রবীন্দ্রনাথ যেমন উজ্জ্বল মুক্তো তুলে এনেছিলেন তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যদিয়ে, তেমনি জগদীশ গুপ্ত তুলে এনেছিলেন অসংখ্য কালোমুক্তো। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা উপন্যাসের যে সূচনা তা আধুনিক জীবনের রাজপথ ধরে এগিয়ে গিয়েছে রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে। ১৮৬৫-১৮৮৭ খ্রীঃ পর্যন্ত বঙ্কিম উপন্যাসের যে ধারা ক্রমশঃ রুদ্ধ হয়ে এসেছিল তাকে নতুন ভাবে গতি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ১৯০৩-১৯৩৪ খ্রী পর্যন্ত উপন্যাসের মধ্যদিয়ে। ১৮৭৭ খ্রীঃ তাঁর প্রথম উপন্যাস 'করুণা' ধারাবাহিকভাবে 'ভারতী' পত্রিকায় বেরিয়েছিল, যেটিকে উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বালকোচিত কাঁচা বয়সের লেখা বলে স্বীকৃতি দেননি। আর ১৮৮৩ খ্রীঃ 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' এবং ১৮৮৭ খ্রীঃ প্রকাশিত 'রাজর্ষি' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের ছায়া তখনও ছিল। সেদিক থেকে 'চোখের বালি'র (১৯০৩) মধ্যদিয়েই তাঁর এবং বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের নতুন পথে যাত্রা শুরু হয়েছিল। তাঁর এই প্রতিভার বিচ্ছুরণকে স্বীকৃতি জানিয়ে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই

লিখেছেন—

"বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাংলা উপন্যাসের অগ্রগতি যখন রুদ্ধপ্রায় হইয়াছিল তখন রবীন্দ্রনাথই তাহার জন্য নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা যাহা স্পর্শ করিয়াছে তাহাই দ্যুতিমান হইয়া উঠিয়াছে এবং উপন্যাসের উপর তাহার প্রভাবের যে ছাপ পড়িয়াছে তাহা মুছিবার নহে, আধুনিক বঙ্গ উপন্যাস তাঁহার প্রদর্শিত পথেই চলিয়াছে।"[১১]

খুব অদ্ভুত হলেও এটাই অপ্রিয় সত্যি যে শ্রীকুমার বাবুর মত সমালোচকের আলোচনায় জগদীশ গুপ্ত অন্তর্ভুক্ত হয় নি; যদিও তাঁর 'উপন্যাসের ধারা' সুবৃহৎ পরিসর জুড়ে এগিয়ে গিয়েছে। সেদিক থেকে জগদীশবাবু প্রথম আলোচনায় যথার্থ স্থান করে নিয়েছেন অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তরে; পরবর্তী সময়ে ড. অশ্রুকুমার সিকদারের 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস' গ্রন্থে। প্রসঙ্গত ঔপন্যাসিক হিসেবে জগদীশবাবুর মূল্যায়ন যাঁরা এমনভাবে করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজনের অভিমত উল্লেখ করা যেতে পারে—

■ "... রবীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমার-শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া তাঁর রচনায় পরিস্ফুট কিন্তু র্তার এই প্রতিক্রিয়ার জন্ম জীবন-বিষয়ক বক্তব্য থেকে। সে বক্তব্য হল এই : মানুষ তার কর্মফলকে মুছে স্বাধীন শুদ্ধতাভিসারী হতে চায়। উত্তম, নটবর, কিশোরী—এরা সকলেই তাঁর এই বক্তব্যের প্রমাণ। অনন্ত প্রয়াসশীল মানুষের যন্ত্রণাকে, পরাভবকে যিনি এঁকেছেন তিনি মানুষকে ছোট করে আঁকেন নি। জগদীশগুপ্ত সম্বন্ধে এইটাই প্রধান কথা।"[১২]

— অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

"...রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের সাহিত্য যেখানে মানুষের উপর অপরিসীম বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, সেখানে জগদীশচন্দ্রের সাহিত্যের মূল কথাই হলো মানুষের মনুষ্যত্বে অবিশ্বাস।"[১৩] —ড. অশ্রুকুমার সিকদার

■ "রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রীয় রুচি, রূপ, রীতি ও বিশ্বাসকে অগ্রাহ্য ও বিচূর্ণ করে আধুনিক বাঙলা কথাসাহিত্যে যে পালাবদল এসেছিল, জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) ছিলেন তার প্রধান ঋত্বিক। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার কার্যকারণ সূত্রে পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক

কাঠামোর অন্তর্গত সংকট ও সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে জীবন-অন্বেষা ও সমাজ বাস্তবতার যে শিল্পভুবন নির্মিত হয়েছিল, তিনিই ছিলেন তার উদ্বোধক ও শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।"[১৪]

—আবুল আহসান চৌধুরী।

বস্তুত আনন্দবাদী রবীন্দ্রনাথ জীবনের আলোকোজ্জ্বল দিকটির উপর এতো বেশী আলো ফেলেছিলেন, কিংবা মানুষগুলোকে অন্ধকার থেকে আলোর ভুবনে পৌঁছে দিয়েছিলেন, জগদীশ গুপ্তে সেই আলোকময়তা নেই বললেই চলে। কিন্তু সেইসব অন্ধকারবাসী মানুষগুলোর অন্তরে আলোয় ফেরার অকুলতা ছিল। সেটাকে লেখক ইঙ্গিতে স্পষ্ট করেছেন। প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসটির সঙ্গে জগদীশবাবুর 'গতিহারা জাহ্নবী' উপন্যাসের একটা অদ্ভুত সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। যোগাযোগের কুমুদিনী যখন স্বামী মধুসূদনের সঙ্গে রুচি-শিক্ষাদীক্ষার কারণে পেরে না উঠে দূরে সরে যাবার কথা ভেবেছে, সেই সময়ই সে অনুভব করেছে, সে মা হতে চলেছে। এই মাতৃত্বের কারণেই সে আর চলে যেতে পারেনি। কিশোরীও শেষ পর্যন্ত অনুভব করে সে অকিঞ্চনের সন্তানের 'মা' হতে চলেছে, তখন সেও এক প্রবল দ্বন্দ্বে আক্রান্ত হয়েছে। সে তখন নিজে কোনো দিশা না পেয়ে মায়ের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে—

"... আমি কিছুই চাইনে, মা, আমি কিছুই চাইনে। ... তোমরা আমায় কেটে ফেল্‌তে পারো, মা? ... আমার পেটে ছেলে এসেছে। তোমার পায়ের তলায় আমি পড়লাম, যা' খুশী করো।"[১৫]

অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কিশোরীকে 'মৃত' বলেছেন। আপাতদৃষ্টিতে সে মৃতই এবং কুমুদিনীও ছিল 'মৃত'—যদিও দু'জনের মৃত্যু এসেছে ভিন্ন পথে। কুমু'র ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিত্বের মৃত্যু আর কিশোরীর মৃত্যু দৈব-নিধারিত। একইভাবে 'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাসের শেষে নকল সিদ্ধার্থ যখন কাশীনাথের সত্য উন্মোচনের ফলে দিশেহারা হয়ে বলেছে—

"...ভগবান জানেন আমি নিরপরাধ। নিয়তির চক্রান্তে ভালোবেসেছিলাম। ভালোবাসার তাড়নায় আর প্রতিদানের লোভে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি। কিন্তু আমি ত' সেই মানুষ।"[১৬]

এইভাবে নিয়তি নির্দেশিত পথে কিশোরী কিংবা সিদ্ধার্থ ওরফে নটবরের জীবন প্রবাহিত হয়েছে। এই পথেই 'তাতল সৈকতে'র শরৎ কিংবা 'মহিষী' উপন্যাসের জ্যোতির্ময়ীর জীবনের গতি বদলে গেছে। জগদীশবাবু কিন্তু কেবল 'মনুষ্যত্ব ধর্মের স্তবে' নিরুত্তর থেকে থেমে যাননি, তিনি মানুষগুলোর এই অসহায় অবস্থার জন্যে নির্দিষ্ট কারণগুলিও চিহ্নিত করেছিলেন। আসলে জীবনের অন্তর্নিহিত শুদ্ধিভবনের শক্তিকে জগদীশবাবু পরাভূত হতে দেখেছেন, কিন্তু তাঁর এই জীবনবোধ কোন অংশেই উপেক্ষার নয়, বরং আজকের যন্ত্রণা জটিল সময়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের পাশে জগদীশবাবুও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

জগদীশবাবুর 'লঘুগুরু' উপন্যাসটির রবীন্দ্রনাথকৃত সমালোচনার সূত্রে দুই প্রতিভার দুই ভিন্নমুখী দিকের পরিচয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। 'পরিচয়' পত্রিকার 'পুস্তক পরিচয়' অংশে রবীন্দ্রনাথ বইটির সমালোচনা করতে গিয়ে দুটি বিষয় মানতে পারেননি—উপন্যাসে বর্ণিত সমাজচিত্রের বাস্তবতা আর গণিকা উত্তমের গৃহী নারী হয়ে ওঠার স্বপ্ন এবং সেই সঙ্গে 'কোমর বাঁধা শয়তান' পরিতোষ চরিত্রটির শৈল্পিক যথার্থতা। এই দুটি ক্ষেত্রের সমালোচনা করে লিখেছেন—

"... এই উপন্যাসে যে লোকযাত্রার বর্ণনা আছে, আমি একেবারেই তার কিছু জানিনে। সেটা যদি আমারই ত্রুটি হয়, তবু আমি নাচার। বলে রাখছি, এদেশে লোকালয়ের যে চৌহদ্দির মধ্যে কাটালুম, এই উপন্যাসের অবলম্বিত সমাজ তার পক্ষে সাত-সমুদ্র-পারের বিদেশ বলিলেই হয়। দূর থেকেও আমার চোখে পড়ে না। লেখক নিজেও হয়তো বা অনতি-পরিচিতের সন্ধানে রাস্তা ছেড়ে কাঁটাবন পেরিয়ে ও জায়গায় উঁকি মেরে এসেছেন।"[১৭]

কিংবা গণিকা উত্তমের পূর্ব-জীবনের পরিচয় না দিয়ে তাকে গৃহী নারী করে তোলার প্রয়াসকে রবীন্দ্রনাথের অবাস্তব বলে মনে হয়েছে—

"... কোনো এককালে তার পতন হয়েছে বলেই যে, সে মেয়ে নষ্ট হবে, এমন কথা নেই, কিন্তু সেটা প্রমাণের দায় লেখকের পরে। অর্থাৎ পতনের ইতিহাসটাকে একেবারে চাপা দিয়ে রাখলে মনে হয় যে, পতিতা নারীর মধ্যেও সতীত্বের উপাদান অক্ষুন্ন থাকতে পারে, এই তত্ত্বটাকে একটা চমক লাগানো অলংকারের মতোই ব্যবহার করা হয়েছে।"[১৮]

এরই পাশাপাশি উপন্যাসের দুই নায়ক বিশ্বম্ভর ও পরিতোষ। প্রথম জন স্বভাবসিদ্ধ ইতর আর দ্বিতীয়জন কোমর বাঁধা শয়তান। বিশ্বম্ভরের ইতরতার নোংরা রং বেশ মূর্তিমান, মানুষটিও অকৃত্রিম ছোটোলোক, অসংকুচিত। আর ইতরতা পদার্থটা সংসারে সুলভ। কিন্তু 'খাঁটি সয়তানী এত সামান্য নয়, খাঁটি সাধুতার মতই সে দুষ্প্রাপ্য। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন পরিতোষের মতো আপাদমস্তক শয়তান লোক সংসারে থাকা সম্ভব নয়। লেখক নিজের ইচ্ছামত চরিত্রটিকে সাজিয়ে দিয়েছেন। তিনি রবিবাসরিক খ্রীষ্টান স্কুলের হেড মাস্টারের মতো লোকশিক্ষার জন্যে এমন চরিত্র তৈরী করে মানুষকে ভয় দেখিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও বলা যায়, তিনি তাঁর সমালোচনায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেন নি। আসলে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত আলোকপ্রাপ্ত অভিজ্ঞতার আলোয় জীবনকে দেখার ফলে লঘুগুরুর অবলম্বিত সমাজটা আর গণিকা উত্তম-পরিতোষ প্রভৃতি চরিত্রকে বাস্তবোচিত মনে হয়নি। সেই বিষয়ে বিরূপ সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি বিষয় ছেড়ে বিষয়ের স্রষ্টাকেও কিছুটা সমালোচনা করেছেন। স্বভাবতই আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে জগদীশবাবু তাঁর 'উদয় লেখা' গল্প সংকলনের মুখবন্ধে স্পষ্টতই জানিয়েছিলেন—

■ "... লোকালয়ের যে চৌহদ্দির মধ্যে এতকাল আমাকে কাটাইতে হইয়াছে সেখানে 'স্বভাবসিদ্ধ ইতর' এবং 'কোমর বাঁধা শয়তান' নিশ্চয়ই আছে, এবং বোলপুরের টাউন-প্ল্যানিংয়ের দোষে যাতায়াতের সময় উঁকি মারিতে হয় নাই, 'ও জায়গা' আপনি চোখে পড়িয়াছে।"[১৯]

■ "... পুস্তকের পরিচয় দিতে বসিয়া লেখকের জীবনকথা না তুলিলেই ভাল হইত, কারণ, উহা সমালোচকের 'অবশ্য-দায়িত্বের বাইরে' এবং তাহার 'সুস্পষ্ট প্রমাণ' ছিল না।"[২০]

■ "... বিচার্য বিষয় ছাড়িয়া তাহা বিপথগামী হইয়াছে অর্থাৎ আসামীকে ত্যাগ করিয়া তাহা আসামীর নির্দোষ জনককে আক্রমণ করিয়াছে।"[২১]

আসলে শান্তিনিকেতনের আলোকিত পরিবেশের বাইরে বোলপুরের আরেকটা অন্ধকার জীবন ছিল। সেই জীবনের গলিপথে জগদীশবাবু নিয়তই হেঁটেছেন এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয়

করেছেন। আদালতের টাইপিস্ট হিসেবে অমন ইতর ও কোমর বাঁধা শয়তান প্রায়ই দেখতে পেতেন। বিশ্বম্ভর যেমন বাস্তব, তেমনি আগাগোড়া অসৎ ও প্রবঞ্চক পরিতোষও মিথ্যা নয়। মিথ্যা নয় উত্তমের অন্তরস্থ গৃহী সত্তা। আর তিনি তো যূথী-বনমালা হয়ে উত্তমের একটা ক্ষীণ অতীতের পরিচয় দিয়েছেন, যেখানে গেলেই আমরা বুঝতে পারি, সেই যূথীর শত্রু ছিল মানুষ, যেমন টুকীর শত্রু অচিন্ত্য। স্বভাবতই একেবারে স্বতন্ত্র ধারার লেখক হিসেবে জগদীশবাবুর চোখে সেই জীবনের ছবি অংকন অস্বাভাবিক ছিল না। উপরন্তু ব্যক্তিগতভাবে শৈশবেই তার সঙ্গে আন্তরিক পরিচয় হয়েছিল গিরিবালা নাম্মী গণিকার। তাই এই সমাজ পরিবেশ 'সাত-সমুদ্রপারের বিদেশ নয়'। চরিত্রগুলি 'চমক লাগানো অলংকার' নয়, বরং দূষিত রক্তের আধিক্য পুষ্ট রক্তমাংসের মানুষ। অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাই 'লঘুগুরু'র ইতিবাচক মূল্যায়ন করেছেন—

''... কাম্য বিষয়ের স্পষ্টতায় এবং স্পষ্ট কামনার সঙ্গে প্রাক্তনের কর্মফলের সংঘাতে ব্যক্তির চূর্ণীকৃত রূপ রচনায় 'লঘুগুরু' অনুপম।''[২২]

এইভাবে জগদীশবাবু সম্পর্কে তাই পুনর্মূল্যায়নের সময় এসেছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যাবতীয় বিরূপ সমালোচনার 'গৌরচন্দ্রিকা' করেছিলেন লেখকের কলমের প্রশংসা করেই—

''... 'লঘুগুরু' বইখানা পড়ে দেখলুম। লেখবার ক্ষমতা তার আছে, একথা পূর্বেই জানা ছিল। এবারেও তার পরিচয় পেয়েছি।''[২৩]

এখানেই রবীন্দ্রনাথের মহানুভবতা আর জগদীশ গুপ্তের অনন্যতা।

■ শরৎচন্দ্র ও জগদীশ গুপ্ত :

জগদীশগুপ্তের 'রোমন্থন' উপন্যাসের 'মুখবন্ধে' শ্রী রাবীন্দ্রকুমার ঘোষ বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী বাংলা সাহিত্যাকাশে শরৎচন্দ্রের শতচন্দ্র-প্রভায় বাঙালীর মন-প্রাণ যখন আলোচিত সেই সময়ই 'নভোমণ্ডল খচিত' করে জগদীশবাবুর আবির্ভাবের কথা বলেছেন। প্রসঙ্গত তিনি জগদীশবাবু আর শরৎচন্দ্রের তুলনা টেনে স্পষ্টতই জানিয়েছেন—

''... জগদীশ শরৎচন্দ্রেরই গোত্রজ, তাঁরই প্রতিভার মানসপুত্র। এই বস্তুতন্ত্র সংসারের

সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, কামনা-বাসনার পাঁকে মধু-গন্ধ সুরভিতে অনুপম পদ্ম ফুটিয়ে তোলবার শিল্পী এঁরা। আকাশের আলো যে ধরিত্রীরই অন্ধকারের গর্ভজাত সন্তান, সত্য ও সুন্দর যে মিথ্যা ও অসুন্দরের ত্বকে ঢাকা সুমিষ্ট অমৃতফল, তা এঁরাই মনোজ্ঞ করে মানুষকে দেখিয়েছেন। এই সুন্দরের জগতে পাপ-পুণ্য নাই, আছে জগৎ স্রষ্টার অভিনব নব নব রস আর তার বিচিত্র ভিয়ান।"[২৪]

রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকেরা। কারণ তাঁদের বক্তব্যই ছিল রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করা। এবিষয়ে বুদ্ধদেব বসু একজন একনিষ্ঠ রবীন্দ্রভক্ত হয়েও প্রচণ্ড রবীন্দ্র বিরোধী ছিলেন। তিনি স্পষ্টতই ঘোষণা করেছিলেন—

"যাকে 'কল্লোল' যুগ বলা হয়, তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ।"[২৫]

স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা শরৎচন্দ্রের রচনার মধ্যে পেয়েছিলেন তাঁদের স্বকীয় সাহিত্যাদর্শের বীজ। এই শরৎচন্দ্রের সঙ্গেই কল্লোলদের তুলনায় খানিকটা বয়সে বড় জগদীশবাবুর সাহিত্যের সাযুজ্য খুঁজেছেন শ্রী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। শরৎচন্দ্রের সমকালে শরৎচন্দ্রের রচনার সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেও জগদীশবাবু কোন অবস্থাতেই শরৎচন্দ্রের মানসপুত্র নন, নন তাঁর গোত্রজ। বরং বিশ্লেষণে দেখা যায় দুইয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। জগদীশ বাবুর সাহিত্য দৃষ্টিতে আছে এক ভবিতব্য ভারাতুর নির্লিপ্ততা, উদাসীনতা, সেখানে শরৎসাহিত্য সম্পূর্ণ এর বিপরীত মেরুর। সেদিক থেকে এই দুই শিল্পীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল—

■ শরৎসাহিত্য মূলত রোমান্টিসিজমের ভাবালুতায় আচ্ছন্ন; তিনি বাঙালী পাঠকের হৃদয়ের দুয়ারে আঘাত করে সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে তাদের কাঁদিয়েছেন। কিন্তু সেদিক থেকে জগদীশবাবু নির্মম, নির্লিপ্ত, উদাসীন। আবেগ এসে তাঁর রচনায় পৌঁছনোর আগেই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। তিনি মানুষের সুস্থতার আদর্শে নয়—বরং অসুস্থতা এবং আদর্শহীনতার ওপর অধিক আলো ফেলেছেন।

■ নারীকে মহীয়সী করে তুলতে গিয়ে শরৎচন্দ্র গণিকার ভেতরেও সতীত্বকেই বড় করে দেখিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে বাঈজিরা কখনো বাঈজি নয়, তাঁর ঝিয়েরা ঝি নয়, তাঁর

দিদিরাও কখনো দিদি নয়; কিন্তু সকলেই একটা অন্য কিছু হয়ে সার্থক হতে চেয়েছে। বৌদিরা মায়ের মতো, জ্যাঠাইমা গুরুমা আর মেসের ঝি হয়েছে আদর্শ প্রেমিকা। সাবিত্রী, কিরণময়ী রাজলক্ষ্মী, কমল—এইসব নারী চরিত্র শেষপর্যন্ত কেউই আর বাস্তব পৃথিবীর মাটিতে পা রাখেনি। সকলেই হয়ে উঠেছে মহিষী। নারী নির্যাতনের কথা থাকলেও শেষপর্যন্ত তাদের তিনি এক অলীক চেতনার জগতে নিয়ে গেছেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচক ড. সরকার আবদুল মান্নান লিখেছেন—

"... নারী নির্যাতন দেখিয়েই তিনি নির্যাতিতের প্রতি করুণা প্রদর্শন ও তাদের ভালত্ব প্রচার করতে চেয়েছেন, কিন্তু নিপীড়কের প্রতি ঘৃণার ভাব সৃষ্টি তাঁর উদ্দিষ্ট ছিল না। শুধু তাই নয় সামাজিক নিপীড়নের কার্যকারণ সম্পর্কটি সমাজের যে গভীর কন্দরে লুকিয়ে আছে, যে ঐতিহাসিক ধারাক্রম এর পশ্চাতে জলসিঞ্চন করে এসেছে তার সন্ধান তিনি দেননি।"[২৬]

অন্যদিকে জগদীশবাবুর উপন্যাসে নারীর জীবন যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, তা মূলতঃ পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পেষণেই হোক আর নারীদের ভাগ্য দোষেই হোক, সেসব তিনি খুব নির্মোহ দৃষ্টিতে বর্ণনা করেছেন। তাদের অকারণে মহীয়সী করে তোলেননি। 'লঘুগুরু'র উত্তম-সুন্দরী-টুকী, 'নন্দ আর কৃষ্ণা' উপন্যাসের কৃষ্ণা কিংবা 'গতিহারা জাহ্নবী'র কিশোরী থেকে শুরু করে 'তাতল সৈকতে'র শরৎ, 'মহিষীর জ্যোতির্ময়ী, 'সুতিনী'র রাজবালা, সকলেই রক্তমাংসের নারী হয়েই আছে। এবং তাদের পরিণতি যাদের কারণে তারাও চিহ্নিত হয়েছে। কেবলমাত্র 'কলঙ্কিত তীর্থ' উপন্যাসের মাখন প্রথমাবধি জীবন্ত নারী চরিত্র, কিন্তু শেষাংশে সে হয়ে উঠেছে আদর্শায়িত নারী যা জগদীশগুপ্তের স্বভাব জাত নয় বললেই চলে। অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুই প্রতিভার দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে স্পষ্টতই লিখেছেন—

"... শরৎচন্দ্রের কাছে পতিতার সমস্যা বলে কিছু ছিল না। পতিতারা সাধু রমণীমাত্র এই কথাটুকুই ছিল শরৎচন্দ্রের বক্তব্য। তাদের শ্রেণী বা ব্যক্তি কোন রূপকেই শরৎচন্দ্র ধারণ করতে চাননি, করেন নি। এইসব রমণীদের মধ্যে আছে প্রেম এবং প্রেমেই সবশুদ্ধ, সতীত্ব অপেক্ষা নারীত্ব অনেক বড় কথা, এই ছিল মোটামুটি শরৎচন্দ্রের বক্তব্য। উত্তমের সাহায্যে জগদীশবাবু দেহজীবিণী এক নারীর গোটা জীবনের বাসনার সমস্যাকে রূপদান করেছেন।

শরৎচন্দ্রের মত সহানুভূতির প্রশ্ন জগদীশ গুপ্তের মুখ্য প্রশ্ন ছিল না।"[২৭]

এখানেই শরৎচন্দ্রের বিপরীতে জগদীশগুপ্তের অনন্যতা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় জগদীশবাবু তাঁর কালে কোনরকম পাদপ্রদীপের আলোয় আসতে পারেননি।

'লঘুগুরু'র সমালোচনাসূত্রে যেমন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জগদীশ গুপ্তের প্রত্যক্ষ সাহিত্যিক সংঘাত দেখা দিয়েছিল তেমনি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সংঘাত, অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গিগত মেরুকরণ দেখা দিয়েছিল শরৎচন্দ্রের 'শেষের পরিচয়' উপন্যাসটির জগদীশ গুপ্ত কর্তৃক সরাসরি দীর্ঘ সমালোচনার মধ্যদিয়ে। এটিকে শুধু একটা গ্রন্থ সমালোচনা না বলে দু'জন লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির সার্বিক মেরুকরণ বলা যায়। 'শরৎচন্দ্রের শেষের পরিচয়' নাম দিয়ে জগদীশবাবু একেবারে অধ্যায় পরিচ্ছেদ চিহ্নিত ক'রে শরৎসাহিত্যের মূল আকর্ষণ যে চিত্ত বিনোদিনী আবেগ ঘনতা সৃষ্টি সেটা জগদীশবাবু কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। সেই সমালোচনা সূত্রেই উঠে এসেছে শরৎচন্দ্রের অসংযত খণ্ডিত জীবনবোধ এবং সঙ্গতিহীন শিল্পক্রিয়ার নির্মম বিশ্লেষণী প্রতিক্রিয়া। পরিবর্তিত এই পাঠক-প্রতিক্রিয়ায় জগদীশবাবুর ক্ষুরধার দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা শরৎসাহিত্য কেবল আক্রান্ত হয়েছে তাই নয়, শরৎচন্দ্রকে প্রকারান্তরে এমন যুক্তি শৃঙ্খলাহীন আবেগ সর্বস্ব উপন্যাস বাঙালী পাঠককে উপহার দেওয়ার জন্যে জগদীশবাবু কয়েক ধাপ এগিয়ে ধাপ্পাবাজের দলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি সমালোচনার এক জায়গায় লিখেছেন—

"... রাখালরাজ ভক্তি ভ'রে সবিতার সর্বাঙ্গে যত মর্যাদাই নিরীক্ষণ করুক, আর, মা মা আহ্বান যতই ধ্বনিত করুক আর সারদা যত উৎসাহ লইয়াই রাখালের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাক শরৎচন্দ্র সবিতাকে মর্যাদা দিয়া ফুটাইয়া তুলেন নাই সজ্ঞানে কিংবা অজ্ঞাতে আমাদের ধাপ্পা দিয়াছেন।"[২৮]

শরৎচন্দ্রের তুলনায় জগদীশবাবুর ভিন্নমুখী প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন করা যায় জগদীশবাবুর গ্রামীণ জীবনভাবনার ফসল ত্রয়ী উপন্যাস—'রোমন্থন-দুলালের দোলা যথাক্রমে'-র মধ্যদিয়ে। এই উপন্যাস তিনটিতে তিনি যে গ্রাম সমাজের চিত্রাঙ্গন করেছেন তা শরৎচন্দ্রের 'রেঙ্গুনে' বসে দেখা স্মৃতিমেদুর গ্রামজীবন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। লেখকের

ব্যক্তিগত জীবনে কুষ্ঠিয়ার গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতা তাকে এমন দূষিত গ্রামের চিত্রাঙ্গণে সহায়তা করেছিল। শরৎচন্দ্র তাঁর গ্রামের অবক্ষয়, সোনালী অতীত আর অবক্ষয় থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে শাসকের মানসিকতার পরিবর্তন আর জ্ঞানের আলো জ্বালানোর কথা বলেছিলেন। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে জ্যাঠাইমার রমেশের উদ্দেশ্যে আহ্বানের মধ্যে সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, 'শুধু আলো জ্বেলেরে বাবা'। কিন্তু এই ভাবনা নিছক পানা পুকুরে সাময়িক ঢেউ তোলার মতোই ক্ষণস্থায়ী। যে পল্লীসমাজ গঠনের স্বপ্ন শরৎচন্দ্র দেখেছিলেন আজ শতবর্ষের দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে সেই গ্রাম এখনও অধরা। যদিও রাস্তাঘাট পাকা হয়েছে এবং বৈদ্যুতিক আলো পৌঁছে গেছে দূর-দূরান্তের গ্রামেও। গ্রামের লেখাপড়া জানা সন্তানদের বাইরে গিয়ে পড়াশুনা করে গ্রামেই ফিরতে আসতে বলেছিলেন। কিন্তু জগদীশবাবুর উপন্যাসে আমরা দেখি গ্রামীণ জীবনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ডাক্তার নিত্যপর্দার শেষ পরিণতি। কিংবা 'রোমন্থনে' তিন শহরবাসী ভাইয়ের গ্রাম সম্পর্কে রোমান্টিক ধারণাকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। 'দুলালের দোলা'র পিরু চরিত্রটির কথনের দ্বারা তিনি গ্রাম জীবনের নগ্ন বাস্তবতাকে অকৃত্রিমভাবে তুলে এনেছেন। এইসব গ্রামজীবন কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলিতে জগদীশবাবুর মৌলিকতা কতটা সে বিষয়ে সমালোচক ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন—

"... পল্লী সমাজের রীতি-নীতি বিষয়ক যে তথ্যগুলি তিনি পরিবেষণ করেছেন, সংবাদ হিসাবে তার অনেকগুলিই আমাদের জানা ছিল কিন্তু বাস্তব চিত্রণে সেগুলি আমাদের সামনে অবিকৃতভাবে উপস্থিত করতে তাঁর পূর্বে কাউকে দেখি না। পল্লী চরিত্রগুলি সম্বন্ধেও একই কথা। তারা আছে জানতাম, কিন্তু এমনভাবে পল্লী গ্রামের সোঁদা গন্ধ নিয়ে, ধুলো কাদা মেখে মুখোসহীন অকৃত্রিমতায় সাহিত্যে তারা এর আগে কখনো আসে নি। নাগরিক চরিত্রের সঙ্গে তাদের মৌলিক পার্থক্য, তারা সহজবোধ্য। সমস্ত লালসা, নীচতা এবং স্বার্থপরতা নিয়েও তারা জটিলতা বর্জিত। তাদের সঠিকভাবে চিনে নিতে খুব বেশী সময় লাগে না। জগদীশ গুপ্ত এইসব চরিত্রের আপাত সারল্যে অভিভূত হননি, নীচতা এবং স্বার্থপরতায় মনকে বিষিয়েও তোলেন নি—দূরে দাঁড়িয়ে নিরাসক্ত দর্শকের মত মোহ বিমুক্ত দৃষ্টিতে জটিলতা বর্জিত এই চরিত্রগুলির স্বার্থপরতা ঢাকবার ব্যর্থ প্রয়াস লক্ষ্য করেছেন এবং সকৌতুকে তা সাহিত্যে

পরিবেষণ করেছেন।"[২৯]

এখানেই জগদীশবাবুর অনন্যতার পরীক্ষা হয়ে যায়।

■ **কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক ও জগদীশ গুপ্ত :**

'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের 'সাহিত্যে নবত্ব' নিবন্ধের এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের 'ওরিজিন্যালিটির ' মানদণ্ড নির্ণয় প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—

"বড়ো সাহিত্যের একটি গুণ হচ্ছে অ-পূর্বতা, ওরিজিন্যালিটি। সাহিত্য যখন অক্লান্ত শক্তিমান থাকে তখন সে চিরন্তনকেই নূতন করে প্রকাশ করতে পারে। এই তার কাজ। এ'কেই বলে ওরিজিন্যালিটি। যখনই সে আজগুবিকে নিয়ে গলা ভেঙ্গে মুখ লাল করে, কপালের শিরাগুলোকে ফুলিয়ে তুলে ওরিজিন্যাল হতে চেষ্টা করে তখনই বোঝা যায় শেষ দশায় এসেছে। জল যাদের ফুরিয়েছে তাদের পক্ষে আছে পাঁক। তারা বলে, সাহিত্য ধারায় নৌকা চলাচলটা অত্যন্ত সেকেলে; আধুনিক উদ্‌ভাবনা হচ্ছে পাঁকের মাতুনি—এতে মাঝিগিরির দরকার নেই—এটা তলিয়ে যাওয়া রিয়ালিটি।"[৩০]

খুব অপ্রিয় হলেও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বিষয়ক ধারণার এই চিত্রকল্পের মধ্যেই লুকিয়ে আছে কল্লোল গোষ্ঠীর সেদিনের হইচই করা সাহিত্য রচনার আসল ভবিষ্যৎ। রবীন্দ্রনাথ থেকে স'রে আসতে হবে, রবীন্দ্রনাথের প্রবল বিরোধিতা করতে হবে—মূলতঃ এটাই ছিল কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের প্রধান শ্লোগান। মজার ব্যাপার এরা গোপনে কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে ভীষণ শ্রদ্ধা করতেন; কিন্তু বাইরে সেটা প্রকাশ যাতে না পায় তার জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালিয়েছেন। এমনই এক গোপনতম শ্রদ্ধার কথা উচ্চারণ করেছেন বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক' প্রবন্ধে—

"... এই আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন সেইসব তরুণ লেখক, যাঁরা সবচেয়ে বেশী রবীন্দ্রনাথে আপ্লুত; অন্ততঃ একজন যুবকের কথা আমি জানি, যে রাত্রে বিছানায় শুয়ে পাগলের মতো 'পূরবী' আওড়াতো, আর দিনের বেলায় মন্তব্য লিখতো রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ ক'রে।"[৩১]

বলাবাহুল্য এই যুবক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু নিজেই। তবে এই গোপন শ্রদ্ধা বা প্রকাশ্য আক্রমণ

যাই থাক না কেন, সেদিন ‘কল্লোল গোষ্ঠী’র তরুণ তুর্কীদের আদর্শ হয়ে উঠেছিল শরৎচন্দ্র। কারণ শরৎসাহিত্যেই তাঁরা পেয়েছিল তাঁদের নিজস্ব সাহিত্যার্শের বীজ—যা তাঁরা রবীন্দ্রনাথে পায় নি। তাই রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে তাঁরা নেমেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত জনতার মিছিলে। এই প্রভাবের কথা তারাশংকরও স্বীকার করেছেন। এবং পরবর্তী সময়ে তাঁরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমর্থন জানিয়েছিলেন। এ বিষয়ে অচিন্ত্য সেনগুপ্তের স্বীকারোক্তি ছিল—

‘‘মানিকই একমাত্র আধুনিক লেখক যে ‘কল্লোল’ ডিঙিয়ে ‘বিচিত্রা’য় চলে এসেছে—পটুয়া টোলা ডিঙিয়ে পটল ডাঙায়। আসলে সে ‘কল্লোলেরই’ কুলবর্ধন। তবে দুটো রাস্তা এগিয়ে এসেছে বলে সে আরো ত্বরান্বিত। কল্লোলের দলের কারু-কারু উপন্যাসে পুলিশ যখন অশ্লীলতার অজুহাতে হস্তক্ষেপ করে তখন মানিক বোধহয় শুক্তিমগ্ন।’’[৩২]

এইভাবে প্রভাব আত্মস্থ করে, রবীন্দ্রনাথকে পাশ কাটিয়ে কল্লোলীয়রা স্বতন্ত্র সাহিত্য ধারা সৃষ্টির প্রয়াসে নেমেছিলেন। বাস্তবতার দাবী মেনে পাশ্চাত্যের রিয়ালিটির কারি পাউডার মাখিয়ে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখলেন ‘বেদে’ উপন্যাস যাতে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন অকৃতার্থ মানুষের জীবন যন্ত্রণার কথা। কলকাতার রাজপথ ছেড়ে গলিপথ দিয়ে যেতে যেতে বস্তি জীবনের ছবি তুলে আনলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর ‘পাঁক’ উপন্যাসে। এই পথেই এলেন মণীশ ঘটক, গোকুলচন্দ্র নাগ, প্রবোধকুমার সান্ন্যাল, তারাশংকর সহ আরো অনেকে। তাঁদের সাহিত্যের প্রধান বিষয় হয়ে উঠল—সমকালের রাজনীতি, শ্রমিক জীবনের কথা, বস্তি ও গণিকা পল্লীর নগ্ন জীবনকথা, শহর-শহরতলির মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক জীবনের অনুষঙ্গ হিসেবে বিধবাদের জীবনকথা, দাম্পত্য জীবন সংকট সহ মানুষের যৌনতার কদর্য ঘাঁটাঘাঁটি পর্যন্ত। ফলে খুব দ্রুত সেই সাহিত্য ধারায় ‘জল শুকিয়ে গিয়ে’ নৌকো চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। দেখা দিল ‘পাঁকের মাতুনি’, ‘তলিয়ে যাওয়া রিয়ালিটি’। ফলে ধীরে ধীরে কল্লোলীদের সৃষ্টি প্রদীপের তেল ফুরিয়ে এল।

কল্লোলীয়দের চেয়ে খানিকটা বয়সে বড় জগদীশ গুপ্ত যদিও ‘কল্লোল-কালিকলমে’র লেখক বলে পরিচিতি; তবুও কল্লোলের সঙ্গে তাঁর সেই অর্থে কোনদিন ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠেনি—যেটা ‘কালি-কলম’-এর মুরলীধর বসুর সঙ্গে গড়ে উঠেছিল। নরেশ সেনগুপ্তের

মত কল্লোলীয়রা দেহচেতনার কথা যেভাবে সরাসরি তুলে এনে আরোপ করেছেন তাঁদের গল্পে, জগদীশ গুপ্তে জীবনের এতো অন্ধকারময়তা সত্ত্বেও কিন্তু যৌনতার কোনোরকম উত্তাপ নেই। এহেন কল্লোলকালীন, অথচ কল্লোল থেকে দূরের প্রতিভা সম্পর্কে হাসান আজিজুল হক লিখেছেন—

''... মানুষের প্রবৃত্তি জগতের হিসেব নিলে বাৎসল্য যেমন সত্য, নিষ্ঠুরতাও তেমনি সত্য। নিষ্ঠুরতার চেয়ে বাৎসল্য মহত্তর বৃত্তি কেন এক নৈয়ামিকের কাছে তার কোনো যুক্তি নেই। প্রশ্নটা নৈতিকতার নয়, প্রশ্নটা বাস্তবিকতার। মানুষ বাস্তবিক কোন ধরণের জীব এটা যাচাই করতে গেলে ভাল-মন্দর বাই নিয়ে নীতিবাগিশ হওয়া চলে না। সাহিত্যিক গির্জার ফাদারও নন, স্কুলের হেড মাস্টারও নন, কাজেই নীতিবুলি কপচানোর চাইতে মানুষ যা সেই ভাবেই তাকে বোঝাতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। মনে হয় মানুষ এবং মানুষের মনের ভিতরের যত অন্ধকার এবং কালিমা সবই টেনে বের করে এনে তিনি তাঁর সাহিত্য জগৎটি অন্ধকারে পরিপূর্ণ করে তুলেছিলেন।''[৩৩]

এইভাবে জীবনের অন্ধকার গলিপথে বিচরণ করে জগদীশবাবু মানুষের নীচতা, ক্রুরতা, খলতা, পরশ্রীকাতরতা, লোলুপতা, অন্ধ-প্রতিযোগিতা, বীভৎস যৌনতা ইত্যাদি তুলে এনেছেন। আচরণের আর আচরণের আড়লের মানুষের স্বরূপকে, নিয়তির লাঞ্ছনাকে একের পর তুলে এনেছেন তাঁর উপন্যাসে। এই যে চোখে দেখা জীবন অভিজ্ঞতা তাতে কোনো কৃত্রিমতা, কিংবা আরোপিত দুঃখবাদ, যৌনতা, রবীন্দ্র বিরোধিতার ধুঁয়া এসব কিছু ছিল না। এখানেই কল্লোলীয়দের সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্য। তাঁর প্রতিভার এই দিকটি সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচকদের মধ্যে দু'একজনের অভিমত উল্লেখ করা যেতে পারে—

■ ''জগদীশচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) শৈলজানন্দের মতোই জীবনের প্রত্যক্ষদর্শী এবং ইঁহার গল্পেও প্রকৃতিকতাই পরিস্ফুট। ... মানুষের দৈন্যতা-কুশ্রীতা-নোংরামির জন্য জগদীশচন্দ্র সমসাময়িক 'আধুনিক' লেখকদের মতো সমাজের বা ব্যক্তির ঔদাসীন্য, ঘৃণা বা লুব্ধতা দায়ী বলিয়া দেখান নাই। শৈলজানন্দের মতো নির্লিপ্ত ভাবে ছবি আঁকিয়াই যান নাই।''[৩৪]

— ড. সুকুমার সেন

■ "... জগদীশগুপ্ত অবিশ্বাসী; তাহলেও বিশ্বাসহীন নন তিনি। অর্থাৎ সৌন্দর্য, কল্যাণ ও সত্য সম্পর্কে মানুষের যুগ-যুগ প্রচলিত নীতিচেতনার প্রতি এক মৌলিক অবিশ্বাসে জগদীশ গুপ্ত একান্ত বিমুখ। এই বিমুখতা তার দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। ফলে জীবন সম্পর্কিত সকল নীতিবোধ ও কল্যাণমূলক মূল্যমানকে কেবল অস্বীকার করেই তিনি তৃপ্ত নন। বিশ্বপ্রবাহের মূলে এক অমোঘ শক্তির অস্তিত্ব তিনি অনুভব করেছেন, যা একান্তরূপে বিনাশক—ক্রূর এবং কদর্য।"[৩৫]

—অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী

■ "শিল্প-সাহিত্যে মানব-প্রবৃত্তির রহস্য উন্মোচনের কঠিন দায়িত্ব নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন জগদীশ গুপ্ত। তিনি যে সমাজের মানুষ সেই সমাজ ছিল অসুস্থ-দরিদ্র ক্ষয়িষ্ণু, সঙ্গত কারণেই অনেকাংশে এই সমাজের মানুষ ও তার মন ছিল না সুস্থ ও সুন্দর। তাই তাঁর সাহিত্যে যখন এই মনের প্রকৃতি বিশ্লেষণে অগ্রসর হলেন দেখলেন সেখানে অন্ধকার, গলিত, বীভৎস একরূপ।"[৩৬]

—আবুল আহসান চৌধুরী।

এইভাবে কল্লোলের সাহিত্য যখন 'পাঁক বন্দী' হয়ে পড়ছিল, জগদীশবাবু অন্ধকার নদীস্রোতে নৌকায় শক্তহাতে হাল ধরে এগিয়ে গেছেন। তাঁর সেই অন্ধকার চর্চার ভেতরেই খুঁজে দেখলে পাওয়া যাবে উত্তরণের সূত্র। তিনি ইচ্ছাপূরণার্থে কোনো সস্তা রোমান্টিসিজমের পাউডার দিয়ে তাঁর শিল্প প্রতিমাকে কলুষিত করেননি। হয়তো একারণেই তাঁকে ঘিরে সচেতন ও সংবেদনশীল পাঠকের অনুসন্ধান থেমে নেই।

■ **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জগদীশ গুপ্ত :**

বয়স এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভাব কালের বিচারে জগদীশ গুপ্ত ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছুটা অগ্রবর্তী। একজন কল্লোলীয়দের চেয়ে কিছুটা বয়ঃজ্যেষ্ঠ আর আরেকজন 'কল্লোলেরই কুলবর্ধন'। এই দুই প্রতিভার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন—

"... জগদীশ গুপ্ত এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প উপন্যাস পড়ে সব সময়েই মনে হয়, শরৎচন্দ্রের আবেগ পুষ্ট বাংলা সাহিত্যে একটা নতুন আস্বাদ পাচ্ছি—কিন্তু কখনো একথা মনে হয় না যে, বিদেশী উপন্যাসের নায়কদের চলন বলন, মননকে ধুতি পাঞ্জাবি পরিয়ে হাজির করা হচ্ছে। কেন না তাঁরা তাঁদের শিল্প কর্মে যে অভিজ্ঞতার রঙ লাগিয়েছিলেন সেটা আসল রঙ। তাকে তাঁরাই খুঁজে বের করেছিলেন নিজ নিজ অন্বেষার টানে।"[৩৭]

তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম মানিককে সাধারণত বিচার করা হয় ফ্রয়েড আর মার্কসকে সামনে রেখে। লেখক জীবনের প্রথম পর্যায়ে তিনি ছিলেন ফ্রয়েডের শিষ্য আর উত্তরকালে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে মার্কসের শিষ্য। কিন্তু এভাবে ব্যক্তিগত জীবন ধারা প্রবাহিত হলেও তাঁর সৃষ্টি প্রবাহে পুরোপুরি এরকম মেরুকরণ ঠিক সমীচীন নয়। অর্থাৎ ফ্রয়েড আর মার্কসীয় ভাবনাকে সামনে রেখে তিনি দুটি পৃথক ধারা বজায় রেখেছেন সাহিত্য রচনায়—এমনভাবে বলাটা সঙ্গত নয়। বরং বলা যায় তিনি তাঁর ভাবনাকে সমৃদ্ধ করার জন্য এঁদের প্রভাব আত্মস্থ করেছেন, কিন্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রয়োগের সময় নিজের মতো করে প্রয়োগ করেছেন। যেকারণে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র মতো উপন্যাসের জন্য কমিউনিস্ট সমালোচক শীতাংশ মৈত্রের আক্রমণের মুখে পড়ে উপন্যাসটি সম্পর্কে 'আত্মসমালোচনা' করতে গিয়ে লেখক ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। শীতাংশু মৈত্রদের সমালোচনায় জবাবে তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন, এই বইয়ের মানুষগুলি নিয়তির হাতের পুতুল নয়; বরং যারা মানুষকে পুতুলের মতো নাচায় তাদের বিরুদ্ধে দরদী প্রতিবাদ। যদিও এরকম কোনো প্রতিবাদ উপন্যাসে নেই। তাই বলা যায় তিনি বিশেষ কোনো মতাদর্শের গণ্ডীতে আবদ্ধ থেকে তাঁর জীবনের প্রথম দিকের উপন্যাসগুলি লেখেন নি। যখনি তিনি পুরোপুরি 'ইজমের' দাসত্ব শুরু করেছেন তখনি তাঁর অবক্ষয় শুরু হয়েছিল। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর শারীরিক রোগশোক আর উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আনুষঙ্গিকভাবে বৈজ্ঞানিক সমাজবোধ আর একপ্রকার আধিভৌতিক বিশ্বাসে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাওয়া। তবে আদিপর্বের উপন্যাসগুলিতে, বিশেষ করে 'জননী' 'দিবারাত্রির কাব্য', পদ্মানদীর মাঝি আর পুতুলনাচের ইতিকথা'য় যে শিল্পী প্রতিভার বিচ্ছুরণ আছে তার দ্বারাই মানিককে অনায়াসে চিনে নেওয়া যায়।

বিজ্ঞানের ছাত্র মানিকের সৃষ্টি ধারার প্রথমদিকে একটা দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ছিল। যার ফলে সেই সময়ের সাহিত্যে মানুষের নিরুপায়ত্বের কথা থাকলেও তাদের হেরে যাওয়া নেই। বিশেষ করে 'পুতুলনাচের ইতিকথায়' নিয়তির প্রভাব থাকলেও নায়ক শশীর জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়নি। কেবল কুসুমের সঙ্গে তার সম্পর্কের চির বিচ্যুতি ঘটেছিল। এই বিচ্ছেদ অনিবার্য ছিল। কারণ তাদের ভিন্ন মানসিকতা। শশীর অন্বিষ্ট ছিল মন, কিন্তু সে ভুল মানুষের কাছে সেই মনের অন্বেষণ করেছে। কারণ কুসুম ছিল শরীর সর্বস্ব ক্ষুধার্ত নারী। শেষ পর্যন্ত সাড়া না পেয়ে সে চিরদিনের জন্য বাপের বাড়ী চলে গেছে। অন্যদিক থেকে দেখলে বলা যায় শশী ছিল শিক্ষিত মার্জিত কলকাতা আর কুসুম ছিল শিক্ষাদীক্ষা বর্জিত গাঁওদিয়া গ্রাম। ফলে এই দুইয়ের মিলন সম্ভব নয়। শেষপর্যন্ত শশী তালবনে টিলার উপর সূর্যাস্ত দেখতে না গিয়ে যাদবের রেখে যাওয়া অর্থে হাসপাতাল গড়ার কাছে আত্মনিয়োগ করেছে। ফলে শশী কুসুমের পরিণতিকে অনিবার্য বলা যায়।

জগদীশগুপ্তের উপন্যাসে, বিশেষ করে 'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাসে নকল সিদ্ধার্থের রহস্য উন্মোচন, অজয়ার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হওয়া; 'গতিহারা জাহ্নবী'র কিশোরীর আত্মিক মৃত্যু ঘটেছে, সে শুধু গর্ভের সন্তানকে নিয়ে বেঁচে থাকবে; 'তাতল সৈকতে' উপন্যাসে শরৎ এর পরিণতি, 'মহিষী'তে জ্যোতির্ময়ীর পরিণতি, 'সুতিনী'তে রাজবালার পরিণতি, 'কলঙ্কিত তীর্থ'-এর প্রথমাংশে মাখনের পরিণতি এসবই যেন দৈব নির্ধারিত। এই দৈব দুর্বিপাকের ফলেই 'রতি ও বিরতি' উপন্যাসে তিনটি প্রাণের বিনাশ সাধিত হয়েছে। এই নিয়তি নির্ভরতার গল্পই ভিন্ন আঙ্গিকে পরিবেশিত হয়েছে। ফলে দুই প্রতিভার রচনার পরিণতি সম্পর্কে তাই বলা যায়, জগদীশ বাবুর বিষয় ছিল মানুষের নিঃসহায়ত্ব আর মানিকের ছিল নিরুপায়ত্ব। মানিক শেষপর্যন্ত হারেন নি। জগদীশবাবু হারলেও কিন্তু তিনি পুরোপুরি নৈবাশ্যবাদী নন। কারণ তিনি মানুষ গুলির এই করুণ পরিণতির পশ্চাতের কারণটি নির্ণয় করতে পেরেছিলেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে উত্তম - টুকী- কিশোরী- শরৎ -জ্যোতির্ময়ী - রাজবালা-মাখন—এরা শাস্তি ভোগ করে। কিন্তু এই পরিণতির যারা কারিগর সেই বিশ্বম্ভর পরিতোষ - অকিঞ্চন- অশোক -সাতকড়ির কোনো শাস্তি হয়নি। এই সব মানুষকে কঠোর

শাস্তি দিতে পারলেই ওইসব নারীদের জীবন সমস্যার কিনারা হয়ে যাবে। তাই তো মানিক প্রতিভা যখন শেষপর্যন্ত সমস্যার বাধা পেরিয়ে পৌঁছে যায় গন্তব্যে, জগদীশ বাবু তখন তাঁর বিরল প্রতিভা নিয়ে গুটিপোকার মতো ঘুরে বেরিয়েছেন। বের হবার পথ পাননি। 'কল্লোলের কুলবর্ধন' হলেও মানিকের সঙ্গে কল্লোলীয়দের বিস্তর পার্থক্য তৈরী হয়ে গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে সমালোচক অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন—

''মানিকের মানসিকতা গঠনে 'কল্লোলের' প্রভাব অনেকখানিই পড়েছিল, কিন্তু তা যুক্তিহীন ভাবে নয়; তাঁর বিজ্ঞানী বুদ্ধির সাহায্যে কল্লোলীয় আন্দোলনকে তিনি বিচারের মাধ্যমেই গ্রহণ করেছিলেন—নতুনত্বের চাঞ্চল্য বা আবেগের উন্মাদনা তাঁকে প্ররোচিত করতে পারেনি।''[৩৮]

এভাবেই ভাববাদী কল্লোলীয়দের থেকে সরে এসেছিলেন মানিক আর জগদীশবাবু কোনকালেই কল্লোলীয়দের সঙ্গে সেভাবে সংশ্রবই রাখেননি সেভাবে। শুধু তাঁর অন্তরস্থ তারুণ্যকে কল্লোলীয়রা বিশেষ কদর করতেন। যৌবন যে বয়সে নয়, মনের মাধুরীতে সেটা তিনি প্রমাণ করেছিলেন।

মানিকের সঙ্গে জগদীশবাবুর এতো অমিল সত্ত্বেও দু'একটি বিষয়ে অদ্ভুত মিল ছিল। যেমন, মানিক তাঁর উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যদিয়ে যে সুগভীর জীবন দর্শন তা একেবারে গৌণ চরিত্রের মুখ দিয়ে ব্যক্ত করিয়েছেন। পুতুলনাচের ইতিকথা'য় কুসুমের বাবা অনন্তই কাহিনীর সারসত্যটি উচ্চারণ করে বলেছিল, 'সংসারে মানুষ চায় এক হয় আর, চিরকাল এমনি দেখে আসছি ডাক্তারবাবু। পুতুল বই তো নই আমরা, একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন।''[৩৯]

একইভাবে 'দুলালের দোলা' উপন্যাসের পিরু যেন লেখকেরই অভিন্ন সত্তা। সে নানা সময়ে কথা প্রসঙ্গে নীরদবরণকে জানিয়েছে—

''আমি ভেবে দেখেছি, বাবু, ধর্ম্মপত্নী, স'ধর্ম্মিণী আরো অনেক কথার এমনি মানে নাই। মন্তর মেয়েকে বাঁধার কৌশল, তার দেহটাই আসল।''[৪০]

কিংবা, ''... লোকে বলে, দশটার বেশী দিক্ নাই; কিন্তুক্ আমি বলি বাবু, হাজার দিক

আছে, পুণ্যের না থাক, পাপের আছে, আর হাজার দিকে মানুষের মন ছুটছে; তার না আছে ধর্ম্মজ্ঞান, না আছে নরকের ভয়।”[৪১]

আসলে এসব সত্যোপলব্ধি তাঁদের জীবন-অভিজ্ঞতা প্রসূত। এটা দু'জন লেখকই তাঁদের জীবন থেকে উপলব্ধি করেছিলেন। এরই সাথে দু'জনেই আঞ্চলিক ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগ যেমন করেছেন তেমনি বিশ্লেষণী বুদ্ধিতে দুজনেই সমুজ্জ্বল, দু'জনেই খুঁজে ফিরেছেন কার্যকারণ। এখানেই দুজনের অনন্যতা।

জগদীশ গুপ্তর অগ্রজ শরৎচন্দ্র আর মন্ত্র শিষ্য (ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে) মানিক দুজনেই তাঁদের কালে ভীষণ জনপ্রিয়তা-খ্যাতি-প্রশংসা লাভ করেছিলেন। কিন্তু জগদীশবাবুর সৃষ্ট চরিত্রের মতোই তিনি মন্দভাগ্যের অধিকারী। 'অন্তরালের কথাসাহিত্যিক', 'অনুপস্থিত লেখক', 'অনেকের কাছেই অদেখা' এই মানুষটি সুদীর্ঘ অর্ধশতক ধরে নীরবে নিঃভৃতে বসে সাহিত্যচর্চা করে গেছেন। শেষ জীবনে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে তিনি মূলতঃ কবিতাই লিখে গেছেন। এইসময় তাঁকে মোহিতলাল মজুমদার লেখা ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শও দিয়েছিলেন—

“লেখা এখন ছেড়ে দিন। এবয়সে দৃষ্টিশক্তি বাড়ে, কিন্তু সৃষ্টিশক্তি কমে।”[৪২]

জীবনের চূড়ান্ত সৃষ্টিশীলতার অধ্যায়ে দাঁড়িয়ে তিনি সমকালের 'কল্লোল' 'কালি-কলম', 'বঙ্গবাণী', 'বিজলী', 'উত্তরা', 'ভারতী', 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষ', 'প্রবর্তক', 'সোনার বাংলা', 'জাগরণ', 'দীপিকা' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার জন্য লেখা পাঠিয়েছেন সাম্মানিক দক্ষিণার জন্য কোনোরূপ আকাঙ্ক্ষা না রেখেই। এইসব পত্রিকা ছাড়াও বহু অখ্যাত পত্র-পত্রিকাতেও তিনি লিখেছেন। প্রায় কাউকেই কখনো বিমুখ করেননি। অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত তাঁকে 'অনুপস্থিত' লেখক হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। এর উত্তরে কিছুটা অভিমান ক'রে তিনি লিখেছিলেন—

“শ্রদ্ধেয় অচিন্ত্যবাবু ১৩৫৬/অগ্রহায়ণের পূর্বাশায় প্রকাশিত 'কল্লোল যুগ' প্রবন্ধে একটি অকপট সত্য অতিসুন্দর করিয়া বলিয়াছেন। জগদীশবাবু সাহিত্য ক্ষেত্রে বিচরণশীল অনেকের কাছেই 'অনুপস্থিত'। এই একটি শব্দ 'অনুপস্থিত' শব্দটি, আমার সঙ্গে পাঠকের যোগরেখা চমৎকার নির্বিকারভাবে দেখাইয়া দিয়াছে। একটি শব্দের দ্বারা এতটা সত্যের উদ্‌ঘাটন

আমার পক্ষে ভয়াবহ হইলেও আনন্দপ্রদ। সরল ভাষায় কথাটার অর্থ এই যে, অনেকেই আমার নাম শোনেন নাই। কাজেই অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, যাহাদের কাছে আমি 'অনুপস্থিত' তাহাদের সম্মুখে আচম্‌কা লাফাইয়া পড়িতে আমি পারি না। লেখা পড়াইয়া সন্তোষবিধান ব্যতীত নিজের খবর আর তথ্য জানাইয়া তাঁদের কৃতার্থ করিবার দায়িত্ব নেই।"[৪৩]

'আত্মপ্রচার বিমুখ' আত্মাভিমানী লেখকের এই অভিমানী প্রকাশ স্বাভাবিক ছিল। নিজেকে 'ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া ফলাইয়া' কোনকালেই প্রকাশ করতে ভালোবাসতেন না। লেখালেখি করেন জেনে বোলপুর টাউনে তাঁর সুহৃদ কানুবাবু-শ্রীব্রজজন বল্লভ বসু তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'বিনোদিনী' প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার নিয়েছিলেন। গ্রন্থটি প্রকাশের পর তাঁর লেখা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে প্রবণ আলোড়ন হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রশংসা করে বলেছিলেন—

"তোমার গল্পে নূতন রূপ ও রস দেখিয়া খুশী হইলাম।"[৪৪]

বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা আরেক কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার ব্যক্তিগতভাবে জগদীশ গুপ্তের লেখা পড়ে এতটাই খুশি হয়েছিলেন যে, সেই পরিতৃপ্তি থেকে তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে জগদীশবাবুর রচনাদি সংগ্রহ করেছিলেন নির্বাচিত করে ভূমিকা লিখে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার জন্য। কিন্তু মোহিতলালের অকাল মৃত্যুতে সেই চিন্তা বাস্তবায়িত হয়নি। জগদীশ গুপ্তের রচনাবলী প্রথম খণ্ডের পরিচায়িকায় একথার সমর্থন রয়েছে—

"মোহিতবাবু গুপ্ত মহাশয়ের অনেকগুলি পুস্তক সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি রচনা নির্ব্বাচন করিয়া ভূমিকাসহ একখানি সংগ্রহ পুস্তক প্রকাশ করিবেন। কিন্তু মৃত্যু তাঁহাকে হরণ করায় মোহিতবাবুর ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই—পূর্ণ হইলে সাহিত্য জগৎ নূতনতর আলোকপাতে জগদীশবাবুর রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর ভাবে পরিচিতি এবং রচনা সম্পর্কে অধিকতর শ্রদ্ধাযুত হইতে পারিত।"[৪৫]

আত্মকেন্দ্রিক এই মানুষটি তাঁর দুর্বিসহ জীবন যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে থাকাকালীন খুব বেশী সম্মান ও স্বীকৃতি পাননি। এই বিষয়টি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। জীবন সায়াহ্নে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বদান্যতায় ভারত সরকার তাঁকে ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে মাসিক ১৫০ টাকা সাহিত্যিক ভাতা মঞ্জুর করেছিল। পরে অবশ্য সেই অর্থের পরিমাণ অর্ধেক অঙ্কে নেমে

এসেছিল। যাদবপুরের নিকটস্থ রামগড় কলোনীর ঘেঁষাঘেষি সংকীর্ণ আশ্রয়ে তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি কেটেছে। লেখকের জীবদ্দশায় এই রামগড় কলোনীর প্রগতি সংঘের তরুণরাই একমাত্র লেখককে সম্বর্ধনা জানিয়েছিল। আর কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাকে সম্মান জানায় নি সেভাবে। সেদিক থেকে প্রগতি সংঘের সেই প্রয়াস ধন্যবাদার্হ। ১৩৬০ বঙ্গাব্দের ৫ই পৌষ রামগড়ে অনুষ্ঠিত সেই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের যে বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তার টুকরোটি এরকম—

''সম্প্রতি যাদবপুরের নিকটবর্তী রামগড় কলোনীতে প্রগতি সংঘের সভ্যগণের উদ্যোগে এই কলোনীর অধিবাসী সাহিত্যিক শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্তকে একটি মানপত্র প্রদান করা হয়। গুপ্ত মহাশয় আজীবন সাহিত্য সাধনা করিয়া জীবনের সায়াহ্নে উপনীত হইয়াছেন। বর্তমান সময়ে তাঁহার বয়স ৬৮ বৎসর এবং দৃষ্টিশক্তি অতিশয় দুর্বল ও লুপ্তপ্রায়।....এই বৃদ্ধ সাহিত্যিককে রামগড় কলোনীর অধিবাসীগণের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবার জন্য যে সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে প্রগতি সংঘের বর্তমান প্রেসিডেন্ট শ্রীমতিলাল বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ... এতদুপলক্ষে বিভিন্ন বক্তা জগদীশবাবুর জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া জাতি সংগঠনে সাহিত্যের প্রভাব যে কত শক্তিশালী তাহা বর্ণনা করেন। জগদীশবাবুর পক্ষ হইতেও তাঁহার লিখিত ভাষণ পাঠ করা হয় এবং তিনি কৃতজ্ঞ অন্তঃকরণে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।''[৪৬]

প্রগতি সংঘের এই উদ্যোগ সম্পর্কে বলা যায় তাঁরা 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না' কথাটিকে ভুল প্রমাণ করেছিলেন এই সম্মাননা জ্ঞাপন করার মধ্যদিয়ে।

জগদীশ গুপ্ত এরপর খুব বেশীকাল বাঁচেন নি। মৃত্যুর পর তাঁর চলে যাওয়াকে ঘিরে কোন শোকসভা বা কিংবা স্মরণসভা করা হয়েছিল কিনা তার কোনরূপ প্রমাণ নেই। তবে দু-একটি পত্রিকায় তাঁর মৃত্যু সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল বেং তারা কেউ কেউ স্বল্প পরিসরে লেখকের শিল্পী প্রতিভার বিষয়েও দু-চার কথা বলেছেন। তাঁর মৃত্যুতে 'শনিবারের চিঠি'তে একটি নিবন্ধ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল 'সংবাদ সাহিত্য' অংশে। এই নিবন্ধ-সংবাদ লিখেছিলেন সম্পাদক সজনীকান্ত দাস—এরকমই অনুমান করা হয়। সেই নিবন্ধে জগদীশবাবু সম্পর্কে

লেখা হয়েছিল—

"বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক জগদীশ গুপ্তের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। তিনি যেকালের মানুষ সেকালের সাহিত্যিকদের সঙ্গে পথ চলিবার চেষ্টা করেন নাই, করিলেও পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন। মধ্যবয়সে উপনীত হইয়া হঠাৎ তিনি এমন গল্পের সৃষ্টি করিলেন যে, 'কল্লোল' পত্রিকায় নূতনত্ব প্রয়াসী তরুণেরাও চকিত হইয়া উঠিলেন এবং জগদীশ গুপ্তকে বয়সে তরুণ-কল্পনা করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। সময়ের অগ্রগামী তাহাকে বলিব না, গতানুগতিক পথে চলিতে চলিতে পরাজয়ের গ্লানিতে বোধহয় প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়াই তিনি অভিনব পথ ধরিয়াছিলেন। ... তাঁহার মনের অন্তরালে যে জটিল গ্রন্থি ছিল, তাহা তাঁহাকে সাহিত্য সরণী হইতে বহুবার বিপথে লইয়া গিয়াছে, তবুও নতমস্তকে স্বীকার করিব কথাসাহিত্যে তিনি ওস্তাদ শিল্পী, জোরালো তাঁহার ভাষা, নিপুণ তাঁহার মানব চরিত্র চিত্রণ। তাঁহার নিষ্ঠুরতা ও কাঠিন্যের মধ্যেও বেদনার ফল্গুপ্রবাহ রহিয়াছে। তিনি তাই বাঁচিয়া থাকিবেন।"৪৭

নিবন্ধটির প্রথমাংশে লেখক সম্পর্কে কিছুটা বিরূপ ভাবনা বা আংশিকতাদোষ দুষ্ট চিন্তা থাকলেও শেষে কিন্তু স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। লেখকের মৃত্যুতে এই রচনাটুকুই হয়তো প্রথম বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য।

সমকালের 'যুগান্তর' পত্রিকার (৪ঠা বৈশাখ, ১৩৬৪) সম্পাদকীয় কলমে জগদীশবাবুর মৃত্যু সংবাদের পাশাপাশি তাঁর সাহিত্য প্রতিভার কিছুটা মূল্যায়নও করা হয়েছিল। নিঃসন্তান জগদীশবাবুর সৃষ্টিগুলিকেই তাঁর সন্তানরূপে উল্লেখ করেছিল এই পত্রিকা। সেই প্রকাশিত সংবাদের কিছুটা অংশ এরকম—

"প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক জগদীশ গুপ্ত লোকান্তরিত হইয়াছেন এ সংবাদে সাহিত্যমোদী মাত্রেই ব্যথিত হইবেন। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বাংলায় যে নূতন সাহিত্যিক দল দেখা দেন, বয়সে বড় হইলেও জগদীশ গুপ্ত ছিলেন তাহাদের অন্তর্ভুক্ত—সে সমাজচেতনার দিক হইতেও, মননশীলতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির দিক হইতেও। কল্লোল, কালি-কলম, বঙ্গবাসী প্রভৃতি তৎকালীন প্রসিদ্ধ পত্রিকাগুলির মধ্যে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ এবং প্রথম আবির্ভাবেই

গুণীজনের সসম্মান স্বীকৃতির অধিকারী হন।"[৪৮]

জগদীশবাবুর সাহিত্য রচনার কালকে চিহ্নিত করে তাঁকে সসম্মান স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এই সংবাদে।

'দেশ' পত্রিকার (১৪ই বৈশাখ, ১৩৬৪) 'সাময়িক প্রসঙ্গ' অংশে জগদীশবাবুর রচনার মূল্যায়ন ক'রে তাঁকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের অন্যতম পথিকৃৎ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। পত্রিকাটিতে লেখা হয়েছিল—

''বাংলা সাহিত্যের বোধকরি দুঃসময় আসিয়াছে, যাঁহাদের একনিষ্ঠ সেবায় বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শব্দ ঐশ্বর্য মণ্ডিত হইতেছিল তাঁহাদের অনেকেই একে একে বিদায় লইতেছেন। মাত্র ছয়-সাত মাসের মধ্যে মানিক, সুনির্মল দক্ষিণারঞ্জন, দীনেশচন্দ্রের মতো সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিককে আমরা হারাইয়াছি, সম্প্রতি জগদীশ গুপ্ত মহাশয়কেও হারাইলাম। তাহার পরলোক গমনে ক্ষতির পরিমাণ আরও অসহ্য হইয়া উঠিল। জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যের সহিত ইদানিংকার পাঠক সমাজের ঘনিষ্ঠতা হয়ত নাই, কারণ প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জনের যে সিধা সড়ক গুপ্ত মহাশয় তাহা হইতে দূরত্ব রচনা করিয়া সাহিত্য সেবা করিয়া গিয়াছেন।"৪৯

সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্ট এই মূল্যায়ন জগদীশবাবুর প্রাপ্য। বিশেষকরে একেবারে শেষে তাঁর সম্পর্কে অকপট সত্য ভাষণ উচ্চারিত হয়েছে।

অধ্যাপক ও সাহিত্য সমালোচক ড. ক্ষেত্র গুপ্ত একটি প্রবন্ধের সূচনায় (সাহিত্য ও সংস্কৃতি/কার্তিক-পৌষ সংখ্যা, ১৩৮০) জগদীশ প্রতিভার মূল্যায়ন করে লিখেছেন—

''জগদীশ গুপ্ত বাংলা সাহিত্যের একজন অবহেলিত লেখক। অথচ, কথাসাহিত্যে মনস্তাত্বিক জটিলতা উদ্ঘাটনে তিনি অতি দুর্লভ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পথিকৃতের সম্মান তাঁর প্রাপ্য। কিন্তু জীবৎকালে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান তিনি পান নি।... সতর্ক পাঠক জগদীশচন্দ্র গুপ্তের রচনাবলী পাঠ করলে তাঁর বাইরের স্বল্পায়োজনে এবং অন্তরের অতি গভীর মানবিক সম্পদে বিস্মিত হবেন—একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।"[৫০]

ড. ক্ষেত্র গুপ্তের শেষ বাক্যেই রয়েছে জগদীশবাবুর প্রতিভার প্রকৃত পরিচয়। তাঁর রচনা ফল্গুধারার মতো। উপর থেকে তার অন্তরঙ্গ গভীর ও ভয়ংকর স্রোত কল্পনা করা যায় না।

উত্তরকালে বাংলা সাহিত্যে যখন 'হাংরি প্রজন্মের মধ্যে নতুন পথ-অন্বেষণের জন্য সূচিত হয়েছে সাহিত্যে 'হাংরি জেনারেশন' বা 'ক্ষুধার্তদের আন্দোলন' ।সেই আন্দোলন কারীরাও জগদীশবাবুকে সম্মানের আসন দান করেছেন। মলয় রায়চৌধুরী, শৈলেশ্বর ঘোষ, বিনয় মজুমদারদের এবং প্রথমাবধি শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যয়দের সেই আন্দোলনের মধ্যদিয়ে বাংলা সাহিত্যে যখন একটা 'নতুন বাঁক' সৃষ্টি হচ্ছে, পরে অশ্লীলতার কারণে, প্রশাসনিক পেষণে সেই আন্দোলন ছত্রভঙ্গ হয়েছে এই ইতিহাসের ধারাতেও জগদীশ গুপ্ত প্রেরণাদানকারী লেখক যে ছিলেন সেকথার সমর্থন পাওয়া যায় উত্তরবঙ্গের হাংরি প্রজন্মের কবি অরুণেশ ঘোষের কথাতেও। তিনি 'জগদীশগুপ্ত : বাস্তবতার উত্তরাধিকার' — নামক এক স্বল্প পরিসরের প্রবন্ধের একজায়গায় লিখিছেন—

''জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে নতুন উৎসাহ দেখা দিয়েছে। আর সেটা সাহিত্য মহলে নয়, তরুণ লেখক ও পাঠকের মধ্যে। কারণটা কি খুব স্পষ্ট নয়? যখন চারপাশের সাংস্কৃতিক সাহিত্যিক শূন্যতা অবর্ণনীয় তখন এমন একজন লেখকের লেখা থেকে প্রেরণা পেতে চায় একজন তরুণ লিখিয়ে যাঁর মধ্যে ভণ্ডামি নেই, যাঁর সত্যদৃষ্টির উপর অবস্থা রাখা যায়।''[৫১]
আসলে সাহিত্যের গতি তো নদীর মতোই বাঁক নেয়, তেমনি একেকটা বাঁকে এসে পেছনের দিকে ফিরে তাকালে তরুণ প্রজন্ম তাদের ভাবনার সঙ্গে একেক জনের সাদৃশ্য খুঁজে পায় কিংবা তারা নিরন্তর খুঁজে চলে সেই প্রতিভাকে যাঁর সামনে নত হয়ে সত্যকে আত্মস্থ করা যায়। জগদীশ গুপ্তের প্রাসঙ্গিকতা আজও এখানেই।

সাম্প্রতিকালে সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে রাজীব চৌধুরী সম্পাদিত 'দুস্প্রাপ্য জগদীশ গুপ্ত' নামে দুটি পৃথক খণ্ডে বিন্যস্ত গ্রন্থ। এই গ্রন্থ দুটিতে জগদীশবাবুর দুস্প্রাপ্য উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা, নাটিকা ইত্যাদি সংকলিত হয়েছে। সংকলক ও সম্পাদক তাঁর গ্রন্থ নামের মধ্যেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন জগদীশবাবু আজ আর সহজলভ্য নন, তিনি দুস্প্রাপ্য। প্রসঙ্গত তিনি সংকলনের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছেন—

'' 'দুস্প্রাপ্য জগদীশ গুপ্ত' এরকম নামের একটি সংকলনে লেখক জগদীশ গুপ্তের যে কয়েকটি উপন্যাস, বড়গল্প এবং ছোটগল্প একত্রে সংকলিত করা হল, সেগুলি যে বর্তমানে

সহজসভ্য নয়, সেই ইঙ্গিতটিই করতে চাওয়া হয়েছে এখানে। কিন্তু পরে ভেবে দেখা গেল যে এই মুহূর্তে কেন, দুদশকেরও বেশি সময় ধরে জগদীশগুপ্তের কথাসাহিত্য বাঙালি পাঠকের কাছে দুষ্প্রাপ্যই হয়ে উঠেছে বটে।... বাংলা গল্পের কয়েকটি সংকলনে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হবার সুবাদে লেখকের পরিচিত কয়েকটি গল্পের নামই ঘুরে ফিরে আসে।"[৫২]

রাজীব চৌধুরীর বক্তব্যে অপ্রিয় সত্যটুকুই বড় নির্মমভাবে উচ্চারিত হয়েছে। তবুও এরপরেও থাকে সচেতন পাঠক-গবেষকের সুতীক্ষ্ণ ইতিহাসবোধ আর জীবন দৃষ্টি। তাকে ধুসর ইতিহাসের পাতায় প্রায় বিবর্ণ হয়ে যাওয়া অধ্যায়কে পুনরায় লিখে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতেই হয়। বাংলা কথাসাহিত্যের সেই ইতিহাসের ধারায় জগদীশ গুপ্তকে উল্লেখ না করে পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস রচনা কোনোমতেই সম্ভব নয়। বিশেষ করে আজকের এই ইন্টারনেটের যুগে মানুষের জীবনে যখন গতিবেগ বেড়েছে, কমেছে আবেগ, তখন বাংলা উপন্যাসের ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব জগদীশবাবু নিঃসঙ্গ মানবাত্মার যথার্থ প্রকাশক। তার 'অসাধু সিদ্ধার্থে'র ছদ্মবেশী সিদ্ধার্থ স্বামী প্রেম বঞ্চিতা কিশোরী-জ্যোতির্ময়ী কিংবা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চাহিদা পূরণ করতে সুস্থ জীবন থেকে টুকী নাম্নী মেয়েটির অন্ধকারে নেমে যাওয়া—এসবই তো এই সময়ের সমাজ দলিল। সুতরাং জগদীশবাবুর পুনঃপাঠ অনিবার্য। তাকে বাংলা উপন্যাসের পথরেখায় একটা স্বতন্ত্র মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত করতে হয়—যেখানে সংবেদনশীল পাঠক এসে অন্ততঃ একবার থমকে দাঁড়ায়।

তথ্যসূত্র :

১. কল্লোল যুগ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স্ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নবম প্রকাশ, ২০০২, পৃ. ১৪৮।

২. ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, সম্পাদনা : কার্তিক ভদ্র, এস. ব্যানার্জী এণ্ড কোং, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৭৪।

৩. সঞ্চিতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, পঞ্চাশতম সংস্করণ, ১৯৯৮, পৃ. ৯১।

৪. পত্রগুচ্ছ, জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, ১ম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রা. লি., পৃ. ৬০৮।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২০।

৬. জগদীশ গুপ্তের রচনা ও জগৎ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৫৪।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২।

৮. দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃ. ২৩১।

৯. ভিন্ন সন্ধান, ভিন্ন আঙ্গিক : উপন্যাসে জগদীশ গুপ্ত; জগদীশ গুপ্ত : জীবন ও সাহিত্য, সম্পাদনা : ড. সমরেশ মজুমদার, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১২, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৯২।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০।

১১. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ১৩৮।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭।

১৩. আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ৭২।

১৪. জগদীশ গুপ্ত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৯।

১৫. জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, পৃ. ৭২।

১৬. জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, পৃ. ১৫৪।

১৭. জগদীশ গুপ্তের রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রা. লি., কলকাতা, পৃ. ৬৩৭।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৮।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৪।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪১।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪০।

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৭।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।

২৫. রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক, সাহিত্যচর্চা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ১১১।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১।

২৯. বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ১৫২।

৩০. বিশ্বভারতী, পৃ. ৮৬।

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।

৩৩. বাংলা কথাশিল্পের কয়েকজন মগ্ন অবলোকন ও সামান্য বিচার, চারুলিপি, বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৮৯।

৩৪. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৩৫১।

৩৫. বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা. লি., কলকাতা, পৃ. ৩৬৯।

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১।

৩৮. বাংলা গল্প বিচিত্রা, প্রকাশভবন, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০০৩, পৃ. ৯১।

৩৯. পুতুলনাচের ইতিকথা, প্রকাশভবন, কলকাতা, চল্লিশতম মুদ্রণ, ২০১০, পৃ. ১৮২।

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪।

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫।

৪২. ভূমিকা, জগদীশ গুপ্ত গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, পৃ. vi।

৪৩. জগদীশ গুপ্ত গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রা. লি., কলকাতা, পৃ. ৬৪৬।

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৭।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. vi।

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩১।

৪৭. জগদীশ গুপ্ত; আবুল আহসান চৌধুরী, বাংলা একাডেমী ঢাকা, পৃ. ৩৮।

৪৮. জগদীশ গুপ্ত'র কথাসাহিত্য : ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের আলোকে : বেস্ট বুকস্, কলকাতা, পৃ. ২৪৪।

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৪।

৫১. তিতির পত্রিকা, ফেব্রুয়ারী ২০০৭, সম্পাদক : সঞ্জয় সাহা, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, পৃ. ১৩৮।

৫২. দুষ্প্রাপ্য জগদীশ গুপ্ত, প্রথম খণ্ড, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১১।

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

ক. আকরগ্রন্থ :

১. জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) : বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা।

২. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) : সম্পাদক : নিরঞ্জন চক্রবর্তী গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭৮।

৩. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) : সম্পাদক : নিরঞ্জন চক্রবর্তী গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

৪. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড) : সম্পাদক : আনন্দরূপ চক্রবর্তী গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৩।

৫. জগদীশ গুপ্ত গল্পসমগ্র (প্রথম খণ্ড) : সম্পাদনা : ড. সরোজ মোহন মিত্র নিরঞ্জন চক্রবর্তী, গ্রন্থালয় প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৯০।

৬. জগদীশ গুপ্ত গল্পসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড) : গ্রন্থালয় প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৯৬।

৭. দুষ্প্রাপ্য জগদীশ গুপ্ত (প্রথম খণ্ড) : সংকলন ও সম্পাদনা রাজীব চৌধুরী, সপ্তর্ষি প্রকাশন শ্রীরামপুর, হুগলী ২০০৭।

৮. দুষ্প্রাপ্য জগদীশ গুপ্ত (দ্বিতীয় খণ্ড) — সংকলন ও সম্পাদনা : রাজীব চৌধুরী, সপ্তর্ষি প্রকাশন শ্রীরামপুর, হুগলী, ২০১০।

৯. জগদীশ গুপ্তর গল্প — সম্পাদনা : সুবীর রায়চৌধুরী দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬।

সহায়ক গ্রন্থ :

খ. বাংলা গ্রন্থ :

১. আজাদ হুমায়ুন — নারী, আগামী প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১১

২. ইসলাম নজরুল — সঞ্চিতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, পঞ্চাশৎ সংস্করণ, ১৯৯৮

৩. কর অরবিন্দ — আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও জগদীশ গুপ্ত বইওয়ালা, কলকাতা, ২০০৮

৪. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ — বাংলা গল্প বিচিত্রা প্রকাশ ভবন, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০০৩

৫. গুপ্ত ক্ষেত্র — বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থনিলয়, কলকাতা নতুন দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬

৬. গুপ্ত ক্ষেত্র — বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ, ২০০৮

৭. গুপ্ত ক্ষেত্র — বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড) গ্রন্থনিলয়, কলকাতা তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০

৮. গুপ্ত ক্ষেত্র — বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড) গ্রন্থনিলয়, কলকাতা দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০৮

৯. গুপ্ত ক্ষেত্র — বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : শিল্পীরীতি

		গ্রন্থনিলয়, কলকাতা
		তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৯৬
১০. গুপ্ত ক্ষেত্র (সম্পাদিত)	—	বঙ্কিমচন্দ্র : আধুনিক মন
		পুস্তক বিপণি, কলকাতা
		প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯
১১. ঘোষ ড. অজিতকুমার	—	জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্র
		সাহিত্য লোক, কলকাতা,
		নতুন সংস্করণ, ২০০৫
১২. ঘোষ ড. অজিতকুমার	—	শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার
		দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
		দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০০
১৩. ঘোষ প্রসূন	—	উপন্যাসের নানাস্বর, এবং মুশায়েরা,
		কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫
১৪. ঘোষ বিশ্বজিৎ	—	বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস নৈঃসঙ্গ চেতনার রূপায়ণ
		বাংলা একাডেমী ঢাকা
		প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭
১৫. চক্রবর্তী কৃষ্ণরূপ	—	বাংলা কথাসাহিত্যে মনোবিশ্লেষণ, পুষ্প,
		কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৯
১৬. চৌধুরী আবুল আহসান	—	জগদীশগুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭)
		বাংলা একাডেমী ঢাকা
১৭. চৌধুরী কমল (সম্পাদিত)	—	বাঙ্গালার ইতিহাস
		(প্রাচীন যুগ থেকে ইংরেজ আমল)
		দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
		প্রথম দে'জ সংস্করণ : ২০০৬

১৮. চট্টোপাধ্যায় ড. প্রবীরকুমার — জগদীশ গুপ্তর কথাসাহিত্য ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের আলোকে, বেস্টবুক্স্, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯২

১৯. চট্টোপাধ্যায় ড. প্রবীরকুমার — মনঃসমীক্ষণের বিচারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য, জে.এন. ঘোষ এণ্ড সন্স্, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১১

২০. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম — বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) তুলি-কলম, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৫

২১. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিম — বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) তুলি-কলম, কলকাতা, ১৯৮৬

২২. চট্টোপাধ্যায় বিজয়লাল — রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯১

২৩. চৌধুরী শ্রীভূদেব — বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (দ্বিতীয় পর্যায়) দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০০২

২৪. চৌধুরী শ্রীভূদেব — বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, তৃতীয় পর্যায়, (রবীন্দ্র যুগ : প্রথম পর্ব) দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৩

২৫. চৌধুরী শ্রীভূদেব — বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, চতুর্থ পর্যায়, (রবীন্দ্র যুগ : দ্বিতীয় পর্ব) দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৩

২৬. চৌধুরী শ্রীভূদেব — বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি., কলকাতা,

পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৯

২৭. চট্টোপাধ্যায় শ্রীশরৎচন্দ্র — সুলভ শরৎ সমগ্র (১), আনন্দ পাবলিশার্স, প্রা.লি., কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৯৯৫

২৮. চট্টোপাধ্যায় শ্রীশরৎচন্দ্র — সুলভ শরৎ সমগ্র (২), আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৯৯৫

২৯. চক্রবর্তী সুধীর (সম্পাদনা) — বুদ্ধিজীবীর নোটবই, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫

৩০. চৌধুরী ড. সুবোধ — সাহিত্য-শিল্প ও নন্দনতত্ত্ব, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮

৩১. চক্রবর্তী সুমিতা — উপন্যাসের বর্ণমালা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৩২. চট্টোপাধ্যায় হীরেন — বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতা : জগদীশ গুপ্ত, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩

৩৩. চট্টোপাধ্যায় হীরেন — জগদীশ গুপ্ত, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, প্রথম প্রকাশ, ২০০০

৩৪. চট্টোপাধ্যায় হীরেন — কথা সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১০

৩৫. জাহান সারোয়ার — বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : মূল্যায়ণের পালাবদল, বাংলা একাডেমী ঢাকা, বালাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৫

৩৬. ঠাকুর শ্রীরবীন্দ্রনাথ — রবীন্দ্র রচনাবলী (১-১০ খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১২৫তম রবীন্দ্র জয়ন্তী সুলভ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৮

৩৭. দত্ত বীরেন্দ্র — বাংলা কথাসাহিত্যের একাল, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮

৩৮. দত্ত ভবতোষ — বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, সাহিত্য লোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫

৩৯. দত্ত সম্রাট — বিশ শতকের আখ্যান তত্ত্বের প্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাস, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১০

৪০. দাশ জীবনানন্দ — জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, সপ্তম মুদ্রণ, ১৯৮৮

৪১. দাশ জীবনানন্দ — জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ, ভারবি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৬

৪২. দাশগুপ্ত প্রফুল্লকুমার — উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম বামা পুস্তকালয়, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০০

৪৩. দাশগুপ্ত সুরজিৎ — যুগ বদলে বাংলা উপন্যাসের রূপবদল, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৪১৬

৪৪. দাস বেলা (ও বিশ্বতোষ চৌধুরী সম্পাদিত) — বাংলা আখ্যান : বহুমাত্রিক পাঠ, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১১

৪৫. দাস সীমারেখা — নারীবাদী ভাবনায় বঙ্কিমের নারী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৬

৪৬. দাস সঞ্জীব — বাস্তববাদের বহুরূপ ও শৈলজানন্দের কথাসাহিত্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১১

৪৭. দাস বেলা — বাংলা উপন্যাসের উন্মেষপর্ব, সাহিত্যশ্রী পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯

৪৮. দে আশিষকুমার — উপন্যাসের শৈলী : তারাশংকর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যাপিরাস, কলকাতা

৪৯. দে নাড়ুগোপাল (সম্পাদিত) — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১১

৫০. দে নাড়ুগোপাল — উনিশ শতকে বাংলা রেনেসাঁস ও বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১০

৫১. নাথ দ্বিজেন্দ্রলাল — বঙ্কিম সন্ধিৎসা, পুথিপত্র (ক্যালকাটা) প্রা. লি., প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯

৫২. পোদ্দার অরবিন্দ — বঙ্কিম মানস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, নবম মুদ্রণ, ২০০৩

৫৩. বন্দ্যোপাধ্যায় ড. জয়ন্ত — বাংলা সামাজিক উপন্যাসের দুই স্থপতি, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০২

৫৪. বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ন্ত — শরৎসাহিত্যে ব্যক্তি ও সমাজ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯

৫৫. বন্দ্যোপাধ্যায় ড. অসিতকুমার — বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি., কলকাতা, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০১১

৫৬. বন্দ্যোপাধ্যায় পার্থপ্রতীম — উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪

৫৭. বন্দ্যোপাধ্যায় ড. দেবদ্যুতি — কথাসাহিত্য প্রকরণ, বি.বি. কুণ্ডু এ্যাণ্ড সন্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৬

৫৮. বসু ড. দেবকুমার — কল্লোল গোষ্ঠীর কথাসাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম করুণা সংস্করণ, ২০০৪

৫৯. বসু নৃপেন্দ্রকুমার — ফ্রয়েডের নারী চরিত্র, বীণা লাইব্রেরী, কলকাতা, পরিমার্জিত ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৮

৬০. বসু নৃপেন্দ্রকুমার — ফ্রয়েডের ভালোবাসা, বাণী লাইব্রেরী, কলকাতা,

নতুন সংশোধিত সংস্করণ, ২০০৩

৬১. বিশী শ্রীপ্রমথনাথ — বঙ্কিম সরণী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৫

৬২. বসু বুদ্ধদেব — সাহিত্য চর্চা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০০

৬৩. বন্দ্যোপাধ্যায় রুমা — বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪

৬৪. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক — পুতুলনাচের ইতিকথা, প্রকাশভবন, কলকাতা, চল্লিশতম মুদ্রণ, ২০১০

৬৫. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার — বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি., কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৮

৬৬. বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ — বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, পরিমার্জিত, ১৯৯৫

৬৭. বিশ্বাস ড. সন্তোষকুমার — শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০২

৬৮. বিশ্বাস সর্বাণী — রবীন্দ্র উপন্যাসে নারী, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭

৬৯. বসু স্বপন (ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত) — উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, (অধ্যাপক বিজিতকুমার দত্ত স্মারকগ্রন্থ), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৫

৭০. বসু স্বপন — বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ২০১৪

৭১. বন্দ্যোপাধ্যায় সুনীলকুমার — উপন্যাস শিল্পী রবীন্দ্রনাথ, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮

৭২. ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন — বঙ্কিম সৃষ্টি সমীক্ষা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১১

৭৩. ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন — বঙ্কিমবিদ্যা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৬

৭৪. ভদ্র কার্তিক (সম্পাদিত) — ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, এস. ব্যানার্জী এণ্ড কোং, কলকাতা, পরিমার্জিত প্রথম সংস্করণ, ২০০৩

৭৫. ভট্টাচার্য তপোধীর — উপন্যাসের আলো আঁধার, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪

৭৬. ভট্টাচার্য তপোধীর — প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৬

৭৭. ভট্টাচার্য তপোধীর — উপন্যাসের ভিন্ন পাঠ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫

৭৮. ভট্টাচার্য তপোধীর — কথার সময় : সময়ের কথা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩

৭৯. ভট্টাচার্য দেবাশীষ — বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা, অক্ষর পাবলিকেশনস্, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১০

৮০. ভট্টাচার্য দেবীপদ — উপন্যাসের কথা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮২

৮১. ভট্টাচার্য বীতশোক — কথা জিজ্ঞাসা, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৪

৮২. ভট্টাচার্য মালিনী — নির্মাণের সামাজিকতা ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ, ১৯৯৬

৮৩. ভট্টাচার্য ড. সুধীন্দ্রনাথ — উপন্যাসের তত্ত্ব ও বঙ্কিমচন্দ্র, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৩

৮৪. মজুমদার মোহিতলাল — বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও বঙ্কিমবরণ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫

৮৫. মজুমদার মোহিতলাল — সাহিত্য বিচার, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম করুণা সংস্করণ, ২০০৬

৮৬. মজুমদার সমরেশ — জগদীশগুপ্ত : জীবন ও সাহিত্য (সম্পাদিত), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০১২

৮৭. মজুমদার রমেশচন্দ্র — বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), প্রাচীন যুগ, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, দশম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১০

৮৮. মজুমদার রমেশচন্দ্র — বাংলাদেশের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), মধ্যযুগ, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৩

৮৯. মজুমদার রমেশচন্দ্র — বাংলাদেশের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড), আধুনিক যুগ, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০১

৯০. মজুমদার সমরেশ — বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৬

৯১. মজুমদার উজ্জ্বলকুমার — উপন্যাসে জীবন ও শিল্প, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০০৮

৯২. মজুমদার উজ্জ্বলকুমার — উপন্যাস পাঠকের ডায়ারি, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯

৯৩. মাইতি প্রভাতাংশু — ভারত ইতিহাস পরিক্রমা, শ্রীধর প্রকাশনী, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৮

৯৪. মাজি ড. উমা — উনিশ শতকের প্রথম পাদে বঙ্গ সমাজ ও সাহিত্যে ভাব-সংঘর্ষ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭

৯৫. মিত্র ড. সরোজমোহন — শরৎ সাহিত্যে সমাজচেতনা, গ্রন্থালয় প্রা. লি., কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৪

৯৬. মিশ্র ড. গোকুলানন্দ — প্রতীচ্য প্রেরণা ও কল্লোলীয় সাহিত্য, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রজ্ঞা বিকাশ সংস্করণ, ২০১১

৯৭. মিশ্র পুষ্পা (ও মানবেন্দ্র মিত্র) — সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড : মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি প্রা. লি., কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৭

৯৮. মিশ্র ড. অশোককুমার — সাহিত্যের রূপরীতি কোষ, সাহিত্যসঙ্গী, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৯

৯৯. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার — মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে, বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২

১০০. মুখোপাধ্যায় ড. বিমলকুমার— সাহিত্য-বিচার : তত্ত্ব ও প্রয়োগ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৬

১০১. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার — কালের প্রতিমা, বাংলা উপন্যাসের যাট বছর : ১৯২৩-১৯৮২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯১

১০২. মুখোপাধ্যায় ড. বিমলকুমার — সাহিত্য বিবেক, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৯

১০৩. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার — শরৎচন্দ্র : পুনর্বিচার, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ, ২০০১

১০৪. মুখোপাধ্যায় তরুণ — সাহিত্য : বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১০

১০৫. মুখোপাধ্যায় দুর্গাশংকর — সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য প্রসঙ্গ সমালোচনা বিচিত্রা, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭

১০৬. মুখোপাধ্যায় ড. জীবনকুমার — বঙ্কিমচন্দ্রের ট্রাজেডি চেতনা, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম নবপত্র সংস্করণ, ২০০৮

১০৭. মুখোপাধ্যায় ড. প্রশান্ত — কথাসাহিত্যিক জগদীশ গুপ্ত, এডুকেশন ফোরাম, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০১

১০৮. রহমান ড. শাহীদা — রবীন্দ্র উপন্যাসে নারীর অধিকারচেতনা, সমাবেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৮

১০৯. রায় অলোক (সম্পাদিত) — সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য, সাহিত্যলোক, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০২

১১০. রায় অতুলচন্দ্র (ও প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়) — ভারতের ইতিহাস, মৌলিক লাইব্রেরী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০০

১১১. রায় কবিশেখর কালিদাস — শরৎ সাহিত্য, বুকস্ ওয়ে, কলকাতা, বুকস্ ওয়ে পরিবার্জিত সংস্করণ, ২০০৯

১১২. রায় কবিশেখর কালিদাস — বঙ্কিম সাহিত্য, বুকস্ ওয়ে, কলকাতা, প্রথম বুকস্ ওয়ে পরিমার্জিত সংস্করণ, ২০১০

১১৩. রায়চৌধুরী গোপিকানাথ — দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০০

১১৪. রায় দেবেশ — উপন্যাস নিয়ে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৩

১১৫. রায় ড. নীহাররঞ্জন — বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০১

১১৬. রায় ড. নীহাররঞ্জন — রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৩

১১৭. রায় রঞ্জন (সীমা সাহা রায়) — রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি : একটি বিশ্লেষণ, এস. ব্যানার্জী এণ্ড কোং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৬

১১৮. রায় সত্যেন্দ্রনাথ — বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০০

১১৯. রায় সত্যেন্দ্রনাথ — সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ, ২০০৩

১২০. শাস্ত্রী শিবনাথ — রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (সম্পাদনা : বারিদবরণ ঘোষ), নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, দ্বিতীয় নিজ এজ সংস্করণ, ২০০৭

১২১. সরকার আবদুল মান্নান — জগদীশ গুপ্তের রচনা ও জগৎ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ২০০১

১২২. সরকার আবদুল মান্নান — উপন্যাসে তমসাবৃত জীবন : নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩

১২৩. সলীম গোলাম হুসেন — বাংলার ইতিহাস, সোপান পাবলিশার, কলকাতা, প্রথম সোপান সংস্করণ, ২০১১

১২৪. সরকার সুনীলকুমার — ফ্রয়েড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৯০

১২৫. সাইফুদ্দিন ড. কাজী — মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, বাংলাদেশ, ষষ্ঠ প্রকাশ, ২০১১

১২৬. সান্যাল অরুণ (সম্পাদিত) — প্রসঙ্গ : বাংলা উপন্যাস, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯১

১২৭. সিকদার অশ্রুকুমার — আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৯৯৩

১২৮. সিকদার অশ্রুকুমার — ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫

১২৯. সিকদার অশ্রুকুমার — সাহিত্যের সমাজ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫

১৩০. সিংহ রায় জীবেন্দ্র — কল্লোলের কাল, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৯৮৭

১৩১. সেন সুকুমার — বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১৯৯৪

১৩২. সেন সুকুমার — বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১৯৯৬

১৩৩. সেন সুকুমার — বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (পঞ্চম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১৯৯৯

১৩৪. সেনগুপ্ত প্রমোদবন্ধু — পাশ্চাত্য দর্শন, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, ষোড়শ সংস্করণ, সর্বশেষ মুদ্রণ, ২০০১

১৩৫. সেনগুপ্ত অচিন্ত্যকুমার — কল্লোল যুগ, এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা, নবম প্রকাশ, ২০০২

১৩৬. সেনগুপ্ত, শ্রীসুবোধচন্দ্র — বঙ্কিমচন্দ্র, এ মুখার্জী এণ্ড কোং প্রা. লি., কলকাতা,

চতুর্থ সংস্করণ, ২০০২
১৩৭. সেনগুপ্ত ড. নীতিশ — বঙ্গভূমি ও বাঙালির ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৮
১৩৮. সেন মজুমদার জহর — উপন্যাসের ঘরবাড়ি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০১
১৩৯. সৈয়দ আবদুল মান্নান — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অন্তবাস্তবতা-বহির্বাস্তবতা, প্রথমা প্রকাশন, কারওয়ান বাজার ঢাকা, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩
১৪০. সেন সুকুমার (সম্পাদিত) — কবি-কঙ্কন বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, প্রথম প্রকাশ, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০০১
১৪১. সাহা সঞ্জয় — তিতির (পত্রিকা), মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, প্রকাশ, ২০০৭
১৪২. হক হাসান আজিজুল — কথাসাহিত্যের কথকথা, সাহিত্য প্রকাশ, পুরানা পল্টন, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৪
১৪৩. হক হাসান আজিজুল — বাংলা কথাশিল্পের কয়েকজন মগ্ন অবলোকন ও সামান্য বিচার, চারুলিপি, বাংলা বাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৪
১৪৪. হাজারী আবদুল গণি (অনূদিত) — সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, মনঃসমীক্ষা, অবসর, ঢাকা, প্রথম অবসর প্রকাশন, ২০০২
১৪৫. হোসেন সৈয়দ আকরম — রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, নয়া উদ্যোগ সংস্করণ, ২০১১।

গ. ইংরাজী গ্রন্থ :

1. E. M Forster	:	Aspects of the Novel, Doaba Publications, Delhi, First Indian Edition, 2004
2. J. A. Cuddon	:	Dictionary of Literary Terms & Literary Theory, Penguin Reference, Published in Penguin Books, 1999
3. M. H. Abrams	:	A Glossary of Literary Terms (Seventh Edition), Thomson Heinle, First Reprint by Thomson Business, International India, Pvt. Ltd., 2006
4. Peter Childs and Roger Fowler	:	The Routeledge Dictionary of Literary Terms, Routeledge, Taylor and Francis Group, London and New York, 2006
5. Ramen Selden Peter Widdowson Peter Brooker	:	A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory (Fifh Edition), Pearson, 2012

নির্ঘণ্ট

অ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : ৮২, ১৮৯, ২৬৯, ২৮০

অনিলবরণ রায় : ১৫৮

অশ্রুকুমার সিকদার : ১, ৩০, ৩৭, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ১৮৯, ২৭০

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : ৩২

অ্যারিস্টটল : ১২৪, ২২৫

অসাধু সিদ্ধার্থ : ১, ৭৪, ১০৫, ১৫৮, ১৫৯, ১৬১, ১৭০, ১৭৮, ১৯০, ২২১, ২২৪, ২৩১, ২৪০, ২৫২, ২৬৭, ২৬৮, ২৭১, ২৮৪

অভয়ামঙ্গল : ৫, ৯০, ৯৪

অন্নদামঙ্গল : ২৩

অক্ষরা : ৫৭

অভাগীর স্বর্গ : ১১৩

অঙ্গুরীর বিনিময় : ৭

অরক্ষণীয়া : ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৪০

অতিথি : ৪৩

আ

আবুল আহসান চৌধুরী : ১, ৬০, ৬৭, ৭২, ৮৫, ২৭১, ২৮২

আবুল ফজল : ৯৪

আলালের ঘরের দুলাল : ৭, ৮, ১০১, ১০২

আনন্দমঠ : ১০, ১১, ১২, ১৮, ১৯, ২০, ২২৬, ২২৯

আলুনি আলু	:	৮১, ২৩৮
আইন-ই-আকবরী	:	৯৪
আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস	:	২৭০

ই

ইন্দিরা	:	১১, ১২
ই.এম. ফরস্টার	:	২২৬

ঈ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	:	১৬, ৮৪, ৯৯, ১০০, ১০১, ১৩০
ঈশ্বরগুপ্ত	:	৯৯, ১০০

উ

উইলিয়াম জেমস্	:	১৮২
উজ্জ্বলকুমার মজুমদার	:	২৩৩, ২৩৭

ঐ

ঐতিহাসিক উপন্যাস	:	৭

ক

কলঙ্কিত তীর্থ	:	১, ৭৪, ১০৫, ১৪৯, ১৫০, ১৫২, ১৫৮, ২২১, ২২২, ২৩১, ২৩৬, ২৫১, ২৫৫, ২৫৮, ২৬৮, ২৭৬
কপালকুণ্ডলা	:	১০, ১১, ১২, ১৪

কল্লোল যুগ : ৮২, ২৮৬

করুণা : ২২, ২৬৯

কশ্যপ ও সুরভি : ৫৭

কালি-কলম : ৫৩, ৬৭, ৬৯, ৭২, ৮৩, ২২১, ২২৫, ২৬৬, ২৮৬, ২৮৯

কৃষ্ণকান্তের উইল : ১১, ১৫, ১৭, ১০৩, ১১৬, ১২৪, ১৮৮

কল্লোল : ৩২, ৫৩, ৬৭, ১১৯, ২৬৫, ২৮৬, ২৮৯

কলঙ্কিত সম্পর্ক : ১১১, ১৪৯

কাজী নজরুল ইসলাম : ১৩০, ২৬৬

কুমারেশ ঘোষ : ৫৫

কলিকাতা কমলালয় : ৭

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য : ৭

কালীপ্রসন্ন সিংহ : ৭

কুসুমকুমারী দেবী : ৫৪

কালিদাস রায় : ৮০

গ

গতিহারা জাহ্নবী : ১০৫, ১১৫, ১৪২, ২১৫, ২২৪, ২৩৪, ২৪৬, ২৫৪, ২৭১, ২৭৬, ২৮৪

গোরা : ২৩, ২৯, ৪২, ১২৬

গীতাঞ্জলি : ১২৬

গৃহদাহ : ৩৮, ৪২, ১২৮

গোবিন্দচন্দ্র দাস : ৫৭
গোপীমোহন ঘোষ : ৭

ঘ

ঘরে বাইরে : ২৩, ২৯, ৩০, ৩৮, ১২৮

চ

চৌধুরাণী : ১৫১, ১৫২
চোখের বালি : ৫, ২২, ২৩, ২৫, ২৬, ২৭, ১০৩, ১৮৯, ২২৩, ২৬৯
চতুরঙ্গ : ২৩, ৩১, ৩৩, ২২৬
চর্যাপদ : ৯৩
চারঅধ্যায় : ২৩, ২৯, ৩১
চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান : ৭, ১০১, ১০২
চরিত্রহীন : ৩৫, ৪১, ৪২, ১১৬
চারুবালা গুপ্ত : ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬২, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৭৩, ৭৫, ৭৬, ৮০, ৮১, ৮৩, ৮৪, ১৩৩
চণ্ডীমঙ্গল : ৫, ১০৮
চন্দ্রশেখর : ১০, ১২, ১৪, ৪১
চন্দ্রনাথ : ৩৫, ৪১

জ

জীবনস্মৃতি : ২২

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় : ১৩, ৩৫
জীবনানন্দ দাশ : ৫৪, ৯০, ১৩০, ২৩৪
জলধর সেন : ২৮
জননী : ২৮৩
জগদীশ গুপ্ত : ১, ৪৬, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৬৯, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৯, ৯১, ১০৫, ১০৮, ১১৪, ১১৯, ১৩২, ১৩৩, ১৪০, ১৫৭, ১৫৯, ১৭১, ১৮২, ১৯১, ১৯৭, ২০৪, ২১৬, ২২২, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৫৪, ২৬৫, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭৪, ২৭৯, ২৮১, ২৮৩, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯২

ট

টমাস অ্যাকুইনাস : ১২৪

ত

তাতল সৈকতে : ১৫৯, ১৬৯, ২০৯, ২২৪, ২৩১, ২৩২, ২৩৬, ২৪৬, ২৫০, ২৫৫, ২৭২, ২৮৪
তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় : ৫৯, ৮১
তপোধীর ভট্টাচার্য : ১৮৭

তরুন মুখোপাধ্যায়	:	২৫৪

দ

দুলালের দোলা	:	৭৫, ৭৬, ৮৪, ১০৫, ১০৯, ১১২, ১৬৬, ২০৫, ২৩২, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৮, ২৩৯, ২৪৫, ২৪৯, ২৫৮, ২৭৭, ২৭৮, ২৮৫
দুর্গেশ নন্দিনী	:	৮, ১০, ১৩, ১০৩
দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা	:	১৪৫, ২৩৪, ২৩৬, ২৩৯, ২৪৮
দেবী চৌধুরানী	:	৪, ১০, ১১, ১৮, ১৯, ২০, ১২৪, ২২৬
দুইবোন	:	২৩, ৩১, ৩৩, ১২৪, ১৪১
দিবারাত্রির কাব্য	:	২৮৩
দেশ	:	৮৩, ২৯০
দেনাপাওনা	:	৩৫, ৪০, ১১৩, ১২৪
দিবসের শেষে	:	১৫৯
দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ	:	৭
দেবদাস	:	৩৫, ৪১
দত্তা	:	৩৫, ৪১, ৪২
দীনেশরঞ্জন দাশ	:	৬৭, ২৯০
দেবীপদ ভট্টচার্য	:	১০২

ধ

ধর্মতত্ত্ব	:	১৫

ন

নন্দ আর কৃষ্ণা	:	১০৫, ১১৫, ১৪৭, ২১৩, ২২৪, ২৪০, ২৭৬
নিষেধের পটভূমিকায়	:	১১৫, ১৪২, ২৩৫, ২৪৮, ২৫১
নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ	:	১৪৬, ২১৪, ২৪৮
নীলদর্পণ	:	১৩৭
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	:	২৮০
নববাবু বিলাস	:	৭
নববিবি বিলাস	:	৭
নৌকাডুবি	:	২৩, ২৭
নষ্টনীড়	:	২৫
নীহাররঞ্জন রায়	:	৩১
নববিধান	:	৩৪, ৩৯
নিষ্কৃতি	:	৩৬
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	:	২৮৫

প

পল্লীসমাজ	:	৩৫, ৩৯, ৪০, ১০৩, ১০৬, ১০৮, ১১৩, ১২৮, ২৭৮
পুতুল নাচের ইতকথা	:	১১৩, ১৫৮, ১৬৭, ২০৮, ২৮৩, ২৮৪
পথের পাঁচালী	:	৫৬
পেয়িং গেস্ট	:	৬৮
পরিচয়	:	১১৮, ২২৭, ২৭২
পথের দাবী	:	৩৫, ৪৩, ৪৪, ১২৯

প্রেমেন্দ্র মিত্র : ১৮৯, ২৬৯, ২৮০
প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায় : ৫২, ৭০, ১৮৮, ১৮৯, ১৯২, ২০৭, ২১১
প্যারীচাঁদ মিত্র : ১০১
প্রভাতাংশু মাইতি : ৯২, ৯৬
প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় : ১১৪
প্রজাপতির নির্বন্ধ : ২২
প্রমথ চৌধুরী : ৩১
পরিণীতা : ৩৫, ৪২
পণ্ডিত মশাই : ৩৭
পয়োমুখম্ : ১৯৪

ফ

ফুলমণি ও করুণার বিবরণ : ৭, ১০১, ১০২

ব

বঙ্কিমচন্দ্র : ৪, ৫, ৮, ১৩, ১৫, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৪১, ৫৪, ৬১, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ১০০, ১০৩, ১০৪, ১১৬, ১২৪, ১৩২, ২২০, ২২১, ২৬৬, ২৬৯, ২৭০
বুদ্ধদেব বসু : ২৭, ১৮৯, ২৭৯
বড়ু চণ্ডীদাস : ৬, ৯০
বেলা দাস : ১০৩

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ : ১০৬, ২৭৪, ২৭৫
বিশু মুখোপাধ্যায় : ২২২
বীরেন্দ্র দত্ত : ১৬৫
বিষবৃক্ষ : ১১, ১২, ১৫, ১৬, ৮৪, ১০০, ১০৩, ১২৪, ১৮৮
বউ ঠাকুরাণীর হাট : ২২, ২৩, ২৬৯
বিপ্রদাস : ৪৩, ১০৪
বাংলা উপন্যাসের কালান্তর : ২৭০
বাবু উপাখ্যান : ৭
বিচিত্রবীর্য : ৭
বিজয়বল্লভ : ৭
বঙ্গদর্শন : ১৪, ২১, ২২০
বিহারীলাল চক্রবর্তী : ২১
বাংলার ইতিহাস : ২৪
বিসর্জন : ২৪
বিচিত্রা : ২৮, ৮২
বড়দিদি : ৩৪, ৪১, ১০৪
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : ৩৫
বিন্দুর ছেলে : ৩৬
বৈকুণ্ঠের উইল : ৩৬, ৩৭
বিরাজ বৌ : ৩৭
বামুনের মেয়ে : ৩৯, ৪০, ১১২
বিজলী : ৬৮
বৈষ্ণব পদাবলী : ৯৮

বিনয় মজুমদার : ২৯১

ভ

ভারতচন্দ্র রায় : ২৩, ৯০, ২৬৫, ২৬৬

ভারতী : ২২, ৬৮, ২৬৯, ২৮৬

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : ৭

ভূদেব মুখোপাধ্যায় : ৭

ভূদেব চৌধুরী : ৫৭, ২৮২

ভারতবর্ষ : ৭৯, ২৮৬

ম

মহিষী : ১৪৪, ১৬৫, ১৭৯, ১৯৪, ২২৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৯, ২৫৬, ২৭২, ২৭৬, ২৮৪

মালঞ্চ : ২৩, ৩১, ৩৩

মৃণালিনী : ১০, ১২, ১৪, ১৮, ২১, ৯২

মুকুন্দ চক্রবর্তী : ৫, ৯০, ৯৪, ৯৫

মুরলীধর বসু : ৬৭, ৬৯, ৭১, ৭২, ৭৪, ৮৩, ২২১, ২২২, ২২৫, ২৩০, ২৬৬, ২৬৭

মধুসূদন দত্ত : ২১, ৫৪, ৬১

মোহিতলাল মজুমদার : ১৫৯, ২৮৬, ২৮৭

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ৪৬, ১৫৮, ২৮০, ২৮২, ২৮৩, ২৯০

মিহির চৌধুরী কামিল্যা : ৬

মধুসূদন মুখোপাধ্যায় : ৭

মানসী : ৪০

মহাভারত : ৬১

মনোজ বসু : ৮১

মলয় রায়চৌধুরী : ২৯১

য

যথাক্রমে : ৭৬, ১৬৬, ২০৭, ২৩১, ২৩৮, ২৪৫, ২৫০, ২৫৬, ২৭৭

যোগাযোগ : ২৩, ২৮, ৪১, ৪৩, ১২৪, ১২৬, ১৪৪, ১৯৬, ২১২, ২৭১

যুগলাঙ্গুরীয় : ১০, ১১, ১৪

র

রোমন্থন : ৬৪, ৭৫, ৭৬, ১০৫, ১০৬, ১০৯, ১১২, ১৭৬, ২০৪, ২০৫, ২২২, ২২৫, ২৩২, ২৩৫, ২৩৮, ২৪৫, ২৫৮, ২৭৭, ২৭৮

রতি ও বিরতি : ৮০, ১৫৯, ১৭৬, ১৭৯, ২১১, ২২৪, ২৪৮, ২৫১

রাজসিংহ : ৯, ১০, ১১, ১৪, ২২০

রাজর্ষি : ২২, ২৪, ২৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ১৪, ২১, ২৩, ২৪,২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৭৭, ৮৯, ১০৩, ১০৪, ১১৮,

১১৯, ১২৫, ১২৭, ১৩২, ১৪১, ১৪৪,
১৪৫, ১৮৮, ১৮৯, ১৯৮, ২১২, ২২১,
২৬৬, ২৬৯

রমেশচন্দ্র দত্ত : ৫৪, ৬১

রাধাকান্ত দেব : ৯৯

রাজা রামমোহন রায় : ৯৯, ১৩০

রাজীব চৌধুরী : ২৯১, ২৯২

রজনী : ১১, ১২

রামরাম বসু : ২৩

রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র : ২৩

রাজমালা : ২৪

রামের সুমতি : ৩৬, ৩৭

রামায়ণ : ৬১

ল

লঘুগুরু : ৬২, ৭৬, ১০৫, ১১৫, ১১৬, ১৩২,
১৫৯, ১৬২, ১৭৯, ১৯৭, ২১৪, ২২৪,
২২৯, ২৩১, ২৩২, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৯,
২৪১, ২৪৯, ২৫৩, ২৭২, ২৭৭

লাল বিহারী দে : ৭, ১০১, ১০২

শ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : ১৭, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪২, ৪৩,
৪৪, ৪৫, ৭৫, ৮০, ৮৯, ৯০, ৯১,

		১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৮, ১১২, ১১৪, ১১৬, ১১৯, ১২৭, ১২৮, ১৩০, ১৩২, ১৪৫, ১৮৯, ২২১, ২২৬, ২৬৬, ২৭৪
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	:	৫, ৭, ১০, ১৭, ২০, ২৪, ২৮, ৩২, ৩৪, ৩৮, ৩৯, ৪৫, ৪৬, ১০২, ১২৯, ২৬৯, ২৭০
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	:	৮০, ২৬৯
শ্রীচৈতন্যদেব	:	৯৩, ৯৬
শেকস্‌পীয়র	:	১৪১
শিবনাথ শাস্ত্রী	:	৯৯
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	:	৫, ৬, ৯০
শেষের কবিতা	:	৩১, ৩২
শ্রীকান্ত	:	৩৫, ৪৫, ১১৬, ১২৮
শেষপ্রশ্ন	:	৩৫, ৪৪, ১২৯, ২২৬
শরৎসাহিত্যে ব্যক্তি ও সমাজ	:	৩৫
শুভদা	:	৩৬, ৩৭
শিবদাস ঘোষ	:	৩৯
শেষের পরিচয়	:	২৭৭
শৈলেশ্বর ঘোষ	:	২৯১

স

সুতিনী	:	৮০, ১৪০, ১৭১, ১৭৯, ২১০, ২১১, ২৩, ৯০, ২২২৪, ২৩৬, ২৪৬, ২৪৭, ২৫০, ২৭৬

সীতারাম	:	১০, ১১, ১২, ১৮, ২০, ২২৬
স্ত্রীরপত্র	:	১২৭
সমরেশ মজুমদার	:	২৩৬
সুমিতা চক্রবর্তী	:	২২৬, ২২৭, ২২৮, ২৩৪, ২৬৮
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	:	২৯, ১৪৪, ১৬২, ২৩০, ২৩১, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭৪, ২৬৬
সরকার আবদুল মান্নান	:	১০৫, ১০৮, ১৩৮, ১৯১, ১৯৪, ২০২, ২৬৭, ২৭৬
সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত	:	৩৯
সরোজকুমার রায়চৌধুরী	:	৮১
সাগরময় ঘোষ	:	৮২
সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড	:	১৩১, ১৮৪
স্বামী বিবেকানন্দ	:	১৩০
স্বপন বসু	:	৯৭
সফল স্বপ্ন	:	৭
সুশীলার উপাখ্যান	:	৭
সুকুমার সেন	:	৮, ১২, ২৭, ৩৫, ৩৮, ৪৪, ৬৮, ১৭৯, ২৮১
সাম্য	:	১৬
সবুজপত্র	:	৩১
সরোজমোহন মিত্র	:	৯১
সুনীলকুমার সরকার	:	১৮৫
সাহিত্যের পথে	:	২৭৯

হ

হাড় : ১৫৯, ১৬০

হৈমন্তী : ১১৩, ১২৪

হ্যানা ক্যাথারিন মুলেন্স : ৭, ১০১

হাসান আজিজুল হক : ২১৬

হুতোমপ্যাঁচার নক্শা : ৭

হীরেন চট্টোপাধ্যায় : ৫৩, ৬৩, ৬৯, ৭০, ১৪৫, ১৫৩, ১৬৩, ১৭৮, ২৩৩, ২৩৫, ২৫৮, ২৭৮

ক্ষ

ক্ষেত্রগুপ্ত : ৩, ২০, ২৪, ২৮, ৩৩, ৩৭, ৪৩, ১৪০, ২১০, ২২৫, ২২৯, ২৪০, ২৫২, ২৯০

ইংরেজী :

I

Indian Field : ৮

R

Rajmohan's wife : ৮

T

The Principles of psychology : ১৮২

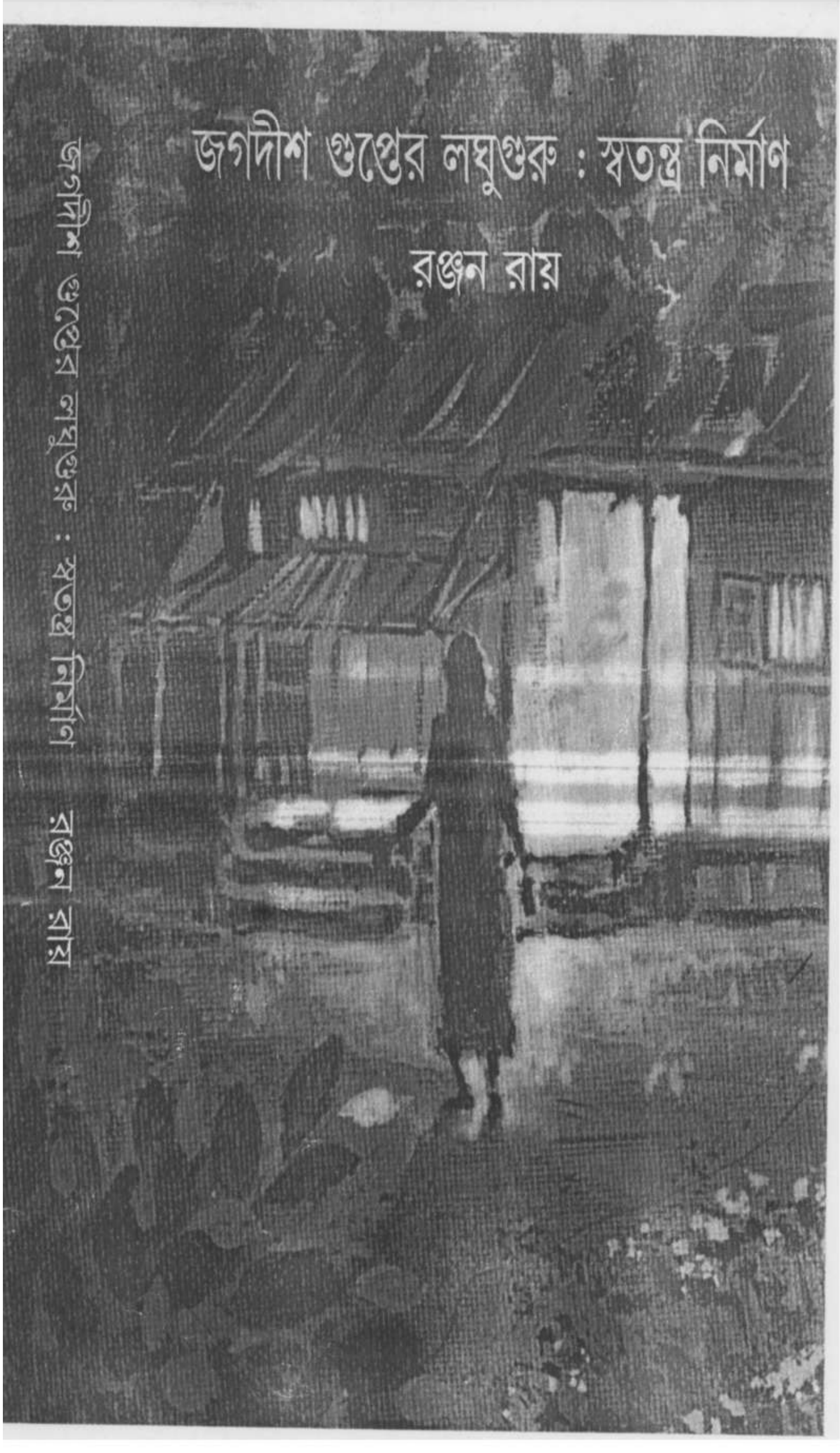
জগদীশ গুপ্তের লঘুগুরু : স্বতন্ত্র নির্মাণ
রঞ্জন রায়
জগদীশ গুপ্তের লঘুগুরু : স্বতন্ত্র নির্মাণ রঞ্জন রায়

জগদীশ গুপ্তের

লঘুগুরু : স্বতন্ত্র নির্মাণ

জগদীশ গুপ্তের
লঘুগুরু : স্বতন্ত্র নির্মাণ

রঞ্জন রায়

SOPAN
সোপান
কলকাতা

Jagadishgupter Laghuguru : Satantra Nirman by Ranjan Roy
Published by Joyjit Mukhopadhaya. Sopan
206, Bidhan Sarani, Kolkata-700 006
(033) 2257-3738 / 9433343616 / 9836321521
E-mail : sopan1120@yahoo.com

প্রকাশ
২০১৭

© : সোহম রায়

প্রচ্ছদ : সজল মণ্ডল

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক
জয়জিৎ মুখোপাধ্যায়
সোপান
২০৬, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬
ফোন : (০৩৩) ২২৫৭-৩৭৩৮/৯৪৩৩৩৪৩৬১৬
Email : sopan1120@yahoo.com

মুদ্রক
সারদা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৯সি, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলকাতা-৬

ISBN : 978-93-82441-38-0

মূল্য : ৩৫০ টাকা

উৎসর্গ

ড.অশ্রুকুমার সিকদার

ড. রঘুনাথ ঘোষ

ড. অঙ্কুশ ভট্ট

"রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের সাহিত্য যেখানে মানুষের উপর অপরিসীম বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, সেখানে জগদীশচন্দ্রের সাহিত্যের মূল কথাই হলো মানুষের মনুষ্যত্বে অবিশ্বাস।''

—আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস :
ড. অশ্রুকুমার সিকদার।

বিষয় সূচি

◆ প্রাক্কথন—ড. নিখিলেশ রায় ১
◆ সম্পাদনার পশ্চাদপটে ৯
◆ জগদীশ গুপ্তের জীবনরেখা ১১
◆ জগদীশ গুপ্তের রচনাধারা ১৫
◆ ঔপন্যাসিক জগদীশ গুপ্ত ৪৪

প্রসঙ্গ : লঘুগুরু
◆ পূর্বসূরীদের উপন্যাসের জগৎ ৭১
◆ বাংলাদেশের সমাজ ও লঘুগুরু ৮৪
◆ বিষয় : লঘুগুরু ৯১

অন্তর্বিশ্লেষণ
◆ নামকরণের ব্যঞ্জনা ১০১
◆ নিষিদ্ধ পল্লীর জীবন ও লেখকের অতীতচারিতা ১১১
◆ টুকীর স্বপ্নভঙ্গ ১১৯
◆ শয়তানের মুখ বিশ্বম্ভর ১২৬
◆ কলঙ্কিত নারী সুন্দরী ১৩২
◆ মুদ্রার ভিন্ন পিঠ পরিতোষ ১৩৯
◆ গৌণ চরিত্রের ভিড় ১৪৪
◆ উত্তম থেকে টুকী—পরম্পরার ইতিহাস ১৫৩
◆ মনোজগতের কুটিল বিসর্পিল গতি ১৬৫
◆ পরিণতি : অবণমনের শুরু ১৭৮
◆ ভাষা : অন্তরঙ্গে ও বহিরঙ্গে ১৮৪
◆ গঠন : ভিন্ন আঙ্গিকে ১৯১

অনু বিশ্লেষণ
◆ 'পরিচয়' পরিত্রকায় রবীন্দ্রনাথের অভিমত ১৯৯
◆ জগদীশ গুপ্ত কর্তৃক রবীন্দ্র-সমালোচনার উত্তর ২০৩
◆ পূর্বসূরীদের দৃষ্টিতে জগদীশ গুপ্ত ও লঘুগুরু ২০৪
◆ 'লঘুগুরু'র পাতায় পাতায় ২০৯
◆ সহায়ক গ্রন্থ ২১৯

ঔপন্যাসিক জগদীশগুপ্ত

"রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রীয় রুচি, রূপ, রীতি ও বিশ্বাসকে অগ্রাহ্য ও বিচূর্ণ করে আধুনিক বাংলা কথা সাহিত্যে যে পালাবদল এসেছিল, জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) ছিলেন তার প্রধান ঋত্বিক।... মানুষের অস্তিত্বের সংকট মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, তার প্রবল প্রবৃত্তির নগ্ন রূপের বিস্ময়কর উন্মোচন ঘটেছে তাঁর সাহিত্যে, যার তুলনা বা সাদৃশ্য পূর্বাপর বাংলা কথা সাহিত্যে প্রায় দুর্লক্ষ্য।" — *জগদীশ গুপ্ত: আবুল আহসান চৌধুরী (পৃ.৯)*

❑ বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পৃথিবীতে মানুষের প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, আত্মসর্বস্বতা, শ্রেষ্টত্বলাভের ইঁদুর দৌড় প্রতিযোগিতা — তারই ফলশ্রুতিতে পারস্পরিক সন্দেহ-হিংসা -বিদ্বেষ, শোষণ, বঞ্চনা- প্রতারণার বিষবাষ্পে পৃথিবীর স্বচ্ছ-নির্মল আকাশ ছেয়ে গেছে ক্রমশ:। জীবনের প্রতি পলে পলে প্রত্যাশার আলোক রশ্মি ম্লান থেকে ম্লানতর হচ্ছে। এই অন্ধকার সময়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ব্যক্তি-সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে নেমে এসেছে এক 'অদ্ভুত আঁধার। সেই আঁধারে নিমজ্জমান মানুষের অন্তরের গহন লোকে প্রবেশ করে তাদের জীবনধারাকে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় সংবেদনশীল স্রষ্টারা লিপিবন্ধ করে চলেছেন। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে সেই লিপিবন্ধকরণের কাজটি উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শুরু হলেও সেহ অর্থে জীবন সমস্যার অতলে পৌঁছতে পারেননি সেই সময়ের অন্যতম স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি মূলত: ইতিহাস ও ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স ধর্মী উপন্যাস এবং অনেকটাই নীতিবাগীশের ঢঙে তাঁর সামাজিক উপন্যাসগুলিতে জীবন সমস্যার রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। সেদিক থেকে তাঁর পরে রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের অতল গভীরে প্রবেশ করেছিলেন। ফলে বঙ্কিম পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা উপন্যাস নতুন রূপ পেয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে নিজেই তাঁর চোখের বালি (১৯০৩) উপন্যাসের 'সূচনা' অধ্যায়ের একেবারে শেষে লিখেছিলেন— "সাহিত্যের নব পর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পর বিবরণ দেওয়া নয় বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো ।" — রবীন্দ্র পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র মাটি ঘেঁষা জীবনের কাছাকাছি মানুরে আবেগ-ব্যথা বেদনা- আশা আকাঙ্ক্ষকে ব্যক্ত করতে গিয়ে এই আঁতের কথাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাঁরই উত্তরসুরী হিসেবে জগদীশ গুপ্ত মানব জীবনের বিচিত্র গতি প্রকৃতিকে তাঁর উপন্যাসে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। গ্রাম থেকে শুরু করে শহরতলীর জীবনধারাকে তিনি অংকন করতে গিয়ে তাদের দারিদ্র্য, হতাশা গ্লানির পাশাপাশি তাদের জৈবিক সম্পর্ক হিংসা-বিদ্বেষ-সহ জীবনের যাবতীয় ক্লেদ-পঙ্কিলতাকে তুলির টানে ফুটিয়ে তুলেছেন।

কুষ্ঠিয়া থেকে ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে 'কালি কলম' 'পত্রিকার সম্পাদক

মুরলীধর বসুকে একটি চিঠিতে জগদীশ গুপ্ত লিখেছিলেন —

"যে বইখানা আপনাকে পড়িতে দিয়াছি ওখানা ঠিক নটিক নয়, — কি যে তাহা পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন।

ঐ স্বপ্নের গল্পটা ছাড়া আরও একটি গল্প লিখিয়াছি। আপনার কাজের ভার একটু হাল্কা হইয়াছে যখন মনে হইবে, তখন পাঠাইব। গল্পটি ভালই হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।"...

উপন্যাস লেখা আমার পক্ষে-দুরূহ– অসম্ভবই।" চিঠিটি থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে জগদীশবাবু নিজের গল্প সম্পর্কে প্রবল আত্মপ্রত্যয়ী ছিলেন। কিন্তু উপন্যাস বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু এই চিঠি লেখার মাত্র তিন বছরের মধ্যেই তাঁর প্রথম উপন্যাস 'অসাধু সিদ্ধার্থ' (১৯২৯) প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটি পাঠ করেই বসজ্ঞ পাঠক বুঝতে পারেন যে, উপন্যাস লেখা বিষয়ে জগদীশ গুপ্তের ওইভাবে অক্ষমতার প্রকাশ করা আসলে বিনয় ছাড়া কিছু ছিল না। ছোটগল্পের পাশাপাশি উপন্যাস রচনাতেও তিনি তাঁর নিজস্ব স্বভাবের প্রমাণ রেখেছিলেন। 'কলঙ্কিত তীর্থ' (১৯৬০) কে তাঁর শেষ উপন্যাস ধরলে তিনদশকেরও বেশী সময়ে তিনি মাত্র ১৭টি উপন্যাস লিখেছিলেন — যেগুলো আত্মপ্রকাশ করেছিল বিভিন্ন সময়ে। কালানুক্রমের নিরীখে তাঁর উপন্যাসগুলি হল —

অসাধু সিদ্ধার্থ (১৯২৯)
মহিষী (১৯২৯)
লঘুগুরু (১৯৩১)
রোমন্থন (১৯৩১)
দুলালের দোলা (১৯৩১)
যথাক্রমে (১৯৩৩)
তাতল সৈকতে (১৯৩৩)
সুতিনী (১৯৩৩)
রতি ও বিরতি (১৯৩৪)
গতিহারা জাহ্নবী (১৯৩৫)
দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা (১৯৩৯)
নন্দ আর কৃষ্ণা (১৯৪৭)
চৌধুরানী (১৯৪৭)
আলুনী আলু (১৯৫০)
নিষেধের পটভূমিকায় (১৯৫২)
নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ (প্রকাশ কাল জানা যায়নি)
কলঙ্কিত তীর্থ (১৯৬০)

অসাধু সিদ্ধার্থ —

আচরণের মানুষ আর আচরণের আড়ালের অচেনা মানুষ — মানুষের এই দ্বৈত সত্তাকে আদালতে টাইপস্টের কর্মসূত্রে বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে এসে চিনতে পেরেছিলেন জগদীশ গুপ্ত। সে রকম একজন মানুষের জীবনের গল্প লেখকের প্রথম উপন্যাস 'অসাধু সিদ্ধার্থ'। উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র সিদ্ধার্থ। এটি তার ছদ্মনাম। আসল নাম নটবর। একজন বৈষ্ণবীর গর্ভে কোন এক ব্রাহ্মণের জারজ সন্তান সে। জীবনের প্রথম লগ্নে নটবর ছিল দোকানের বিনা মাইনের চাকর। তারপর সখের থিয়েটারের ছোকরা অভিনেতা, এখন অর্থের বিনিময়ে এক বৃদ্ধা বেশ্যার শয্যাসঙ্গী। এই নটবর সিদ্ধার্থ নামের একজন ভালোমানুষের ছদ্মবেশ নেয়। এক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে তার বাহ্যিক সুদর্শন সৌম্যকান্তি চেহারা। এই দুটি পৃথক সত্তাই উপন্যাসের কাহিনীতে জটিলতা সৃষ্টি করেছে। লেখক চরিত্রটির বাইরের স্বরূপের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন —

"সিদ্ধার্থের ঋজু বলিষ্ঠ দেহ, বর্ণ গৌর, মুখে বুদ্ধির দীপ্তি। এমনি করিয়া সে মাটিতে পা ফেলিয়া চলে যেন পৃথিবীর যাবতীয় প্রতিকূলতা আর বিমুখতা সে অতীব অবজ্ঞার সহিত দু-পা দিয়া মাড়াইয়া চলিয়াছে। মানুষের সঙ্গ দিয়া সাহচর্য দিয়া তার কোনো প্রয়োজন নাই; সহানুভূতির সে ধার ধারে না।

এই তার বাহ্যিক মূর্তি।" *(জগদীশগুপ্ত রচনাবলী, ১ম খন্ড, পৃ ৭৩)*

এর বিপরীতে লেখক তার ভেতরের রূপটিকে আগ্নেয়গিরির সঙ্গে তুলনা করেছেন। অগ্ন্যুপাতের ফলে যেমন আগ্নেয়গিরির ভেতরের লাভাদি বেরিয়ে আসতে শুরু করে, তেমনি নটবরের ভেতরে 'আগ্নেয়গিরির অগ্নিবমন শুরু হইয়া গেছে।' ভেতরে এই নটবর শ্রান্ত এবং একেবারেই পরমুখাপেক্ষী চরিত্র।

লেখক এই পরমুখাপেক্ষী নটবরের চিন্তা প্রবাহের সঙ্গে দীপের চঞ্চল শিখা আর তার সমগ্র মানসিক জগতের সঙ্গে অন্ধকারের তুলনা করেছেন। দেবরাজের ডান হাতখানা বুকের ওপর টেনে সে 'অন্ধকার' দেখিয়েছে —

"অন্ধকার এইখানে। কান পেতে থাকো, একটা শব্দ শুনতে পাবে। ভগবানের অভিসম্পাত বুকের গহ্বর জুড়ে চেপে বসে আছে। তার ভেতর থেকে অবিশ্রান্ত উঠছে পৃথিবীর ক্ষুধার গোঙানি।" *(পৃ. ৭৪)*

সিদ্ধার্থ ওফের নটবরের অভিনয় ও ভাবোচ্ছ্বাসের অনেক বর্ণনা থাকলেও নিজের সম্পর্কে তার এই মন্তব্যে কোনো অভিনয় বা ভণ্ডামি নেই। তার মনের যাবতীয় টানাপোড়েনের কারণে যখন সে অবচেতনের অবদমিত আকাঙ্খার তাড়নায় অস্থির, তখনই প্রস্তাব আসে জাল করে অর্থ সংগ্রহ করার। প্রস্তাব শুনে 'সিদ্ধার্থ তক্তপোষের কিনারাটা আঙুল বাঁকাইয়া চাপিয়া ধরিয়া উপরের দিকে টানিতে লাগিল।' দেবরাজের একে অভিনয় বলে মনে হলেও সিদ্ধার্থের ভেতরের এই বিকার স্বাভাবিক ছিল। যেজন্য দেবরাজের তমসুক জাল করার প্রস্তাবে সিদ্ধার্থ কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। শেষপর্যন্ত দেনার দায়ে জর্জরিত সিদ্ধার্থ

তমসুক জাল করার প্রস্তাবে রাজী হয়। কিন্তু এতে তার মনের অতলে মনস্তাপের সঞ্চার হয়। আসলে জন্মসূত্রেই সিদ্ধার্থের জীবনে যাবতীয় শুভ ভাবনার অপমৃত্যু ঘটেছিল। এতে করে তার জীবন এমন এক ফলহীন বন্ধ্যাত্বের সঙ্গো জড়িয়ে গিয়েছিল যে এর থেকে তার উত্তরণের কোনো পথ ছিল না। অথচ এই 'সিদ্ধার্থ গৃহী নয়, গৃহ তার নাই-বৈরাগী সে নহে, বৈরাগ্য তার জন্মে নাই।' এই চরিত্রটির মূল্যায়ণ করে সমালোচক ড. সরকার আবদুল মান্নান তাই লিখেছেন —

"জগদীশ গুপ্ত সিদ্ধার্থের মানস-জগৎ বিশ্লেষণে দুর্বলতার ফাঁক আবিস্কারে সুনিপুন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। চরিত্রের এই দুর্বলতার জন্য বাস্তব পৃথিবীতে চলবার স্বাভাবিক মাত্রা জ্ঞান সে রক্ষা করতে পারেনি। ফলে সহজেই প্রবঞ্চক ও ইতরে পরিণত হয়েছে।"

(উপন্যাসে তমসাবৃত জীবন: নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ১৪৩)

সিদ্ধার্থর অপরাধবোধ থেকে যে মানসিক যন্ত্রনার সূত্রপাত তার থেকে মুক্তির জন্যে সে একসময় আত্মহত্যার জন্যে প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে সফল হয় না। মৃত্যুর কাছাকাছি এসেও সে জীবনের এমন এক আশ্চর্য রূপের সন্ধান পায় যার জন্যে তার মনে হয় 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে'। তার এই মানসিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যার প্রসঙ্গো লেখক জানিয়েছেন—

"যাহাকে দর্শন মাত্রেই সিদ্ধার্থ ডিগবাজি খাইয়া মরণের তট হইতে জীবনের জ্যোতির্মঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বলা বাহুল্য সে একটি নারী। প্রপাতের অদূরে সে রাস্তা দিয়া যাইতেছিল সহসা তাহাকে দেখিয়াই সিদ্ধার্থের মরিবার সংকল্প উল্টাইয়া সরাসরি একটা সহজ বুদ্ধির উদয় হইল।" (পৃ ৮১)

এই নারী হল অজয়া। এই অজয়ার মধ্যে সিদ্ধার্থ একটি পরিপূর্ণ নারীর সন্ধান পেয়েছে। এবং এই নারীর চোখের সামনে নিজেকে স্পষ্টভাবে দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ তার বিশ্বাস অজয়ার প্রেমেই তার জীবনের গ্লানি ও বেদনা দুর হয়ে যাবে। 'অতিশয় হীন সংশ্রবে জীবনের দীর্ঘদিন সে কাটাইয়াছে তাই তার আহৃত শিক্ষার ফলটিকে আবৃত করিয়া মাঝে মাঝে পাঁকের বুদ্‌বুদ্‌ উঠিতে থাকে।' কিন্তু নিজেকে আড়াল করতে গিয়ে সে নিজের কাছেই বারবার ধরা পড়ে যায়। সেই সঙ্গো তার পিসিমা এবং ভাই রজতের কথাতেও সন্দেহের কালো মেঘ জমে ওঠে। প্রকৃত সিদ্ধার্থের মাতামহ কাশীনাথ এই ছদ্মবেশী সিদ্ধার্থকে দেখে অজয়াকে জিজ্ঞাসা করে —

"সিদ্ধার্থকে তুমি খুব ভালোবাসো? বলো লজ্জা কি? আমি যে তোমার দাদামশাই।" (পৃ. ১৫০)

বিবাহের আয়োজন যখন শেষ পর্যায়ে তখন অজয়ার কাছে সিদ্ধার্থের প্রকৃত পরিচয় ফাঁস হয়ে যায়। কাশীনাথ কোনো কিছুই গোপন না করে অকপটে সিদ্ধার্থের সমস্ত অতীত বলে দিলেন। 'তোমরা সিদ্ধার্থ বলছ কাকে? ওর নাম নটবর। বৈষ্ণবীর গর্ভে এক ব্রাহ্মণের

জারজপুত্র।' এই পরিচয় পেয়ে অজয়া আকাশ থেকে পড়ে। সে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে নিলে রজত তাকে ধরে ফেলে। কাশীনাথ নটবরের কাছে সক্রোধে জানতে চান —

"তুই কেন এ কাজ করলি? কেন তুই মানুষের সর্বনাশ করে বেড়াচ্ছিস? বল্ সিদ্ধার্থ কোথায়? তার নাম আর পরিচয় তুই কোথায় পেলি?" (পৃ, ১৫২)

প্রবঞ্চক নটবর একথার কোনো জবাব দেয় না। নিজেকে নিরপরাধ দাবী করে। 'নিয়তির চক্রান্তে ভালবেসেছিলাম। ভালবাসার তাড়নায় আর প্রতিদানের লোভে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি। কিন্তু আমি ত সেই মানুষ'। অজয়ার কথায় রজত নটবরকে বেরিয়ে যেতে দেয়। যাবার সময় জানিয়ে যায় প্রকৃত সিদ্ধার্থ এই পৃথিবীতে বেঁচে নেই। উপন্যাসটির আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন —

"জগদীশ গুপ্তের কাছে এই গল্পের অর্থ অন্যতর। 'নিজে যা নয় ছদ্ম আচরণে নিজেকে তাই প্রতিপন্ন করবার প্রাণান্ত প্রয়াস তো প্রত্যেকেরই জীবনের এক অংশ' - এই জীবনগত চিন্তন অদৃষ্ট লিখনের টানে আমাদের অনেক ব্যর্থতার জন্ম। সিদ্ধার্থের ছদ্মবেশের ব্যর্থতা প্রকৃতপক্ষে তার জীবনের ব্যর্থতা।"

(বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পৃ ২৩১)

চরিত্রিকে সেদিক থেকে শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' (১৯২০) উপন্যাসের সুরেশ চরিত্রের কথা স্মরণে রেখেও বলা যায় নটবর ওরফে সিদ্ধার্থ বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে প্রথম যথার্থ অর্থেই 'অ্যান্টি হিরো'।

□ মহিষী :

কালিদাস রায় সম্পাদিত 'বসুধারা' পত্রিকায় এই উপন্যাসটি প্রথমে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল। সতীন সমস্যা আর পুরুষের ইতরতার চূড়ান্ত প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি এই উপন্যাসের কাহিনীতে। সমালোচক ড. প্রবীর কুমার চট্টোপাধ্যায় উপন্যাসটির আলোচনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন —

"পুত্রের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার সুযোগ গ্রহণ করে পিতা অর্থের লোভে কালো মেয়ের সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দেয়। পুত্র ষড়যন্ত্রটি পরে জানতে পারে, ফলে নিজ দুর্বলতার প্রতি গ্লানি এবং স্ত্রীর প্রতি তীব্র ঘৃণা জন্মায়। পুরুষকারের অভাবে পিতার বিরুদ্ধে ক্রোধ ব্যক্ত করতে না পেরে পিতার নির্বাচিত পাত্রীর বিরুদ্ধেই তা প্রধূমিত হয়। শেষ পর্যন্ত এই মনান্তর স্থায়ী বিচ্ছেদে পরিণত হল।"

(জগদীশ গুপ্ত'র কথা সাহিত্য: ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণের আলোকে, পৃ. ১১০)

— সামাজিক পটভূমিকায় রচিত এই উপন্যাসের মূল বিষয় দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে নারীর আত্মমর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ। আত্মমর্যাদা সম্পন্ন নারী কখনোই নিজের স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দিয়ে আত্ম-অবমাননাকর জীবনকে মেনে নিতে পারে না। তার জন্যে সে চরমতম স্বার্থত্যাগ করতেও প্রস্তুত। লেখক নারী চরিত্রের এই মহৎ দিকটির পাশাপাশি পুরুষজাতির স্বার্থপরতা আত্মদম্ভ, নারীর প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা, দেহকাতরতা প্রভৃতি হীন দিকগুলি তুলে

ধরেছেন।

উপন্যাসের কাহিনীতে আমরা দেখি, ধুরন্ধর বৈষয়িক ব্রজকিশোরের একমাত্র সন্তান অশোক মোকতারি পড়ছে। আলালের ঘরের দুলাল আর রূপবান বলে বন্ধুদের কাছে সে 'যুবরাজ'। পুত্রের জন্য পাত্রী নির্বাচন করতে গিয়ে ব্রজকিশোরের প্রথম বিচার্য হল পাত্রী পক্ষের সম্পত্তি এবং অর্থনৈতিক অবস্থা। সেই বিচারে তিনি বাতাসপুরের মন্মথ চৌধুরীর কন্যাকে নির্বাচন করেন। বন্ধু মারফত পিতার কাছে পাত্রী দেখার প্রস্তাব পাঠিয়ে অশোক ব্যর্থ হয়। পুত্রকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার অভিপ্রায় প্রকাশ করলে অশোকের মতের পরিবর্তন ঘটে এবং সে কালো মেয়েকেই বিবাহে সম্মত হয়। অশোক দেখে স্ত্রী জ্যোতির্ময়ী কালো হলেও লাবণ্যময়ী এবং বুদ্ধিমতী। স্ত্রীকে সে যথেষ্ট সমাদরেই গ্রহণ করে। কিন্তু যেদিন পিতার অভিসন্ধি তার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন তার যাবতীয় ক্রোধ নিরপরাধ জ্যোর্তিময়ীর উপর বর্ষিত হয়। স্বামীর কাছে অনভিপ্রেত ও অনাদৃতা জ্যোতি স্বামীর সঙ্গ এড়িয়ে চলতে শুরু করে। ক্রমে তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এবং জ্যোতি বাপের বাড়ী যাবার ইচ্ছা প্রাকাশ করলে অশোক স্ত্রীকে বাধা দেয়নি।

জ্যোতির্ময়ী পিত্রালয়ে চলে গেলে অশোক নিজের নির্বুদ্ধিতা ও স্বার্থপরতার দোষ না দিয়ে স্ত্রীর ঘাড়ে সেই দোষ চাপিয়ে দেয়। স্ত্রীর বিরুদ্ধে সে এক অশ্লীল অভিযোগ করে। বন্ধুদের কাছে অনায়াসেই স্ত্রী সম্পর্কে বলে —

"কালো বউ আরো আছে; কালো বউ নিয়ে সুখ-শান্তিতে আছে, এমন মানুষও আছে। কিন্তু এ একেবারে। .... প্রবৃত্তি বড় জঘন্য, আর ঘেন্না বলে কোনো আবরণ তার নেই। হস্তিণী নারীর সব লক্ষণ তাতে বিদ্যামান।" (পৃ, ১৮০)

এই রটনা ক্রমে প্রচারিত হয়ে জ্যোতির পিতা মন্মথনাথের কানে যায়। আহত মন্মথনাথ মেয়ের কাছে ব্যক্ত করেন এই অপবাদের কথা। কিন্তু এই সংবাদে জ্যোতি বিচলিত হয় না। সে বুঝতে পারে কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। সে স্বামীগৃহে ফেরার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং একরকম জোর করেই বাপের বাড়ী থেকে চলে আসে।

জ্যোতির্ময়ী ফিরলেও অশোক তাকে গ্রহণ করে নি। ফলে তাদের শয্যাগৃহ পৃথক হয়েছে। জ্যোতি সম্পর্কে অপবাদ রটানোর জন্যে সে স্বামীকেই সন্দেহ করে এবং সেই সন্দেহকেই অশোক একদিন রেগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে উন্মোচন করে দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠা করে। 'জ্যোতির হৃদয় লক্ষ্য করিয়া প্রহরণ নিক্ষেপের দানবীয় উল্লাসে সে অন্ধ হইয়া উঠিল। বলিল, আমিই, কিন্তু সেটা মিথ্যে নয়'। এই অনিষ্ঠুর মিথ্যাচার ও এই মূলক প্রতিহিংসার পরে জ্যোতি বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়ে। আপন ব্যর্থ যৌবনের দুঃসহ তাড়নায় একদিন অশোক স্মরণ করে স্ত্রীকে। শাশুড়ি রত্নময়ী প্রবল উৎসাহে পুত্রবধূকে নিজের হাতে সাজিয়ে পুত্রের ঘরে পাঠিয়ে দেয়। জ্যোতি নীরবে শাশুড়ির এই অত্যাচার সহ্য করে স্বামীর ঘরে এল। অশোকের কথায় জ্যোতি তার দেহগত কামনার রূপটি দেখতে পেয়ে ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে। সে নির্বিকারভাবে স্বামীকে জানিয়ে গেল—

" .... দিতে না এসে নিতে আসা তোমাদের পক্ষেই সম্ভব; কিন্তু সম্পর্ক তাতে জন্মে না। আমরা তা পারিনে। ... শয্যাংশ দিয়ে যদি আমায় কৃতার্থ করবার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে সে তোমার বৃথা আশা। ... তুমি যে ত্যাগ করেছিলে সেটটেই সত্য। মাকে বলেছি কনে দেখতে।" (পৃ, ১৯২)

— জ্যোতি বুঝেছিল অশোক তাকে মোটেই ভালোবাসে না, কেবল জৈবিক ক্ষুধা নিবৃত্তির তাড়নায় একটা মীমাংসায় আসতে চায়। মূলত তারই অনুরোধে ব্রজকিশোর রত্নময়ী পুনরায় পুত্রের বিবাহে উদ্যোগী হলেন। দরিদ্র পিতার রূপবতী কন্যা নন্দরানী। জ্যোতি বিবাহের সমস্ত আয়োজন শুরু করেছে তাই নয়, নববধূর সাথে আলাপও করল। কয়েকদিনের মধ্যেই জ্যোতি লক্ষ্য করল অশোকের পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের বর্ণনা করে লেখক জানিয়েছেন —

"অশোকের মন রূপ সাগরে ডুবিয়া গেছে। এ জ্ঞানটাই যেন তার নাই যে সে এই মাটিরই মানুষ। ... জ্যোতি তাহাকে লুকাইয়া আড়াল হইতে দেখে। দেখে, স্বামীর চেহারাই বদলাইয়া গেছে, এবং আরো উজ্জ্বল হইয়াছে, চোখে কণ্ঠে ললাটে অধরে পুলক যেন প্রাণ পাইয়া নাচিতেছে। দেখিয়া সে তৃপ্ত হল ... বিধাতা তাহাকে ছুটি দিয়াছেন ... স্বামী তাহার ভোগ্যবস্তু লাভ করিয়াছেন ।" (পৃ, ২০০)

এরপর একদিন শাশুড়ির কাছে পিত্রালয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। স্বামীর কাছে বিদায় চাইতে গিয়ে দেখে অশোক তখন নববধূর সঙ্গে প্রণয়ালাপে মগ্ন। জ্যোতির বিদায়কালে শাশুড়ি কাঁদছিলেন। নন্দরানী বিদায় জানায়। 'জ্যোতির জবাব ছিল না, কিংবা অশোকের সেই হাসিটা শেষ মুহূর্তে তার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠল বলিয়া সে কথার জবাব দিতে পারিল না তাহা জানা নেই।' এইভাবে দাম্পত্য জীবনে সংকট মুক্তির উপায় হিসাবে পুরুষের পুনর্বিবাহে প্রথমা পত্নীর উদ্যোগের কথা আমরা প্রথম দেখি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথের 'দুইবোন' কিংবা জগদীশ গুপ্তেরই 'সুতিনী' উপন্যাসে। কিন্তু এখানে নারীর যে আত্মমর্যাদাজ্ঞান আর স্বতন্ত্র সত্তার পরিচয় ফুটে উঠেছে তা অতুলনীয়। যদিও কেউ কেউ উপন্যাসটিকে প্রথম শ্রেণীর সার্থক উপন্যাস বলতে চাননি।

□ লঘুগুরু :

অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটির আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন -" কাম্য বিষয়ের স্পষ্টতায় এবং স্পষ্ট কামনার সঙ্গে প্রাক্তণের কর্মফলের সংঘাতে ব্যক্তির চূর্ণীকৃত রূপ রচনায় 'লঘুগুরু' অনুপম। 'লঘুগুরু' তাঁর প্রথম দিকের উপন্যাস হলেও সার্থকতায় বোধকরি জগদীশ গুপ্তের সর্বোত্তম রচনা।"

(বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পৃ. ২৩৬)

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা উপন্যাসের যে সূচনা সেই ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই প্রায়-স্বৈরিণী চরিত্রের অস্তিত্ব ছিল। 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' , রোহিণী'

কিংবা 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের রাজলক্ষ্মী নিঃসন্দেহে এই ধরনের স্বৈরিণী চরিত্র। এদেরই উত্তরসূরী জগদীশ গুপ্তের সৃষ্ট চরিত্র উত্তম-সুন্দরী। এদেরই জীবনের এক ট্রাজিক দলিল লেখকের আলোচ্য উপন্যাস। এতে লেখক উত্তম থেকে টুকী - গণিকা নারীর জীবন যন্ত্রণাকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এরই সাথে সুন্দরী নাম্নী রক্ষিতা নারীর কদর্য জীবন, আর 'স্বভাব সিদ্ধ ইতর' বিশ্বম্ভর এবং 'কোমর বাঁধা শয়তান' পরিতোষের কদর্যজীবনকে লেখক তুলে ধরেছেন। এই জীবন বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতা যেমন নেই, তেমনি নেই শরৎচন্দ্রীয় আবেগ-বিহ্বল স্বপ্ন। বাস্তবতা আর মানবিকতার যৌগিক পরিচর্যায় লেখক একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সৃষ্টি করেছেন। এক সময়ের গণিকা উত্তম তার অতীতের কদর্য জীবন ছেড়ে প্রতিষ্ঠা পেতে চেয়েছে সংসারের গৃহীনারীর মতো গৃহস্থের গৃহান্তরালে। লেখক সেই উত্তমের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন —

..."মানুষকে হাতে পাইয়া তাহাকে বশীভূত করিয়া খেলাইয়া খেলাইয়া পিশাচ করিয়া তুলিবার বিদ্যাটা সে চেষ্টা করিয়া, ভিতরকার বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া শিক্ষা করিয়াছিল— তখন তার নাম ছিল বনমালা —তারও আগের নাম যূথী। মানুষ সেই যূথীর শত্রু। কিন্তু যেদিন ঐ কাজে দুরন্ত ঘৃণা ধরিয়া গেল, আর যেদিন তার বিশ্বম্ভরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, ঐ দু-দিনের ব্যবধান খুব অল্প তার হিংস্র পুরুষ বুভুক্ষা লুপ্ত হইয়া তখন পুরাতন গৃহ বুভুক্ষা জাগরিত হইয়াছে।"

(জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, ১ম খন্ড, পৃ. ১১)

শ্রাবণের একরাত্রে ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে মদের আসর বসিয়েছিল বিশ্বম্ভর। স্ত্রী হিরণ তখন অন্তঃস্বত্তা। এই অবস্থায় হিরণ প্রতিবাদ করলে বিশ্বম্ভর তার দিকে মারমুখী হয়ে ছুটে যায়। পালাতে গিয়ে হিরণ পিচ্ছিল উঠানে পড়ে গিয়ে আর উঠতে পারে নি। টুকীকে জন্ম দিয়েই মারা যায় হিরন। একটা দীর্ঘসময় টুকী প্রতিবেশীদের হাতেই মানুষ। বিপত্নীক বিশ্বম্ভরের জীবনে উত্তমের আর্বিভাব এবং স্ত্রী হিসেবে তাকে সংসারে নিয়ে এলে টুকী নতুন মাকে পেয়ে খুশি হয়। কিন্তু বিশ্বম্ভরের প্রতিবেশীরা খুশি হতে পারেনি। তারা শুধু উত্তমকেই আক্রমণ করেনি, উত্তমের স্নেহাশ্রয়ে বড় হতে থাকা টুকীর কানে তারা বিভিন্ন সময়ে বিষ ঢেলে দিয়েছে।

□ টুকীকে গয়না পরতে দেখে মোক্ষর মা টুকীর হাত ধরে তাকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে বলেছে—

"তোর মা বেশ্যে ছিল, গয়না দিয়েছে হাজার লোকে, তোর এ বাবা দেয়নি। — যা শুদোগে তোর মাকে।" (পৃ.২২)

□ শুধু প্রতিবেশীরা নয়, বিশ্বম্ভরের বন্ধুরাও বাড়ীতে মদের আসর বসানোর অনুমতি না পেয়ে উত্তমকে 'খান্ডারী' বলেছে।

□ বিশ্বম্ভর নিজে পছন্দ করে উত্তমকে সংসারে এনেছে, কিন্তু গৃহী নারীর মর্যাদা দিতে চায়নি। হিরণের মৃত্যুর উত্তাপহীন বর্ননা যখন বিশ্বম্ভর দিয়েছে তখন উত্তম কেঁদে

ফেলেছে। এই কান্না দেখে বিশ্বম্ভর উত্তমকে বিড়ালের সঙ্গে, শকুনের সঙ্গে তুলনা করে বলেছে—

"কার শোকে কে কাঁদেরে বাবা তার দিশে পাওয়া ভার— মাছ মরলে বিড়াল কাঁদে, গরু মরলে শকুন; আর পদির পিসি কাঁদে পদি মারলে বলে উকুন।" (পৃ. ১১)

শুধু এইভাবে সমালোচনা করা নয়, উত্তমের গৃহী নারী হয়ে ওঠার চেষ্টাকে বিশ্বম্ভরের বাড়াবাড়ি মনে হয়েছে। কিংবা মোক্ষর মায়ের উত্তমকে 'বেশ্যা' বলাটা সে উপভোগ করেছে হাসতে হাসতে। বন্ধুরা স্ত্রীকে 'খান্ডারী' বললেও কোনো প্রতিবাদ করেনি বিশ্বম্ভর। উত্তমের যাবতীয় যন্ত্রণার একমাত্র সমমর্মিতা দেখা যায় টুকীর মধ্যে। এমনভাবে ঘরে বাইরে উত্তমের যাবতীয় গঞ্জনা ভাগ করে নিতে নিতেই টুকী একদিন বিয়ের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। ভগ্নিপতি লালমোহন শুধু বিশ্বম্ভরের সঙ্গে উত্তমের সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রেই ভূমিকা পালন করে নি। টুকীর বিয়ের ব্যাপারেও পাত্রের সন্ধান দিয়েছিল। তার চিঠিসূত্রেই জানা যায়, টুককে দেখতে পাত্রের পিতা ও ভাইয়ের আগমনের সংবাদ। বিয়ের প্রাথমিক আলোচনা পর্ব মিটেও যায়। কিন্তু এরই মাঝে বিপত্তি ঘটে পাত্রের পিতা ধম্মদাসের চিঠি থেকে। তিনি স্পষ্টই জানিয়ে দেন, বিয়ে সম্ভব নয়, 'আপনি অন্যত্র পাত্রের সন্ধান করুন।' এর পেছনে ছিল বিশ্বম্ভরের কোনো 'সহৃদয়' প্রতিবেশীর ধর্ম্মদাসকে প্রেরিত সর্তকবার্তাবাহী পত্র। পত্রে লেখা হয়েছিল —

"মহাশয়, আপনি যাহার কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিতেছেন, সে ব্যক্তি একটি রক্ষিতা লইয়া বাস করিতেছে । কন্যাটি তার গর্ভজাতা নহে; কিন্তু তাহাকে সেই স্ত্রীলোকটিই মানুষ করিয়াছে। অতএব সাবধান হউন।" (পৃ. ২৯)

বেনামী চিঠির কারণে টুকীর বিয়ে ভেঙ্গে যায়। বিশ্বম্ভর এর জন্যে যাবতীয় দায়ভার উত্তমের ওপর চাপায়। অথচ উত্তমের প্রদত্ত অর্থেই তার সংসারে স্বচ্ছলতা এসেছে। সে কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে বিশ্বম্ভর শেষ পর্যন্ত বিপত্নীক পঞ্চাশোর্ধ পরিতোরে সঙ্গে টুকীর বিয়ে ঠিক করে। নগদ পনেরো শ'টাকা আর অন্যান্য সামগ্রীর পরিবর্তে আরও তিনশত টাকা নগদ পণের বিনিময়ে। টুকী মায়ের সান্নিধ্য ছেড়ে বিপত্নীক শয়তান পরিতোষ এবং তার রক্ষিতা সুন্দরীর কদর্যপূর্ণ জীবনের মাঝখানে গিয়ে পড়ে। পরিতোষ তার সাকরেদ বঙ্কুসহ অন্যান্যদের নিয়ে কীর্তনের আসরে মেতে থাকে। টুকীর প্রতি তার স্বামীসুলভ কোনো দায়বদ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায় না। অভাবের সংসারে পণের পুরো টাকাটাই চুরি হয়ে যায় সুন্দরীর ঘর থেকে। অর্থশোক কাটিয়ে সুন্দরীর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে যুবতী টুকীর রূপ যৌবনের প্রতি। এরজন্যে সে পাপ পুণ্যের ধার ধারেনি। কেন না, তার মতে, মনের সুখও শরীরের সুখ দিয়েই আসে। পরিতোষের স্ত্রীর প্রতি অবিচার শুধু করেছে তাই নয়, তার কীর্তনাসক্তি সুন্দরীকেও অসহিষ্ণু করে তোলে। তার সেই মানসিকতার ব্যাখ্যা করে লেখক জানিয়েছেন —

"টুকীর রূপ আর যৌবন তার চোখের সম্মুখেই অনুপভুক্ত হইয়া অস্পৃশ্য আবর্জনার

মত অপচয়িত হইতেছে দেখিয়া সুন্দরীর গণিকাচিত্ত যেন নিজেই সর্বস্ব লুণ্ঠনের যন্ত্রণা অহরহ সহ্য করে। তার বিরাম নাই। তার বিশ্বভূক উত্তীর্ণ যৌবন সুখ-দু:খের অনুভূতি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া যেন তাহাকে আছড়াইতে চায়।" (পৃ. ৪৫)

এখানেই শেষ নয়। পরিতোষের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সুন্দরী বাড়ীতে খদ্দের হিসেবে অচিন্ত্যবাবুকে ডেকে নিয়ে আসে। টাকা নিয়ে টুকীকে ঠেলে দেয় পরপুরুষ অচিন্ত্যববুর দিকে। জীবনের এই কঠিনতম সময়ে দাঁড়িয়ে টুকীর মাকে মনে পড়ে। ফেরার আর কোনো উপায় নেই বুঝে টুকী চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। এবং অচিন্ত্যবাবুকে জানিয়ে দেয় —

"একাজ যদি করতে হয়, তবে আমি আপনাকে দেব দেহ, আপনি আমাকে দেবেন টাকা। মাঝখানে ওরা কে?" (পৃ.৫২)

আশৈশব মায়ের কাছে প্রাপ্ত শিক্ষার ফলশ্রুতিতে এই অন্ধকার সময়ে দাঁড়িয়েও সে স্বামীর ভিটে থেকে অচিন্ত্যকে বেরিয়ে যেতে বলে। সুন্দরী তখন আপন প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করে ক্ষেপে ওঠে এবং বলে, ' ওরে আমার সোয়ামী উলি, বেরো বল্‌ছিস কাকে তুই? কার ঘরে তুই আছিস জানিস? যেতে যেতে দাঁড়িয়ে ফিরে স্বামীর স্বত্ব জাহির করলি তুই? আমার সামনে্ দাঁড়িয়ে?" (পৃ.৫২)

শেষপর্যন্ত সুন্দরীর বাড়ীর চৌকাঠ পার হয়ে টুকী বাইরে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায়। উত্তম থেকে টুকী গণিকা জীবনের একটা বৃত্ত পূর্ণ হয়। ওই বৃত্ত সম্পর্কে সমালোচক ড. সরকার আবদুল মান্নান যথার্থই লিখেছেন —

"... টুকী তো উত্তমেরই প্রতিমূর্তি, তারই মানস প্রতিমা। তাই টুকীর জীবনের মর্মান্তিক পরিণতি প্রকারে উত্তমের জীবনেরই বিপর্যয়। উপন্যারাসের শেষে তাই উত্তমের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হয়, বিয়ের পর টুকী যে অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, উত্তম সেই অন্ধকারের রূপনির্মাতা, তারই অতীত ইতিহাসের পুনরুত্থান। উত্তম এবং টুকীর নিয়তি একই সূত্রে বাঁধা। আর এই নিয়তি নির্ধারিত হয়ে যায় সমাজ সংগঠনের অন্তর্নিহিত পচন থেকে।" (পৃ.১৩৪)

❑ **রোমন্থন :**

জগদীশ গুপ্তের যে ক'টি উপন্যাসে বাংলা দেশের গ্রামীন জীবনচিত্র উঠে এসেছে, তার মধ্যে অন্যতম একটি হল এই উপন্যাস। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার নির্মোহ উপস্থাপন আর আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে তাদের জৈব অস্তিত্বকে অমানবীয় স্বরূপে আবিস্কার করার একটি যথার্থ প্রয়াস এই উপন্যাস। যদিও লেখক উপন্যাসটির ভূমিকায় রচনাটিকে উপন্যাস বলতে চান নি। উপন্যাসে যে ধরণের প্লট থাকে, এই রচনায় সেটি নেই বলে তিনি নিজেই দাবী করেছেন। প্রসঙ্গত লিখেছেন —

"ইহাতে 'প্লট' নাই — আমার বক্তব্য ব্যক্ত করিয়াছি মাত্র, গল্প তৈরী আমার উদ্দেশ্য নয়।... উপন্যাস বা গল্পের সংজ্ঞার অধীনে আনিয়া ইহাদের বিচার না করিয়া প্রবন্ধ হিসাবেই

যদিও কেহ ইহাদের বিচার করেন তবে আমি বিস্মিত হইব না।"

(জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, ১ম খন্ড, পৃ. ১৫৭)

লেখকের এই অভিমত কতটা সমর্থনযোগ্য তা উপন্যাসের যেটুকু কাহিনী তিনি বর্ণনা করেছেন তারই নিরীখে পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

লন্ডনপ্রবাসী কলকাতাস্থ একই পরিবারের তিন ভাই বড়বাবু, মেজবাবু, ও ছোটোবাবু- জেঠামশায়ের আদেশে কলকাতা থেকে ৪২ মাইল দূরে মান নগর গ্রামে আসেন, তাদের আদি নিবাসে। 'ইহাদের পিতামহ সেই পল্লীভবনের মাটিতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, কিন্তু তিনি এবং তাহার পত্নীও চিতায় ওঠেন কলিকাতায়'। চিরকুমার জেঠামশায় আসন্ন পার্লামেন্ট মহাসভার প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হতে পারলে পাকাপাকি ভাবে দেশে ফিরে গ্রামের বাড়িতে এসে থাকবেন। সেজন্য যাবতীয় ব্যবস্থা তদারকি করতেই তিন ভ্রাতুপুত্রের গ্রামের বাড়ীতে আগমন। গ্রাম জীবনে পোকা-মাকড়, সাপ, জোঁক, মশা-মাছি প্রভৃতি মনুষ্যেতর প্রাণী আর অসুখ-বিসুখ সম্পর্কে ভ্রাতৃত্রয়ের শহরবাসী হিসেবে একটা ধারণা থাকলেও গ্রামীণ মানুষকে তারা যথার্থই চিনতেন না। এখানে এসে সেই নীচতার হীনতার দৈন্যতার সঙ্গে তাদের প্রত্যাক্ষ পরিচয় ঘটে। এ যেন হারানো অধ্যায়ের স্মৃতি রোমন্থন। কলকাতার বাড়ি থেকে একটা দীর্ঘ প্রস্তুতি শেষে অনেকটা রোমাঞ্চকর অভিযানের মতো গ্রামীন জীবনে এসে প্রবেশ করেছেন। এই জীবনের কৃষক প্রতিনিধি একজন সম্পদশূন্য অসহায় কৃষক অভয়। তাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। পশু যেমন বেঁচে থাকার জন্যে নিরন্তর ব্যস্ত, অভয়ও তেমনি মানসিকতার সব উপাদান হারিয়ে এসে প্রতিমুহূর্তে বেঁচে থাকার প্রাণান্তর প্রচেস্টায় মুমূর্ষু। কালো শশীর মতো ঠগবাজ তাকে পাটের দামে ঠকায়। এই কালো শশী বাবুদের আগমনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। উপযাচক হয়ে বাবুদের অভ্যর্থনার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। ফলে বাবুরা, কালোশশী আর অভয়ের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র মেরুকরণ স্পস্ট হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত সালোচক ড. সরকার আবদুল মান্নান লিখেছেন —

"বাবুদের বিশ্রাম আছে, নিশ্চিন্ততা আছে, অস্তিত্বকে নানা দিকে বিলিয়ে দেয়ার অবকাশ আছে। কালো শশীরও তা আছে। কিন্তু অভয়দের তা নেই। বাবুদের সঙ্গে তাঁর এই ঐক্য এবং অভয়দের সঙ্গে এই স্বাতন্ত্র্য বুঝিয়ে দেয়ার জন্য কালোশশী চৈতন্যের কোনো এক গোপন ইন্ধনে বাবুদের অভ্যর্থনা দেয়ার জন্যে মেতে ওঠে।" (পৃ.১৭৬)

আসলে গ্রামীন মানুষের দারিদ্রের বর্ণনা লেখকের উদ্দেশ্য নয়, তিনি মানুষ গুলোর অন্তরের অন্ধকার জগতে প্রবেশ করে তুলে এনেছেন একের পর এক অবাক করা চিত্র।

আসলে দুটো বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে দাঁড়িয়ে মানুষের চরম অর্থনৈতিক সংকট এবং সেই সংকটের ফলে গ্রামীণ মানুষের মূল্যবোধের যে অবক্ষয় তা লেখক তুলে এনেছেন। সেই সূত্রেই শহুরে বাবুদের গ্রামীণ মানুষকে স্বপ্ন দেখানোর বিচিত্র ভাবনা। প্রসঙ্গত লেখক উপন্যাসে কালোশশীর উদ্দেশ্য বাবুর আশ্বাস বাণীতে জানিয়েছেন —

❑ "পল্লী ছাড়া কি আমাদের গত্যন্তর আছে? ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে আমরা খুব ভাবছি, আর চাষের কথাও আমাদের সভায় মাঝে মাঝে আলোচিত হয় — বিশেষজ্ঞ আছেন। খবরের কাগজে দেখে থাকবে।" (পৃ. ১৮৫)

❑ "... ম্যালেরিয়া আর গোচারণ ভূমিই আমাদের প্রথম লক্ষ্য হবে। একটিকে তাড়াব, আর একটাকে তৈরী করব। ফসলের জমি যদি ফসল বেশী দেয়, ঢের বেশী, তবে লোকে খানিকটা জমি গরুর জন্যে উদ্ধৃত্ত করে রেখে দিতে অক্লোশই পারবে। ভূমিকে উর্ব্বরা করো - সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।" (পৃ. ১৮৫)

বাবুদের এই জাতীয় মানসিকতার ফলে শহরের মানুষের মধ্যে গ্রামের মানুষ সম্পর্কে দেখা দিয়েছে একদিকে ঘৃণা, উন্মাসিতা ও অবিশ্বাস; অন্যদিকে পল্লীপ্রকৃতি সম্পর্কে রূপময়ী সৌন্দর্যলক্ষ্মী রূপে রোমান্টিক কল্পনা। এই দুটি ধারণাই তাঁদের অনভিজ্ঞতাজাত আর নিছক কল্পনাপ্রসূত। এই জাতীয় মানসিকতার মানুষদের লেখক তীব্রভাষায় ধিক্কার দিয়েছেন।

উপন্যাসটির ভূমিকায় লেখক যদিও বলেছেন, এতে প্লট নেই, কিংবা এটি উপন্যাসও নয়— কিন্তু লেখকের সুগভীর জীবন অভিজ্ঞতা, বিশ্লেষণ ধর্মিতা আর রচনা কুশলতায় এটি একটি যথার্থ উপন্যাস হয়ে উঠেছে। গ্রাম বাংলার নৈতিক অবক্ষয় ও অর্থনৈতিক দুর্দশার কারণটি অনুসন্ধান করে তার শিল্পায়িত রূপটিকে লেখক তুলে ধরেছেন। দেশের দারিদ্র ক্লিস্ট রূপ আর সাধারণ মানুষের শোচনীয় অবস্থার প্রতীক হিসেবে এক শীর্ণদেহী কুক্কুরীর পিছনে ধাবমান স্তন্য পিপাসু পাঁচটি শাবকের চিত্রটি অতুলনীয়। উপন্যাসের বড়বাবু হিসেবী, বুদ্ধিমান, সংযমী। মেজবাবু স্পষ্টবক্তা ছোটবাবু বিলাসী, দার্শনিক , প্রকৃতি প্রেমিক। কালোশশী, অভয় প্রমুখ প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র যাদের ভাষা মুখের ভাষার কাছাকাছি। উপন্যাসটি সম্পর্কে সমালোচক ড. প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন —

"রোমন্থনের কাহিনীর মধ্যে হয়ত অভয়ের ভাবনার প্রকাশ অনেকক্ষেত্রে দীর্ঘায়িত হওয়ায় পাঠে অবসাদ দেখা দেওয়ার সম্ভবনা রয়েছে, তবু পাঠক চরিত্রটির প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়ে পারে না। এতেও লেখকের কৃতিত্ব কম নয়।"

(কথাসাহিত্যিক জগদীশ গুপ্ত, পৃ. ৬৮)

❑ **দুলালের দোলা :**

'জগদীশ গুপ্ত' গ্রন্থে আবুল আহসান চৌধুরী লিখেছেন — "জগদীশগুপ্তের গল্প উপন্যাসের পটভূমি ও প্রেক্ষিত মূলত গ্রামকেন্দ্রিক। তাহলেও বৃহত্তর গ্রাম জীবনের সমস্যা বা গতি প্রকৃতির পরিচর্যা বা প্রতিফলন সেখানে নেই। অবশ্য এর ব্যতিক্রম তাঁর 'দুলালের দোলা' 'রোমন্থন'ও 'যথাক্রমে' উপন্যাস। এই 'ট্রিল্যজি' (Trilogy) -তে গ্রামীণ জীবনের চালচিত্র নিপুণভাবে ফুটে উঠেছে ।" (পৃ.৭৭)

সমালোচকের এই মন্তব্যের মধ্যেই রয়েছে দ্বিমুখী কথন। তিনি সমালোচনা করলেও লেখকের গ্রামজীবন অভিজ্ঞতার প্রশংসা না করেও পারেননি। লেখকের এই জীবন অভিজ্ঞতার ফসল তাঁর আলোচ্য উপন্যাসটি। এটি প্রথমে 'বেলোয়ারী টোপ' নামক

ছোটগল্পাকারে আত্মপ্রকাশ করেছিল। আলুনী আলু' উপন্যাসটি বাদ দিলে এটি লেখকের একমাত্র আত্মকথন রীতির উপন্যাস। এখানে কাহিনী তথা ঘটনা বিন্যাস এবং চরিত্র সবকিছুই অনেকটা যোগসূত্রহীন। 'রোমন্থন' উপন্যাসের ভূমিকার মতো এখানেও ভূমিকা করে তিনি লিখেছেন —

"ইহাতে প্লট' নাই — আমার বক্তব্য ব্যক্ত করিয়াছি মাত্র। গল্প তৈরী আমার উদ্দেশ্য নয়। উপন্যাস-সুলভ গল্পের বস্তু সংস্থান বা পরিপুষ্টি ইহাতে নাই।" আবার একই ভূমিকার অন্যত্র তিনি লিখিছেন — 'ঘটনাগুলিও পরস্পর বিচ্ছিন্ন'। কিন্তু একস্থানে যাইয়া ফল প্রসব করিতেছে।' অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতার মাঝেও একটা যোগসূত্র অন্বেষণ। সেই বিচ্ছিন্ন কাহিনীর তিনটি অংশ — আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর সংযোগশূন্য হলেও লেখকের মূল লক্ষ্য হল, বাংলাদেশের সমাজ বিশেষ করে পল্লীবাংলার ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের জাত্যাভিমানের অর্থহীনতা আর গৌরবদাবীর অসারতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

উপন্যাসটিতে রয়েছে তিনটি পৃথক অংশ —যার প্রথমটি পশ্চিম প্রবাসী নীরদবরণের তিক্ত অভিজ্ঞতা আর অন্য দুটি গ্রামস্থ বৃদ্ধ পিরুর মুখ দিয়ে বলা ঘটনার কোলাজ। প্রবাসী নীরদবরণের ঠাকুরদার গ্রামের বাড়ীতে বেড়াতে আসা উপলক্ষে তার পিসিমার ভাবনাভিব্যক্তি প্রকাশ সম্পর্কে উপন্যাসের সূচনাতেই লেখক নীরদবরণের জবানীতে জানিয়েছেন —

"পিসিমা অনেকেরই আছেন; কিন্তু ভ্রাতৃষ্পুত্রকে দেখিয়া কোনো পিসিমাই বোধ করি— এমন করিয়া কাঁদেন না। কিন্তু আমার পিসিমার আমাকে দেখিয়া পুলকাশ্রু মোচন করিবার কারণ আছে।... দেশের অধিকাংশ লোকের মত আমাদেরও নিবাস পল্লীগ্রামে।"(পৃ.১৯৫)

এইভাবে নীরদবরণের চোখ দিয়ে লেখক ধর্ম- বর্ণের ভেদে পীড়িত গ্রাম জীবনের ক্লেদাক্তরূপ, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, নির্লজ্জ মানুষের অশ্লীল রসিকতা আর অশ্রাব্য গানের নির্লজ্জ পরিবেশ এসব তিক্ত অভিজ্ঞতা নীরদবরণকে হতাশ করেছিল। গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ দ্বারিক ঠাকুরের প্রসাদ পাবার নিমন্ত্রণ নীরদ প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে জানিয়েছে—

"আগে মানুষ, তারপর ভদ্র-অভদ্র, সকলের শেষে ব্রাহ্মণ শূদ্র। সংস্কার আগে নয়, গুণ আগে—আপনাদের কথাটা মনে করিয়ে দেবার সময় এসেছে। আপনি আমাকে দিয়ে এঁটো বাসন মাজাতেন কিনা জানি নে, আপনি তা করাবেন না প্রতিশ্রুতি দিলেও আমি ব্রাহ্মণবাড়ী খেতে যাব না।" (পৃ.২৩২)

নীরদবরণের এই অকপট সত্য কথনের ফল ভালো হয়নি। পরদিন পরিধেয় বস্ত্রাদি ছাড়া নীরদের সমস্ত কিছু চুরি হয়ে যায়। 'বালক,' তুমি ব্রাহ্মণকে চেন না'। বস্তুত দুশো সিঁদেল চোরের সর্দার ব্রাহ্মণ দ্বারিক ঠাকুরকে চিনতে পারেনি নীরদবরণ।

উপন্যাসের অন্য দুটি ঘটনার বর্ণনা করেছে বৃদ্ধ পিরু। এই পিরু হলেন নীরদবরণের ঠাকরুদার বাল্যসঙ্গী। পিরু শুধু গ্রাম সমাজের নগ্ন চিত্রই বর্ণনা করেননি, সেইসঙ্গে তিনি গ্রামের 'পোড়া বৌ' নামকরণের কালো ইতিহাস বর্ণনার পাশাপাশি নারীপুরুষের সম্পর্কের প্রধান লক্ষ্য যে স্থূল জৈবিকতা সেটাও ব্যক্ত করতে ভোলেন নি। তাঁর কথায়—

'আমি ভেবে দেখেছি বাবু ধম্মপত্নী স'ধর্ম্মিণী, আরো অনেককথার এমনি মানে নাই। মন্তর মেয়েকে বাঁধার কৌশল, তাঁর দেহটাই আসল।" (পৃ. ২৩৪)

উপন্যাসের তিনটি কাহিনীর মধ্যে লেখকের একটা অভিপ্রায় লক্ষ্য করা যায়— তা হল বর্ণাভিমানের অসারতা দেখানো। এরসঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। যে কারণেই জগদীশ গুপ্তকে বলা হয়েছে 'শরৎচন্দ্রের মানস পুত্র'।

যথাক্রমে :

পল্লীবাংলার পটভূমি রয়েছে এই উপন্যাসটিতেও উপন্যাসে রয়েছে দুটি কাহিনী — একটি দীনবন্ধু-সাবিত্রীর কাহিনী এবং অন্যটি নিত্যপদ নামক গ্রাম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ একজন যুবকের নিঃস্বার্থভাবে গ্রামে ডাক্তারী করার সংকল্প ও তার ফলশ্রুতি। এই দুটি কাহিনীর মধ্যদিয়ে লেখক গ্রাম সম্পর্কে সনাতন ধারণাগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে একটি বাস্তব ও নির্মম অভিজ্ঞতার আর্কিটাইপ তৈরী করেছেন। উপন্যাসে পল্লী সমাজ নিজেই একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে। লেখক উপন্যাসের শুরুতেই সেই চরিত্রটি সম্পর্কে লিখেছেন —

"ছোট নদীর ধারে হাট। গ্রামের নাম বেতডাঙ্গা, নদীর নাম চন্ননা, হাটের নাম চন্ননার হাট। নদীর বুক বৃদ্ধার স্তনের মত শুকাইয়া আসিতেছে, তবু স্তন্যের মায়ামধু কৃতজ্ঞ স্তন্যপায়ী সন্তানেরা ভুলিতে পারে না, চন্মনাকে ভালবাসিয়া হাটের নাম দিয়াছে চন্মনার হাট।" (পৃ.৯৫)

— উপন্যাসের প্রথম কাহিনীটি বেতডাঙার ছোট একটি মুদির দোকানের মালিক রামপ্রসাদের সংসারকে কেন্দ্র করে। রামপ্রসাদ মারা গেলে তার ছেলে দীনবন্ধুর অবর্ণনীয় জীবন অভিজ্ঞতা যেমন বর্ণিত হয়েছে, তেমনি বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ীতে পীড়ন ও যন্ত্রণার মধ্যে সাবিত্রীকে বেঁচেবর্তে থাকার মধ্যদিয়ে গ্রামীণ জীবনের নীচতা এবং সংকীর্ণতা পরিস্ফুট হয়েছে। দ্বিতীয় কাহিনীতে, ডাক্তারি পাশ করে দাদার মৃত্যুর পর নিত্যপদ মহকুমা শহর ছেড়ে গ্রামেই স্থায়ীভাবে চলে আসে। শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের রমেশের মতোই সুন্দর গ্রাম সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখত নিত্যপদ। তার ভাবনা ব্যক্ত করে লেখক জানিয়েছেন—

" নিত্যপদ মোহিত হইয়া ভাবিতে লাগিল লক্ষ্মী যে বৈকুণ্ঠ-বাসিনী তাহার প্রমাণ আমাদের পল্লী প্রকৃতি আর পল্লীবাসীর প্রকৃতি।" (পৃ.১০২)

কিন্তু নিত্যপদর স্বপ্নাচ্ছন্নতা খুব দ্রুত-ভেঙে যায় রমেশের মতোই। পল্লীবাসীর প্রকৃত স্বরূপ তার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়। গ্রামের স্বার্থান্ধ মানুষের সঙ্গে তার সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। গ্রামের প্রধান নিত্যপদর উদারতাকে সুকৌশলে ব্যবহার করতে থাকে। হাতুড়ে ফণীডাক্তার এবং গ্রাম পঞ্চায়েত মতিলাল যৌথভাবে নিত্যপদর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। নিজে রংমেশানো ওষুধ দিয়ে মানুষকে ঠকায় ফণী, কিন্তু নিত্যপদ মানুষের কাছে বিনা পয়সায় ওষুধ পৌঁছে দেয়। যাদের কাছে ওষুধের দাম দেবার সামর্থ নেই, তারা পর্যন্ত মতিলাল আর ফণীর প্রবোচনায় পা দেয়। গ্রামের সকল স্তরের মানুষ সম্মিলিতভাবে

ষড়যন্ত্র করে নিত্যপদর জীবন যখন দুর্বিষহ করে তুলেছে, তখন সেই চক্রব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে ফণী ডাক্তারের কৌশলকেই সঠিক বলে মনে করেছে। সহকারী কান্তিভূষণকে সে নির্দেশ দিয়েছে —

" আর ওষুধ বিতরণ করে কাজ নেই। জল দিতে থাকো। ফণীবাবু দেশের লোকের নাড়ী ধরে আছেন। তার ব্যবহারই ঠিক। আমরা ভুল পথে চলেছিলাম ভাই।"

(পৃ. ১৫৪)

শরৎচন্দ্রের 'মানসপুত্র' জগদীশ গুপ্ত তাঁর কথা সাহিত্যে যে প্রথাবিরোধী জীবনতৃষ্ণার বাহন করেছেন, এই কাহিনীতেও তার কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, বাইরে থেকে পল্লী প্রকৃতি এবং পল্লীবাসীকে যতই শান্ত সুস্থির মনে হোক না কেন তার ভেরতটা মাকাল ফলের অনুরূপ। এর প্রতিটি স্তরেই রয়েছে পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থপরতা, দারিদ্র্যের কশাঘাত, কুৎসা রটানোর মধ্যদিয়ে প্রবল আনন্দ ভোগ। উপন্যাসের দীনবন্ধু, সাবিত্রী, নিত্যপদ এরা প্রত্যেকেই সেই অবস্থাগুলোর সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার চেস্টা করেছে এবং বিরূপ সমাজের সঙ্গে লড়াই করতে করতে তারা শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকেই তাদের মতো করেই টিকে গেছে। ড. প্রান্ত মুখোপাধ্যায় উপন্যাসটি সম্পর্কে লিখেছেন —

"জগদীশ গুপ্তের দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল মূলত: নৈরাশ্য পীড়িত। তাঁর দৃষ্টিতে জগৎ সংসার অপরিশোধ্য পঙ্কিলতার ঘন অন্ধকারে নিমজ্জিত। এই সর্বগ্রাসী অন্ধকারের মধ্যে দু'একটি ক্ষীণ আলোকবর্তিকা যদিও কখনও দৃষ্ট হয়, পারিপার্শ্বিকতার চাপে তা স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। এই হল তাঁর জীবন দর্শন। 'যথাক্রমে'র মধ্যেও সেটা দেখাতে চেয়েছেন।"—

(কথা সাহিত্যিক জগদীশ গুপ্ত, পৃ.৬০)

□ তাতল সৈকতে :

উপন্যাসটি সম্পর্কে এর 'নিবেদন' অংশে লেখক জানিয়েছেন —

"গল্পটিকে ঘটনাবহুল এবং দ্রুত গতিশীল করিয়াছি। পাত্র হইতে পাত্রান্তর অবলম্বন করিয়া কথা অগ্রসর হইয়াছে — গতি পুন: পুন: পথচ্যুত হওয়ায় গল্পের অখন্ডতা ভগ্ন হইয়াছে মনে হইতে পারে; সমাপ্তির পুর্বে একটা সমগ্র মূর্তির আভাস পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না ; তথাপি যে পাঠক রস তৃষ্ণা লইয়া যাত্রা করিবেন তাঁহাকে পথমধ্যে বা প্রান্তে পৌছাইয়া হয়তো নিরাশ হইতে হইবে না।"

(পৃ. ২৬৪)

— নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে এতোটাই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন লেখক। এই উপন্যাসের নায়িকা শরৎ। তাঁর জীবনের তিনটি স্তরকে লেখক চিত্রিত করেছেন। প্রথম স্তরে সে স্বচ্ছল পরিবারের গৃহবধূ। তার শ্বশুর এলাকায় সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে যেমন পরিচিত ছিলেন তেমনি উর্পাজনও করেছেন প্রচুর। দ্বিতীয় স্তরে তার সমস্ত বিষয়সম্পত্তি হারাতে হয়েছে এবং দৈব দুর্ঘটনায় শেষ সম্বলটুকুও গেছে। তৃতীয় স্তরে সে একা ও সহায়-সম্বলহীন

হয়ে নিজের দুটি ঘরের একটিতে ভাড়াটে বসাতে হয়েছে। তার এই দুঃসময়ের একমাত্র সঙ্গী বালকপুত্র শান্ত—যাকে মানুষ করার ভাবনা শরৎকে অস্থির করে তোলে। একদিন সে ছেলের জন্যে অন্ধকারে অপেক্ষা করছিল। তখন স্বৈরিণী ভেবে মনোহর দত্ত তাকে সম্ভাষণ করলে শরৎ তার মাথায় আঘাত করেছিল। আঘাত গুরুতর না হলেও ঘটনাটা নিয়ে হৈ চৈ থেমে যায়। শরৎ যে ব্যভিচার করেনি তার জন্যে আতঙ্কগ্রস্থ হওয়া স্বাভাবিক নয়। পুত্রের কাছে নিজের কলঙ্কময় জীবনের কাহিনী ব্যক্ত হয়ে পড়বে এই আশংকায় সে পরিচিত আশ্রয় ছেড়ে সম্পূর্ণ অনিশ্চিৎ ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করেছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য শরৎকে আত্মহননের পথে এগিয়ে যেতে হয়েছে। উপন্যাসটির একেবারে অন্তিমে লেখক জানিয়েছেন —

'একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ জলে ভাসিতেছিল। প্রভাতের পৃথক আলোকে উজ্জ্বল জলাশয়ে অচঞ্চল ভাসমান দেহটির দিকে চাহিয়া মাধব রায় বলিলেন জিতুর নতুন মা।" (পৃ. ৩২৪)

লেখকের অন্যান্য উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসে ঘটনার প্রকৃতির দিক দিয়েও বৈচিত্র্য রয়েছে। গার্হস্থ্য জীবনের কাহিনী সম্বলিত উপন্যাসটির আলোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক ড. প্রবীর কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন —

"গার্হস্থ্য জীবনের কাহিনী রচনার প্রতিশ্রুতি থাকলেও ঘটনাগুলির মধ্যে রোমান্সের স্পর্শ দৃষ্টি এড়ায় না। আত্মসম্মান রক্ষার জন্য প্রবল প্রতিপক্ষ পুরুষকে কঠিন আঘাত প্রদান, পুত্রের নিকট মাতৃসম্মান অক্ষুন্ন রক্ষার জন্য চিরপরিচিত গৃহত্যাগ, স্বল্প পরিচিত যুবকের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা নয়।" (পৃ. ১৬৪)

আসলে মানুষের অর্ন্তজীবনের জটিল ও গভীর স্তরের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরাই ছিল জগদীশগুপ্তের বৈশিষ্ট্য, ফলে বহিরঙ্গময় কাহিনীটিতে অতিনাটকীয় ঘটনাগুলি লেখকের বিশ্বস্ততাকে অনেকটাই ক্ষুন্ন করেছে।

সুতিনী :

বাংলাদেশের সমাজ যে মেয়েদের কোনোকালেই মানুষ হয়ে উঠতে দেয়নি; মেয়ে করেই রাখতে চেয়েছে, তার যথার্থ দৃষ্টান্ত লেখকের 'সুতিনী' উপন্যাসটি। সমালোচক ড. ক্ষেত্রগুপ্ত উপন্যাসটি সম্পর্কে লিখেছেন —

"সুতিনী একটি বহুমাত্রিক জটিল মানসিকতার উপন্যাস। বাঙালির পুরানো দিনের পরিবার জীবনে একটি মৃতবৎসা নারীর মনোকুটের বিভিন্ন স্তর এই লেখায় বেশ শৃঙ্খলার সঙ্গে বিন্যস্ত হয়েছে। বাঙালির সংসার সমাজে নারীর (এবং পুরুষেরও) যৌনতা ভিত্তিক মনোকুটের অর্থাৎ সেক্স-অবসেশনের এই উৎসটি সুপরিচিত। জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসে মনোবিকারের যে বিচিত্র চরিত্র মূর্তি অংকনের চেষ্টা তার মধ্যে সুতিনীর সমস্যাটি বিশেষভাবে বাঙালি জীবনের অঙ্গ।" (পৃ.২৮৪)

উপন্যাসে রাজবালা ও দুর্গাপদর সংসারে একটা সময় পর্যন্ত শান্তি ছিল। কিন্তু রাজবালা পর পর চারটি মৃত-পুত্র প্রসব করায় সংসারে অশান্তির কালোমেঘ ঘনীভূত হয়ে ওঠে। রাজবালা মৃত সন্তান প্রসবের দায় স্বামীর ওপর চাপায়। স্বামীর ভগ্ন স্বাস্থ্য, শ্রীহীনতাজনিত কারণেই যেন চর্তুথ পুত্রের মৃত্যুর পর রাজবালার মুর্তি ভয়ংকর হয়ে ওঠে। একটা সময় স্বামীর প্রতি তাকে বলতে শোনা যায় —

"সাত বছর গোঙালে আমায় নিয়ে তুমি—রোজ এমন চমকালে এতদিন পাঁজরার হাড় ফেটে প্রাণ বেরিয়ে যেত তোমার। আমার অদেস্ট দেখে' তোমার চম্‌কানই উচিত। তোমার বিবেচনা নাই এমন ত নয় — আমার স্বামী ভাগ্য আর সন্তান -ভাগ্য দেখে স্বয়ং শনি চম্‌কে যাবেন - তুমি ত মানুষ; শনির মতো তুমি মানুষের কাঁচা মাথা সত্যিই চিবিয়ে খাও না; কিন্তু আমার অদৃস্ট তুমি পুড়িয়ে দিয়েছ।" (পৃ.২০৭)

যে মেয়ে ছেলেবেলায় বেড়াল পোষা নিয়ে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে ছাড়েনি, সেই একগুঁয়ে জেদী মেয়েটি স্বামীর সুস্থ সন্তান দানের অক্ষমতা আর নিজের জরায়ুর সুস্থতা প্রমাণের জন্যে সে মরিয়া হয়ে ওঠে। জেদের বশে নিজের বোন মধুবালার সঙ্গে স্বামীর বিয়ে দেয়। মুহূর্তের এই বিভ্রান্তি রাজবালার জীবনে ট্রাজেডি ঘনিয়ে তোলে। বিয়ের মাসখানেকের মধ্যেই মধুবালা আর স্বামীর সম্পকর্কে ঘিরে রাজবালার জীবনে যে চরম বিপর্যস্ত অবস্থা দেখা ছিল তারই পূর্ণরূপ প্রত্যক্ষ করা গেল মধুবালা পুত্রবতী হওয়ায়। অন্তরের সুপ্ত ঈর্ষা এখন আগ্নেয়গিরির মতো প্রবল অগ্ন্যুৎপাত শুরু করে। কেবল ঈর্ষা নয়, নিজের পরাজয়ের গ্লানি ও আত্মধিক্কার তাকে জর্জরিত করে তোলে। শেষপর্যন্ত সে তার জরায়ু সংক্রান্ত মিথ্যা জনরবকে মিথ্যা প্রমাণ করার লক্ষ্যে সফল হয়েছে। আসলে দুর্গাপর্দার কাছে স্ত্রী হিসেবে নিজেব মর্যাদা প্রতিষ্ঠাই ছিল তার কাম্য। কিন্তু সেটা সে পারেনি। কারণ 'প্রতিষ্ঠার বেদী থেকে সে নিজেই নিজেকে বির্সজন দিয়েছে।' বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে সূর্যমুখী কর্তৃক নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীর বিবাহ প্রদান এবং রবীন্দ্রনাথের দুইবোন' উপন্যাসে শর্মিলার মনের অবস্থার সঙ্গে রাজবালার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেলেও রাজবালার এই প্রয়াস ছিল সম্পূর্ণই তার স্বেচ্ছাধীন এবং সুপরিকল্পিত। এই ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনার পরিণতিতে তার জীবনে ট্রাজেডি অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। তাকে অনায়াসেই শেক্সপীয়রের ট্রাজিক নায়কদের 'পুরুষ সংস্করণ' বলা যায়।

❑ রতি ও বিরতি :

উপন্যাসটির কাহিনীর অংশ রূপ প্রথমে 'সবার শেষে গয়া' এবং 'রামের টাকা'—নামক গল্প দুটিতে প্রকাশিত হয়েছিল। গল্প দুটির সংযুক্তিকরণ যথাযথ হয় নি। গয়ামনির প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি আর পুত্রশোকে রামের মানসিক বিকার ও মৃত্যুর ঘটনা সম্পৃক্ত হয়ে উঠেনি। উপন্যাসটির তিনটি প্রধান চরিত্র —রাম, তার পুত্র লব আর স্ত্রী গয়ামনি। পুত্র লবের মৃত্যুতে রামের মানস প্রতিক্রিয়াই উপন্যাসের মূল ঘটনা। পুত্রের মৃত্যুতে গয়ামনি পুত্রের

জীবনলাভের আশায় বাস্তবতার পথ পরিত্যাগ করে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছে এবং সর্পদংশনে মৃত্যুর পর ওঝার মন্ত্রে পুনর্জীবন লাভের প্রচলিত বিশ্বাস পোষণ করেছে গয়ামনি। দ্বিতীয় কাহিনীটিই মূল কাহিনী। গয়ামনির ক্ষেত্রে পুত্রের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া তাকে বাস্তব জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অস্বাভাবিক মানস জগতে নিয়ে গেছে। উপন্যাসের শুরুতে পুত্র লবের জন্মসূত্রে রামের ভাবনার পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন —

"রামের জীবন- কথা অতিক্ষুদ্র তার নিজেরও সব কথা মনে নাই, মনে করিবার সময়ও নাই, কিন্তু সকল দিনের চাইতে উজ্জ্বল একটি দিন উর্দ্ধের ঐ বিরাটায়তন সস্মিত আকাশের মত তাহার মনশ্চক্ষুর পুরোভাগে অক্ষয় চিরস্থির আর উদ্ভাসিত হইয়া আছে। সাগর মন্থন করিবার সময় যে দিনটাতে অমৃত পাওয়া গিয়াছিল আর লক্ষ্মী উঠিয়াছিলেন তেমনি স্মরণীয় সে-দিনটি।" (পৃ. ৫৫)

— সর্প দংশনে পুত্রের মৃত্যু হলে দৈবে বিশ্বাসী রামের মনে হয়েছে 'নিশ্চয় ভগবানের দৈবাদেশই সে প্রতিপালন করিয়াছে, নতুবা সামান্য বুকে হাঁটা সরীসৃপ এত তেজ আর এমন নির্ভুল গতি আর এমন অব্যর্থ লক্ষ্য আর কোথায় পাইবে।' কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর রাম আর স্বাভাবিক অবস্থায় থাকেনি। পুত্র লব ছিল রামের কাছে অর্থশক্তির প্রতীক। দৈবের প্রবল বিরুদ্ধতার সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্য অর্থের প্রয়োজন, লব সেই অপরিমেয় অর্থের প্রয়োজন মেটাবে এই ছিল রামের বিশ্বাস। কিন্তু পরিবারকে হারিয়ে তার সমস্ত বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়ে যায়। উপন্যাসের শেষে এসে দেখা গেল, যে ঝুলিটিতে টাকা রাখা হয়েছিল তাতে ছিদ্র থাকায় টাকাটি হারিয়ে গেছে। এবং সেটি অন্তর্হিত হয়েছে সেই সুড়ঙ্গা দিয়ে যে সুড়ঙ্গা দিয়ে বিষধর সাপটি লবকে দংশন করেছিল। শেষপর্যন্ত রাম স্বেচ্ছায় সর্প দংশনে মারা গেছে। এইভাবে মৃত্যুবরণ সম্পর্কে সমালোচক ড. প্রবীর কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন —

"সর্পের দংশনকে স্বেচ্ছায় বরণ করায় রামের বিশেষ একটি মানসিকতা ধরা পড়েছে। প্রতিশোধ গ্রহণের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত ছিল সর্পকে হত্যা করা, তা না হয়ে আকাঙ্খা পূরণের আগ্রহ, অবিকৃতরূপে সর্পদংশনের যন্ত্রণা বরণ করা, এর মধ্যদিয়ে আকাঙ্খিত শান্তি লাভ করার তৃপ্তি প্রকাশ পেয়েছে।" (পৃ. ১৮৯)

❑ গতিহারা জাহ্নবী :

উপন্যাসটি প্রথমে দুটি পৃথক ছোটগল্পের মধ্যদিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল খণ্ডিত আকারে। — এই গল্প দুটি হল — 'মুকুলের মৃত্যু' এবং 'পুত্র এবং পুত্রবধূ'। আদালতে টাইপিস্টের কর্মসূত্রে যে বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে জগদীশগুপ্ত এসেছিলেন তাদের মধ্যে বিবেক বর্জিত স্থূল মানুষই লেখকের রচনায় বেশী ভিড় করে আছে। সেইসব স্থূল মানুষের প্রতিনিধি অকিঞ্চনের জীবনের কদর্য দিকের কাহিনী নিয়েই এই উপন্যাস। পাড়ার সমবয়সীদের সঙ্গে অকিঞ্চন বেড়ে ওঠে; কিন্তু বন্ধুদের থেকে ভিন্নপথে প্রবাহিত হয় তারা জীবন।

যথাসময়ে সে বিয়ে করে কিশোরীকে। 'অপদার্থ অকিঞ্চনের' স্ত্রীর পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন—

"প্রবোধের স্ত্রী শীর্ণা, সুধীরের স্ত্রী স্থূলাঙ্গী, গণেশের স্ত্রী কৃষ্ণকায়া, এ্যম্বকের স্ত্রী স্থূলমধ্যা, অরুণের স্ত্রীর চক্ষু ক্ষুদ্র ইত্যাদি। অকিঞ্চনের স্ত্রীর নিখুঁত দেহ। চন্দ্রের মতো অশেষ তাহার দেহের লাবণ্য, অঙ্গের প্রভা মুখের শ্রী, গঠন সুষমা তাহার অতুলনীয়। অত্যন্ত সচেতন মনে সেই রূপ বেশীক্ষণ দেখা যায় না।" (পৃ. ৩৭)

কিন্তু কিশোরীর এই রূপ লাবণ্য ও সংবেদনশীল হৃদয়বৃত্তি অকিঞ্চনের মনকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। সে স্ত্রীকে ছেড়ে বন্ধুমহলেই পড়ে থাকে। এবং স্ত্রী সম্পর্কে বন্ধুদের প্রশংসায় খুবই নিস্পৃহ থাকে। স্থূল দেহ সর্বস্ব বন্ধুদের চেয়েও অধম অকিঞ্চন। স্ত্রী সম্পর্কে তার ভাবনা ব্যক্ত করে লেখক জানিয়েছেন —

"অকিঞ্চনের তরফ হইতে স্ত্রীর সম্বন্ধে একটা প্রবল উল্লাস আর উচ্ছ্বাস দেখিবার আশা করিয়া তারা কথাটা তোলে —প্রশ্নের মধ্যে তাদের নিজেদের একটা সূক্ষ্মতম অভাবের অনুভূতি যেন তৃপ্তি খুঁজিয়া বেড়ায়। কিন্তু অকিঞ্চনের সম্বিৎ নিদ্রিত কুম্ভকর্ণের মত, থাকিয়াও নাই, পৃথিবীর জীবনের জীবন যেরূপ সেই রূপের নাগাল পাইয়াও সে যেন উন্মীলিত চক্ষুর দৃষ্টির দ্বারা আলিঙ্গান করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিতে চায় না।" (পৃ. ৩৮)

অকিঞ্চনের ভেতরে একটা চরম অস্থিরতা শুরু হয়ে যায়। কিশোরী তো তার স্থায়ী সম্পদ, কিন্তু সেই মেয়েটি একদিনের জন্যেও তার হলো না ভেবে সে উন্মত্ত হয়ে ওঠে, তার মরে যেতে ইচ্ছে করে। বন্ধুদের কাছে রসিয়ে রসিয়ে সেই গল্প করে। ফলে তার এই আদিমতার কথা সমস্ত গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামের বিধবা বৃদ্ধা হরিপ্রিয়া মানুষের এইসব কুৎসা নিয়ে অন্যর কাছে পোঁছে দিতে সিদ্ধহস্ত। ফলে কিশোরীর শাশুড়ির কাছ থেকে যে তেলটুকু ধার নিয়েছিল, সেটুকু, অন্যের কাছ থেকে ধার করে শোধ দিতে আসে। অকিঞ্চনের সেই আদিমতার কথা উত্থাপন করে। সমস্ত রটনার কথা অকিঞ্চনের কানে গেলেও সে নির্বিকার। স্ত্রীর কাছে সে সেই 'সই'য়ের কথা তোলে। প্রচন্ড আশংকা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে বাপের বাড়ী গিয়ে স্বামীর লোলুপতায় হতবাক্ হয়ে যায়। অকিঞ্চন অনায়াসেই সেই সই অপরার কথা জানতে চায় — 'তোমার সইকে দেখলাম না তো?'। বজ্রাহত কিশোরী স্বামীকে চলে যেতে বলে মায়ের কাছে — 'তুমি ওকে আজই যেতে বলো।' কিশোরী শ্বশুর বাড়ীতে শেষ পর্যন্ত আসে মা এবং অন্যান্য শুভাকাঙক্ষীদের অনুরোধে। অকিঞ্চনের গল্প তখনো কিশোরীর বান্ধবীকে নিয়ে। বাগ্‌দিপাড়ায় 'খারাপ' মেয়েদের সঙ্গে তার 'মধুর' সম্পর্ক জানাজানি হয়ে গেছে। স্বামীর কবল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে কিশোরী বাপের বাড়ী চলে গেছে, আর ফিরে আসেনি শ্বশুর বাড়ীতে। কিন্তু দৈব নির্ধারিত পথেই সে দু'মাস না যেতেই গভীর বেদনার সঙ্গে অনুভব করে সে গর্ভবতী। সংসারের আর কোনো নারী জঠরে সন্তান আগমনের সংবাদ কেউ এমন

যন্ত্রণার সঙ্গে গ্রহণ আর অনুভব করে নি। এমন নিরর্থক অযাচিত ব্যাপার, একদিকে হাস্যকর, অন্যদিকে হৃদয় বিদায়ক হয়ে আর কোনো নারীর জীবনে কখনোই ঘটেনি। কিশোরীর মনে হয় —

" ... সন্তান কি স্বামীর আত্মজ? স্বামী যাহা অকাতরে দান করিয়া করিয়া ইহকাল ও পরকালব্যাপী কলুষ মর্ম্মে আত্মায় পুঞ্জীভূত করিয়াছিল, এই সন্তান, সেই অশেষ কলুষজাত, ইহা শুভ নহে, সার্থক নহে, ঈপ্সিত নহে, ইহা অবাঞ্ছিত এবং বর্জনীয় কলুষ।" (পৃ. ৭২)

অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় কিশোরী চরিত্রটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ' উপন্যাসের কুমুদিনী চরিত্রের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। দু'জনের তুলনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

"স্থূল স্বান্দেমী এবং আদর্শ রুচি পত্নীর ব্যক্তিত্ব সঞ্জাত দ্বরে আশ্চর্য শিল্পরূপ আমরা 'যোগাযোগ' উপন্যাসেও প্রত্যক্ষ করি। 'যোগাযোগের' ব্যক্তিসত্তাগুলি নিজ নিজ ইতিহাসের যোগফলে জগদীশবাবুর ব্যক্তিবৃন্দ অপেক্ষা বিরাটতর। উপন্যাসের উদ্দিস্ট রসবস্তুকে শিল্পের ও জীবনের ন্যায়ে বন্দী করার প্রয়াসেও রবীন্দ্রনাথ অধিকতর অভিনিবেশের পরিচয় দিয়েছেন।" (পৃ, ২৩৩)

❑ দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা :

উপন্যাসটি প্রথমে 'পব্বর্ত ও পার্ব্বতী' নামক ছোটগল্পাকারে বেরিয়েছন। এই উপন্যাসে লেখক ব্যক্তি মানুষ থেকে সমষ্টির মধ্যে দেখাতে চেয়েছেন যৌন অস্বাভাবিকতার সংক্রমণ। এখানে দুটি চরিত্রের নামের এবং তাদের কার্যকলাপের মধ্যদিয়ে পল্লীসমাজের চিত্রকে পরিস্ফুট করেছেন। নামকরনের প্রথম চরিত্রটি দয়ানন্দ মল্লিক; সে নিজেকে গ্রামের অভিভাবক বলেই মনে করে। তার সম্পর্কে লেখক উপন্যাসের সূচনাতেই লিখেছেন —

"খন্ডগ্রাম। গ্রামের নাম জানে মুস্টিমেয় লোকে, তথাকার দয়ানন্দ মল্লিককেও চেনে মুস্টিমেয় লোকে, কিন্তু তফাৎ এই যে, 'আছি' বলিয়া একটা বিঘোষিত অপরাজেয় সত্তা গন্ডগ্রাম খন্ডগ্রামে নাই, সেখানকার অন্য কাহারো তা' আছে বলিয়া অনুভূতি গ্রামবাসীর নাই — কিন্তু দয়ানন্দ মল্লিকের তা আছে।" (পৃ, ১৬৬)

কাহিনীর নামের দ্বিতীয় অংশটি খন্ড গ্রামেরই এক গৃহস্থ বধূর নামে। এই দয়ানন্দ মল্লিকার সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সূচনাতেই বলেছেন —

"দয়ানন্দ মল্লিকের নাম আমাদের কন্ঠস্থ হইবার পর আমাদের প্রকাশ করা উচিত যে, মল্লিকা এই দুর্নিবার দয়ানন্দের যে দুগর্তির কারণ হইবে তাহা অন্তহীন।" (পৃ. ১৬৭)

উপন্যাসে মল্লিকার শাশুড়ি কামিনী বংশ রক্ষার জন্য বৌ নাতি চায়, কে সে চায় না। ফলে অসুস্থ শরীরেও মল্লিকাকে গর্ভধারণ করতে হয় এবং সেটার পর তার আদর

বেড়ে যায় অনেক গুণ। কিন্তু কামিনী গর্ভাবস্থায় পুত্রবধূকে গৃহ থেকে যেতে দিতে নারাজ। যথাসময়ে মল্লিকা একটি মৃতসন্তান প্রসব করে। এতে কামিনীর স্বার্থে আঘাত লাগে। মল্লিকার মা মল্লিকাকে পিত্রালয়ে নিয়ে যান। স্বামী ভুবনেশ্বর তাকে আনতে গেলে মা মেয়ে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে জামাইকে বিদায় করে দেয়। ফলে গ্রামের মাতব্বর দয়ানন্দ আর অন্যান্যদের কথায় ভুবনেশ্বরের দ্বিতীয়বার বিয়ের কথা হয়। দয়ানন্দকে নিয়ে আবার শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আসে ভুবনেশ্বর। স্ত্রীকে ফিরে পেতে মামলা করে ভুবনেশ্বর। সেই মামলার শুনানির বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন —

"আদালতে লোক ধরিতেছে না, রঙ্গ দেখিতে কাজের ভিতরেই ফুরসৎ করিয়া লইয়া নিঃস্বার্থ লোক ঢের আসিয়াছে। .. জানাজানি হইয়া গেছে যে, বিনোদিনীর বয়স কুড়ির বেশি নয়। একটিমাত্র সন্তান তাহার হইয়াছিল , এবং বর্ণ উজ্জ্বল। সুতরাং সে আসিতেছে শুনিয়া দর্শকগণের ভিতর একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল।" (পৃ. ১৯৫)

স্বামী গৃহে আর মল্লিকার যেতে চায়নি। আসলে নারীর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল মা হওয়া এমন একটি শাশ্বত ধারণা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে নারীর উপর। অথচ নারীর নিজস্ব কোনো চাওয়া-পাওয়া থাকতে পারে। সেই নারীসত্তার কথাই ব্যক্ত হয়েছে এই মল্লিকা চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে।

❑ নন্দ আর কৃষ্ণা :

'দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা'র মতোই এই উপন্যাসেও দুটি চরিত্রের অন্তর্জগৎই মুখ্য। এরা হল নন্দ আর কৃষ্ণা। পুরুষের রূপজ মোহ ও তার সমস্যা নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। উপন্যাসে মণীন্দ্র বাবুর প্রথম পক্ষের ছেলের গৃহ শিক্ষক নন্দ। আর নন্দ যাকে মণীন্দ্র বাবুর স্ত্রী বলে জানে সেই কৃষ্ণা আসলে মণীন্দ্রবাবুর রক্ষিতা। কাহিনীর প্রথম ভাগে কৃষ্ণার অনাবৃত দেহ আকস্মিকভাবে দেখে ফেলে নন্দ। তীব্র অপরাধবোধের তাড়না এবং শাস্তির ভয়ে সে গৃহে পলায়ণ করেছে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে গৃহের পরিবেশে, স্ত্রীর মমতার স্নিগ্ধ সাহচর্যেও কৃষ্ণার রূপ ও যৌবণের আকর্ষণ ভুলতে পারে নি। এই আকর্ষণ শুধু নন্দর দিকে থেকে নয়, কৃষ্ণাও পলায়নরত নন্দর উদ্দেশ্যে জানিয়েছে —

"পালাবেন না; আমাকে আয়নায় যেমন দেখেছেন, তেমনি দেখা আমার ভালো লাগে, আপনাকে আরো— আপনি নির্বোধ, তাই দিশে পান না, পালান্।" (পৃ. ১১)

কৃষ্ণার আহ্বান উপেক্ষা করেই ভদ্র ও ভীরু নন্দকে পালিয়ে আসতে হয়। কিন্তু তার অন্তরের পুরুষ সত্তাটি নারীর রূপে পিপাসা পূরণ করবার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। এই অন্তর্গত পুরুষটি অবচেতনে জেগে ওঠে নিদ্রিতাবস্থায়। লেখক জানিয়েছেন —

"নারীর রূপ আর আকর্ষণ, বিভ্রান্তিকর সেই মোহন ইন্দ্রজাল, পুরুষ অত সহজে আর অত সত্বর ভুলিতে পারিলে পৃথিবীর বুক হালকা, কাব্য ক্ষুণ্ণ, এমন কি মরণশীল, পুরাণ অপাঠ আর পাগলের সংখ্যা চৌদ্দ আনা হ্রাস প্রাপ্ত হইত। তা যাতে না হয় সেই জন্যই

বোধহয় নন্দকিশোর সেই রাত্রেই এক অভাবনীয় স্বপ্ন দেখিল।"

(পৃ. ১১)

এই ক্ষুধার্ত সত্তাটি নন্দকে গৃহ থেকে দ্রুত শহরে নিয়ে আসে। এতে প্রচ্ছন্ন ইন্ধন ছিল মণীন্দ্রবাবুর অকপট নারী লোলুপতার ব্যাখ্যা। স্ত্রীকে কতটা সময় হাতের নাগালে পাওয়া যাবে সেটা তিনি অংক কষে বলে দিয়েছিলেন নন্দকে। পাশাপাশি মণীন্দ্রবাবু ব্যাঙ্কের কাজে এলাহাবাদে চলে গেলে কৃষ্ণার প্রতি তার যৌন অনুভূতি ও ভোগলালসা চরম আকার ধারণ করে। এর বিপরীতে কৃষ্ণার অন্তর্গত স্বরূপটিও লেখক উদ্‌ঘাটিত করেছেন। পুরুষকে এভাবে খেলাতেই তার চিত্তসুখ হয়। তায় ভেতরের এই সত্যটি প্রকটিত হয়েছে কৃষ্ণার মায়ের কথাতেই —

"তোমাকে বল্‌ব কি বাবা,মেয়েটা চিরকাল শয়তান।.. ভারি নিষ্ঠুরের মত স্বভাব ওর। রূপ আছে , রূপের জোরে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলে মজা দেখা ওর মজ্জাগত অভ্যাস। কতজনকে যে মিছিমিছি পাগল করেছে তার ইয়ত্তা নেই। মনে হয়, কাউকে ভালবাসে না, বাসতেই পারে না, ঈশ্বর ওকে সে ক্ষমতা দেন নাই, তোমাকে মণির বাড়ীতে দেখে আমরা তৎক্ষনাৎ মনে হল, আর ভারি ভয় হলো যে, এই ভালো ছেলেটাকে বজ্জাত মেয়ে আমরা কষ্ট না দিয়ে কিছুতেই ছাড়বে না।" (পৃ. ৩৬)

এইভাবে কৃষ্ণার মায়ের আন্তরিকতায় নন্দর মুক্তিলাভ সম্ভব হয়েছিল কৃষ্ণার রূপ যৌবনের চক্রব্যূহ থেকে।

❑ নিষেধের পটভূমিকায় :

'মেঘাবৃত অশনি' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'শঙ্কিতা অভয়া' গল্পটি বর্ধিত কলেবরে এই উপন্যাসাকারে আত্মপ্রকাশ করেছিল। উত্তরকালে লেখক নিজেই এটির নাট্যরূপও দিয়েছিলেন - যদিও সেটি কোনো পত্র-পত্রিকায় বের হয়নি রচনাবলীতেই (১ম খন্ড) প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল।

'শঙ্কিতা অভয়া' গল্পে সতেরো বছরের তরুণী শান্তির সঙ্গে তার পিতা অতুলের সম্পর্ক একেবারেই আধুনিক কালের পিতা -পুত্রীর মতো বন্ধুত্বপূর্ণ। তারা সমস্ত বিষয়েই খোলামেলা আলোচনা করে; এমনকি আধুনিক কালের নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক বিষয়েও তারা অবাধ আলোচনায় ডুবে যেতেও দ্বিধা করে না। এসব দেখে শুনে অভয়া ভীষণ শঙ্কিতা। একদিন পিতার সঙ্গে শান্তি সিনেমায় যায়, রাত দশটা বেজে গেল তারা গৃহে ফিরছিল না দেখে অভয়া গভীর দুশ্চিন্তা বোধ করে। তারা ফিরে এলে, শঙ্কিতা অভয়া কন্যা শান্তির কাছে প্রশ্ন করে — 'বল সত্যি ক'রে শান্তি, ও তোকে নষ্ট করেনি তো?" (পৃ. ৩৪৪)

একথা শুনে বিস্মিত শান্তি মায়ের কাছে বলেছে — 'তুমি সত্যি ক্ষেপে গেছো। মা— একেবারে উন্মাদ হয়েছ। নইলে এমন অশ্রাব্য কথা ;তোমার মুখে বেরোল কী

করে? বাবা চরিত্রহীন একথা তুমি অনেকবার বলেছো; কিন্তু এ কি কথা তোমার মুখে।"
(পৃ. ৩৪৪)

অভয়া তখন শান্তিকে বিস্মিত করে দিয়ে অসংকোচে জানিয়ে দিয়েছে —

"ও তোর বাবা নয়, কেউ নয়, তোকে নিয়ে ওর সঙ্গে কুলত্যাগ করেছিলাম।"
(পৃ. ৩৪৪)

ছোটগল্পটি এখানে শেষ হয়েছে। কিন্তু উপন্যাসে এরপর কাহিনী ভিন্নমুখে বাঁক নিয়েছে। শান্তি তার বর্তমান পরিচয়ে খুশি হতে না পেরে মায়ের কাছে প্রশ্ন করেছে — 'আমাকে তুমি নিয়ে এসেছিলে কেন? আমার ঘরে আমাকে ফেলে রেখে আসনি কেন? তোমাদের দোষে তারা আমার পর; আমার জন্মক্ষেত্র আমার পক্ষে নিষিদ্ধ স্থান। এর চাইতে দুর্ভাগ্য মানুষের আর কী হতে পারে?' এরপর শান্তির কঠোর জীবন সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। সে তার বর্তমান আশ্রয় ছেড়ে প্রকৃত পিতার ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে তার পিতা আবার বিয়ে থা করে সংসার করছে সন্তান সন্ততি নিয়ে। সমাজের ভয়েই সেখানে তার স্থান হল না। আবার ফিরে এসে অতুলের কাছেও সে আশ্রয় পেল না। শেষে গুরুজী ত্রিদিব তাকে আশ্রয় দিল। ত্রিদিবের এক ধনী বন্ধু নিস্তারণ মজুমদার শান্তিকে পুত্রবধূ করে ঘরে তুলে নিল। শান্তির প্রকৃত পিতা বসন্ত এসেই কন্যা সম্প্রদান করেছে। কাহিনীর কেন্দ্রে এইভাবে শান্তি থাকলেও যেহেতু অভয়ার কৃতকর্মের জন্যেই জীবন জটিলতার সূত্রপাত তাই লেখক কাহিনীকে অভয়াকেন্দ্রিক রেখেছেন। তবে নিস্তারণ মজমদারের ভূমিকাটি বাস্তবোচিত হয়নি। লেখক নিজেই যেন নিস্তারনের ভূমিকা নিয়ে শান্তিকে বলেছেন—

"পৃথিবীর একপাই লোক বাদে সবারই চরিত্র, নীতি, অর্থ, মন, বৃত্তি কলুষিত। তারা তা স্বীকার করে এবং আনন্দ করে তাদের প্রসারের অন্ত নেই, আর তুমি স্বয়ং নিষ্কলুষ হয়ে বলছো; নিজেকে প্রসারিত করার স্থান নেই তোমার। ... আমার এই গৃহ — আর আমার সমাজ যথেস্ট প্রশস্ত।"

এইভাবে ত্রুটি বিচ্যুতি বাদ দিলে উপন্যাসের কাহিনীটি এক দু:খ-সাগর অতিক্রম করে সাফল্যের তীরে পৌঁছেছে।

❑ নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ :

জগদীশ গুপ্ত কেবল দৈব নির্ভরতার কথাই বলেননি, ভবিষ্যৎ গঠনের এবং ভাগ্য ব্যবস্থাপনের ক্ষমতা, দৈব ব্যতিত মানুষের হাতেও যে খানিকটা থাকে সেকথা ব্যক্ত করেছেন আলোচ্য উপন্যাসে। কুম্ভকর্ণ নামের সঙ্গে যে পৌরাণিক গল্প আছে সে ছিল বীর, জীবনের দীর্ঘসময় কেবল ঘুমিয়েই কাটাতেন। সংকটের মাঝে তাকে ঘুম ভাঙাতে হয়েছিল বলে শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারে নি। উপন্যাসের কুম্ভকর্ণ হল নায়ক শশধর। তার অন্তরস্থ কুম্ভকর্ণ সত্তা যে শেষপর্যন্ত সংকটের আবর্তে পড়েও জাগরিত হয় নি, এবং তার ফলে

স্ত্রীর চোখে তার বীরসত্তার পতন ঘটেছে। আবাল্য ভীরুতা নিয়ে সমাজের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বেড়ে উঠেছিল শশধর। পরে শরীরচর্চা করে অসীম বলের অধিকারী হয় সে। স্থানীয় একটি ষাঁড়ের কবল থেকে সে দিনকর দে নামক বিপন্ন পথচারীকে রক্ষা করে বিখ্যাত হয়ে যায়। চারদিকে তার বীরত্বের কথা ছড়িয়ে পড়ে। তার অনেক শিষ্য জুটে যায়। তার স্ত্রী নিজেকে ভীমের স্ত্রী বলে গর্ব করতে শুরু করে। এখন অবস্থায় একটি রাতের ঘটনায় ছন্দপতন ঘটে। প্রতিবেশী নকুলের বাড়ীতে ডাকাত ঢুকেছিল। গতবছর এমন দিনেই দূরের একটা খড়ের বাড়ীতে আগুন লেগেছিল সন্ধ্যার কিছু পরে। শশধর ভাতের থালা ফেলে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গিয়ে একাই একশ জনের কাজ করেছিল। 'আগুনের গ্রাস হইতে অনেক সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছিল। — দুখানা ঘর ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল প্রায় একাই।'

ডাকাতি পড়ার দিনের ঘটনায় শশধরকে ব্যগ্র হতে দেখা গেল না। সে শুয়েই রইল ওঠার কোনো চেষ্টা সে করলো না। লেখক জানিয়েছেন—

"একটি নারীকণ্ঠের আর্তনাদ কানে আসিল আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করিয়া, জ্যোৎস্না লোক তামস তুহিনপুঞ্জে আবৃত করিয়া, জীবনের জাগৃতিকে শিহরিত করিয়া এবং বোধহয় অন্তরের দেবতাকে বিদ্ধ করিয়া সে শব্দ উত্থিত হল এবং মিলাইয়া গেল। ... তারপর গুরুভার দ্রব্য পতনের শব্দ হইল। গুরুভার দ্রব্যটি বোধহয় মনুষ্য দেহ ... এবং তারপরই একটা পুরুষ কণ্ঠ চীৎকার করিয়াই গোঙাইতে গোঙাইতে নিঃশব্দ হইয়া গেল।"

(পৃ. ৩৫২)

শশধরের স্ত্রী স্বামীকে ছুটে যাবার কথা বললে, 'দরকার নেই' বলে শশধর চোখ বন্ধ করে থাকে। তার চেতনার জাগরণ ঘটে না। পরদিন সকালে জানা গেল নকুলের বিধবা কন্যা অপহৃতা হয়েছে। নকুলের পা ভেঙেছে। মানুষের বিপদে মানুষ এগিয়ে যাবে এটাই ঈশ্বর প্রদত্ত সহজ প্রবণতা'। কিন্তু শশধর প্রাণ ভয়ে। সেই কাজ করতে পারেনি। সমবেত জনতার মনে প্রশ্ন ওঠে -'শশধর বাবু কিছু টের পান নি? অর্থাৎ শশধর জেগে থাকলে নিশ্চয়ই এমন ঘটনা ঘটতো না। কিন্তু স্ত্রীর কাছে শশধরের কাপুরুষত্বের কথা গোপন থাকেনি। স্ত্রী তাকে অভিযুক্ত করে বলেছে —

- "তুমি এমন কাপুরুষ তা জানতাম না। আমি তোমার লজ্জায় ; তোমার মুখের দিকে চাইতে পারছিনে।" (পৃ.৩৫৫)
- "সর্বনাশের জন্য দায়ী তুমি — তুমি পাপী।তুমি যে যাওনি এ অন্যায়টা আমি কিছুতেই কোনো কৈফতের সঙ্গো খাপ খাওয়াতে পারছিনে। বড় কষ্ট হচ্ছে আমার।" (পৃ. ঐ)
- "তোমার তরুণ ভক্তেরা তোমায় কি মনে করবে এখন? তাদের সামনে মুখ তুলতে পারবে ... এ তোমার সাময়িক ভীরুতা নয়, তোমার মজ্জাগত চিরদিনের ভীরুতা। তোমার কোনো মূল্য নেই।" (পৃ.৩৫৬)

নিজেকে নিষ্ক্রিয় রেখে শশধর এভাবে নিদ্রিত থেকে কুম্ভকর্ণের মতোই দৈব নির্দেশিত পথে নয়, নিজেই নিজের ভবিষ্যতের সংকীর্ণ স্বার্থপরতার পথ নির্মাণ করেছিল।

কলঙ্কিত তীর্থ :

উপন্যাসটি প্রথমে 'নিরুপম তীর্থ' বা 'ত্রিলোকপতির তীর্থ ভ্রমণ' 'কলঙ্কিত সম্পর্ক' বা 'আহুতি' শীর্ষক বিভিন্ন ছোট গল্পকারে বেরিয়েছিল । উপন্যাসটি আত্মপ্রকাশ করে লেখকের মৃত্যুর পর। 'কলঙ্কিত তীর্থ' গল্পটিতে নারীঘটিত অপরাধের ফলে সাতকড়ি জেলে যায়। জেল থেকে ফিরে এলে বাড়ীর সকলেই তাকে গ্রহণ করে। কিন্তু স্ত্রী মাখন তাকে মেনে নিতে পারে না। এই মেনে নিতে না পারার জন্যে শাশুড়ি সমাজপতির ভূমিকা নিয়ে মাখনকে বাড়ী। থেকে বের করে দেয়। এরপর উপন্যাসে লেখক কাহিনীকে চারটি পৃথক ঘটনায় ভাগ করে একটা পরিপূর্ণতা দেবার চেস্টা করেছেন। মাখনকে উদ্ধার করে ত্রিলোকপতি এবং পরে বিগ্রহের সামনে পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। যে কাহিনী যেখানে শেষে হওয়ার কথা লেখকের সঙ্গত মনে হয়েছে সেখানেই তিনি কাহিনী শেষ করেছেন। এ বিষয়ে কারও কোন উপদেশ বা পরামর্শ তিনি গ্রহণ করেননি। প্রসঙ্গত: উপন্যাসটির ভূমিকায় বিশু মুখোপাধ্যায় লিখেছেন —

"প্রয়োজনে কয়েকখানি গ্রন্থের সর্বস্বত্ব অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করলেও , তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের মর্যাদা কখনও তিনি ক্ষুন্ন হতে দেননি।" (পৃ. ২)

তাঁর ওপন্যাসিক প্রতিভার মূল্যায়ন করে প্রেমেন্দ্র মিত্র এই ভূমিকাতেই লিখেছেন—

"সারাজীবন সাহিত্যের নিভৃত সাধনাই তিনি করে এসেছেন। এই নির্লজ্জ আত্মপ্রচারের যুগে সাধনার এমন নিষ্কাম নিষ্ঠাও বিরল। বর্তমানের নগদ মূল্য যথাযোগ্যভাবে তিনি পাননি; ভাবীকাল তার ক্ষতিপূরণ করবে অনুশোচনায়, এমন আশ্বাস দেবার সাহসও আমাদের নেই, তবু জগদীশগুপ্তের মত লেখক ব্যর্থ হতে পারেন না বলেই আমাদের বিশ্বাস। সময়ের স্রোতে সব কিছুই হারায়, তবু জীবনকে নির্ভীক নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে দেখবার ও বোঝবার চেস্টায় অসাধু সিদ্ধার্থের মত বই লেখবার জন্যে সারাজীবন রোগ শোক অভাব দারিদ্র্যের সঙ্গে অম্লান বদনে যিনি যুঝে এসেছেন, প্রত্যক্ষভাবে না হোক, তাঁর সাহিত্যিক সাধুতা পরোক্ষভাবে ভাবীকালের অনুপ্রাণনা হয়ে থাকবেই।" (পৃ. ৭)

—এই মূল্যায়ন অত্যন্ত যথার্থ। তাইতো মৃত্যুর ছয় দশক পরেও জগদীশগুপ্ত এখনও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

প্রসঙ্গ ঃ লঘুগুরু

□ পূর্বসূরীদের উপন্যাসের জগৎ

"জগদীশ তাঁর উপন্যাসে যে জগৎ ও জীবন তৈরী করেছেন তাতে বিকার ও বিভীষিকার প্রাধান্য। পাপ, কাম, হিংসা, অসুন্দর অকল্যাণের রাজত্ব। চারদিকে অন্ধকার যেন গ্রাস করতে আসছে, একটা রুদ্ধশ্বাস চেপে বসছে। সৎ স্বাভাবিক মানুষ নেই প্রায়, কমনীয় রমণীয় রঙিন সজল শান্ত রূপময় বিশ্ব জগদীশের উপন্যাসে অজানা। রবীন্দ্র-উত্তর কাব্যধারায় যেমন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মধ্যে সৌন্দর্য আনন্দ বিরোধী দুঃখ ও যন্ত্রনার মরুদাহ প্রকাশ পেয়েছিল তেমনি রবীন্দ্র-শরতের কথা সাহিত্যের পর হৃদয়হীনতার একটা উল্টো হাওয়া বইয়ে দিলেন জগদীশ।" *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (৪র্থ খন্ড): ড. ক্ষেত্র গুপ্ত, পৃ.২৭৭*

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, মঙ্গলকাব্যগুলি আর গীতিকা সাহিত্যে বাস্তব জীবন প্রসূত যেভাবে উপন্যাসের শিকড় অন্বেষণ করা হয় সেসব ছেড়ে দিলে বাংলার প্রাক্-বঙ্কিম পর্বের বিভিন্ন নক্শা জাতীয় রচনায় উপন্যাসের পূর্বাভাস খুঁজে পাওয়া যায়। তবে প্রথম যথার্থ উপন্যাস রচয়িতা হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রচনাকাল পরিধি ১৮৬৫—১৮৮৭('দুর্গেশনন্দিনী' থেকে 'সীতারাম')। বঙ্কিমচন্দ্র থেমে যাবার আগেই সেই সৃষ্টিমশাল রবীন্দ্রনাথ হাতে তুলে নিয়েছেন। আবার রবীন্দ্রনাথের মধ্যগগনে অবস্থান কালেই শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব হয়েছে কথাশিল্পী রূপে। সেদিক থেকে জগদীশগুপ্তের পূর্বসূরী হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ক্ষেত্রটিকেই পর্যালোচনা করা যেতে পারে। মূলত: সামাজিক উপন্যাসগুলির নিরীখেই যদি বিচার করি তাহলে জগদীশবাবুর এই তিন পূর্বসূরীর রচনায় তিনটি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পাওয়া যায়।

□ বঙ্কিমচন্দ্র মূলত: ছিলেন রক্ষণশীল মানসিকতার অধিকারী। তিনি তাঁর সময়ের সমাজ কাঠামোকে অপরিবর্তনীয় রাখতে চেয়েছিলেন।

□ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ধীরে ধীরে সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাসী। প্রচলিত সমাজ কাঠামোকে তিনি ধীরে ধীরে প্রগতিশীলতার পথে নিয়ে যাবার কথা ভেবেছেন।

□ শরৎচন্দ্রকে অনায়াসেই 'সমাজ বিপ্লবী' বলা যায়। অন্য দুজনের পথ তাঁর মনঃপুত ছিল না। তিনি পুরনো সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে একটা নতুন সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই শরৎচন্দ্রেরই 'মানসপুত্র' ছিলেন জগদীশ গুপ্ত। তিনি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বীভৎস দিকগুলো নির্মোহ দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন।

□ বাংলাউপন্যাসেরপ্রথমসার্থকস্রষ্টাহিসেবেবঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মনন, কল্পনা, সমাজচেতনা, আর সাংবাদিকের সমন্বয় ধর্ম নিয়ে উপন্যাসের যুগোপযোগী মূর্তিটি গড়েছিলেন। উত্তর সূরীর সৃষ্টির ক্ষেত্র কতটা বিস্তারলাভ কিংবা ভিন্নপথগামী হয়েছে, তার যথার্থ মুল্যায়ণ সম্ভব হবে বঙ্কিমের গড়া প্রতিমার স্বরূপ নির্ণয়ের পথ ধরেই। বিষয়গত বৈচিত্র্যের নিরীখে

তাঁর উপন্যাসগুলি মূলত তিন শ্রেনীর —

- ইতিহাসাশ্রিত ও ঐতিহাসিক
- পরিবার ও সমাজধর্ম কেন্দ্রিক এবং
- তত্ত্বমূলক উপন্যাস।

মধ্যবর্তী ধারাটিকে বেষ্টন করে আছে প্রান্তের ধারা দুটি। উনিশ শতকীয় রেনেসাঁর আলোয় আলোকপ্রাপ্ত বঙ্কিম মূলতঃ স্ববিরোধিতার দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এর পেছনে ছিল সমকালের শিক্ষিত বাঙালির চিত্তের দোলাচলবৃত্তি। সমালোচক ডঃ জয়ন্ত বন্দোপাধ্যায় এই দিকটির প্রতি আলোকপাত করে লিখেছেন —

"উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির চিত্ত কোনো অবস্থাতেই পুরানো অভ্যাস থেকে উন্মুলিত হয়ে পূর্ণ প্রগতিবাদে স্নান করে ওঠেনি। পুরানো শিক্ষা সংস্কারের দৃঢ় প্রোথিত সাবেকীমন নতুন যুগের বাণীকে সীমাবদ্ধভাবে ঠিক বহন করে চলতে পারে, বঙ্কিম সাহিত্যে তারই একটা গড়পড়তা হিসাব পাওয়া যাবে", *(বাংলা সামাজিক উপন্যাসের দুই স্থাপতি, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৯)*

ইতিহাস ও ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসে লেখকের মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য। তবে তিনি সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাসে স্ববিরোধিতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। এইসব উপন্যাসের আলোচনা শুরুর আগে স্পষ্ট হওয়া দরকার বঙ্কিমচন্দ্রের চেতনায় সমাজতরঙ্গ কতটা আলোড়ন তুলেছিল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া না গেলেও তিনি যে উনিশ শতকের সেই নবজাগরণের কালে প্রগতিশীলতার মানদন্ডে তাঁর সাবেকী ব্যবস্থার মির্মমূলে আঘাত করার পক্ষপাতী ছিলেন না, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বরং তিনি পুরনো ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলা যায়। নবীনদের তিনি স্পষ্টতই বলেও ছিলেন সমাজের মঙ্গল সাধনের জন্যেই লিখতে হবে, অন্য কারণে নয়। 'মঙ্গল' বলতে তিনি বুঝেছিলেন সমাজ-কল্যাণ। আসলে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনকে সুচিন্তিত নীতির ভিত্তিতে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই একদিন সমাজসৃষ্টি হয়েছিল। সমাজবিধিকে স্বীকার করেই সভ্যতার অগ্রগতি — এই বিশ্বাস বঙ্কিমের ছিল। আসলে তিনি মূলত মানুষের হৃদয় রহস্য সন্ধানী, কল্পনা-প্রবণ, সৌন্দর্য স্রষ্টা হলেও সমাজ সম্পর্কে তাঁর শিল্পীসত্তা অনেকটাই পিছনে পড়ে গিয়েছিল নীতিবাগীশ সত্তার কাছে। তাই তিনি বিধবার অন্য পুরুষের প্রতি প্রেম কিংবা বিবাহিত পুরুষের অন্য বিধবা নারীর প্রতি আসক্তিকে ভালো চোখে দেখেননি কখনোই। এর প্রমাণ লেখকের 'বিষবৃক্ষ (১৮৭২) এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) উপন্যাস দুটি। এখানে তিনি শুধু বিধবার প্রেমকে স্বীকৃতি দেননি তাই নয়, সেই বিধবাদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছেন সমাজের মঙ্গলার্থে। তিনি মনে করতেন বিধবার প্রেম কিংবা বিবাহিত পুরুষের অন্য নারীতে আসক্তি সমাজের মাটিতে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করে। এ বিষয়ে তিনি তাঁর 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের উনত্রিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদ

'বিষবৃক্ষ কী?' -এর এক জায়গায় স্পষ্টতই লিখেছেন—

"যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইতে ফলোৎপত্তি এবং ফলভোগ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যানে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা সকলেরই গৃহ প্রাঙ্গণে রোপিত আছে। রিপুর প্রাবল্য ইহার বীজ।.... চিত্ত সংযমের অভাবই ইহার অঙ্কুর, তাহাতেই এ বৃক্ষের বৃদ্ধি। এই বৃক্ষ মহাতেজস্বী; একবার ইহার পুষ্টি হইলে আর নাশ নাই। এবং ইহার শোভা অতিশয় নয় প্রীতিকর; দূর হইতে ইহার বিবিধ বর্ণ পল্লব ও সমুৎফুল্ল মুকুলদাম দেখিতে অতি রমণীয়। কিন্তু ইহার ফল বিষময়; যে খায় সেই মরে।"*(বঙ্কিমরচনাবলী, তুলিকলম, পৃ . ২৫৭-৫৮)*

এই ফল খেয়েই বিধবা কুন্দনন্দিনীকে বিষপানে মরতে হয়েছে। কিংবা বিধবানারী হীরাদাসী দেবেন্দ্রতে প্রলুব্ধ হয়ে উন্মাদিনীতে পরিণত হয়েছে। আর 'কৃষ্ণকান্তের উইলে বিধবা রোহিনীকে; গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, সে সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে বাংলাদেশে বিধবা বিবাহ আন্দোলনের প্রচেষ্টাকে বঙ্কিম ভালো চোখে দেখেননি। অত্যন্ত কৌশলে তিনি 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের চরিত্র সূর্যমুখীকে দিয়ে বিদ্যাসাগরকে মূর্খ বলিয়েছেন। সূর্যমুখী একটি চিঠিতে কমলমণিকে লিখেছিলেন–

"ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পন্ডিত আছেন তিনি আবার একখানি বিধবা বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয় সে যদি পন্ডিত, তবে মূর্খ কে ?" *(প্রাগুক্ত, পৃ.২২৭)*

এইভাবে কখনো নায়িকাদের সমাজ থেকে চিরতরে সরিয়ে কিংবা বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করেই ক্ষান্ত হননি তিনি 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের উপসংহারে স্পষ্টতই পাঠকবর্গকে উপদেশের ভঙ্গিতে লিখেছেন —

"আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।" *(প্রাগুক্ত, পৃ ২৯০)*

এ প্রসঙ্গে লেখকের 'সাম্য' গ্রন্থে নারী পুরুষের সমান অধিকারের বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যায়। বঙ্কিম এখানে নারী পুরুষের সমানাধিকারের কথা যেমন বলেছেন, তেমনি বিধবার বিবাহ সম্পর্কে পরস্পর স্ববিরোধী কথা বলেছেন —

"...... বিধবা বিবাহ ভাল কি মন্দ, এটি স্বতন্ত্র কথা। তাহার বিবেচনার স্থল এ নহে। তবে ইহা বলিতে পারি যে, কেহ যদি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, স্ত্রী শিক্ষা ভাল কি মন্দ? সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিত হওয়া উচিত কিনা আমরা তখনই উত্তর দিব স্ত্রী শিক্ষা অতিশয় মঙ্গলকর, সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হওয়া উচিত. কিন্তু বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে আমাদিগকে প্রশ্ন করিলে আমরা সেরূপ উত্তর দিব না। আমরা বলিব বিধবাবিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে, সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভালো নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল।"

(সাম্য, বঙ্কিমরচনাবলী, দ্বি.খন্ড পৃ. ৪০১)

এই অভিমতের মধ্যে যতটা নারী পুরুষে সমানাধিকারের কথা আছে তার চেয়ে স্ববিরোধী ভাবনাই ব্যক্ত হয়েছে। উপরন্তু তিনি এ-ও বলেছেন "যে স্ত্রী সাধ্বী-পূর্ব পাতকে

আন্তরিক -ভালোবাসিয়াছিল, সে কখনই পুনর্ব্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না।" (তদেব)। এর মধ্যেও একটা নীতি বোধের সেন্টিমেন্টকে ব্যবহার করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এরই বিষময় পরিণতি আমরা দেখি 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) উপন্যাসেও। সেখানে বিধবা রোহিণীকে গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলিতে মরতে হয়েছিল। বিধবা রোহিণীর দেহজ কামনা গোবিন্দলাল-ভ্রমণের দাম্পত্য জীবনকে বিনষ্ট করেছে। নগেন্দ্রনাথের মত গোবিন্দলাল রোহিণীকে বিয়ে করেনি, তাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে এবং রিপুর তাড়নায় গোবিন্দলাল দাম্পত্য ধর্মের শুচিতাকে গলাটিপে হত্যা করেছে। অল্পকালের মধ্যেই রোহিনী সম্পর্কে তার মোহ দূর হয়ে গেছে। রোহিণীকে নিষ্ঠুর মৃত্যু দিলেও গোবিন্দলাল তার স্ত্রী ভ্রমরকে আর ফিরে পায়নি। ভ্রমরের হৃদয় যন্ত্রণা অবসান হল মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। আর গোবিন্দলাল সন্ন্যাস জীবনের মধ্যে 'ভ্রমরাধিক' শান্তি পেতে গিয়ে আত্মপ্রতারণা করল। রোহিণীর এই মৃত্যু নিয়ে উত্তরকালে শরৎচন্দ্র প্রশ্ন তুলেছিলেন, সমাজনীতিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে রোহিণীকে মৃত্যুর জন্য কার দায় ছিল? যদিও মোহিতলাল মজুমদার শরৎচন্দ্রের বক্তব্যের বিরোধিতা করে বঙ্কিমচন্দ্রের সপক্ষেই সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মভাবে রোহিণী চরিত্রটি বিশ্লেষণ করেছিলেন। আবার অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও রোহিণীর পরিণতির ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছিলেন—

" যাঁহারা রোহিণীকে অপঘাত মৃত্যু ঘটাইবার জন্যে বঙ্কিমকে হৃদয়হীনতার জন্য অপরাধী করিয়াছেন তাঁহারা রোহিণী সমস্যার কোনো উৎকৃষ্টতর সমাধান নির্দেশ করিতে পারেন নাই। রোহিণী বাঁচিয়া থাকিলে হীরাদাসীর পর্যায়ে নামিয়া যাইত। তাহার মৃত্যু অন্ততঃ তাহাকে এই অবণতি হইতে রক্ষা করিয়াছে। রোহিণীর অপমৃত্যু তাহার কলঙ্কিত ভোগসর্বস্ব প্রেমের স্বাভাবিক ও অপরিহার্য মৃত্যু ইহাতে নীতির কোনো অনুচিত প্রভাব নাই, আছে সূক্ষ্মতর বিশ্ববিধানের সহিত সহজ সঙ্গতি। *(বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ.১২৮)*

একইভাবে যতই বিতর্ক হোক না কেন, একথা নি:সন্দেহে বলা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্র যতটা রক্ষণশীল ও নীতিবাগিশ ছিলেন ততখানি শিল্পীর নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাংলা উপন্যাসের গতিধারা যখন প্রায় রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল সেই সময় রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস সাহিত্যে নতুন ক'রে গতিসঞ্চার করে তাকে নতুন পথে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। আসলে তাঁর অনন্য সাধারণ প্রতিভার স্পর্শে পাষাণী অহল্যার মতো বাংলা উপন্যাসের দীর্ঘ ঘুমের অবসান ঘটে যায়। বাংলা উপন্যাস নব কলেবরে প্রবাহিত হতে শুরু করে। এ বিষয়ে সমালোচক অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন —

"বঙ্কিমচন্দ্রের পরে উপন্যাসে যে গভীরতর বাস্তবতা পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহার প্রথম সূচনা রবীন্দ্রনাথেই পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথই প্রতিভার পূর্বজ্ঞান বলে বঙ্কিম প্রবর্তিত উপন্যাসের ধ্বংসোন্মুখতা উপলব্ধি করিয়া উপন্যাসের ভিত্তিকে রোমান্স ও ইতিহাসের চোরাবালি হইতে সরাইয়া বাস্তব জীবনের দৃঢ়ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ও তাহাকে অসাধারণত্বের অনুসন্ধান হইতে ফিরাইয়া আনিয়া প্রাত্যহিক জীবনের সূক্ষ্ম ও রসপূর্ণ

বিশ্লেষণের কাজে লাগাইয়াছেন।" *(তদৈব পৃ.১৩৭)*

এই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূলত: কবি। তাঁর কিশোর কবিমনকে প্রথম যিনি প্রভাবিত করেছিলেন তিনি বিহারীলাল চক্রবর্তী—বাংলা গীতিকবিতার 'ভোরের পাখি'। তাঁকে রবীন্দ্রনাথ গুরুপদে বরণ করেছিলন সেই কিশোর বয়সে। কেন না বিহারীলালের কাব্যের গভীর আবেগ,তীব্র রোমান্স আর সুদৃঢ় সঞ্চরণের অভিলাষ রবীন্দ্রনাথকে নাড়া দিয়েছিল। এরপর মধুসূদন দত্তের কালসিক কাব্যের গভীরে ডুব দিয়ে তিনি আরও বেশী বসাস্বল দান করেছেন এবং আপন সৃষ্টিধারায় তা ছড়িয়ে দিয়েছেন। এরই পাশাপাশি অবশ্য ১৮৭২ খ্রী থেকে প্রকাশিত বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাটি বাংলাদেশের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র হৃদয়ও লুট করে নিয়েছিল। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন —

"... এমন সময়ে বঙ্গদর্শন মাসিকপত্র দেখা দিল। তখন থেকে বাঙালির চিত্তে নব্য বাংলা সাহিত্যের অধিকার দেখতে দেখতে অবারিত হল। ইংরাজি ভাষায় যাঁরা প্রবীন তারাও একে সবিস্ময়ে স্বীকার করে নিলেন।"*(বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, সাহিত্যের পথে; বিশ্বভারতী, পৃ. ২৫৫)*

এইভাবে রবীন্দ্রনাথের শৈশবেই বঙ্কিম উপন্যাসের জগতে প্রবেশ নিশ্চিত হয়েছিল। তাঁর চেতনার পরিস্ফূরণের সাথে সাথে তিনি দেখেছেন অন্ত:পুরে বটতলার ফাঁকে ফাঁকে 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুন্ডলা' 'মৃণালিনী ইত্যাদি স্বর্ণসম্পদ। তবে ওইসব সম্পদ ঘেঁটে রবীন্দ্রনাথ খুব বেশীকাল আবদ্ধ থাকলেন না। অচিরেই তিনি হয়ে উঠলেন পরবর্তী বাংলা কথাশিল্পের দিক নির্দেশক। বাস্তবিক উপন্যাসের একদিকে যেমন থাকে জীবনের জটিলতা, অন্যদিকে তেমনি আত্মপ্রকাশ করে সচেতন মন। জীবন সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের সামগ্রিকবোধ নির্ভর করে তাঁর জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ধ্যান-ধারণার উপর। এই জীবন আবার নিয়ত রূপান্তর প্রবণ। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক ও বিরোধও পরিবর্তনশীল। তাই প্রতি মূহূর্তের পরিবর্তনশীল সমাজ-সভ্যতার বৃহৎ দায় ব্যক্তি কেমন করে বহন করেছে তার রূপায়ণও ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব। ব্যক্তি মানুষ সমাজ পরিবেশের আঘাতে যে যন্ত্রণা অনুভব করছে, যে যন্ত্রণা তার অস্তিত্বের যন্ত্রণা — তা নি:সন্দেহে উপন্যাসের বিষয়। বিষয়বস্তু সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের বোধ, চেতনার বিস্তার এবং গভীরতা উপন্যাসের প্রতিটি অংশেই অভিব্যক্তি লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে সঞ্চার করেছেন এক নতুন আত্মবিশ্বাস, এক নতুন শিল্পচেতনা — যার ফলে 'রিয়ালিটি' সম্পর্কে আমাদের ধারণা বদলে যায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ জীবনধারায় (১৮৬১ - ১৯৪১) প্রায় অর্ধ- শতাব্দী কালের ব্যবধানে ছোটো বড়ো মিলিয়ে মোট ১৩টি উপন্যাস লিখেছেন। এদের মধ্যে অবশ্য 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'কে ধরা হয় নি। নিতান্ত কিশোর বয়সের অপরিণত প্রয়াস 'করুণাকে বাদ দিলে আর পূর্বসুরী বঙ্কিমচন্দ্রের ছায়ারেখা অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিকে বিষয়ভাবনার নিরীখে বিভাজন ক'রে এইগুলির ওপর আলোকপাত করা যায় —

- ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস :

'বৌঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩)
'রাজর্ষী' (১৮৮৭)

- জীবনসমস্যা মূলক উপন্যাস —
  'চোখের বালি' (১৯০৩)
  'নৌকাডুবি' (১৯০৬)
  'যোগাযোগ' (১৯২৯)
- বৃহত্তর রাজনৈতিক ভাবনার ফসল —
  'গোরা (১৯১০)
  'ঘরে বাইরে' (১৯১৬)
  'চার অধ্যায়' (১৯৩৪)

রোমান্টিক ও তত্ত্বমূলক উপন্যাস :
'চতুরঙ্গ' (১৯১৬)
'শেষের কবিতা' (১৯২৯)
'দুইবোন' (১৯৩৩)
'মালঞ্চ' (১৯৩৪)

উপন্যাসে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তত্ত্বকথার বৃত্তভেঙ্গে জীবন সমস্যার গভীরে অবগাহনের জন্যে রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল সময় নিয়েছিলেন। 'রাজর্ষী' (১৮৮৭) থেকে 'চোখের বালি (১৯০৩) দীর্ঘ১৬ বছর ধরে তিনি কোনো উপন্যাস লিখলেন না। এই সময় তিনি নিজের মত করে উপন্যাস লেখার জন্যে প্রস্তুতি পর্ব রাখলেন। অন্তবর্তীকালীন এই সময় টুকুতে তিনি অসংখ্য ছোটোগল্প লিখেছেন। যেন অনেকটা সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাবার জন্যে সলতে পাকানো। মাঝের সময়কাল গুলোতে তিনি এই ছোটোগল্প লেখা প্রসঙ্গে চোখের বালি উপন্যাসের 'সূচনা' অংশেই লিখেছেন —

" .... এরপূর্বে মহাকায় গল্প সৃষ্টিতে হাত দিইনি। ছোটোগল্পের উল্কাবৃষ্টি করেছি। ঠিক করতে হল এবারকার গল্প বানাতে হবে এযুগের কারখানা ঘরে। শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনো হত, এখনো হয়, তবে কীনা তার ক্ষেত্র আলাদা; অন্তত গল্পের এলাকার মধ্যে।" *(রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয়খন্ড, পৃ. ৩৭৩)*

এই উল্কাবৃষ্টি কালেই ১৯০১ খ্রী. প্রকাশিত হয়েছিল 'নষ্টনীড়' গল্পটি। এটি একটি তরতাজা প্রেমের গল্প। বড়লোকের ছেলে ভূ-পতি তার তরুণী স্ত্রী চারুলতাকে নিয়ে সুখে-দুঃখে ঘর-সংসার করছিল। এই সময় বাড়ীতে আসে ভূ-পতির পিসতুতো ভাই অমল। চারুর সঙ্গে অমলের ঘনিষ্টতা বাড়ে। এর কারণ ছিল ভূ-পতি যখন তার খবরের কাগজ বের করার কাজে ডুবে ছিল, তখন মাঝখান দিয়ে অনেকটা সময় বয়ে গেছে।' রবীন্দ্রনাথ এই সময়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন —

" যে সময়ে স্বামী স্ত্রী প্রেমোন্মেষের প্রথম অরুনালোকে পরস্পরের কাছে অপরূপ

মহিমায় চিরনূতন বলিয়া প্রতিভাত হয়, দাম্পত্যের সেই স্বর্ণপ্রভামন্ডিহত প্রত্যুষকাল অচেতন অবস্থায় কখন অতীত হইয়া গেল কেহ জানিতে পারিল না। নূতনত্বের স্বাদ না পাইয়াই উভয়ে উভয়ের কাছে পুরাতন অভ্যস্ত হইয়া গেল।" *(গল্প গুচ্ছ, বিশ্বভারতী, ১৯৭৬, পৃ.৪৫৪)*

তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙনের গল্পই হল 'নষ্টনীড়'। শেষ পর্যন্ত অমল চলে গেলেও চারু-ভূপতির নীড় নষ্ট হয়েছে। এই নীড় নষ্টেরই এক ভিন্নতর প্রকাশ লেখকের 'চোখের বালি'তে (১৯০৩) আমরা প্রত্যক্ষ করি। তবে দীর্ঘ ১৬ বছরের ব্যবধান কেন প্রয়োজন ছিল তা জানি না। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য উপন্যাসের 'সূচনায়' একটা কৈফিয়ৎ দিয়েছেন নিজের মত করে। তিনি লিখেছেন —

"আমার সাহিত্যের পথযাত্রা পূর্বপর অনুসরণ করে দেখল ধরা পড়বে যে, 'চোখের বালি' উপন্যাসটি আকস্মিক, কেবল আমার মধ্যে নয়, সেদিনকার বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে। বাইরে থেকে কোন্ ইশারা এসেছিল আমার মনে, সে প্রশ্নটা দুরূহ।" *(তদেব, দ্বিতীয় খন্ড, ৩৭৩)*

রবীন্দ্রনাথের এই কথা থেকে পরিস্কার যে, এখান থেকেই রবীন্দ্র উপন্যাসের শুধু নয়, বাংলা উপন্যাসেরও একটা নতুন পথ পরিক্রমার সূচনা। ইতিপূর্বে বিষয়বস্তু, প্রকাশভঙ্গি ইত্যাদির যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন এখানে এসে তার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়েছে। এখান থেকেই বাংলা উপন্যাস যাবতীয় প্রতিকূলতা কাটিয়ে আধুনিক হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের এই আধুনিকতার শীর্ষভূমিতে পৌছানোর ক্ষেত্রে যে দিকগুলি গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল —

সমকালীন সমাজ পরিবেশে যে আধুনিকতার ধারাপাত ঘটছে সেই রূপটিকে উপন্যাসের পটভূমিতে গ্রহণ করা।

চড়াই-উৎরাই শূন্য নিরন্তর নিস্তরঙ্গ জটিলতাহীন সহজ সরল চিত্রের পরিবর্তে নানা সমস্যা কন্টকিত জটিল রূপকে উপন্যাসের কাহিনীতে স্থাপন।

নিছক ঘটনা পরম্পরা নয়, মানব চরিত্রের অন্তগর্ত প্রবৃত্তি প্রবনতা গুলিকে যথাযথভাবে তুলে ধরা।

আধ্যাত্মিক ভাব কল্পনা ও অলৌকিতার পরিবর্তে যুক্তিবাদী ভাবনা, সন্দেহবাদ, ঈশ্বরে বিশ্বাস, না-বিশ্বাসের সনাতন পথ পরিহার করে মানুষকে মানুষের স্বরূপে তুলে ধরা।

নরনারীর গতানুগতিক সম্পর্কের কৌণিকতা ভেঙ্গে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক গুলোর মূল্যায়ণ থাকা দরকার।

গতানুগতিক ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের গন্ডী ভেঙ্গে ব্যক্তি মানুষ নিজেকে তুলে ধরবে— তাতে সমাজ ধর্মের সঙ্গে তার সংঘাত অনিবার্য হবে জেনেও।

বিষয়ের পাশাপাশি প্রকাশভঙ্গির ক্ষেত্রেও নতুন দিক, বিশেষ করে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিকটিতে প্রাধান্য দিয়ে বিশ্বাসযোগ্যতা স্থাপন। এইসব আধুনিক ভাবনার বৃত্ত গড়ে রবীন্দ্রনাথ

'চোখের বালি'কে বাংলা উপন্যাসের পথে একটা মাইল ফলক করে প্রতিষ্ঠা দিলেন। উপন্যাসটির 'সূচনা' অংশের একেবারে শেষে তিনি নিজেও ঘোষণা করেন —

"সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।" (তদেব)

নব পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় উপন্যাসটি 'বিনোদিনী' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথ নামকরণ করেন 'চোখের বালি'। বাল্যবিধবা বিনোদিনীর চিত্তে পুরুষের প্রতি দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার জাগরণ এবং তার মানসিক পরিবর্তনের টানাপোড়েন উপন্যাসের মূল উপজীব্য। এর কাহিনীতে আশা-মহেন্দ্রকে, মহেন্দ্র-বিনোদিনীকে, বিনোদিনী-বিহারীকে আর বিহারী আশাকে ভালোবাসে। ফলে এক জটিলতাময় চমৎকার প্রণয়বৃত্ত রচিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিনোদিনীর কাশী যাত্রার মধ্যদিয়ে উপন্যাসে বাঞ্ছিত শান্তি দিয়ে এসেছে। অবশ্য বিনোদিনীর এই পরিণামকে নিয়ে নানা ভাবে সমালোচনার ঝড় বয়ে গেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সমালোচনা করেছিলেন কবি ও সমালোচক বুদ্ধদেব বসু। তিনি দেখিয়েছেন উপন্যাসটির দুটি পরিণতি হতে পারত — মহেন্দ্র ও বিনোদিনীর মিলনে মহেন্দ্রর পারিবারিক বিপর্যয় কিংবা বিহারী বিনোদিনীর বিবাহ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সাহস করে এগিয়ে গেলেও ভয়ে পিছিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথও এই পরিণতির জন্য 'নিন্দা'র দ্বারা প্রায়শ্চিত্তের কথা বলেছেন। আসলে মানুষ রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর পরিণাম নিয়ে মনে মনে অনুতাপ করলেও তিনি শিল্পীর নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে গিয়ে সিদ্ধান্ত বদলান নি। কেউ কেউ আবার বলেছেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যেহেতু বিধবা বিবাহ পছন্দ করতেন না তাই তাঁর জীবিতকালে রবীন্দ্রনাথ বিধবা বিনোদিনীর বিয়ে দেননি। এই ধরনের দুর্বল সমালোচনার জবাবে ড. সুকুমার সেন যথার্থই লিখেছেন—

" পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবেন এই ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ চোখের বালি গল্পের 'স্বাভাবিক পরিণতি ঘটিতে দেন নাই' এমন কল্পনা যাঁহারা করেন তাঁহারা রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিটিকে মোটেই বুঝিতে পারেন নাই এবং তাঁহার শিল্প অনুধাবনেও তাঁহাদের মনোযোগ নাই।" *(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থখন্ড, পৃ. ৩২৪)*

উপন্যাস হিসেবে 'নৌকাডুবি' (১৯০৬) তরল রোমান্স আশ্রয়ী। রমেশ নামে এক যুবক নৌকাডুবির পর কোনরকমে রক্ষা পায়। জ্ঞান ফিরে এলে সে দেখে তার কাছে কমলা নামে এক অপরিচিতা নববধূ যে সদ্য বিবাহিতা এবং বিয়ের রাতে স্বামীকে দেখেনি — সেও পড়ে আছে। কমলা রমেশকেই স্বামী মনে করে এবং ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করতে চায়। কিন্তু রমেশ জানত কমলা তার স্ত্রী নয়। এবং সে হেমনলিনী নামে একটি মেয়েকে ভালোবাসে। কমলার স্বামী হল নলিনাক্ষ। শেষপর্যন্ত নানা ঘটনার টানাপোড়েনের পর কমলা ও নলিনাক্ষের পুনর্মিলন ঘটে আর রমেশ হেমনলিনীর জীবন ট্র্যাজেডির অন্ধকারেই ডুবে থাকে। এই জাতীয় পরিণতি অত্যন্ত আজগুবি। এই উপন্যাস মহাকবির

হাতের দুর্বল সৃষ্টি। ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত উপন্যাসটি সম্পর্কে বলেছেন —

" উঁচু শিল্পকর্মরূপে এ রচনা গ্রাহ্য হতে পারে না। নায়ক চরিত্রটি বিবর্ণ। যে সমস্যার সামনে সে পড়েছে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার বা তার দ্বারা গভীরভাবে আলোড়িত হবার মত ব্যক্তিত্ব রমেশের নয়। ... মাঝে মাঝে বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের হাতের স্পর্শ অনুভব করা গেলেও উপন্যাস হিসাবে এ গ্রন্থের স্থান খুব উচ্চে নয়।" *(বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, গ্রন্থনিলয় ২০০০, চতুর্থ-সংস্কারণ, পৃ ৩৮৪)*

'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'তিন পুরুষ' নামে যে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল পরে তার নামকরণ হয় 'যোগাযোগ'। সমকালে জলধর সেন 'তিন পুরুষ' নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন আর এটি শেষপর্যন্ত তিনটি প্রজন্মের গল্প নয় বলে এরূপ নানা পরিবর্তন। মধুসূদন ও কুমুদিণীর বিড়ম্বিত দাম্পত্য জীবনের অশান্তি এবং তার পরিণাম এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। হঠাৎ ধনাগমে স্ফীত শিক্ষা সংস্কৃতি বর্জিত মধুসূদন আর মার্জিত আভিজাত্যে বর্ধিত পড়তি ঘরের মেয়ে কুমুদিণী বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হল। কুমুদিণীর দাদা বিপ্রদাসের শিক্ষা-সংস্কৃতি রুচি ও আভিজাত্যবোধ মধুসূদনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে ভরসা যুগিয়েছে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কুমুদিনী যখন জানতে পারল সে মা হতে চলেছে তখন আর সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারেনি। এই দাম্পত্য জীবনের দ্বন্দ্ব সংঘাতের মূল্যায়ন করে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন —

"চরিত্র বিশ্লেষণের দিক দিয়া মধুসূদন কুমুদিনীর চরিত্র বৈপরীত্য ও তাহাদের প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বের বর্ণনা খুব উচ্চাঙ্গের হইয়াছে। ..... বহির্জগতের মত অন্তর্জগতের সংঘর্ষের যদি কোনো বাহ্য লক্ষণ থাকিত, তাহা হইলে মধুসূদন কুমুদিনীর মিলন মূহূর্তে ধূমকেতু পুচ্ছপৃষ্ঠ সৌরজগতের ন্যায় একটা প্রলয়কারী অগ্ন্যুৎপাত হইতা হাতে সন্দেহ নাই ।" *(তদেব, পৃ. ১৭২)*

রবীন্দ্রসৃষ্টি ধারায় নারীকে আমরা মূলত: দুইরূপে পাই — প্রিয়া এবং জননী। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর 'দুইবোন' উপন্যাসটির শুরুতেই 'শর্মিলা' অংশে জানিয়েছেন—

"মেয়েরা দুইজাতের, কোনো কোনো পন্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি।

একজাত প্রধানত মা, আর একজাত প্রিয়া।

ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বর্ষাঋতু। জলদান করেন, ফল দান করেন, নিবারণ করেন তাপ। ... আর প্রিয়া বসন্ত ঋতু। গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র।" *(রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৪২৭)*

মূলত: এই তত্ত্ব 'দুইবোন' এবং 'মালঞ্চ' উপন্যাসের উপজীব্যা 'চতুরঙ্গ-এর মতোই চারটি চরিত্রের বক্তব্য নিয়ে 'দুইবোন' এর কাহিনী রচিত। এরা হল শর্মিলা, নীরা , উর্মিমালা আর শশাঙ্ক। আপাতদৃষ্টিতে চতুর্ভূর্জ থাকলেও এই উপন্যাস আসলে ত্রিভুজ প্রেমের। শর্মিলা-উর্মিমালা আর শশাঙ্ক কেন্দ্রিক। নি:সন্তান শর্মিলার সমস্ত চিন্তা ছিল স্বামী শশাঙ্ককে ঘিরে। শশাঙ্ককে সমস্ত আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করার ভার সে নিজের হাতে তুলে

নিয়েছিল। পরিচিত কক্ষপথে শর্মিলার অসুস্থতার পথ ধরে সংসারে আসে তার বোন উর্মিমালা। পারিবারিক হাস্য-পরিহাস সম্পর্কের ছদ্মবেশে শশাঙ্ক আর উর্মিমালার মধ্যে গড়ে উঠেছে গোপন প্রণয়। প্রথমে কেউ আঁচ না পেলেও পরে শশাঙ্ক টের পেয়েছে এবং শশাঙ্ক উর্মিমালা নিজেরা অবহিত হয়েছে সম্পর্কের পরিনতি সম্পর্কে। অন্যদিকে মালঞ্চ উপন্যাসে নীরজা-সরলা আর আদিত্যের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষের টানা-পোড়েনকে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। উপন্যাস দুটির আলোচনা প্রসঙ্গে ড. ক্ষেত্রগুপ্ত লিখেছেন —

"রবীন্দ্রনাথের কোনো দুটি উপন্যাসে এত মিল নেই। এর সঙ্গে তুলনা চলে বিষবৃক্ষ আর কৃষ্ণকান্তের উইলর। বহিরঙ্গ সাদৃশ্যের আপাতদৃষ্টিতে একই ধরনের অবস্থা ও সমস্যা, কিন্তু মানুষগুলি স্বতন্ত্র হওয়ায় সমস্যার রূপ বদলে যায়। লেখকের সেই খোঁজ একই ধরণের দুটি বড় লেখার ভিত্তিতে কাজ করে থাকবে।' *(বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, ২য় খন্ড, গ্রন্থনিলয়, ২০০১, পৃ,৪১৫)*

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনে যা কিছুই লিখে থাকুন না কেন, তাঁর ভিন্ন পরিচয় খুব বেশী প্রয়োজন পড়ে না - তিনি মূলত: কবি, কাব্যিক ভাব রসেই তাঁর আত্মার মুক্তি ঘটেছে। যথার্থ উপন্যাস রচয়িতার যে ধরণের বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করার দিকে প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ সচরাচর সে পথে হাঁটেন নি। ফলে তাঁর অনেক উপন্যাসেই বাস্তব চিত্রগুলি কল্পনার রংয়ে রঙীন হয়ে উঠেছিল।

❑ রবীন্দ্র পরবর্তীকালে বাংলা উপন্যাসে একটি অনিবার্যভাবে উচ্চারিত নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৮-১৯৩৮)। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের কথা মনে রেখেও বলা যায়, শরৎচন্দ্রই প্রথম বাঙালী পাঠকের মনের মণিকোঠায় পৌঁছতে পেরেছিলেন। তিনিই প্রথম দেখিয়েছেন উপন্যাস শুধু গল্প বলা নয়, তার চেয়ে অনেক কিছু বেশী। উপন্যাস জীবনের কথা বলে, জীবনের নানা টানা পোড়েন জ্বালা-যন্ত্রণার কথা তুলে ধরে। জীবন যন্ত্রণার অভিঘাতে জর্জরিত মানুষের কাছে উপন্যাস মানে শুধু ড্রয়িংরুমে বসে পড়া কোনো জমজমাট গল্প নয়। অর্থাৎ শরৎচন্দ্র নিছক 'কলাকৈবল্যবাদী' নীতিতে বিশ্বাস করতেন না। তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন সাহিত্যিকে যদি সমাজের একেবারে নীচু তলায় পৌঁছে না দেওয়া যায়, তাহলে তা কখনোই সর্বজনীনতা পেতে পারে না। সারা পৃথিবী যখন বিজ্ঞানের হাত ধরে মধ্যযুগীয় সব পুরনো ধ্যান-ধারণা বর্জন করে সার্বিক উন্নয়ণের দিকে এগিয়ে চলেছে তখনো এদেশের বেশীর ভাগ মানুষ নানা জপতপ, মন্ত্রতন্ত্র পুরাণের নানা অলৌকিক কাহিনী ইত্যাদির উপর নির্ভর করে তাদের জীবনপথ পাড়ি দিচ্ছে। সেই আলো -আঁধারি সময়ে দাঁড়িয়ে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত দরদী মন নিয়ে নির্মম বাস্তব কাহিনী তুলে এনে মানুষের বহমূল্য ধারণাকে ভাঙতে সচেষ্ট হয়েছেন। যা কিছু সনাতন, যা কিছু প্রাচীন জীর্ণ সেইসব কিছুকে ভেঙে তিনি নতুন করে ভারতীয় জীবনধারায় আধুনিকতার মুক্ত বাতাস বইয়ে দিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যরচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

"সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখন হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না, সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই — এদের কাছেও কি ঋণ আমার কম? এদের বেদনাই দিলে আমরা মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে।"

এই বক্তব্যের মধ্যেই সমাজের নীচুতলার মানুষদের জন্যে শরৎচন্দ্রের দরদ যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি সমাজ ব্যবস্থার পটপরিবর্তনেরও একটা সুর শোনা যায়। এহেন শিল্পীর উপন্যাসগুলিকে বিষয়ের নিরীখে শ্রেণীকরণ করতে গিয়ে সমালোচকেরা বিভিন্ন কৌণিকতার সৃষ্টি করেছেন। 'বড়দিদি' (১৯১৩) থেকে 'নববিধান' (১৯৩৮) — তাঁর উপন্যাস গুলিকে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে ছয়টি ভাগে ভাগ করেছেন —

- প্রেম-বর্জিত পারিবারিক বিরোধ চিত্র
- সমাজবিধির প্রাধান্য চিহ্নিত দাম্পত্য প্রেম ও বিরোধ কাহিনী।
- সমাজ সমালোচনামূলক উপন্যাস
- পূর্বরাগ পুষ্ট মধুরান্তিক প্রেম
- নিষিদ্ধ সমাজবিরোধী প্রেম এবং
- মতবাদ প্রধান ও পূর্বানুবৃত্তিমূলক উপন্যাস।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাসেই বাঙালী পরিবারের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, পরিবারের মানুষগুলির নানা দোলাচলবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুত শরৎচন্দ্র ছিলেন বাঙালীর পারিবারিক জীবনের রূপকার। বাংলাদেশের হতদরিদ্র, নিম্নবিত্ত, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত এবং ধনী মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেছেন। সেই অভিজ্ঞতাকে তিনি নিপুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন। এই অভিজ্ঞতার ফসল পারিবারিক ও দাম্পত্য সমস্যা মূলক উপন্যাসগুলি। প্রসঙ্গত লেখকের মানসিকতার মূল সুরটি ব্যক্ত হয়েছে অধ্যাপক জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনায়। তিনি লিখেছেন —

"বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের মতো মননশীল পাঠকের চেয়ে সাধারণ পাঠককুলের কাছে, পৌঁছানোই শরৎচন্দ্রের অধিকতর পছন্দ ছিল। কাজেই এই শ্রেণীর পাঠকের মর্মমূলে সহজে আলোড়ন তোলার জন্যই পারিবারিক জীবনের 'ডিটেলে'র উপর তিনি কাজ করতে চেয়েছেন।" *(শরৎসাহিত্যে ব্যক্তি ও সমাজ, করুণা প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ.২৯)*

লেখক দেখিয়েছেন কেমন করে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে একান্নবর্তী পরিবারগুলো ভেঙে যাচ্ছে। তাঁর 'নিষ্কৃতি', 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'শুভদা', 'অবক্ষণীয়া' প্রভৃতি গল্প উপন্যাসে এই ভাঙনের চিত্র আমরা পাই। 'নিষ্কৃতি' উপন্যাসে দেখি, নিজেদের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত দুই আইনজীবী ভাইয়ের সংসারে সংকট। এই সংকটেরই এক ভিন্নরূপ 'রামের সুমতি'। 'বিন্দুর ছেলে' কিংবা 'বৈকুণ্ঠের উইল' উপন্যাস। পারিবারিক

টানা পোড়েনের গল্প হিসেবে প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাস হল — 'বিরাজ বৌ', 'পন্ডিতমশাই', 'অবক্ষণীয়া', এবং 'শুভদা'কে চিহ্নিত করা যায়। 'বিরাজ বৌ' উপন্যাসটিকে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'শ্রেষ্ঠ গল্প' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই উপন্যাসে লেখক বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর মতোই চিরাচরিত পথেই দাম্পত্য সম্পর্কের টানা পোড়েনকে অংকন করেছে। এ বিষয়ে ড. অশ্রুকুমার সিকদার লিখেছেন—

"শুভদা ও বিরাজ বৌ' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র সামন্ততান্ত্রিক ভারতের হিন্দু আর্দশের সতী স্ত্রীর চরিত্র এঁকেছেন, যে স্ত্রী ও সর্ব সময়ে সর্ব অবস্থায় স্বামীর অনুগামী।"

(আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুনা প্রকাশনী, পৃ. ৮৭)

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস প্রধানত: ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। সেই গ্রামকেন্দ্রিক জীবনের এক অনবদ্য দলিল 'পন্ডিতমশাই' উপন্যাসটি। এতে পূর্বে বিবাহিতা ও পরিত্যক্তা স্ত্রীকে পুন গ্রহণের পাশাপাশি গ্রাম সমাজের ছবিও ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। আবার পারিবারিক জীবন প্রবাহেরই একটি বিশেষ পর্যায় দাম্পত্য বিরোধ। এরকমই দাম্পত্য বিরোধের উপন্যাস 'গৃহদাহ' (১৯২০)। এতে হিন্দু ও ব্রাহ্মদের প্রাথমিক দ্বন্দ্বের পথ ধরে দাম্পত্য জীবনের মধ্যে তৃতীয় পুরুষের উপস্থিতিতে ট্রাজেডি ঘনীভূত হয়েছিল। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের বিমলার মত অচলা স্বামী নাকি স্বামীর বন্ধু সুরেশ —এই দুজনের মধ্যে শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। বিমলা শেষপর্যন্ত স্বামীর কাছে ফিরে এলেও অচলার জীবন ট্রাজেডির অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল। এর মূল্যায়ণ করে সমালোচক ড: সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখেছেন —

"…. অচলার জীবনে ছিল একটা মূলীভূত অসঙ্গতি। সুরেশের ভালোবাসা ছিল তাহার বিড়ম্বনা, তাহার সম্পদ, তাহার সম্বল। ইহাতে অগৌরব থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে মিথ্যার ফাঁকি নাই। নারী হৃদয়ের এই যে বিরোধ ও অসঙ্গতি ইহার বিশ্লেষণেই শরৎচন্দ্রের বিশেষত্ব।"

(শরৎচন্দ্র, এ মুখার্জি এন্ড কোং, কলকাতা, ২০০০, সপ্তদশ সংস্করণ)

শরৎচন্দ্র ছিলেন যতটা শিল্পী, ততোটাই সমাজ সংস্কারক। মার্কসবাদী চিন্তাবিদ্ শিবদাস ঘোষ এই সমাজ সংস্কারকের মূল্যায়ণ করতে গিয়েই লিখেছেন —

" … আমাদের দেশে সাহিত্যের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রই একমাত্র সাহিত্যিক, যিনি তখনকার দিনে সমাজ বিপর্যয়ের ঝান্ডাকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। সমাজ বিপ্লবের কর্তব্য সম্পাদন করার জন্যে একনিষ্ঠভাবে লড়েছেন।"

(শরৎমূল্যায়ণ প্রসঙ্গে, পৃ. ৯)

মূলত তিনটি উপন্যাসে লেখকের এই ভাবনার বহি:প্রকাশ ঘটেছে। 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬), 'বামুনের মেয়ে' (১৯২০) এবং 'দেনাপাওনা' (১৯২০)। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য দেনাপাওনার পরিবর্তে 'অবক্ষনীয়ার' (১৯১৬) কথা বলেছেন। শরৎচন্দ্র শুধুই সমাজ শক্তির কেন্দ্র বিন্দুটিকে স্পষ্ট করেন নি, এর পোষণ ও সমর্থনের স্বার্থপুষ্ট অংশটিরও উন্মোচন করেছেন। তিনটি উপন্যাসেই তিনি সামাজিক ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে

খড়্গহস্ত হয়েছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গত লিখেছেন —

"'অরক্ষণীয়া', 'বামুনের মেয়ে' ও 'পল্লীসমাজ' —এই তিনটি উপন্যাসে সামাজিক অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাদের মধ্যে যে সামান্য রকমের প্রণয়চিত্র আছে, সমাজের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতাকে ফুটাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই তাহাদের অবতারণা করা হইয়াছে।" (তদেব, পৃ ২৪১)

'ভালোবাসো প্রেমে হও বলি, চেয়ো না তাহারে' — এই প্রেম মধ্যবিত্তের কাছে প্রকৃস্ট ভাববিলাসের উপাদান। যা অনির্বচনীয়, যা দুরধিগম্য যা বিমূর্ত তার প্রতি মধ্যবিত্তের অন্তরের টান অত্যন্ত প্রবল। প্রেমের অনতিস্পস্ট চেহারাটিকে ঘিরেই মধ্যবিত্তের রোমান্টিক কল্পনার পরিমাণ সর্বাধিক। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে এই প্রেমের মূলত: দুটি বিশেষ দিক ধরা পড়েছে। মধুর প্রেম ও সমাজ নিষিদ্ধ প্রেম। এই ধারার উপন্যাস হল বড়দিদি '(১৯১৩), 'দত্তা' (১৯১৮), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'পরিনীতা' (১৯১৮), 'দেবদাস' (১৯১৭) , 'বিপ্রদাস (১৯৩৫), ইত্যাদি। তবে লেখকের সবচেয়ে বিতর্কিত উপন্যাস 'শেষপ্রশ্ন' (১৯৩১)। উপন্যাসটির আলোচনা প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেন লিখেছেন —

"বইটি উদ্দেশ্য লইয়া লেখা। তবে সে উদ্দেশ্য আগেকার উদ্দেশ্য নয় — সাধারণ পাঠক ভোলাইবার জন্য লেখা নয়। তবে ইহাও টেক্কা দিবার জন্য লেখা —'অতি আধুনিক সাহিত্যিকদের।' (তদেব, পৃ ২২৮)

চারখন্ডে বিভক্ত লেখকের আত্মস্মৃতিমূলক উপন্যাস 'শ্রীকান্ত'। শ্রীকান্তের সঙ্গে রাজ-লক্ষ্মীর সম্পর্কের টানাপোড়েনসহ জীবনের বিচিত্র দিক এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মেয়েদের জীবনের মূল্য জলের মতই। কেন না তাদের অভাব বোধ করে না সমাজ। তাই মেয়েদের আত্মহত্যা করা ছাড়া অন্যপথ খোলা থাকে না। কিংবা আত্মসম্মান নিয়ে সমাজবৃত্তের বাইরে গিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করতে হয়। তাইতো উপন্যাসের কমললতাকে দেখা যায় অর্থের জন্য বৃন্দাবনের দিকে ফিরে গেছে। আর রাজলক্ষ্মী গঙ্গামাটির পোড়ামাটিতে জমিদারী কিনেছে। এক কথায় নারীর দুর্গতির আর প্রতিকারহীন লাঞ্ছনার কাহিনী বর্ণনা করেই লেখক কাহিনীতে ইতি টেনেছেন। কাহিনীটিতে ধারাবাহিকতা থাকলেও উপন্যাসের সংহত ও অখন্ড রূপ এতে ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতার বিবর্তনের ধারায় শরৎচন্দ্রই নির্ণায়ক হবেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এর প্রতি -মূল্যায়ণ করে ড. অশ্রুকুমার সিকদার যথার্থই লিখেছেন—

"তিনি (শরৎচন্দ্র) গতিনিয়ামক হয়েছেন একথা দুর্ভাগ্যজনক ঐতিহাসিক সত্য, আবার এটাও ঐতিহাহিক সত্য যে, জগদীশচন্দ্র গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—যাঁরাই বাঙলা সাহিত্যে আধুনিকতাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, তারা শরৎচন্দ্রের প্রভাবমুক্ত হয়েছিলেন বলেই তা করতে পেরেছেন।" (তদেব, পৃ. ৪৮)